প্রকাশকের কথা

বাংলাদেশের শীর্ষস্হানীয় ইসলামী বিদ্যাপিঠ জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দ্বীনের বহুবিধ খেদমত আঞ্জাম দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কওমী মাদরাসা হিসেবে উলামায়ে কিরামের অন্তরে স্হান করে নিয়েছে। বার বার তার পবিত্র অঙ্গন ধন্য হয়েছে দেশী-বিদেশী বহু আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের পদচারণায়। জামি‘আ রাহমানিয়ার খেদমতের বিস্তৃত পরিধি ও তার সূচারু সুষ্ঠ যুগোপযোগী পরিকল্পিত কার্যক্রম সম্পর্কে যারাই যথাযথভাবে অবগতি লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন, তাদের সকলেই অন্তর থেকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাণ খুলে দু'আ করেছেন, বাড়িয়েছেন সহযোগিতার হাত। যার দরুন শত ঝড়-ঝঞ্ঝা ও হাজারো প্রতিকূলতা সত্বেও জামি‘আ রাহমানিয়া তার মঞ্জিলে মাকসাদের দিকে এগিয়ে চলছে অব্যাহত গতিতে। অল্পদিনের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ঈর্ষণীয় মাকামে। এসব কৃতিত্বের পিছনে যাদের অবদান নীরবে রুহের ভূমিকা পালন করছে, তারা হলেন জামি‘আ রাহমানিয়ার মুখলিস আসাতেযায়ে কিরাম। আর তাঁদের অন্যতম হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদদ্বয় মুফতী মনসূরুল হক সাহেব ও মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশের আধ্যাত্মিক রাহবার বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহুমের এই খলীফাদ্বয় ব্যক্তি জীবনের সকল কামনা-বাসনাকে তুচ্ছ করে জামি'আ রাহমানিয়াকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

সত্যিকার মুখলিস আলেম গড়ার কারিগর জনাব মুফতী মনসূরুল হক সাহেব শুধু যে উস্তাদ তা নয় বরং ছাত্রের হতাশা ও প্রতিকূল অবস্হায় পরম হিদাকাংখী অভিভাবক ও বন্ধুরূপে আশার বাণী শুনিয়ে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি। আমাদের মত ভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত ছাত্রদের জন্য তিনি ছিলেন পরম শান্তনার জায়গা ও আশ্রয়স্হল।

জামি'আ রাহমানিয়ার খেদমতসমুহের মধ্যে অন্যতম একটি জাতীয় খেদমত ছিলো ‘মাসিক রাহমানী পয়গাম'–এর প্রকাশনা। এ পত্রিকার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিভাগ হলো প্রশ্নোত্তর বিভাগ। এ বিভাগে সমকালীন সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর যুগোপযোগী যথাযথ উত্তর প্রদান করতেন জনাব মুফতী সাহেব। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুফতী ও বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সাবেক খতীব জনাব মাওলানা মুফতী আব্দুল মুঈয (রহঃ)-এর অন্যতম নায়েব ও শাগরেদ জনাব মুফতী মনসূরুল হক সাহেবের দেয়া উত্তরসমূহ এতই আকর্ষণীয় হতো যে, সচেতন পাঠক সমাজের পক্ষ থেকে এগুলোকে গ্রন্হাকারে প্রকাশের তাগীদ বার বার করা হয়েছে।

আমাদের বর্তমান আয়োজন দুই খন্ডে সমাপ্ত ‘ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া' সে তাগীদের বাস্তবায়ন মাত্র।

ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া বাংলার ইসলামী সাহিত্যের ক্ষেত্রেই শুধু নয় বরং মুসলিম জনগনের দ্বীনী রাহনুমায়ীর ক্ষেত্রেও যুগান্তকারী অবদান রাখবে ইনশাআল্লাহ।

বহু বাধার পথ পেরিয়ে পাঁচ পাঁচটি প্রুফ ও দুটি ট্রেনিং থেকে কালো অক্ষরগুলো শেষ পর্যন্ত সাদা কাগজের গায়ে স্হান করে নেয়া পর্যন্ত একদল নবীনের পরিশ্রম সম্পর্কে পাঠক হয়তো কোনদিনই জানতে পারবেন না। কিন্তু যার জানা সবচেয়ে বেশী জরুরী সেই মহান রাব্বুল ‘আলামীনতো এর অস্তিত্ব লাভের পূর্ব থেকেই জানেন। আল্লাহপাক তাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন।

আমরা ফাতাওয়ার এই নাজুক সংকলনটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য খুবই চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কাজেই যদি কোন সচেতন পাঠকের চোখে এরূপ কোন অসংগতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদের অবগত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরে নিবো ইনশাআল্লাহ।

মাকতাবাতুল আশরাফের পক্ষ থেকে এরূপ একটি প্রয়োজনীয় সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহপাকের শুকরিয়া আদায় করছি, আল্লাহপাক এটিকে কবুল করুন এবং সকলের জন্য উপকারী বানান। আমীন! ইয়া রাব্বুল ‘আলামীন।

দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গেঃ আলহামদুলিল্লাহ! অতি অল্প সময়েই ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়ার প্রথম মুদ্রণ শেষ হল। সম্মানিত ইমাম সাহেবান ও উলামায়ে কিরামকে সাধারণত যে সকল মাসআলা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং একজন সচেতন মুসলমানের মনে যে সকল কৌতুহল জাগে তার প্রায় সবই এ সংকলনে এসেছে, এ বিষয়টি এর মাকবুলিয়্যাতের একটি কারণ। তাছাড়া মুফতী সাহেবের ইখলাস ও তাঁর পাঠকপ্রিয়তাও এর অন্যতম কারণ। ভুল মাসআলা ছড়াছড়ির এই যুগে এ সংকলন দ্বীনী রাহবার হিসেবে সকল মুসলমানের ঘরে থাকা একান্ত জরুরী। আল্লাহপাক আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক মাসআলা জেনে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বুল 'আলামীন।

বিনীত

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

সম্পাদনা পরিষদের কথা

আমি একজন মুসলমান। আমার রয়েছে একটি সতন্ত্র জীবনাদর্শ, রয়েছে নীতি নৈতিকতা। আমার জীবন কস্মিনকালেও নীতি নৈতিকতাহীন যাচ্ছেতাই ভাবে পরিচালিত হতে পারে না। আমাকে অনুসরণ করতে হবে কিছু বিধি, বর্জন করে চলতে হবে কিছু নিষেধ। এ অনুভূতি ও চেতনায় উদ্বেলিত হয়ে এরূপ বিধি-নিষেধ ও নীতি আদর্শের আলোকোজ্জল ধারায় পরিচালিত জীবনের নামই হল ইসলামী জীবন।

ইসলামী জীবন যাপনে জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও নীতিমালার কুরআন-সুন্নাহ তথা শরীয়ত ভিত্তিক বিশ্লেষণের নামই হল "ফাতাওয়া"। আর ফাতাওয়া প্রদানের এ দায়িত্বপূর্ণ কাজটি আঞ্জাম দিয়ে যারা দেশ ও জাতিকে ইসলামী জীবনধারা অনুসরণে পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকেন শরীয়তে তাদের সম্মানিত উপাধি হল "মুফতী"।

ইসলামী জীবন ধারায় কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন যাপনে ফাতাওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। ফাতাওয়া হলো ইসলামী জীবন পদ্ধতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ কারণেই ইসলামী বিধি-বিধান তথা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য জীবনাদর্শ ইসলাম শরীয়তের মৌল বিষয়াদি ও শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ ও আলোচনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, ইসলামী মৌলিক বিষয়াবলী ছাড়াও সময় ও পরিস্হিতির প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন বিষয়কে শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা বিশ্রেষণ করার প্রয়োজন ক্ষনে ক্ষনে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। আর সে জন্য দেশের দায়িত্বশীল উলামায়ে কিরাম এ দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে দ্বীন ও শরীয়তকে প্রাণবন্ত ও সচল করে রেখেছেন। বর্তমানে রয়েছে মুফতী বোর্ড, দারুল ইফতা, ফাতাওয়া বিভাগ ইত্যাদি নামে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর ঢাকা-এর দারুল ইফতা তথা ফাতওয়া বিভাগ সে প্রতিষ্ঠান সমূহেরই অন্যতম একটি কেন্দ্র।

আজ থেকে প্রায় একযুগ পূর্বে এক বৈরী পরিবেশে হাজারো ত্যাগ কুরবানীর প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল জামি'আ রাহমানিয়ার। দ্বীনের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগকে সহাস্যে বরণ করা ও বিলাস বহুল সুরম্য অট্টালিকা, আয়েশী জীবন পরিত্যাগ করে জীর্ণশর্ণি ছাপড়ায় কোন মত মাথা গুজে পবিত্র কুরআন আর হাদীসের শিক্ষা অব্যাহত রাখার এ অনুপম দৃষ্টান্ত জামি'আ রাহমানিয়ার ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে আছে। হক ও ইনসাফের পতাকাবাহী দ্বীনী শিক্ষার যথার্থ আত্ম নিবেদিত এক দল মর্দে মুজাহিদ, জামি'আ কর্ণধারদের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানী এবং অক্লান্ত শ্রমের বদৌলতেই সূর্যের ন্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে আজকের জামি'আ রাহমানিয়া। এর উন্নত শিক্ষা ব্যবস্হা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাহমানিয়ার ত্যাগী দ্বীনী কাফেলার মহান ত্যাগের বদৌলতেই আজ তাদেরকে মহান আল্লাহতা'আলা এভাবে পুরষ্কৃত করেছেন। সন্দেহ নেই, আজকের জামি'আ রাহমানিয়া অল্প

সময়ে দেশের সীমা অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে যে বিরল দৃষ্টি স্হাপন করেছে তা সত্যিকার অর্থেই মহান আল্লাহর এক অপার অনুগ্রহ।

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া তার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে তার ফাতাওয়া বিভাগের মাধ্যমে দেশের মুসলিম জনসাধারণের বিভিন্ন সমস্যার শরীয়ত সম্মত সমাধান দেয়ার কাজ সুবিন্যস্তভাবে আঞ্জাম দিয়ে আসছে। সে খিদমতকে আরো ব্যাপক করার লক্ষ্যে জামি'আ রাহমানিয়া থেকে প্রকাশিত মাসিক 'রাহমানী পয়গামে' (যা প্রথমে হক পয়গাম নামে প্রকাশিত হত) দেশ-বিদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে আসা বিভিন্ন প্রশ্নের শরীয়ত সম্মত সমাধান প্রদান ও ফাতাওয়া সম্পাদনার এ কাজ সূচনা লগ্ন থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছে দেশের প্রথিত যশা মুফতী ও মুহাদ্দিস জনাব মাওলানা মনসূরুর হক (দাঃবাঃ) এর দক্ষ হাতে। তিনি তার সহযোগী তৎপর ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ একদল নবীন-প্রবীন মুফতীকে সাথে নিয়ে দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সাথে এ দায়িত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন অব্যাহত গতিতে।

জামি'আ রাহমানিয়ার ফাতাওয়া বিভাগ থেকে দেয়া ও মাসিক রাহমানী পয়গামের প্রশ্ন-উত্তর কলামে প্রকাশিত এ যাবৎকালের ফাতাওয়াসমূহ ইতিমধ্যে ইসলামী শরীয়তের বিশ্লেষণধর্মী বিধানসমূহের এক বিশাল ভান্ডারে পরিণত হয়েছে। যা মুসলিম জনসাধারণের সামনে স্বতন্ত্র গ্রন্হাগারে পেশ করতে পারলে একজন মুসলমানের জন্য সেটি একটি "গাইড বুক" হিসেবে কাজ করতে পারে। এটি দ্বারা তৈরী হতে পারে একটি স্বতন্ত্র ফাতাওয়া গ্রন্হ।

এ অনুভূতি সকলের মাঝেই ছিল অত্যন্ত সতেজ। কিন্তু সে সব ফাতাওয়াকে সুবিন্যস্ত তরে স্বতন্ত্র গ্রন্হরূপে প্রকাশের অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও শ্রমবহুল, স্পর্শকাতর এ কাজে এগিয়ে আসা সহজ ব্যাপার নয়। অথচ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এটি ছিল অত্যন্ত জরুরী ও উপকারী।

শ্রদ্ধেয় মুফতী সাহেব (দাঃবাঃ), জামি'আর স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব (দাঃবাঃ) সহ আসাতিযায়ে কিরামের অনুপ্রেরণায় জামি'আর ১৪২১-২২ হিজরী শিক্ষাবর্ষের শিক্ষা সমাপনকারী দাওরায়ে হাদীস (এম.এ) এর ছাত্রবৃন্দ এ মহৎ কাজটি সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দাওরায়ে হাদীসের (১৪২১-২২ হিঃ) নিবেদিত প্রাণ এক দল তরুন আলেমের দিবা-নিশির অক্লান্ত শ্রমের ফসল হচ্ছে 'ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া'। এ গ্রন্থে মূলতঃ এ যাবৎকালে রাহমানী পয়গামের 'জিজ্ঞাসার জবাব' বিভাগে প্রকাশিত ফাতাওয়া সমূহকে বিভিন্ন অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সংযোজন ও বিয়োজনসহ নতুন নতুন তথ্য ও উদ্বৃতি সংযুক্ত করে এক কথায় নতুন আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর তা পাঠকবর্গের সামনে পেশ করা হয়েছে।

সময় ও শ্রম দিয়ে গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষেত্রে যারা সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। আমরা তাঁদের প্রতি শুধু অকৃত্রিম শুকরিয়া জানিয়েই তাঁদের খাটো করছিনা। আল্লাহতা'আলা তাঁদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবর্গের সমীপে অনুরোধ। দরসী ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে স্বল্প সময়ে এ বৃহৎ কর্ম সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় ক্ষেত্র বিশেষে অসংলগ্নতা ও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। কোন সচেতন পাঠকের নজরে এমন কিছু গোচরীভূত হলে তা অনুগ্রহ পূর্বক আমাদেরকে মুক্ত মনে অবগত করবেন। সংশোধনীর ব্যাপারে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মহান মাওলার শাহী দরবারে আমাদের বিনীত ফরিয়াদ, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমাদের এ মেহনতটুকু কবুল কর, মাকবুলিয়্যাত দান কর। এটাকে আমাদের পিতামাতা, আমাদের আসাতিযায়ে কিরাম এবং সকল পাঠক-পাঠিকার জন্য ইহ ও পরকালীন মুক্তি ও নাজাতের উসিলা বানিয়ে দাও। এর দ্বারা উপকৃত কর তোমার বান্দা-বান্দীদের, ক্ষমা কর আমাদের ত্রুটিগুলো। তাকাব্বাল ইয়া রব্বাল 'আলামীন। আমীন!

বিনীত

সম্পাদনা পরিষদ

ফাতাওয়া প্রসঙ্গে কিছু কথা

ফাতাওয়া কি ও কেন?

ফাতাওয়া একটি আরবী শব্দ। ফাতাওয়ার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান, চাই শরঈ আহকামের সাথে সম্পর্কিত হোক বা অন্য কিছুর সাথে। পরবর্তীতে এ শব্দটি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে শরঈ প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রে। ইসলামী পরিভাষায় দ্বীনী প্রশ্নের কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক উত্তরকেই ফাতাওয়া বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উল্লেখ্য, সাধারণ মুসলমান কোন ধর্মীয় বিষয় সম্পর্কে জানার প্রয়োজন হলে একজন মুফতীর শরনাপন্ন হন। তিনি তাদেরকে শরীয়তের সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। এটা একজন মুফতীর দায়িত্ব ও কর্তব্য।

ফাতাওয়া কোন ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় নয়। এটা কোন উর্বর মস্তিস্কের আবিষ্কার বা কল্পিত গল্প নয়। এটা আল্লাহ প্রদত্ত আইন। এর সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আছে ইসলামী বোধ-বিশ্বাস, ইতিহাস ঐতিহ্য। ফাতাওয়া মানে কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস যুগে-যুগে, ক্ষণে-ক্ষণে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলোর শরীয়তসম্মত মীমাংসাই তো ফাতাওয়া। একজন মানুষকে জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সামাজিক জীবন থেকে নিয়ে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত মানুষের সমস্যা অন্তহীন। এসবের আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল নির্দেশিত বিশুদ্ধ ও যথার্থ বিধানই ফাতাওয়া। এই ফাতাওয়া ছাড়া একজন ঈমানদার মুহূর্তের জন্যও বাঁচতে পারে না। হ্যাঁ, ফাতাওয়া ছাড়া আরেকটি জীবন কল্পনা করা যায় সেটা হলো চতুষ্পদ জন্তুর জীবন। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য ইসলামী শত্রুরা আর কিছু অবুঝ নামধারী মুসলমান তাদের অনুকরণে ফাতাওয়ার মত কুরআনের এই পবিত্র সম্মানিত শব্দ ও বিষয় নিয়ে ভয়ানক ও আত্মঘাতি অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে। তারা বুঝে না, ফাতাওয়া ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, এর সাথে ঈমানের গভীর সংযোগ।

সর্বপ্রথম ফাতাওয়া প্রদানকারী আল্লাহ তা'আলা

ফাতাওয়ার উৎপত্তি হয় মহান রাব্বুল 'আলামীন থেকে। মূল ফাতাওয়া দাতা হলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন। কুরআনে মাজীদে এ সম্পর্কে মহান স্রষ্টা ঘোষণা করেছেন قل الله يفتيكم في الكلا لة বলুন, (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম!) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কালালা (যার কোন সন্তান-সন্ততি ও মাতা-পিতা নেই তার উত্তরাধিকার) সম্পর্কে ফাতাওয়া দিচ্ছেন........। [সূরা নিসাঃ ১৭৬।]

অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ফাতাওয়া প্রদান করেছেন সাইয়্যিদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তারপর সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন থেকে আইম্মায়ে মুজতাহিদীন হয়ে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবেই হক্কানী উলামায়ে উম্মত ফাতাওয়ার এই গুরু দায়িত্ব অব্যাহতভাবে পালন করে আসছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বিশিষ্ট মুফতী ছিলেন অন্তত ১৩০ জন। চার খলীফা, ইবনে মাসউদ, আবদুর রহমান ইবনে আউফ, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর, আয়িশা সিদ্দীকা, আনাস, আবূ হুরাইরা (রাঃ) প্রমুখের নাম সবিশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইমাম চতুষ্ঠয় ছিলেন বিশিষ্ট মুফতী। তাছাড়া ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার সহ হাজারো মুফতীর ফাতাওয়া ঐতিহাসিক কীর্তি হিসেবে আজো বিদ্যমান।

মুফতীই ফাতাওয়া প্রদানের অধিকার রাখেন

রাসূলের যোগ্য উত্তরসূরী, ইসলামী বিধান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ মুফতীগণই কেবল ফাতাওয়া প্রদানের যোগ্য ও অধিকার প্রাপ্ত। যে কোন সাধারণ আলেমেরও ফাতাওয়া দেয়ার অধিকার নেই। আগেতো সরকারীভাবেই মুফতী নিয়োগ করা হতো। ভারতবর্ষে ইংরেজদের দখলদারীর পর সরকারীভাবে এই ধারা বন্ধ

হয়ে যায়। তারপর থেকে দারুল উলূম দেওবন্দ ও বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশিষ্ট মুফতীয়ানে কিরাম জাতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ দায়িত্বটি নিরলসভাবে লিল্ল্যাহিয়্যাতের সাথে আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। গোটা দুনিয়ায় মুফতীয়ানে কিরামের সেসব ফাতাওয়া সশ্রদ্ধভাবে ও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মেনে নেওয়া হয়।

এরপর ইংরেজ দখলদারীর অবসানের পর রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হলেও মুফতীগণের ফাতাওয়া কস্মিনকালেও বন্ধ হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত হবেও না ইনশাআল্লাহ। উলামায়ে উম্মতের এই ফাতাওয়াই ইসলামী উম্মাহকে চিরজীবি করে রেখেছে। সারা বিশ্বের ঈমানদারদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত গোটা জিন্দেগীকে সচল রেখেছে এই ফাতাওয়া। এক কথায় ইসলামী উম্মাহর অস্তিত্ব ও স্হায়িত্বের মূল উপাদান হল ফাতাওয়া।

ফাতাওয়ার প্রভাব

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.)-এর ঐতিহাসিক ফাতাওয়া ইতিহাসের পাতায় স্হান করে নিয়েছে। তিনিই ফাতাওয়া দিয়েছিলেন ইংরেজ কবলিত ভারত মহাদেশকে ‘দারুল হরব’ (শত্রু কবলিত দেশ) বলে। তিনি বলেছিলেন- ‘ভারত এখন দারুল হরব।’ এবার হয় জিহাদ করতে হবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে, না হয় দেশ থেকে হিজরত করতে হবে। ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র থেকে তিনি এই ফাতাওয়া দেয়ার সাথে সাথে জনগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার ফলশ্রুতিতে ইংরেজ জাতি এ দেশ থেকে অপদস্হ হয়ে বিতাড়িত হয়। শাহ আব্দুল আযীযের সেই ফাতাওয়া আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ মাইলফলক রূপে ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ইংরেজরাও এর স্বীকৃতি দিয়েছে।

মূলতঃ উলামায়ে উম্মতের ফাতাওয়ার উপর ভিত্তি করেই রেশমী রুমাল আন্দোলন, ফরায়েযী আন্দোলন, সৈয়দ আহমদ শহীদের জিহাদ, শামেলীর যুদ্ধ, তীতুমীরের যুদ্ধ ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটেছে। এক কথায় ফাতাওয়ার প্রভাব মুসলমানদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে সর্বত্রই। একে অস্বীকার করা মানে দিবালোকে সূর্যকে অস্বীকার করা। ফাতাওয়ার এই অসাধারণ প্রভাব দেখেই ইসলাম বিদ্বেষী মহল এর বিরুদ্ধে বিষাদগার করছে। দুঃখজনকভাবে একশ্রেণীর মুসলমানও না বুঝে অথবা ইসলামের শত্রুদের ফাঁদে পড়ে ফাতাওয়ার বিরুদ্ধে অবস্হান গ্রহণ করছে।

অথচ ফাতাওয়া ছাড়া একজন মুসলমান মুহূর্তের জন্য বাঁচতে পারে না। ফাতাওয়া কুরআন ও সুন্নাহ এর সারমর্ম। ফাতাওয়া আল্লাহ দিয়েছেন, নবীজী প্রদান করেছেন, দায়িত্ব বর্তিয়েছে উম্মতের মুফতীয়ানে কিরামের উপর। তাই ফাতাওয়াকে অস্বীকার করা মানে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে দ্বীনের মূল ভিত্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এই বিদ্রোহের পর একজন মানুষ কখনো মুসলমান থাকতে পারে না।

ফাতাওয়ার কার্যকারিতা

কোন দেশে যদি রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসন না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফাতাওয়ার কার্যকারিতা নির্ভর করবে পরিস্হিতির উপর। এর বাস্তবায়নের জন্য জনগনকে মুফতীরা বাধ্য করবেন না। এমতাবস্হায় জনগণ তা গ্রহণ করে নিলে আলহামদুলিল্লাহ। যেমন- দারুল হরবেও শাহ আব্দুল আযীয (রহ.)-এর ফাতাওয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনসাধারণ মেনে নিয়েছিলেন।

দন্ডবিধি বাস্তবায়ন মুফতীর দায়িত্ব নয়

আমাদের এ বিষয়টিও স্মরণ রাখতে হবে যে, রাষ্ট্র যদি ইসলামী হয় তাহলে ফাতাওয়া প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের ন্যস্ত থাকে সরকারের উপর। আর রাষ্ট্র ইসলামী না হলে শরঈ দন্ডবিধি বাস্তবায়ন মুফতীর দায়িত্ব নয়। মুফতী সাহেব শুধু শরঈ সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন। বাস্তবায়নের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকারের। বাংলাদেশে কোন কোন

অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত লোক যিনা-ব্যভিচারের দন্ড বাস্তবায়নের বিচ্ছিন্ন দুই একটি ঘটনা ঘটিয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে অথচ দোষ চাপানো হয়েছে মুফতী ও আলেম সমাজের উপর। এটা কোন ক্রমেই কাম্য নয়।

আইন ও ফাতাওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি উদ্যোগ

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আইম্মায়ে কিরামের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকাহ ও ফাতাওয়া সংকলনে মৌলিক ও বুনিয়াদী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। আইন ও ফাতাওয়া পরিষদ তৈরী করে তিনি এর সুবিশাল খিদমতের দ্বার উম্মতের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। ৪০ অথবা ৫০ কিংবা ৭০ জন বিশিষ্ট ফকীহ মুফতী মুহাদ্দিস মুজতাহিদ ছিলেন তার সেই আইন সভার সদস্য। সে সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তবলী তথা ফাতাওয়া উলামায়ে উম্মতের নিকট আজো সংরক্ষিত আছে। এরূপভাবে প্রচুর ফাতাওয়ার কিতাব মুফতীগণ তৈরী করেছেন।

হিজরী ১১ শতকে সম্রাট আলমগীর সিংহাসনে আরোহনের চার বৎসর পর ফাতাওয়ার একটি প্রামাণ্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের শাহী ফরমান জারী করেছিলেন। দেশের বিজ্ঞ আলেম মুফতীদের সমন্বয়ে নিজামুদ্দীন বুরহানপূরীর সভাপতিত্বে সুদীর্ঘ আট বৎসরের নিরলস প্রচেষ্টায় তৈরী হয়েছিল বিখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ‘ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী’।

ফাতাওয়া ও ইসলামী আইন সংকলনের ফলপ্রসূ ও সুনিপণ প্রচেষ্টা সারা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। ১৮শ শতকে তুর্কী সুলতান দেওয়ানী আইন সংকলন করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৯ সালে একটি নির্দেশ বলে সাআদত পাশার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। সে কমিটি একটি ইসলামী দেওয়ানী আইন সংকলন করে। এর নাম দেয়া হয় مجلة الاحكام العدلية। ১৯১৭ সালে তৈরী করা হয় বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন। حقوق العا ئلة নামে সেটি পরিচিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইসলামী আইন ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করার যে ধারা গড়ে উঠে তাতে মিসর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। মিসরে ব্যক্তি সম্পর্কিত আইন সংকলনের কাজ সর্বপ্রথম ১৯১৫ সালে আরম্ভ হয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে চার মাযহাবের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠিত হয়। এর দীর্ঘ ৬ বৎসরের শ্রম ও সাধনার ফলে পান্ডুলিপি তৈরী ও প্রকাশিত হয়।
الا حكام الشرعية في الا حوال الشخصية নামে এটি প্রসিদ্ধ।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে সিরিয়ায় প্রকাশিত হয় ব্যক্তি আইনের সংকলন قانون الاحوال الشخصية। তিউনিশিয়ায় সংকলিত হয় ব্যক্তি আইন مجلة الاحوال الشخصية নামে। বস্তুতঃ لائحة الاحوال الشخصية নামক একটি আইন সংকলন ইরাকের বিচার মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় ১৯৫৯ ইংরেজীতে। মরক্কোতে مدونة الاحوال الشخصية নামে, জর্ডানে قانون حقوق العا ئلة الاردني নামে ইসলামী আইন সংকলিত হয়। এমনকি সিংগাপুরেও এরূপ উদ্যোগ গ্রহন করা হয় ১৯৫৭ সালে এবং সেখানে মুসলিম অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। এই আইনের আওতায় শরীয়তসম্মত আদালত কায়েম করা হয়। ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের ফিল্ড মার্শাল আইউব খানও পারিবারিক আইন কমিশনের প্রস্তাব মুতাবিক পারিবারিক আইন অর্ডিন্যান্স জারী করেন। কিন্তু তাতে অনেকগুলো বিষয় ছিল ইসলামী আইনের পরিপন্থী। যে কারণে হক্কানী উলামায়ে কিরাম তার স্বীকৃতি দেননি বরং তার বিরোধিতা করেছেন এবং সংশোধনীর দাবী জানিয়েছেন এবং এখনো সে দাবী অব্যাহত আছে। তাছাড়া উলামায়ে উম্মত যুগে যুগে অনেক মূল্যবান পূর্ণাঙ্গ ফাতাওয়ার কিতাব রচনা করে গেছেন। নিম্নে কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হল-

ফিকাহ ও ফাতাওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

(১) জামে সগীর, (২) জামে কবীর, (৩) সিয়ারে সগীর, (৪) সিয়ারে কবীর, (৫) কিতাবুল আসল (মাবসূত), (৬) যিয়াদত (জাওয়াহিরুল রেওয়ায়াত, এছাড়া আরো রয়েছে নাওয়াদিরুর রেওয়ায়াত), (৭) কাফী, (৮) মাবসূতে সারাখসী, (৯) আল হাভিল কুদসী, (১০) আলহাভী লিলহাসীরী, (১১) আলহাভী লিযযাহিদী, (১২) ফাতাওয়া

সিরাজিয়্যাহ, (১৩) ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, (১৪) ফাতাওয়া কাযী খান, (১৫) মাজমাউল ফাতাওয়া, (১৬) মাফাতীহুল আসরার, (১৭) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, (১৮) ফাতাওয়া সুগরা, (১৯)ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যাহ, (২০) যখীরাতুল ফাতাওয়া, (২১) বিকায়া, (২২) কানযুদ দাকায়িক, (২৩) আল মুখতার লিল ফাতাওয়া, (২৪)ফাতাওয়া ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাহ, (২৫) মাজমাউল বাহরাইন ওয়া মুলতাকান নাহরাইন, (২৬) মুলতাকাল আবহুর, (২৭) আদদুররুল মুনতাহা, (২৮) তুহফাতুল ফুকাহা, (২৯) গুরারুল আহকাম, (৩০) দুরারুল বিহার, (৩১) তানভীরুল আবসার, (৩২) আল মুহীতুল কবীর, (৩৩) আদদুররুল মুখতার, (৩৪) রুদ্দুল মুহতার (শামী), (৩৫) ফাতাওয়া খায়রিয়্যাহ, (৩৬) মাজহারুল হাকায়িক, (৩৭) কুহিসতানী, (৩৮) কিনইয়াতুল মুনইয়াহ, (৩৯) আস সিরাজুল ওয়াহহাজ, (৪০) আল জাওহারাতুন নায়্যিরাহ, (৪১) ফাতহুল কাদীর, (৪২) আল-বাহরুর রায়িক, (৪৩) আল-বাদায়িউস সানায়ি, (৪৪) ইমদাদুল ফাতাওয়া, (৪৫) ইমদাদুল মুফতীন, (৪৬) ইমদাদুল আহকাম, (৪৭) ফাতাওয়া দারুল উলুম, (৪৮) ফাতাওয়া মাহমুদিয়্যাহ, (৪৯) আহসানুল ফাতাওয়া, (৫০) জাওয়াহিরুল ফিকাহ ইত্যাদি।

এগুলো হলো ইসলামী আইন ও ফাতাওয়া সংকলন সংক্রান্ত বিভিন্নমুখী তৎপরতা। এই তৎপরতা যুগে যুগে অব্যাহত ছিল এবং থাকবে। কোন বাতিল শক্তি কোনদিন এটাকে মিটাতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

যাই হোক, ইসলামকে উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত টিকিয়ে রাখার মানসে ঐতিহ্যবাহী জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ফাতাওয়ার ধারাবাহিকতা চালু রাখা হয়। দীর্ঘ দিনের সে ফাতাওয়া গ্রন্থাগারে প্রকাশের সে উদ্যোগ নেয়া হয় এবার। আলহামদুলিল্লাহ, প্রায় ১০০০ পৃষ্টার এই ফাতাওয়া দুই খন্ডে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ২০০১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রকাশিত ফাতাওয়াগুলো এতে এসেছে। আল্লাহ তা‘আলা এটিকে এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন।

সতর্কবাণী

স্মর্তব্য, ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া একটি ফাতাওয়া সংকলন। এই সংকলন দ্বারা উদ্দেশ্য শরীয়তের সিদ্ধান্ত জেনে সে মুতাবিক আমল করা। এটা ফাতাওয়া দেয়ার জন্য নয়। সাবধান! এটি অধ্যয়ন করে কেউ যেন ফাতাওয়া দিতে আরম্ভ না করেন। ফাতাওয়া দেওয়ার জন্য শুধু একটি বাংলা গ্রন্থই নয় বরং আরবী কিতাবাদী অধ্যয়ন করাও যথেষ্ট নয়। শুধু কিতাব অধ্যয়ন করে ফাতাওয়া দেয়া করো জন্য জায়েয নেই। ফাতাওয়া দিতে হলে ইসলামী আইন বিষয়ে পারদর্শী হতে হয় এবং নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ মুফতীর নিকট নিয়মতান্ত্রিকভাবে ফাতাওয়া শিখতে হয়। এভাবে ফিকাহ সংক্রান্ত স্বাভাবিক যোগ্যতা ও বুৎপত্তি অর্জনের পর ফাতাওয়া দেয়া যায়। অতএব, কোন পাঠক যেন ১/২ টি বাংলা ফাতাওয়ার গ্রন্থ দেখে ফাতাওয়া প্রদান করতে আরম্ভ না করেন। ফাতাওয়া যার দায়িত্ব, যিনি এর যোগ্য তার নিকটই ফাতাওয়ার জন্য শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ফাতাওয়া প্রদান একটি স্পর্শকাতর বিষয়। এর মানে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ্যতা করা। যথাযথভাবে এর যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও এর আসনে সমাসীন হওয়া মানে নিজেকে ছুরি ছাড়া জবাই করা। আল্লাহ তা‘আলা হেফাযত করুন। আমীন!

বিনীত

সম্পাদনা পরিষদ

ফাতাওয়ায়ে রাহমানিয়া

জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ঈমান ও আকাইদ

বিষয় পৃষ্ঠা

{পৃষ্ঠা-৪৩}

بسم الله الرحمن الرحيم

ঈমান ও আক্বাইদ
তাওহীদ ও রিসালাত

তাকদীরের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া

জিজ্ঞাসা: উলামায়ে কেরামের বয়ানে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'টি কিতাব বাদফতর আছে। তার একটির মধ্যে শুধু জান্নাতীদের নাম আছে। আর অপরটির মধ্যে আছেকেবলমাত্র জাহান্নামীদের নাম । উভয় খাতায় নাম গুলো যোগ করে টোটাল সংখ্যানির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে কোন হের ফের বা কম বেশ হবে না। তাহলেপ্রশ্ন হয় যে, সব কিছু যদি আগেই নিদির্ষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমাদেরকষ্ট করে আর আমল করার প্রয়োজন কি? তাছাড়া আমল করেই বা লাভ কি? ফয়সালা তোআগেই হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে একটু খুলে বলার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, এ ব্যাপারে আমি খুবই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মাঝে আছি।

জবাব : আপনি যে হাদীসটি শুনেছেন, তা সহীহ ও সঠিক। হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উক্ত হাদীসটি বর্ণিত আছে। তবে উল্লেখিত হাদীসটি নিয়ে নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করা উচিৎ নয়। কারণ, তাকদীরের ব্যাপারে নিজের আকল-বুদ্ধি দ্বারা গবেষণা করা বা তর্ক- বিতর্কে লিপ্ত হওয়া অথবা বিস্তারিত অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা শরীয়তে নিষেধ। একথা ঠিক, আল্লাহ্ তা'আলা তার পরিপূর্ণ জ্ঞান ও ইলমের দ্বারা লিখে রেখেছেন যে, কোন বান্দা নিজের ইখতিয়ার অনুযায়ী আমল করে জান্নাতের বাসিন্দা হবে, আর কোন বান্দা হবে জাহান্নামের বাসিন্দা। তবে তিনি এরূপ কেন লিখে রেখেছেন তা তিনিই জানেন। এর মধ্যে অনেক হিকমত নিহিত রয়েছে। আমাদের শুধু এতটুকু জানতে হবে যে, এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি? এর চেয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত নয়।

এ ব্যাপারে বান্দার যিম্মাদারী হলো, আল্লাহ্ তা'আলার এই ফয়সালার উপর ঈমান আনা এবং বাস্তবিক পক্ষে যে দুটি কিতাব তৈরী আছে, তা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করা। এতটুকু করলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে গেল। এর উপর ভিত্তি করে আমল না করা বা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করা আমাদের দায়িত্ব বহির্ভূত বা অনধিকার চর্চার শামিল। সারকথা, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, উক্ত দুই ব্যাপারে বান্দার যিম্মাদারী

{পৃষ্ঠা-৪৪}

কিতাবের উপর ঈমান রাখা এবং নিজের ইখতিয়ার দ্বারা আল্লাহর হুকুম আহকাম ও বিধি নিষেধ বাস্তবায়ন করা। কারণ, উক্ত কিতাবদ্বয়ে কি লেখা আছে, তা আমাদের জানা নেই। তাছাড়া সেই লেখা দ্বারা আমাদের ইখতিয়ার ও শক্তি তো নষ্ট হয়ে যায়নি। সুতরাং কিতাবে যাই লেখা থাকুক, আমাদের আমল করে যেতে হবে এটাই বান্দার বান্দেগী ও তার দায়িত্ব। আর এরই মধ্যে তার সার্বিক কল্যাণ নিহিত রয়েছে। উক্ত হাদীস শুনে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও একই প্রশ্ন করেছিলেন। জওয়াবে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁদেরকে কিতাবের উপর ভরসা করে বসে না থেকে আমল করতে বলেছিলেন। কারণ, আমলই বান্দার ইখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়।

উক্ত কিতাবে দুটি সম্পর্কে একটি উদাহরণ পেশ করা হচ্ছে। আশা করা যায় এর দ্বারা বিষয়টি অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন, একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম বাদশাহের দরবারে বিভিন্ন লোকের যাতায়াত ও যোগাযোগ

আছে। কেউ বাদশাহকে দ্বীনী ব্যাপারে সহযোগিতা করতে আসেন এবং তার দ্বীনদারীর কারণে তাকে মুহাব্বত ও শ্রদ্ধা করেন। আবার অনেকে নিজের হীন স্বার্থ আদায়ের জন্য বাদশাহের প্রতি বাহ্যতঃ মুহাব্বত প্রদর্শন করেন। এক সময় বাদশাহ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যেম প্রকৃত বাদশাহ প্রেমীদের পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু সমস্যা হলো নকল মুহাব্বতকারীগণ দুর্নাম রটাবেন যে, বাদশাহ মহোদয় আমাদের প্রতি ইনসাফ করলেন না। বাস্তবে আমরাও তাকে ভালবাসি। কিন্তু তিনি আমাদেরকে পুরস্কান না দিয়ে অন্যদেরকে দিলেন। এ সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য বাদশাহ একটা হিকমত অবলম্বন করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন যে, আমার দরবারে দুটি দফতর তৈরী করা হয়েছে। ১ম দফতরে যাদের নাম এসেছে, তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি পুরস্কৃত করব। আর ২য় দফতরে যাদের নাম এসেছে তাদেরকে নির্দিষ্ট তারিখে আমি শাস্তি প্রদান করব এবং উভয় দফতর চূড়ান্ত করে শেষে টোটাল লাগানো হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে পরিবর্তনের কোনা সুযোগ নেই। বাদশাহের এ ঘোষণার পর প্রকৃত বাদশাহ প্রেমীগণ তাদের আচার-আচরণ ও দরবারে যাতায়াতের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করবেন না। তারা বললেন যে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই আল্লাহওয়ালা বাদশাহকে মুহাব্বত করেছি এবং তার কাজে সহযোগিতা করেছি। সুতরাং আমরা নেক কাজ করেই যাব। চাই বাদশাহ আমাদেরকে পুরস্কৃত করুন বা শাস্তি প্রদান করুন। এটা বাদশাহের নিজস্ব ব্যাপার।

আর স্বার্থান্বেষী মহল বাদশাহের ঘোষণার পরে বাদশাহের দরবারে আসা- যাওয়া ও সহযোগিতা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিল। তারা বলতে লাগল যে, দু'টি দফতর যখন তৈরী হয়ে গেছে, তাহলে এখন দরবারে যাতায়াত বৃথা। কারণ,

{পৃষ্ঠা-৪৫}

প্রথম দফতরে নাম থাকলে সর্বাবস্থায় পুরস্কার পাওয়া যাবে। সুতরাং দরবারে যাওয়া না যাওয়ার সাথে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি ভাবে যদি দ্বিতীয় দফতরে নাম থাকে, তাহলে শাস্তি তো নিশ্চিত। কাজেই দরবারে গিয়ে সময় নষ্ট না করে নিজের কাজ করাই ভালো।

এরপরে নির্দিষ্ট তারিখে দেখা গেল যে, যারা দফতরের উপর ভরসা করে যাতায়াত বন্ধ করেছিলে তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পেয়েছে। আর যারা তাদের খালেস মুহাব্বতের কারণে পুরস্কৃত হয়েছেন। এটা হলো উপরোক্ত বিষয়ের এটি উদাহরণ। এর উপর ভিত্তি করে আমরা আল্লাহ তা'আলার দুই কিতাবের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারি। আল্লাহ তা'আলা রূহের জগতে প্রথম যখন সকলকে জমা করেছলেন, তখনই নিজের ইলম মুতাবিক এক দলকে জান্নাতে, আরেক দলকে জাহান্নামে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু এমতাবস্থায় কাফির-মুশরিকদের আল্লাহর বিরুদ্ধে এই অভিযোগের সুযোগ থাকতো যে, আল্লাহ আমাদের সেই দুনিয়ায় পাঠিয়ে আমল করার সুযোগ দিলে আমরা অন্যদের থেকে বেশী আমল করতাম। কিস্তু আল্লাহ তো আমাদেরকে সুযোগই দিলেন না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা তার ইলম দ্বারা ফয়সালা না করে সকলকে আমলের সুযোগ দিয়ে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং উভয় দফতরের কথা ঘোষণা করেছেন। এখন দুনিয়াতে যারা দফতরের উপর ঈমান তো রাখবে কিন্তু দফতরের ভরসায় আমল পরিত্যাগ করবে না, হাশরের ময়দানে দেখা যাবে- শুধু তাদেরই নাম জান্নাতী দফতরে লেখা আছে। আর যারা দফতরের উপর নির্ভর করে আমল করেনি, দুনিয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুব বুদ্ধিমান হলেও আখেরাতের ব্যাপারে বড়ই অলস। অথচ যুক্তি-তর্কে খুব পারদর্শী। হাশরের ময়দানে দেখা যাবে যে এ লোকগুলোর নাম জাহান্নামের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সারকথা, আল্লাহর এ কিতাবদ্বয়ের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া যাবে না বরং আমল করতে হবে তাহলে পরকালে জান্নাতী হওয়া যাবে।

জিজ্ঞাসাঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এই কালিমার মধ্যে আল্লাহ এবং রাসূল অর্থাৎ স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে 'ওয়াও' শব্দ ব্যবহার না করার কারণে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য মনে হয় না। এ ব্যপারে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সে সবের মিল থাকা জরুরী নয়। আর আরবী ভাষায় বিশেষত্বের মধ্যে এটাও

{পৃষ্ঠা-৪৬}

একটা যে, বাক্যে কখনো কখনো দু'একটা শব্দ উহ্য থাকে। তখন ভাষান্তর করার সময় তা প্রকাশ করে তরজমা করতে হয়। নতুবা বাক্যের ভাব পূর্ণ হয় না। প্রশ্নোল্লেখিত কালিমায়ে তায়্যিবার ব্যাপারটিও এমন।
অতএব, কালিমা তাইয়্যিবার মাঝে 'ওয়াও' শব্দ ব্যবহার করা হলো না কেন? এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য রইল না- এ ধরনের কোন প্রশ্নের অবকাশ রইল না। ভন্ড ও বিদ'আতীদের আলাপে বিভ্রান্ত হবেন না।
জবাবঃ প্রত্যেক ভাষারই কিছু না কিছু বিশেষত্ব থাকে। বাংলা ভাষার সঙ্গে সে সবের মিল থাকা জরুরী নয়। আর আরবী ভাষায় বিশেষত্বের মধ্যে এটাও একটা যে, বাক্যে কখনো কখনো দু'একটা শব্দ উহ্য থাকে। তখন ভাষান্তর করার সময় তা প্রকাশ করে তরজমা করতে হয়। নতুবা বাক্যের ভাব পূর্ণ হয় না। প্রশ্নোল্লেখিত কালিমায়ে তায়্যিবার ব্যাপারটিও এমন।
অতএব, কালিমা তাইয়্যিবার মাঝে 'ওয়াও' শব্দ ব্যবহার করা হলো না কেন? এতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য রইল না- এ ধরনের কোন প্রশ্নের অবকাশ রইল না। ভন্ড ও বিদ'আতীদের আলাপে বিভ্রান্ত হবেন না।
জবাবঃ সর্বত্র হাযির-নাযির হওয়া যেমন আল্লাহ তা'আলার বৈশিষ্ট তদ্রূপ আলিমুল গায়েব হওয়ার আল্লাহর বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কাউকে নিজ ক্ষমতা বলে আলিমুল গায়েব ও হাযির নাযির বিশ্বাস করা শিরকী কাজ। যে কেউ এরূপ আকীদা রাখবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। তার পিছনে নামায পড়া জায়িয হবে না। তার বিবাহ বন্ধনও ঠিক থাকবে না। নতুনভাবে কালিমা পড়ে ঈমান এনে তওবা করে বিবাহ দুহরিয়ে নিতে হবে।
আর যদি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত বলে হাযির-নাযির কিংবা আলিমুল গায়েব মনে করে তা হলে সেটা তার মনগড়া মত এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ হবে। কেননা,আল্লাহ পাক কোথাও একথা বলেননি যে, তিনি স্বীয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে হাযির-নাযির কিংবা আলিমুল গায়েব বানিয়েছের; তেমনি রাসূলও কখনো দাবী করেননি যে তিনি হাযির-নাযির বা আলিমুল গায়েব ছিলেন।
উপরন্তু খোদ নবী জীবনে এমন বহু ঘটনা রয়েছে যাদ্বারা এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনি নির্দিষ্ট ওহীর বাইরে অন্য কোন গায়েব জানতেন না এবং তিনি হাযির নাযিরও ছিলেন না।
হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর প্রতি মুনাফিকদের মিথ্যা অপবাদ ও বীরে মাঊনায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রিয় সাহাবীদের শাহাদতের ঘটনা, ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে বিষ মিশ্রিত খানা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি

{পৃষ্ঠা-৪৭}

ওয়াসাল্লাম)-এর খাওয়া সহ অসংখ্য ঘটনা এর জলন্ত প্রমাণ। কোন কোন জাহেল কুরআন মাজীদের দুএকটা শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এ গোমরাহ মতবাদ প্রমাণ করতে চায় যা স্বয়ং কুরআন মাজীদের অসংখ্য আয়াতের স্পষ্ট ভাষ্যের পরিপন্থী হওয়ায় তাদের মুর্খতাকেই দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ করে দেয়।
সুতরাং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম আলিমুল গায়েব বা হাযির-নাযির এমতটি নিছক গোমরাহী আকীদাগত মারাত্মক ধরনের বিদআত। এ মত পোষণকারী কাফের হবে না বটে, তবে নিশ্চিত ফাসিক এবং গোমরাহ। এমন লোকের ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী। বিনা উযরে তার উকতেদা করাও মাকরূহে তাহরীমী। মসজিদ কমিটির উচিত এমন ইমামকে উক্ত আকীদা হতে তাওবা না করলে অব্যাহতি দিয়ে মুত্তাকী পরহেযগার আলেমকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দেয়।
(২) পৃথকভাবে ইমাম মাহদী-এর সাথে আলাইহিস সালাম না বলাই ভাল। যেহেতু এটা পারিভাষিকভাবে নবী এবং ফেরেশতাগণের জন্য খাছ।

[প্রমাণ ঃ খাইরুল ফাতওয়া ১ঃ১৪৭, # আহসানুল ফাতওয়া ১ঃ২০১, # শামী ৬ঃ৩৯৬]

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মাওলানা সাহেব বলেছেন এবং ফাতওয়াও দিয়েছেন যে, নবী করীম (সাঃ) হাযির-নাযির। এটাই তিনি বিশ্বাস করেন। এটাই তিনি বিশ্বাস করেন। এ ফাতওয়াটা কতটুকু সত্য? হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে জানালে অত্র এলাকাবাসী উপকৃত হবে।

জবাবঃ সর্বত্র হাযির-নাযির থাকা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ছিফাত। কোন নবী বা ওলী সব জায়গায় হাযির-নাযির হতে পারেন না। আল্লাহ তা'আলার ছিফাতের সঙ্গে বান্দাকে মিলানো কুফর ও শিরক। এ ধরনের বিশ্বাস দ্বারা ঈমান চলে যায়। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন, তোমরা আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লে ফিরিস্তাদের মাধ্যমে তোমাদের নাম ও গোত্রসহ তা আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

[নাসাঈ শরীফ ১ঃ১৪৩]

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির-নাযির কুরআন ও হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই। যারা এ রকম বিশ্বাস রাখে, তারা গোমরাহ এবং বিদ'আতী। এটা শুধু হানাফী মাযহাবেরই নয় বরং সকল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা। তাদের পিছনে নামায মাকরূহ তাহরীমী হবে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুনঃ [(১) শরীয়ত ইয়া জাহালাত ৩৮০ পৃঃ। # মিশকাত শরীফ ১ঃ৮৬২, # জাওয়াহিরুল ফিকহ ১ঃ২১৭, # দারিমী শরীফ ৪১৬, # আহসানুল ফাতাওয়া ১ঃ৩৪৭, # মাহমূদিয়া ১ঃ১৮৮, # কিফায়াতুল মুফতী ১ঃ১৫০]

{পৃষ্ঠা-৪৮}

তবে একথা ঠিক যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় কবরে জীবিত আছেন এবং প্রতি সপ্তাহে দুদিন তাঁর সামনে ফিরিশতাদের মাধ্যমে উম্মতের আমল পেশ করা হয়। [বাযযাযীয়া ৩ঃ৩২৬]

জিজ্ঞাসাঃ আমি একটা মিলে চাকুরী করি। মিল মসজিদের ইমাম সাহেব এবং বাসার আশপাশের মসজিদের ইমামগণ এই আকীদা পোষণ করেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হাযির ও নাযির। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরী। যা সরাসরি আল্লাহ পাকের জাতি নূরের অংশ। খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহঃ) সহ সকল ওলীগণ স্বীয় কবরে যিন্দা। তাদেরকে যে মৃত বলবে, সে কাফের হবে। এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত আকীদা পোষণ করেন। উল্লেখিত আকীদা পোষণের কারণে আমি তাদের পিছে নামায পড়ি না। একাকী নামায পড়ে নেই। এখন জুমু'আর নামায নিয়ে সমস্যা। কারণ-শুক্রবারও ডিউটি থাকে। অনেক দূরে গিয়েও জুমু'আ আদায় করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় উক্ত ইমামের পিছনেই জুমু'আর নামায আদায় করবো, নাকি একাকী যোহরের নামায আদায় করবো?

জবাবঃ আপনার বর্ণনা মতে, উল্লেখিত আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে গুমরাহ এবং বিদ'আতী। আর বিদ'আতী লোকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ঃ২৪০, ২৪৫, ২৮০, # দুররে মুখতার ১ঃ৫৬৬ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ঃ৭৩]

তবে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সরাসরি আলিমুল গাইব ও হাযির-নাযির মনে করা, তাকে নূরের তৈরী মনে করা এবং সে নূরকে আল্লাহ তাআলার জাতি নূরের অংশ মনে করা কুফরী আকীদার শামিল। এক্ষেত্রে এ ধরনের আকীদা পোষণকারী ব্যক্তিরা পিছনে নামায না পড়ে অন্য কোন মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে হবে। অন্য মসজিদ অনেকদূরে হলেও সেখানে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে। যদি কোন দিন বিশেষ কোন কারণে দূরের মসজিদে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে একা একা যোহরের নামায আদায় করে নিবে।

[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ১ঃ১৬৪, # সূরা আল-আনআম ৫৯]

জিজ্ঞাসাঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরী না নূরের তৈরী?

জবাবঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মাটির তৈরী ছিলেন, নূরের তৈরী নয়। তবে তার মাটির শরীরের মধ্যে যথেষ্ট নূরের সংমিশ্রন ছিল। এটা মাটির তৈরী মানুষ জাতের হওয়ার পরিপন্থী নয়।

{পৃষ্ঠা-৪৯}

মানব জাতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করে মাতৃদুগ্ধ পান করে, ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হতে থাকে। পানাহার, নিদ্রা ও প্রস্রাব-পায়খানার ইত্যাদির মত স্বাভাবিক ক্রিয়া কর্মের পাশাপাশি তারা জৈবিক চাহিদার কারণে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং এতে সন্তান-সন্তুতির প্রজন্ম হয়ে থাকে। তারা সুখে যেমন হাসে, দুঃখে তেমন কাঁদে।

রোগ, শোক ও দুঃখ যেমন তাদের কাতর করে, তেমনি যাদু ও বিষের ক্রিয়া তাদের চরম কষ্ট দেয়। এমনকি মৃত্যুর দুয়ারে পর্যন্ত ঠেলে দেয়। আর এ সমস্ত মানবীয় বৈশিষ্ট্য কেবল মাটির তৈরী মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য। এখন এমন কেউকি আছেন, যিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, মানবীয় এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কোন একটি থেকেও হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মুক্ত ছিলেন? কেউ পারবেন না। কারণ- তিনি তো মাটির তৈরী মানুষই ছিলেন। তার শরীরের ভিতর নূরের সংমিশ্রণ ছিল। কিন্তু তিনি নূরের তৈরী ছিলেন না। অধিকন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন সমস্ত নবীগণের সরদার, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব।

প্রমাণঃ

১। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- হে নবী! আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের মত মানুষ জাতেরই একজন। তবে আমার নিকট ওহী আসে। (এ ক্ষেত্রে আমি তোমাদের থেকে ব্যতিক্রম) [সূরা কাহাফ ১১০]

আল্লাহ পাক বলেন- "আর আমি মানুষকে মাটির সারাংশ (খাদ্যসার) হতে সৃষ্টি-করেছি।" [সূরাহ মু'মিনূন- ১২]

আর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে যেহেতু মানুষ বলা জরুরী, তা না হলে, প্রথম আয়াত অস্বীকার করে কাফির হবে। আর যখন মানুষ বলা হল, তাহলে দ্বিতীয় আয়াত হিসেবে তাঁর মাটির তৈরী হওয়া জরুরীভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তা না হলে দ্বিতীয় আয়াত অস্বীকার কারে কাফির হতে হবে। তাছাড়া সেক্ষেত্রে মানুষ যে আশরাফুল মাখলুকাত, তার থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বহির্ভূত হয়ে যাবেন, যা কখনও বাঞ্ছনীয় নয়। কাজেই তাঁকে যদি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে স্বীকার করা হয, তাহলে তাঁকে মাটির তৈরী মানুষ হিসেবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

২। সূরা আ'রাফ ৬৯ নং আয়াত। হুদ ২৭ নং আয়াত। মু'মনিূন ৩৩ নং আয়াত, শুয়ারা ২৩নং আয়াত।

{পৃষ্ঠা-৫০}

উল্লেখিত আয়াতসমূহেও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাটির তৈরী হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩। মিশকাত শরীফ ২য় খন্ড ২৫০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছেঃ হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন মানুষ ছিলেন।"

৪। বুখারী শরীফ ১ম খন্ড ৩৩২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ "নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ।"

আর মানুষ মাটিরই হয়, নূরের হয় না। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীর মুবারক নূরের তৈরী ছিল এ ব্যাপারে কোন আয়াত বা সহীহ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তাই একথা অস্বীকার করা যায় না যে, মাটির তৈরী ছিলেন এবং মানুষ জাতের ছিলেন; মানুষ জাতের বাইরে ছিলেন না। তবে রুহানিয়্যতের মত শারীরিক বিভিন্ন দিক দিয়েও তিনি সাধারণ মানুষ থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন। যেমন হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর শরীরে জান্নাতী ৪০ জন লোকের সমপরিমাণ শক্তি ছিল ইত্যাদি (সুবহানাল্লাহ)। আর রাসূল হিসেবে তার মর্যাদা তো

সকল নবী ও রাসূলের ঊর্ধ্বেং ছিল। বিভিন্ন আয়াতে বা হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে “নূর” বলা হয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- তিনি হিদায়াতের নূর ও পথ প্রদর্শনের জ্যোতি ছিলেন।
নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নূরকে যারা আল্লাহর জাতের নূরের অংশ মনে করে, তাদের এ আকীদা শিরকের পর্যায়ভুক্ত।
সুতরাং যে ব্যক্তি ‘রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নূরের তৈরী’ এ আকীদা পোষণ করবে সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। [খাইরুল ফাতাওয়া ১ঃ১৩৭]

জিজ্ঞাসাঃ জ্বীন জাতির মধ্যে আল্লাহ তা’আলা কোন নবী–রাসূল বানিয়েছেন কি–না এবং জ্বীনদের মধ্যে নর ও নারী আছে কি–না?

জবাবঃ জ্বীন জাতির মধ্যে থেকে আল্লাহ তা’আলা কোন নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেননি। নবী ও রাসূল একমাত্র মানব জাতি থেকেই প্রেরিত হয়েছে। অবশ্য জ্বীন জাতির উপরও আল্লাহর বিধান আরোপিত হয়েছে। এজন্য তাদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে হেদায়াতের কাজের জন্য আল্লাহ তা’আলা মানুষদের থেকেই নবী প্রেরণ করেছেন। জ্বীন জাতির মধ্যে নর–নারী আছে এবং সন্তান প্রজননের ধারা বিদ্যমান আছে। [প্রমাণঃ আকামুল মারজান ফি আহকামিল জান্নন– ৪৮]

{পৃষ্ঠা–৫১}

জিজ্ঞাসাঃ কোন আলেম বা পীর–মাশায়িখ নবুওয়াত বা রিসালাতের মর্যাদার উন্নীত হতে পারে কি–না?

জবাবঃ নবী বা রাসূল মাখলুকাতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানী। আল্লাহ তা’আলা যাকে ইচ্ছা করেন, তিনিই এ মর্যাদা লাভ করেন। কেউ চেষ্টা-তদবীর করে এ মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। সুতরাং আলেম বা পীর-মাশায়িখ যত বড়ই ওলী হোক না কেন, তারা কখনও নবুওয়াত বা রিসালাতের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে না। এমনকি আদনা সাহাবীর মর্যাদায়ও উন্নীত হতে পারেন না।
উল্লেখ্য যে, নবুওয়াতের সিলসিলা হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। তারপর আর কোন নতুন নবী আসবেন না। হযরত ঈসা (আঃ) আখেরী নবীর একজন উম্মত হিসেবে কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতে তাশরীফ আনবেন। নতুন নবী হিসেবে নয়। [সূরাতুল আহযাব ২২, আকীদাতুত তাহাবী ৪৭]

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কটূক্তি বা অবমাননা মুলক কথা বলে, তবে তার জন্য শরীয়তের বিধান কি?

জবাবঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে যদি কোন লোক কটূক্তি বা অবমাননাকর কোন কথা বলে তাহলে তার ঈমান চলে যাবে এবং বিবাহিত হলে তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। তাকে নতুন ভাবে কালিমা পড়ে তাওবা পড়তে হবে এবং বিবাহ পড়াতে হবে। গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার, মাতব্বর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মিলে জন সম্মুখে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে পারে। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৪:২৩১, ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২:৩৬২ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৫৩]

জিজ্ঞাসাঃ সাহাবয়ে কিরাম হকের মাপকাঠি কি–না? এক বিশেষ আন্দোলনের কর্মীরা প্রচার করে থাকেন যে, সাহাবাগণ হকের মাপকাঠি নন। হকের মাপকাঠি হচ্ছেন কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ ব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়েছি। আশা করি ইসলামের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ জানিয়ে হিদায়াতের পথে চলতে সাহায্য করবেন।

{পৃষ্ঠা–৫২}

জবাবঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম আকীদা হল- সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং যারা এ আকীদা পোষণ করে না তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। সাহাবায়ে কিরাম যে সত্যের মাপকাঠি এর অসংখ্য প্রমাণাদির মধ্য থেকে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হল-

১. আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেনঃ

"যদি তারা ঈমান আনে তোমাদের (সাহাবাগণের) ঈমান আনার মত, তবে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হবে।" এই আয়াতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকে হিদায়াত প্রাপ্তির মাপকাঠি ঘোষণা করেছেন এবং বলেছেন যে, মহান প্রভুর দরবারে ঐ ঈমানই গ্রহণযোগ্য যা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং সাহাবায়ে কিরাম এনেছিলেন। অতএব, যে ব্যক্তির ঈমান তাঁদের ঈমানের চেয়ে এদিক ওদিক হবে, তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। [মা'আরিফুল কুরআন উর্দূ ১:২৯৬, সূরা বাকারা- ১৩৭]

২.অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ

"যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঈমান আনো যেমন অন্য লোকেরা (সাহাবাগণ) ঈমান এনেছে।"

মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন যে, এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন ব্যক্তির ঈমানের দাবী সঠিক কি-না, তা যাচাই করার মাপকাঠি হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান। সুতরাং যার ঈমান কোন বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানের সাথে মিলবেনা, তার ঈমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। (মা'আরিফুল কুরআন উর্দূ ১:৭৩) উপরোক্ত আয়াতদ্বয় হতে একথা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, যখন ঈমানের ন্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের ঈমানকেই বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে, তাহলে দ্বীনের অন্যান্য ব্যাপারেও সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই সত্যের মাপকাঠি।

৩. নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ বনী ইসরাঈল ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মত ৭৩ ফিরকায় বিভক্ত হবে। সেগুলোর মধ্য হতে একটি ফিরকা ব্যতীত অবশিষ্ট ৭২ ফিরকা জাহান্নামী হবে। সাহাবা (রাযিঃ) প্রশ্ন করলেন উক্ত নাজাত প্রাপ্ত ফিরকাভুক্ত কারা হবে? মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করলেন- "আমি এবং আমার সাহাবগণ যে তরীকার উপর, সেই তরীকার উপর যারা অটল থাকবে তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দল। [তিরমিযী ২:৯৩]

৩. অন্যত্র নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র সমতুল্য। তাদের মধ্য হতে তোমরা যারই অনুসরণ করবে হিদায়াত পেয়ে যাবে।[মিশকাত শরীফ ২:৫৫৪]

জিজ্ঞাসাঃ সাহাবয়ে কিরাম হকের মাপকাঠি কি-না? এক বিশেষ আন্দোলনের কর্মীরা প্রচার করে থাকেন যে, সাহাবাগণ হকের মাপকাঠি নন। হকের মাপকাঠি হচ্ছেন কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ ব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়েছি। আশা করি ইসলামের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ জানিয়ে হিদায়াতের পথে চলতে সাহায্য করবেন।

{পৃষ্ঠা-৫৩}

উক্ত হাদীসটি শব্দের সামান্য বেশ-কমে অনেকগুলো সনদে বর্ণিত হয়েছে। শব্দের সামান্য তারতম্য থাকলেও অর্থ ও উদ্দেশ্য সবগুলোরই এক। উক্ত হাদীসের একটি সনদের শব্দ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে কট্টরপন্থী কতিপয় ইমাম কোন কোন শব্দকে মাওযূ বলেছেন। কিন্তু যেহেতু হাদীসটি একাধিক সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং সকল হাদীসের অর্থও এক, এজন্য হাদীসের হুবহু শব্দ কি হবে, তা নিয়ে আপত্তি করলেও অর্থের ব্যাপারে কেউ আপত্তি তোলেননি এবং হাদীসটিকে একাধিক সনদের দিকে লক্ষ্য করে "হাসান" পর্যায়ে ঘোষণা করেছেন। আর "হাসান" পর্যায়ের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করা সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য। যেমন- "দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয" এ হাদীসটি কোন কোন সূত্রে দুর্বল হলেও সামগ্রিক ভাবে 'হাসান' প্রমাণিত হয়েছে। কিছু লোক "অল্প বিদ্যা ভয়ংকর" রোগে আক্রান্ত হয়ে এ সূক্ষ্ম পার্থক্য বুঝতে সক্ষম না হওয়ায় তারা উপরে উল্লেখিত

হাদীসটি শুনলেই ‘মাওযূ’ বলে চিৎকার করে উঠে। কিন্তু হাদীসটি মোট কতগুলো সনদে বর্ণিত আছে এ খবর তারা রাখে না।

৫. হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- যে ব্যক্তি সঠিক তরীকা অবলম্বন করতে চায় সে যেন ঐ সমস্ত সাহাবাগণের তরীকা অবলম্বন করে, যারা ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থাৎ শেষ জীবন পর্যন্ত ইসলাম ত্যাগ করেনি। (মৃত্যুবরণের কথা এজন্য বলা হয়েছে যে, জীবিত মানুষ যে কোন মুহূর্তে গোমরাহ হয়ে যেহে পারে।) তাঁরা (সাহাবাগণ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহচার্যে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁরা এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন। সবচেয়ে নেকদিল ওয়ালা ছিলেন। সবচেয়ে গভীর ইলমের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা’আলা তাদেরকে বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন স্বীয় নবীর সহচার্যলাভে ধন্য হওয়ার জন্য এবং তাঁর দ্বীন কায়িমের জন্য। হে দুনিয়ার মানুষ! তোমরা তাদের মর্তবা অনুধাবন করো এবং তাদের পদাংক অনুসরণ করো। সাধ্যানুযায়ী তাঁদের আখলাক-চরিত্রকে আঁকড়ে ধর। কারণ তারা সীরাতে মুস্তাকীমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। [মিশকাত শরীফ ১:৩২]

নমুনা হিসেবে এখানে ২টি আয়াত ও কতিপয় হাদীস পেশ করা হলো। সুষ্ঠু বিবেক সম্পন্ন লোকের জন্য এতটুকুই যতেষ্ট।

যুগ যুগ ধরে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি মেনে আসছেন। প্রায় দের হাজার বৎসর যাবৎ উলামায়ে উম্মত এ আকীদা পোষণ করে চলছেন। ইসলামী আকীদার সকল কিতাবেও এ কথার স্বীকৃতি রয়েছে। অধুনা জনৈক ইসলামী চিন্তাবিদ (?) যিনি শুধু রিচার্স করে ইসলাম শিখেছেন দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য উলামাগণের

জিজ্ঞাসাঃ সাহাবয়ে কিরাম হকের মাপকাঠি কি–না? এক বিশেষ আন্দোলনের কর্মীরা প্রচার করে থাকেন যে, সাহাবাগণ হকের মাপকাঠি নন। হকের মাপকাঠি হচ্ছেন কেবল নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। এ ব্যাপারে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়েছি। আশা করি ইসলামের সঠিক সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ জানিয়ে হিদায়াতের পথে চলতে সাহায্য করবেন।

{পৃষ্ঠা–৫৪}

নিকট থেকে ইলম হাসিল করার সুযোগ পাননি। তিনি সর্বপ্রথম ও উদ্ভট কথার দাবী তুললেন যে, খোদার রাসূল (সাঃ) ব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি বিশ্বাস করবে না এবং কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করবে না। (না’ঊযুবিল্লাহ)

দুনিয়ার কোন বিদ্যা যেমন- ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় শিক্ষা করতে পারদর্শী শিক্ষকের মাধ্যম ছাড়া শুধু ঐ সকল সাবজেক্টের বই পড়ে কেউ ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না। হলেও তাদের কাছে ঐ ব্যাপারে কেউ যাবে না। বরং তাদের ডিসিশন মানলে রুগী মরার আর বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনাই বাড়বে। তাহলে কুরআন-হাদীস কি এতই মিসকীন এবং লাওয়ারিস হয়ে গেলো যে, এর ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য কোন শর্ত নেই? যে কেউ তার নিজস্ব মতানুযায়ী এর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে? হতে পারে, অন্য বিষয়ে সে মহাপন্ডিত। কিন্তু মুহাক্কিক উস্তাদের সুহবতে থেকে ইলম না শিখে থাকলে এ ব্যাপারে সে অজ্ঞ। তার ব্যাখ্যা কি আল্লাহ-রাসূলের মর্যি মত হবে? কখনও নয়। আনাড়ী ডাক্তার দ্বারা যা হয়, উক্ত চিন্তাবিদ দ্বারা তা-ই হয়েছে। ইসলামের নামে তিনি বহু কিছু করেছেন। কিন্তু তার কিছুই সত্যিকার ইসলামের কাজে আসেনি। বরং তার লিখনী দ্বারা সহীহ ইসলামের মহা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তার ভ্রান্ত মতবাদ ও আকীদার বিশ্বাসী হয়ে অনেক লোক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত থেকে খারিজ হয়ে গেছেন। নিজের ঈমানকে কমযোর করেছেন। এটা কি কোন ইসলামের খিদমত? আর এ কারণে এদেশের দ্বীনের যত সহীহ সিলসিলা ও লাইন আছে, যেমন- (ক) দেওবন্দী লাইনের হাজার হাজার মাদ্রাসা, (খ) হক্কানী পীর-বুযুর্গ (গ) তাবলীগী জামা’আত ও (ঘ) সহীহ ইসলামী আন্দোলনরত উলামা, তাঁদের কেউ ঐ ব্যক্তির কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা গ্রহণ করেননি বা স্বীকৃতি দেননি। কেউ কি মনে করবে

এ সকল তবকার উলামাগণ হিংসার কারণে তাকে সমর্থন করেননি? দেড় হাজার বছর যাবত যারা ইসলামের খিদমত করে এসেছেন এবং যাদের উসীলায় আমরা দ্বীন পেলাম সেই সব মুসলিম বুযুর্গগণের ব্যাপারে এ ধারণার অবকাশ নেই। কোন ব্যক্তি ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা প্রচার করলো আর লক্ষ লক্ষ লোক তা গ্রহণ করল, তাতে ইসলামের কি লাভ হবে? নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেনঃ "যে ব্যক্তি সাহাবাগণের ব্যাপারে বিদ্বেষ রাখে বা তাদের সমালোচনা করে, সে বস্তুতঃ আমার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করল। (তিরমিযী শরীফ) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঘোষণার পরে কোন সাহসে ইসলামের নামে এ কথা বলা যায় যে, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ব্যতীত কাউকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করবে না?

আমাদের দায়িত্ব হক কথা পৌঁছে দেয়া। যাদের ভাগ্যে হেদায়েত আছে, তারা তা গ্রহণ করবে। আর কেউ সাহাবগণের ব্যাপারে সমালোচনা করে নিজেই নিজের ঈমান বরবাদ করলে, অন্যদের সুপথ দেখানো ছাড়া কিইবা করার আছে? [বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আকীদাতুত তহাবী ১৪৬]

{পৃষ্ঠা-৫৫}

জিজ্ঞাসাঃ এক মসজিদের ইমাম সাহেব সাহাবগণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বললেন, সাহাবাগণের সমালোচনা করা ও তাদের দোষ-ত্রুটি চর্চা করা সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। তিনি আরো বললেন- ইয়াযীদকে কাফির বলা যাবে না। বরং তাকে ফাসিক, জালিম ও গোমরাহ ইত্যাদি বলা যায়। মজলিসের মধ্য থেকে জনৈক ব্যক্তি বললেন-ইয়াযীদ অবশ্যই কাফির। আপনি যদি তাকে কাফের না বলেন, তাহলে আপনার পিছে নামায পড়া যাবে না। এ বিষয় নিয়ে কিছুটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আসলে ইয়াযীদকে কাফির বলা যায় কি-না? বা সাহাবাদের সমালোচনা করা যাবে কি-না?

জবাবঃ সাহাবগণের (রাঃ) প্রতি বিদ্বেষ ভাব রাখা, তাদের দোষ চর্চা করা বড় ধরনের গুনাহ এবং ইসলামী আকীদার পরিপন্থী। এর দ্বারা ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা সকল সাহাবগণের (রাঃ) বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন এবং নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সমালোচনা করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন। এমনকি নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যাদের অন্তরে আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে, তারাই কেবল আমার সাহাবাদের দোষচর্চা করতে পারে। বলা বাহুল্য, সাহাবগণ মা'সুম নন। তাদের দু' একজনের দ্বারা কোন প্রকার ত্রুটি হয়ে থাকলেও তারা তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নিজেরদেরকে গুনাহ থেকে পাক সাফ করে নিয়েছেন। দ্বীনের জন্য তাঁরা এত বড় যবরদস্ত কুরবানী তারা পেশ করেছেন যা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব হয় নাই। কিয়ামত পর্যন্ত সম্ভব হবেও না। এ কারণে তাদের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা উম্মতের জন্য হারাম। তাদের ব্যাপারে ভাল আলোচনা করা ঈমানের অঙ্গ। সাহাবগণ মা'সুম নন সত্য, তবে তারা মাগফূর তথা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও হকের মাপকাঠি। আকীকাদাতু তাহাবী নামক কিতাবে বর্ণিত আছে, সাহাবাগণের প্রতি মুহাব্বত রাখা দ্বীন-ঈমান ও ইহসান। তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা কুফর, মুনাফিকী ও সীমালংঘন (আকীদাতুত তহাবী ১৪০)।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হলো- সাহাবাগণের দোষচর্চা ও সমালোচনা করা নিষিদ্ধ। আর ইমাম সাহেব ইয়াযিদের ব্যাপারে যা বলেছেন, এটাই ঠিক। অর্থাৎ ইয়াযিদকে ফাসিক ও জালিম ইত্যাদি বলা যায়। কাফির বলা যায় না। কারণ, তার জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ইয়াযিদ ফাসিক বা জালিম ছিল, কাফির ছিল না। তদুপরি আহলে হকগণ কেউ তাকে কাফির বলেননি। বিনা প্রমাণে কাউকে কাফির বলাও কুফরী কাজ।

{পৃষ্ঠা-৫৬}

জিজ্ঞাসাঃ যারা অমুসলিমদেরকে নিজেদের বন্ধু বলে মনে করে, বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার পরও যাদের মনে কোনরূপ ব্যথার প্রতিক্রিয়া আসে না, কুরআন সংশোধনের দাবীর পরে তাদের মনে কোন আপত্তি হয় না, আলেম-উলামাগণকে হেয় প্রতিপন্ন করতে, মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজ বলতে দ্বিধা করে না এবং

দেশে শান্তি–শৃংখলা বজায় থাকার পরও যারা সর্বদা সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতি বিনষ্টের মিথ্যা ধূয়া তুলে আলেম সমাজ ও দ্বীনদার মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিছিল করছে, তারা কেমন মুসলমান? তারা তো নামায–রোযা ইত্যাদিও পালন করে। তাদের সম্পর্কে কি হুকুম?

জবাবঃ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং বহু হাদীসে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআনের আয়াত এবং হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে অনেকের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তো বিধর্মীদের সাথে ভাল ব্যবহার করতেন এবং সকলের সাথে ভাল ব্যবহার করার জন্য অন্যদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে বিধর্মীদের সাথে শত্রুতা পোষণের কি অর্থ? তাদের সেই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে- এ হাদীস তো ঠিক, কিন্তু এটা সকল বিধর্মীদের ব্যাপারে নয়। বরং শুধু তাদের ব্যাপারেই যারা মুসলমানদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করার কখনও চিন্তা ভাবনাও করেনা কোনভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত নয়। শুধুমাত্র তাদের সাথে মানবতার দাবীতে সহানুভূতি দেখানো এবং বিপদে-আপদে সমবেদনা প্রকাশের নির্দেশ রয়েছে। বর্তমান বিধর্মীদের যে অবস্থা, তারা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে আঘাত হানাতো সাধারণ ব্যাপার, উপরন্তু তারা মুসলমানদের রক্ত দিয়ে খেলায় মেতে উঠেছে। তাদের বর্বরতা থেকে অবুঝ নিষ্পাপ শিশু এবং নিরীহ মহিলারা পর্যন্ত রেহাই পাচ্ছে না। তারা ভূপৃষ্ঠে মুসলমানদের অস্তিত্বই সহ্য করতে পারছে না। এদের সাথে বন্ধুপ্রতীম কোন সম্পর্ক রাখার ইসলামী শরীয়তের কোন রূপেই অনুমতি নেই।

মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া, কুরআনের সংশোধন চাওয়া এবং উলামায়ে দ্বীনকে হেয় করার জন্য ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদী প্রভৃতি বলা এসবের প্রত্যেকটাই কুফরী কাজ। মুসলমান বলে দাবী করা সত্ত্বেও যে কেউ এরূপ করবে যে, মুরতাদ বা ইসলামত্যাগী গণ্য হবে। ইসলাম ও মুসলমানিত্বে তাদের কোন অংশ নেই। কোন অন্যায় দেখলে মু'মিনের মনে ব্যাথা লাগতেই হবে। যদি কোন অন্যায় হতে দেখে, তখন মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছেঃ (ক) হাতের ক্ষমতা খাটানো

{পৃষ্ঠা–৫৭}

গেলে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিরোধ করে আল্লাহর নাফরমানী বন্ধ করা। (খ) যেখানে হাতের ক্ষমতা চলে না সেখানে মুখের নসীহত বা ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবাদ দ্বারা ঐ নাফরমানী বন্ধ করা। (গ) উক্ত ব্যবস্থার অপারগতায় (যেমন নিজের জান চলে যাওয়ার ভয় থাকে) উক্ত নাফরমানীর কারণে মনে ব্যথা রাখা এবং তা বন্ধ করার জন্য দিলে দিলে ফিকির করতে থাকা, দু'আ করা, পরামর্শ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রোগ্রাম তৈরী করা যাতে ভবিষ্যতে উক্ত নাফরমানী বন্ধ করা যেতে পারে। আর আন্তরিকভাবে উক্ত কাজটাকে ঘৃণা করতে থাকা- এটা হচ্ছে ঈমানী দায়িত্ব। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনে যে, তৃতীয় কাজটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তরের অর্থাৎ এতটুকু বোধ যদি কারো মধ্যে বিদ্যমান না থাকে, তাহলে তার ঈমানের দাবী মিথ্যা ও প্রহসনমূলক। তার দ্বীনদারী শুধু লোক দেখানো। [প্রমাণঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ২৮ # সূরা মুমতাহিনা আয়াতঃ ১ # মিশকাত ৪৩৬]

মওদূদী সাহেবের ব্যাপারে কতিপয় প্রশ্নের সমাধান।

প্রশ্ন একঃ মওদূদী সাহেরেব চিন্তাধারাকে উলামায়ে কিরাম নিয়মিতই ভ্রান্ত ও গোমরাহ বলে থাকেন, এর আসল কারণ কি?

সঠিক ইসলামী চিন্তাধারার সাথে মওদূদী চিন্তাধারার মৌলিক সংঘাতগুলো কি কি? নির্ভরযোগ্য প্রমাণসহ জানানোর আবেদন রইল।

প্রশ্ন দুইঃ মওদূদী সাহেবের লিখিত বাই-পুস্তক তথা তাফহীমুল কুরআন, তাফহীমাত, তানকীহাত, খুতবাত, রাসায়েল মাসায়েল, তাজদীদ ও ইহ্য়ায়ে দ্বীন, খেলাফত ও মুলুকিয়াত, ইসলামী রিয়াসাত, কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহে ইত্যাদি পড়া যাবে কি না?

প্রশ্ন তিনঃ মওদূদী পন্থী ইমামের পিছনে নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে কি-না? এবং তাদেরকে ইমাম বা মুয়াজ্জিন হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাবে কি-না?
১নং প্রশ্নের জবাবঃ
মাসিক তরজুমানুল কুরআন ১৩৫৫ হিজরী রবিউল আউয়াল সংখ্যায় জনাব মওদূদী সাহেব নিজের সম্পর্কে লিখেনঃ

مجھے گروہ علماء میں شامل ہونے کا شرف حاصل نہیں ہے، میں ایک بیچ کی راس کا آدمی ہوں جس نے جدید اور قدیم دونوں طریقہ ہائے تعلیم سے کچھ کچھ حصہ پایاہے، اور دونو کوچوں کو چل پھر کر دیکھا ہے۔
{পৃষ্ঠা-৫৮}
অর্থঃ উলামা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি মধ্য বিন্দুর লোক, যে নতুন-পুরাতন উভয় শিক্ষাব্যবস্থার কিছু কিছু অংশ পেয়েছে এবং উভয় গলিতেই হেঁটে চলে দেখেছে।
অপরদিকে ‚মাওলানা মওদূদী” নামক বইতে জনাব আব্বাস আলী খান লিখেনঃ ঊনিশ্ শ’ চৌদ্দ খৃঃ এ বালক মওদুদী মৌলভী (তথা তার বর্ণনা মতে মেট্রিক) পরীক্ষা দেন- ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে (তার পিতা) আওরাগাবাদ থেকে হায়দারাবাদগমন করেন এবং সেখানে দারুল উলূমে (তথা ডিগ্রী কলেজে) পুত্র মওদূদীকে ভর্তি করে দেন,– কিন্তু ছ’মাস অতীত না হতেই ভূপোল থেকে দুঃসংবাদ এলো যে, পিতা মৃত্যু শয্যায় শায়িত।- এ সময় থেকেই বালক মওদূদীকে জীবিকা অন্বেষণ উপায় অবলম্বন করতে হয়। (মাওলানা মওদূদী পৃঃ ৩৬)
মাসিক তরজুমানুল কুরআন রবিউল আউয়াল সংখ্যায় উদৃত নিজ ভাষ্য ও ‚মাওলানা মওদূদী” নামক বইতে উদ্ধৃত জামা‘আতের সাবেক ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের উক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা গেল যে জনাব মওদূদী সাহেব দ্বীনী ও দুনিয়াবী শিক্ষার কোনটিতেই পরিপূর্ণ শিক্ষিত নন।
একদিকে যেমন নিয়মিত কোন শিক্ষা গ্রহণ করে আলেম হওয়ার সুযোগ তিনি পাননি অপর দিকে কোন কামেল ও দক্ষ আলিমের দিক নির্দেশনার অধীনে থেকে দ্বীনী কাজ করার প্রয়োজনীয়তাও তিনি স্বীকার করেননি। বরং নিজ মেধার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ও চরম মুক্ত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। উম্মতের রাহবার আঈম্মায়ে মাযহাব থেকে শুরু করে আঈম্মায়ে হাদীস ও যামানার মুজাদ্দিদগণ সহ অতীতের প্রায় সকল দক্ষ উলামায়ে কিরাম তাঁর নিকটে ছিল অতিতুচ্ছ। যা তার বিভিন্ন লেখনির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।
এই ধরনের লোক ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করলে পরিণতি যা হওয়ার তাই ঘটেছে। বিষয়টি মওদূদী সাহেব পর্যন্ত সীমিত থাকলে উলামায়ে কিরামের তেমন বিচলিত হওয়ার কিছু ছিল না, কিন্তু যখন তিনি নিজ গবেষণার ফসলগুলো জামায়াতে ইসলাম নামে একটি দল গঠনের মাধ্যমে উম্মতের মাঝে ছড়ানোর প্রয়াস পেলেন তখন শরয়ী মৌলনীতির আলোকে তার চিন্তাধারাকে যাচাই বাছাই করে উম্মতের সামনে পেশ করার জরুরী দায়িত্ব দক্ষ ও পরিপক্ক, মুত্তাকী ও স্বচেতন উলামাদের যিম্মায় বর্তায়।
উপমহাদেশের খ্যাতনামা উলামাদের প্রায় সকলেই মওদূদী সাহেবের চিন্তা ধারায় যে সব মারাত্মক ভুল ভ্রান্তি স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে প্রথমে তা মওদূদী সাহেব ও তার প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী নেতৃবর্গকে বিভিন্ন ভাবে অবহিত করে সেগুলো প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করতে বলেছেন। কিন্তু দেখা গেল মওদূদী সাহেব বা জামায়াতের নেতৃবর্গ তা প্রত্যাহার করার পরিবর্তে বাড়তি কিছু
{পৃষ্ঠা-৫৯}
বিভ্রান্তি যোগ করে ক্রমাগত তা প্রতিষ্ঠিত করতেই চেষ্টা করেছেন। তখন মুসলিম জন সাধারণকে গোমরাহী থেকে বাঁচানো স্বার্থে উলামায়ে কেরাম মওদূদী সাহেবের মৌলিখ ভুলগুলো সুদৃঢ় প্রমাণসহ মুসলিম উম্মাহর সামনে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন, এমনকি মওদূদী সাহেবের প্রাথমিক পর্যায়ের তুলনামূলক ভ্রান্তিমুক্ত রচনা-প্রবন্ধ

ইত্যাদি দেখে যেসব বিদগ্ধ উলামায়েকেরাম ও ইসলামী বুদ্ধিজীবীগণ জামাআতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠালগ্নে জনাব মওদূদী সাহেবের সঙ্গে এমনকি জামায়াতের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদ সমূহে অধিষ্ঠিত হয়ে মওদূদী সাহেবকে খুব কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন। অতঃপর মওদূদী সাহেবকে ক্রমশঃ ভুলপথে চলতে দেখে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরাও একে একে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে জামায়াত হতে পৃথক হয়ে গেছেন। উদাহরণতঃ জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা নায়েবে আমীর মাওঃ মনজুর নো'মানী, সেক্রেটারী জনাব কমরুদ্দীন (এম,এ) বেনারসী। মজলিসে শুরার অন্যতম সদস্য হাকীম আঃ রহীম আশরাফ ও মাওলানা আমীন আহসান এসলাহী বিশ্ব বরেণ্য দাঈয়ে ইসলাম মাওঃ আবুল হাসান আলী নদভী। জামায়াতের অন্যতম রুকন ও মওদূদী সাহেবের জন্যে নিবেদিত প্রাণ ডক্টর এসরার আহমাদ সাহেব প্রমূখ সহ প্রথম সারীর প্রায় আরো সত্তর জন নেতৃবর্গ।
দ্রঃ মাওঃ মনযুর নো'মানী লিখিত ,,মওদূদী সাহেবের সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত।"
যুগসেরা মুহাক্কিক উলামায়েকিরাম সঠিক বরাতের ভিত্তিতে মওদূদী সাহেবের গোমরাহ চিন্তাধারাগুলোর তাত্বিক পর্যালোচনা করে অনেক বই-পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মাধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম যথাক্রমে-১। মাওঃ মনজুর নো'মানীর ,,মাওঃ মওদূদী ছে মেরী রেফাক্বতকী ছার গুযাশ্ত" অনুবাদ ,,মাওঃ মওদূদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত"। ২। শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রঃ-এর ,,ফিতনায়ে মওদূদীয়্যাত"। ৩। বিশ্ববরেণ্য আলেম ও ইসলামী দার্শনিক জাস্টিস মুফতী, মাওঃ মুহাম্মাদ তক্বী উসমানীর ,,হযরত মুআ'বিয়া আওর তারিখী হাক্বায়েক" বাংলা অনুবাদ ,, ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআ'বিয়া" ৪। মুজাহিদে আযম আল্লামা শামছুল হক ফরীদপুরী রঃ-এর ,,ভুল সংশোধন" ও হযরত মাওঃ ইউসুফ বিন্নোরী রহ-এর الاستاذ المودودي وشيئ من حياته وافكاره ইত্যাদি, বিস্তারিত দেখার প্রয়োজন বোধ করলে উপরোক্ত বাইগুলো দেখুন।
আপনার প্রশ্নের প্রেক্ষিত আমরা নিম্নে কয়েকটি মারাত্মক ভ্রান্তির উল্লেখ করে সেগুলোর সংক্ষিপত পর্যালোচনা করছি।
১। মওদূদী সাহেব ,,কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ" নামক পুস্তকে লিখেন:
{পৃষ্ঠা-৬০}
الہ، رب، دین، اور عبادت یہ چار لفظ قران کی اصطلاحی زبان میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں- عرب مین جب قران پیش کیا اس وقت ہر شخص جانتا تھا کہ الہ کے کیا معنی ہیں اور رب کسے کہتے ہیں........لیکن بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب کے وہ اصل معنی جو نزول قران کےوقت سمجھے جاتے تھے بدلتے چلے گئے........محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قران کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم بلکہ اسکی حقیقی روح نگاہوں سےمستور ہوگئی.
অর্থঃ ইলাহ, রব দ্বীন ও ইবাদত এই চারটি শব্দ কুরআনের পরিভাষায় মৌলিক গুরুত্ব রাখে, আরবে যখন কুরআন নাযিল হয় এই শব্দগুলোর মর্ম সকলেই জানত, কিন্তু পরবর্তী শতাব্দিসমূহে ক্রমে ক্রমে কুরআন নাযিলের সময়কার অর্থ নিজ ব্যাপকতা হারিয়ে একেবারে সীমিত বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্যে নির্দিষ্ট হয়ে যায়........। আর বাস্তবে এই চারটি মৌলিক পরিভাষায় অর্থে আবরণ পড়ে যাওয়ার কুরআনের তিন চতুর্থাংশেরও বেশী শিক্ষা বরং মূল স্প্রিটই দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। পৃষ্ঠা ৮,৯১০
পর্যালোচনা ঃ বাস্তবেই ইলাহ, বর, দ্বীন ইবাদত শব্দগুলো কুরআনের মৌলিক পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বস্তুর সাথেই শব্দগুলোর যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। শব্দগুলোর সহীহ মর্ম অস্পষ্ট হয়ে গেলে কুরআন বুঝা সম্ভব হবে না এবং তদনুযায়ী আমল করাও যাবে না। মওদূদী সাহেবের মতে সাহাবাদের যামানা তথা ১ম শতাব্দীর পর হতে এগুলোর সঠিক মর্ম অদৃশ্য হয়ে গেছে, সাথে সাথে কুরআনের তিন চতুর্থাংশ শিক্ষা বরং মূল স্প্রটই পর্দার অন্তারালে চলে গেছে।

অথচ কুরআন আল্লাহ তা'আলার সর্বশেষ কিতাব। পূর্ববতী সব আসমানী কিতাব এর দ্বারা রহিত হলেও পূর্ণাঙ্গ নাযিলের পর কিয়ামত অবধি ও কিতাব কোন অংশেও কখনো রহিত হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের পরিপূর্ণ হিদায়াতের একমাত্র মাধ্যমে এ কুরআন। সকল যুগের সর্বজনের জন্যেই পথ প্রদর্শক এ কুরআন। কাজেই কিয়ামতের আগ পর্যন্ত এর শব্দাবলী হুবহু বিদ্যমান থাকা চাই, তেমনিভাবে সব সময়ের জন্যে এর মর্মার্থও থাকা চাই অবিকৃত ও সহজবোধ্য, সাথেই কুরআনের আমলী নমুনাও থাকতে হবে নাযিল হয়া থেকে কিয়ামত পূর্বপর্যন্ত একই সূত্রে গাঁথা।

{পৃষ্ঠা–৬১}

শব্দ, অর্থ ও বাস্তব নমুনা কোন একটিও যদি অস্পষ্ট ও বিকৃত হয়ে যায় বা মাঝপথে তা পর্দার অন্তরালে চলে যায়। তাহলে পরবর্তীদের জন্যে এ কিতাব আর হিদায়াতের কাজ দিতে পারবে না। পক্ষান্তরে এ গুলোর যথাযথ সংরক্ষণ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয় কাজেই আল্লাহ তা'আলা-ই এগুলোকে সংরক্ষণ করবেন এটাই স্বাভাবিক, তাই তো আল্লাহ তা'আলা নিজ কালামে পাকে অত্যন্ত জোরালো ভাবে ঘোষণা করেছেন-

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -}

অর্থঃ নিশ্চয়ই আমিই যিক্‌র তথা এ কুরআন নাযিল করেছি, এবং নিশ্চয়ই আমিই তা সংরক্ষণ করবো। (সূরায়ে হিজর আয়াত-৯)

আর সংরক্ষণের আওতায় উপরোক্ত সবগুলো বিষয় শামিল থাকা জরুরী। তাইতো শ্রেষ্ঠ মুফাসসির আল্লামা আলূসী বাগদাদী "আমিই তা সংরক্ষণ করবো" এর তাফসীরে বলেন-

{وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} اي من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان .....وقال الحسن حفظه بقاء شريعته الي يوم القيامة-

অর্থঃ (এবং নিশ্চয় আমিই তা সংরক্ষণ করবো) তথা অর্থগত বিকৃতি, সংযোজন ও বিয়োজন জাতীয় সব ধরনের ত্রুটি হইতে .... এবং হযরত হাসান বছরী বলেন কুরআনের সংরক্ষণের অর্থ কুরআনের শরীয়ত (আমল পদ্ধতি) কে কিয়ামত পর্যন্ত বাকি রাখা।

(রুহুল মাআনী ১৪ পারা পৃঃ ২৪)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ করেন- { لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ }

অর্থঃ সম্মুখ কিংবা পশ্চাৎদিক হতে কোন বাতিল (বিকৃতি ও মিথ্যা) এই কিতাবে প্রবেশ করতে পারবে না। (সূরায়ে হা-মীম সিজদা আয়াত ৪২)

তেমনিভাবে আল্লাহর রাসূলও ঘোষণা করে গেছেন- يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله....الخ

অর্থঃ এই ইল্‌ম (কুরআন ও হাদীস) কে সঠিক ভাবে ধারণ করে যাবে পরবর্তী প্রত্যেক যুগের যোগ্য বান্দারা-যারা দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন কারীদের বিকৃতি, বাতিলদের বিভ্রান্তি ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যা হতে কুরআনও হাদীসের ইল্‌মকে মুক্ত রাখবে। (মিশকাত শরীফ ৩২ পৃঃ)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ ফরমান-

لا تزال من امتي امة قائمة بامر الله لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتي يأتي امر الله وهم علي ذلك . متفق عليه

{পৃষ্ঠা–৬২}

অর্থঃ আমার উম্মতের প্রকটি দল সব সময়েই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোন হেয় প্রতিপন্নাকারী কিংবা বিরুদ্ধাচারী তাদেরকে হক হতে বিচ্যুত করতে পারবে না। (মিশকাত শরীফ ৫৮৩ পৃঃ)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয় ও হাদীস দু'টির দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, কুরআনে পাকের শব্দ, অর্থ ও আমল পদ্ধতি সর্বদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সংরক্ষিত ছিল, আছে ও থাকবে। সেই সূত্রে উম্মতের একটি দলকে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা কুরআন হাদীসের সঠিকভাবে ধারণকারী ও হকের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখবেন।

কিন্তু উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলোর সাথে মুওদূদী সাহেবের বক্তব্য সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। তাছাড়া অযৌক্তিকও বটে। কারণ প্রথম শতাব্দীর পর হতে কুরআনের মৌলিক পরিভাষা সহ তিনচতুর্থাংশ শিক্ষা বরং মূল স্প্রীটই লোকন্তরে চলে গেলে উক্ত কুরআনের সর্বকালীন ও সার্বজনীন পূর্ণ হিদায়াতের কিতাব হওয়ার কি অর্থ থাকে? তাছাড়া ইলাহ রব এ শব্দগুলোর সাথে মানুষের ঈমানের সম্পর্ক। যদি ইলাহের অর্থই অস্পষ্ট থাকে বা বিকৃত থাকে তবে মানুষ لا اله الا الله পড়ে ঈমান আনবে কি করে? তেমনি ভাবে ১ম শতাব্দীর পর হতে এ শব্দ চতুষ্ঠয়ের অর্থ যদি ব্যাপক ভাবে মানুষ ভুলে বসে তাহলে তেরশত বছর পর মওদূদূ সাহেবই বা এগুলোর সঠিক অর্থ উদঘাটন করে তাফসীর লিখে বসলেন কি ভাবে?
বস্তুত কুরআনের মৌলিক পরিভাষা সমূহের সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের উক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এবং সাহাবায়ে কিরামের যামানা হতে এ যাবত তাফসীরে কুরআনের বড় একটি ধারাকে অব্যাহত না ধরলে, কুরআন ও দ্বীন বিকৃতির দ্বারা একেবারেই উন্মুক্ত হয়ে যায়। কারণ যে কেউ পূববর্তী তাফসীর সমূহকে ভুল আখ্যা দিয়ে নিজে মনগড়া একটি তাফসীর করে সেটাকেই সঠিক বলতে সুযোগ পাবে; তখন তার ভুল ব্যাখ্যাকে ভুল বলার দলীল কোথায় পাওয়া যাবে ?
(২) মওদূদী সাহেব তানকীহাত নামক বইয়ে লিখেন-

قران اور سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلی سب پر مقدم مگر تفسیر وحدیث کے پرانے ذخیروں سے نہیں
اسلامی قانون کی تعلیم بھی ضروری ہے مگر یہاں بھی پرانی کتابیں کام نہ دینگی-........

অর্থঃ কুরআন, সুন্নাহর শিক্ষাই সবার উপরে। কিন্তু তার তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভান্ডার হতে নয়। ইসলামী আইনের শিক্ষাও আবশ্যক, তবে এক্ষেত্রেও পূর্বের কিতাব সমূহ কাজে আসবে না। তানকীহাত – ১৭৫ {পৃষ্ঠা–৬৩}
অন্যত্র লিখেনঃ
قران کےلئےکسی تفسیر کی حاجت نہیں ایک اعلی درجہ کا پروفیسر کافی ہے، جس نے قران کا بنظر غور مطالعہ
کیا ہو اور جو طرز جدید پر قران پڑھانے اور سمجھانے کی اہلیت رکھتا ہو ....الخ۔

অর্থঃ কুরআনের জন্যে কোন তাফসীরের প্রয়োজন নাই। একজন উচুঁ মানের প্রফেসরই যথেষ্ট যে গভীর দৃষ্টিতে কুরআন অধ্যয়ন করেছে এবং নতুন পদ্ধতিতে কুরআন পড়ানোর ও বুঝানো যোগ্যতা রাখে। তান্‌কীহাত ২৯১
পর্যালোচনাঃ
মাওদূদী সাহেবের মতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী আইন শিক্ষার জন্যে একদিকে যেমন তাফসীর ও হাদীসের পুরাতন ভান্ডারের প্রয়োজন নাই অপর দিকে এর জন্যে আলেম হওয়ার কোন জরুরী নয়, বরং গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করলে এসবের জন্যে একজন প্রফেসরও যথেষ্ট।
অথচ সর্বজনবিদিত যে, কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাকার হলেন স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর ব্যাখ্যার নামই হল হাদীস। রাসূলের হাদীসের আলোকে ও কুরআন নাযিলের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে দ্বিতীয় ব্যাখ্যাকার হলেন জামাআতে সাহাবা, যে ব্যাখ্যার নাম হল আ-ছা-রে সাহাবা। হাদীস ও আছারে সাহাবার আলোকে কুরআনের তাফসীর ও ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে গেছেন, এ কাজের জন্যে প্রয়োজনীয সকল জ্ঞানে সর্বোচ্চ পারদর্শী আঈম্মায়ে কিরামগণ, যা নিশ্ছিদ্র সূত্র পরম্পরায় আজো উম্মতের নিকট হুবহু সংরক্ষিত। পরবর্তী বিদগ্ধ উলামাগণ সময় ও প্রেক্ষাপটভেদে সেই পুরাতন ভান্ডারেরই যুগপোযুগী বিশ্লেষণ করেছেন। গ্রহণযোগ্য বরাতের হাদীস ও আছারে সাহাবা এবং উৎসদ্বয়ের আলোকে কৃত তাফসীরের সাথে সাংঘর্ষিত কেনা তাফসীর যেমন তারা নিজেরা করেননি, তেমনি কেউ করে থাকলে তাকে বাতিল বলে বর্জন

করেছেন। এটাই মূলতঃ সঠিক ও নিরাপদ রাস্তা, এ রাস্তায় কোন বিকল্প নাই। কারণ হাদীস ও আছারে সাহাবার ভান্ডার পুরাতন হয়ে গেছে। সেগুলোর আলোকে কৃত তাফসীরও পুরাতন। নতুন হয়ে আবির্ভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, এখন যদি সে গুলো হতে বিমূখ হয়ে কোন তাফ্সীর, সুন্নাত বা আইন আবিষ্কার করা হয়। তাহলে সেটা হবে মনগড়া, যার পরিণতি নিশ্চিত গোমরাহী বিশ্বাস না হলে খুলে দেখুন গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও স্যার সৈয়দ-আহমাদ খানের তাফসীরের কিতাবগুলো।

{পৃষ্ঠা–৬৪}

এমন গোমরাহী হতে উম্মতকে বাঁচানোর জন্যেই আল্লাহর রাসূল অত্যন্ত স্পষ্ট ও কঠোর ভাষার বলে গেছেনঃ

من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من النار .

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে সে যেন জিন ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। –তিরমিযী ২ঃ১২৩ ও মিশকাত শরীফ ৩৫ পৃঃ

অপর হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে – من قال في القران برأيه فاصاب فقد اخطأ .

অর্থঃ যে ব্যক্তি কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে সে (ঘটনাক্রমে) সঠিক ব্যাখ্যা করলেও তা ভুল গণ্য হবে। –তিরমিযী ২ঃ১২৩ ও মিশকাত শরীফ ৩৫ পৃঃ

মোটকথা হাদীস ও আ-ছা-রে সাহাবার সেই পুরানো ভান্ডার বাদ দিয়ে মনগড়া তাফসীর গোমরাহীর মোক্ষম হাতিয়ার; যার কারণে এর পরিনতি জাহান্নাম এবং এমন তাফসীর সবাংশেই ভুল গণ্য হবে। হাদীসের আলোকে এমন তাফসীরের মোটেও অনুমতি নাই। এক্ষেত্রে মওদূদী সাহেবের পূর্বোক্ত দুইটি বক্তব্যই সরাসরি হাদীস পরিপন্থী।

তাছাড়া মওদূদী সাহেবের বক্তব্য পরস্পরে বিরোধীও বটে। কারণ ‚কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা নামক পুস্তকের বক্তব্য অনুসারে ছাহাবায়ে কিরামের পরবর্তী যুগে কুরআনের তিন চতুর্থাংশের শিক্ষায় পর্দা পড়ে গেছে অর্থাৎ তাঁর মতে আঈম্মায়ে মুজতাহেদ্বীন, মুফাচ্ছীরন ও মুহাদ্দেসীনদের মত যুগশ্রেষ্ঠ মহা মনীষীগণের দ্বারাও কুরআনের এক চতুর্থাংশের বেশী সঠিক শিক্ষা উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। যদি তাই বাস্তব হয়ে থাকে তাহলে তেরশত বছর পর কি করে মওদূদী সাহেবের মত একজন অপূর্ণ শিক্ষিতের জন্যে তাফসীর ও কুরআনের শিক্ষা উদঘাটন এত সহজ হয়ে গেল? কিভাবে তিনি একজন প্রফেসরের জন্যে তাফসীরের সনদবিতরণ করতে সক্ষম হন? তার আবার হাদীস ও পূর্বের তাফসীরের ভান্ডারকে বাদ দিয়ে।

সারকথা তান্কীহাতে উদ্ধৃত মওদুদী সাহেবের কথা দু'টি শরীয়াত ও বিবেক বিরোধী। স্বয়ং তারই অপর বক্তব্যের পরিপন্থী। অথচ তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে তানকীহাতে উদ্ধৃত বক্তব্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। যথাঃ মওদূদী সাহেব তাঁর তাফসীরের ভূমিকার পূর্বে ‚প্রসঙ্গ কথায়” লিখেছেন যে, আমি ‚তাফহীমুল কুরআনে” কুরআনের শব্দাবলীকে উর্দূর লেবাস পরানোর পরিবর্তে এই চেষ্টাই করেছি যে, কুরআনের বাক্য সমূহ পড়ে যে অর্থ আমার বুঝে এসেছে এবং উক্ত আয়াত সম্পর্কে আমার মনে যে প্রভাব পড়েছে যথা সাধ্য সঠিক ভাবে উহাকে নিজ ভাষায় ব্যক্ত করে দেই। (তাফহীমুল কুরআন উর্দূ পৃঃ ১০ ১ম খন্ড)

{পৃষ্ঠা–৬৫}

কথাটির ব্যাপারে চিন্তা করে দেখুন! আয়াতের সম্পর্কে রাসূল কি বলেছেন, ছাহাবগণ কি বলেছেন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈনগণ কি বলেছেন, এসব কিছু বাদ দিয়ে তাঁর মনে যে প্রভাব পড়েছে তা দিয়ে তিনি তাফসীর লিখে ফেললেন। এটা ভ্রান্তি না হলে মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে যারা খতমে নবুওয়াতকে অস্বীকার করেছে, যারা আম্বিয়ায়ে কিরামের মু'জিযা সমূহকে স্বীকার করেছে, তাদেরকে কেন ভ্রান্ত বলা হবে? হাদীস ও আছারে সাহাবা এবং পুরাতন তাফসীর ভান্ডার ছাড়া মওদূদী সাহেবের তাফসীর ও কাদিয়ানীর তাফসীরের মধ্যকার পার্থকটা কি দিয়ে নির্ণয় করা হবে?

(৩) দ্বীন সম্পর্কে মওদূদী সাহেবের কয়েকটিবক্তব্য নিরুরূপ-

(ক) اس تشریح سے یہ بات صاف ہوجاتاہے کہ دین در اصل حکومت کا نام ہے –شریعت اس حکومت کا قانون ہے -

(দ্বীনের অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ভূমিকার পর তিনি বলেন উক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্রের নাম, শরীয়ত হল সে রাষ্ট্রের বিধান। খুতবাত ৩২০ পৃঃ
আরেকটি বক্তব্যঃ
(খ) سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ اپ نے نماز روزوں کے ارکان اور ان کی ظاہری صورت ہی کو اصل عبادت سمجھ رکھا ہے اور آپ اس خیال خام میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس نے یہ ارکان پوری طرح ادا کر دیئے اس نے بس اللہ کی عبادت کردی۔

অর্থঃ সর্বাপেক্ষা বড় ভুল এই যে, আপনি নামায রোযার আরকান ও বাহ্যিক আকৃতিকেই আসল ইবাদত মনে করেছেন। এবং আপনি এই খাম খেয়ালীপনায় লিপ্ত যে-যে ব্যক্তি এই আরকান সমূহকে পূর্ণরূপে আদায় করলে সে আল্লার ইবাদত করে নিল। খুত্বাত ১৯২পৃঃ
অপর একটি বক্তব্যঃ
(গ) اسلام کا مقصد حقیقی مختصر الفاظ میں تو صرف اتنا کہ دینابی کافی ہے کہ وہ مقصد انسان پر سے انسان کی حکومت کو مٹا کر خدائے واحد کی حکومت قائم کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے سردھڑی کی بازی لگا دینے اور جان توڑ کوشش کرنے کا نام جہاد ہے اور نماز،
{পৃষ্ঠা–৬৬}
روزہ، حج، زکوۃ سب اسی کام کی تیاری کی لیئے ہیں......عبادات ایک تربیتی کورس ہیں، نماز ، روزہ اور یہ زکوۃ اور حج در اصل اسی تیاری اور تربیت کےلئے ہیں۔
অর্থঃ ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সংক্ষিপ্ত কথায় মানুষের উপর মানুষের শাসন মিটিয়ে এক খোদার শাসন কায়েম করা। এর জন্যে মস্তক-মেরুদন্ডের বাজি লাগিয়ে আপ্রাণ চেষ্টার নাম জিহাদ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এসব সে উদ্দেশ্যেরই প্রস্তুতির জন্যে ..... ইবাদাত একটি ট্রেনিং কোর্স। নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্ব মূলতঃ তারই প্রস্তুতি ও ট্রেনিংয়ের জন্যে। খুতবাত ৩০৭ ও ৩১৫ পৃঃ
আরেকটি বক্তব্যঃ
(ঘ) حکومت کے بغیر دین بالکل ایسا ہے جیسے ایک عمارت کا نقشہ آپ کے دماغ میں ہو مگر عمارت زمین پر موجود نہ ہو، ایسے دماغی نقشے کے ہونے کا فائدہ ہی کیا ہے؟
অর্থঃ রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন অবিকল একটি বিল্ডিংয়ের কাল্পনিক চিত্র, ভূ-পৃষ্ঠে যার অস্তিত্ব নাই। এমন কাল্পনিক চিত্রের ফায়দাটাই বা কি? –খুতবাত ৩২২ পৃঃ
আরো একটি বক্তব্যঃ
(ঙ) لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے۔ بلکہ دراصل ایک انقلابی نظریہ ومسلک ہے۔
অর্থঃ বাস্তব কথা হল ইসলাম কোন ধর্মের নাম নয়। এবং মুসলমান কোন জাতির নাম নয়। বরং মূলতঃ ইসলাম একটি বিপ্লবী চিন্তাধারা ও পদ্ধতি এবং মুসলমান সেই আন্তর্জাতিক বিপ্লবী বাহিনীর নাম। তাফহীমাত ১ম খ- ৭৭ পৃঃ
সার সংক্ষেপঃ মওদূদী সাহেবের মতে- (ক) দ্বীন মূলতঃ রাষ্ট্রের নাম।
(খ) রাষ্ট্র ছাড়া দ্বীন অস্তিত্বহীন কাল্পনিক চিত্রের ন্যয় নিরর্থক।

(গ) ইসলাম একটি বিপ্লবী চিন্তাধারার নাম। ইসলামী রাষ্ট্র ছাড়া নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাতকে ইবাদত মনে করা মারাত্মক ভুল। বরং নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি জিহাদ ও রাষ্ট্র কায়িমের জন্যে ট্রেনিং কোর্স মাত্র।
পর্যালোচনাঃ
মওদূদী সাহেব দ্বীনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা মূলতঃ দ্বীনের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। শরয়ী ব্যাখ্যা আদৌ নয়। কারণ আল্লাহ পাক স্বীয় কালামে পাকে ইরশাদ করেন-
{পৃষ্ঠা-৬৭}
{إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ } [آل عمران : 19]
অর্থঃ ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।
সূরায়ে আলে ইমরান আয়াত-১৯। (অনুবাদ তাফহীমুল কুরআন বাংলা)
উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম। এবার দেখুন ইসলাম কি জিনিস। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল কি বলেছেন, বুখারী মুসলিম শরীফে সর্বসম্মত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে একদা হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এক অপরিচিত লোকের আকৃতি ধারণ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসে রাসূলের হাঁটুর সাথে হাঁটু মিলিয়ে বসে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল এরূপঃ হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমাকে ইসলামের ব্যাখ্যা বলুন, তদুত্তরে রাসূল বললেনঃ ইসলাম হল– তুমি এ মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এবং তুমি নামায কায়িম করবে, যাকাত আদায় করবে। রমযানে রোযা রাখবে ও বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ হলে হজ্ব আদায় করবে। এ উত্তর শুনে জিব্রাঈল (আঃ) বললেন আপনি সঠিক বলেছেন। বুখারী মুসলিম সূত্রে মিশকাত শরীফ কিতাবুল ঈমানের প্রথম হাদীস। হাদীসটি হাদীসে জিব্রাঈল নামে প্রসিদ্ধ।
মোটকথা আল্লাহপাক বললেন যে, তার নিকট একমাত্র দ্বীন হচ্ছে ইসলাম আর রাসূল বললেন, আল্লাপকে একমাত্র ইলাহ ও মুহাম্মাদকে তাঁর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া, নামায পড়া, যাকাত দেওয়া, রোযা রাখা ও হজ্ব করা হচ্ছে ইসলাম, জিব্রাঈল তা সত্যায়ন কররেন, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ওহীর বাহক জিব্রাঈলের মতে দ্বীন হচ্ছে- ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর আক্বীদাও তাই। অথচ মওদূদী সাহেব বললেন এগুলো দ্বীন নয়। দ্বীন হচ্ছে „রাষ্ট্র ও জিহাদ" আর রাষ্ট্র অর্জনের ট্রেনিং হল নামায রোযা, হজ্ব, যাকাত। রাষ্ট্র ছাড়া এসব ইবাদাতও নিরর্থক ও অস্তিত্ববিহীন কাল্পনিক নক্শা।
আল্লাহর ও তাঁর রাসূল এবং জিব্রাঈলের বর্ণনার বিপরীতে দ্বীনের এহেন ব্যাপারকে যদি অপব্যাখ্যা না বলা যায় তাহলে অপব্যাখ্যা আর কোন বস্তুকে বলবে?
বস্তুতঃ কুরআনের বহু আয়াত এবং রাসলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বহু হাদীসের দ্বারা একথা একদম পরিষ্কার যে দ্বীনের মূল বিষয় ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত, বান্দার পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার মূল চাওয়া এগুলোই। আরো কিছু ইবাদাত আছে তবে সেগুলো প্রাসঙ্গিক বা সম্পূরক। তাছাড়া বান্দাদের পরস্পরে
{পৃষ্ঠা-৬৮}
চলতে গেলে পারিবারিক বিষয়, সামাজিকতা-জাতীয়তা ও লেন-দেনের প্রসঙ্গ আসে। সেগুলোও যেন খোদার মর্জীতে হয়ে বান্দা আরামে জীবন-যাপন করতে পারে এজন্যে মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক ও সিয়াসাত বা হুকুমত তথা শাসন বিষয়ক বিধি-বিধান দেওয়া হয়েছে। আর মূল ইবাদত সহ অন্যান্য বিধি বিধান সূচারু রূপে আঞ্জাম দেওয়ার দ্বারা বান্দা হবে ভূ-পৃষ্ঠে আল্লাহর খলীফা তথা প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিত্ব যে মানবে না বা এতে যে বাধা দিবে তার বিরুদ্ধে মুসলমান জিহাদ করবে। এক কথায় ঈমান ও মৌলিক ইবাদাত তথা নামায রোযা, যাকাত, হজ্ব, এগুলোই দ্বীনের মূল ও কান্ড। আর জিহাদ সিয়াসত সহ অন্য সব বিধি-বিধান হল নিজ নিজ

পজিশনভেদে শাখা-প্রশাখা, এ-কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করে গেছেন।

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخاري في صحيحه برقم:8, ومسلم برقم:122

অর্থঃ ইসলাম তথা দ্বীনের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের উপরঃ একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেওয়া-নামায কায়িম করা, যাকাত দেওয়া, হজ্ব করা; ও রামাযানের রোযা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মওদূদী সাহেব রাসূলের এ ঘোষণার বিপরীতে হুকুমাত তথা রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও জিহাদকে মূল দ্বীন আর নামায, রোযা, যাকাত, হজ্ব কে তার ট্রেনিং বলার মাধ্যমে শাখা-প্রশাখাকে মূল ও কান্ড, আর মূল ও কান্ডকে শাখা-প্রশাখা বানিয়ে দিলেন, যাতে রয়েছে আক্বীদার খারাবীসহ আরো বহুবিধ খারাবী, যা বিবেকবান মাত্রই বুঝতে পারছেন।

৪। জনাব মওদূদী সাহেবের একটি মৌলিক থিওরী তিনি এভাবে প্রকাশ করেনঃ

رسول خدا کے سوا کسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، کسی کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے، کسی کی ذهنی غلامی میں مبتلاء نہ ہو۔

অর্থঃ রাসূলে খোদা ছাড়া অন্য কাউকে সত্যেও মাপকাঠি বানাবে না। কাউকে সমালোচনার উর্দ্ধে মনে করবে না। কারো মানুষিক গোলামীতে লিপ্ত হবে না। (দস্তুরে জামাআতে ইসলামী পৃঃ ১৪, সত্যেও আলো পৃঃ ৩০)

এই থিওরীর উপর ভিত্তি করে তিনি অন্যত্র লিখেনঃ

میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص سے سمجھنے کی بجائے ہمیشہ قران و سنت ہی سے سمجھنے کی کوشش کی ہے -

{পৃষ্ঠা-৬৯}

অর্থঃ আমি অতীত বা বর্তমানে ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে দ্বীন বুঝার পরিবর্তে সর্বদা কুরআন সুন্নাহ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করেছি। এ কারণে খোদার দ্বীন আমার ও প্রত্যেক মুমীনের নিকট কি চায় তা জানার জন্যে এটা দেখতে চেষ্টা করিনি যে অমুক-অমুক বুজুর্গ কি বলেন। বরং সর্বদা এটাই দেখতে চেষ্টা করেছি যে, কুরআন কি বলে ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন। –রুয়েদাদে জামাআত তৃতীয় খন্ড পৃঃ ৩৭ সূত্র মওদূদী ছাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ৯০ প্রকাশঃ দারুল ইশাআত –করাচী।

সারকথা মওদূদী সাহেবের মতে সত্যকে জানার ও অনুসরণের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পর আর কোন নির্ভর যোগ্য মাধ্যম নাই। এই থিওরীর অন্তরালে তিনি কুরআন ও হাদীস থেকে দ্বীনকে বুঝার ও অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেছেন।

এছাড়া সাহাবায়ে কিরামের জীবনে বিভিন্ন ভাবে কালিমা লেপনের জন্যে তিনি „খেলাফত ও মুলুকিয়্যাত” নামে স্বতন্ত্র কিতাবও লিখেছেন। সবগুলোরই সারকথা হল যে, সত্যকে জানা ও মানার জন্যে সাহাবাদের জামাত নির্ভরযোগ্য নয়, বরং জামাআতে সাহাবার উপর নির্ভর করা যাবে না। তাঁদের অনেকেই পাপী ছিলেন এজন্যে তাঁরা পরবর্তীদের যাচাই বাছাইয়ের উর্ধ্বে নন।

অথচ ইসলামে রয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই তার ব্যাপ্তি, এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শুধু বিধান শুনিয়ে ক্ষান্ত হননি বরং বিধান সমূহ কার্যকর করে দুনিয়ার সামনে তার আমলী নমুনা রেখে গেছেন। আর আল্লাহ ও তার রাসূলের বিধানাবলীর কার্যক্ষেত্রই ছিল যে পরিবার, যে সমাজ, যে রাষ্ট্র তার নাম জামাআতে সাহাবা। শুধু বিধান বলে গেলে কার্যক্ষেত্রে তার রূপরেখাকে বিকৃত করে ফেলত পরবর্তী যুগের বক্র স্বভাবের লোকেরা। তার থেকে হেফাজতের জন্যেই প্রয়োজন ছিল উক্ত জামাআতে। আর যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধানাবলীর প্রাক্টিক্যাল রূপই হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের জীবনী, তাই মূল

বিধানাবলীর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জীবনও হবে মাপকাঠি। এটাই স্বাভাবিক। এই কারণে কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের ঈমান, আমল ও ইলমকে অন্যদের জন্যে অনুসরণীয় হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যথাঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ ۖ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّـهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٧)

অর্থঃ (সাহাবাদের লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে) তারা যদি তোমাদের মত ঈমান আনয়ন করে তাহলে হেদায়াত পাবে আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তারাই হঠকারিকতায় রয়েছে। –সূরায়ে বাকারা আয়াত ১৩৭

{পৃষ্ঠা–৭০}

অন্যত্র ইরশাদ করেনঃ

وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (١١٥)

অর্থঃ আর যে সরল পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদের অনুসৃত পথের বিরুদ্ধে চলে আমি তাকে সেদিকেই ফিরাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। আর তা হল নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান। (সূরায়ে নিসা –আয়াত ১১৫)

এই আয়াতে মুমনিদের পথ বলতে প্রথমতঃ যারা উদ্দেশ্য তারা হলেন জামায়াতে সাহাবা।

অন্য আয়াতে কুরআনে পাক প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٤٩)

অর্থঃ বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের অন্তরে ইহা তো স্পষ্ট আয়াত – সূরায়ে আনকাবুত ৪৯। এই আয়াতেও যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের দ্বারা প্রথম উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কিরাম।

পক্ষান্তরে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিভিন্ন হাদীসে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণের তাকীদ করেছেন যথাঃ –

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار الا واحدة ، قالوا من هى يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابى -

অর্থঃ অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর ফেরকায় বিভিক্ত হয়ে পড়বে তন্মধ্যে একটি জামাআত হবে জান্নাতী আর বাকীগুলো হবে জাহান্নামী। উপস্থিত সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতী দল কারা হবে? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলরেনঃ যারা আমার ও আমার সাহাবাদের তরীকার অনুসারী হবে। (তিরমিযী শরীফ ২য় খন্ড পৃঃ ৯৩)

অন্য হাদীসে ইরশাদ ফরমানঃ فعليكم بسنتي وسنت الخلفاء الراشدين

অর্থঃ (উম্মতকে লক্ষ্য করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন) তখন তোমাদের জন্যে আমার ও খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকা মত চলা অত্যাবশক। (আবু দাউদ শরীফ ২-৬৩৫)

{পৃষ্ঠা–৭১}

এছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও রাসূলের বহু হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত যে, কুরআন-হাদীস মুতাবিক ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের অনুসরণ জরুরী। এক্ষেত্রে সাহাবাদের পথ ও মতকে বর্জন করে কুরআন হাদীসের জ্ঞানার্জন ও তদুনযায়ী আমল সম্ভব নয়। লক্ষাধিক সাহাবীর মধ্যে সবাই অনুসরণেযোগ্য। কুরআন হাদীসের কোথাও এ ক্ষেত্রে কোন সাহাবীকে বাদ দেওয়া হয় নাই। কোন সাহাবীর দ্বারা কখনো গুনাহ হয়ে গেলে তাও হয়েছে গুনাহের পরে তাওবার পদ্ধতির ক্ষেত্রে উম্মতের অনুসরণযোগ্য হওয়ার জন্যেই। দ্বিতীয়তঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু সবকিছু বাস্তব নমুনা হিসাবে দেখিয়ে গেছেন তাই ইসলামী দন্ডবিধির বাস্তব প্রয়োগবিধি শিক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে দু একজন সাহাবী থেকে ভুল প্রকাশ পেয়েছে। একারণেই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেঃ

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أوحي الله يا محمد ان اصحابك عندي كالنجوم بعضها اضوأ من بعض ولكل نور فمن اخذ بشي مماهم عليه من اختلافهم فهو عندي علي الهدي – رواه الدارقطني-

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন আল্লাহ অহী পাঠিয়েছেন যে, হে মুহাম্মাদ! আপনার সাহাবীগণ আমার নিকট নক্ষত্রতুল্য, কেউ অতি উজ্জল কেউ তার চেয়ে কম, তবে সকলেরই আলো আছে। অতএব, তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রেও যে কোন এক পক্ষকে অনুসরণ করলেই সে অনুসারী আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্ত বলে গণ্য হবে।

(কেননা, তাদের বিরোধ হবে ইজতেহাদী, আর সঠিক ইজতেহাদের কোন অংশকেই নিশ্চিত ভুল বলা যাবে না) হাদীসটির সনদে দুর্বলতা থাকলেও এমর্মে আরো অনেক হাদীস থাকায় এবং হাদীসটি বিষয় বস্তু কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও অপরাপর হাদীস সমর্থিত হওয়ায় হাদীসটি সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য (অবশ্য কারো মতে কুরআন-হাদীসের সমর্থন গ্রহণযোগ্য না হয়ে নিজের মনের সমর্থন গ্রহণ যোগ্য হলে তা ভিন্ন কথা)তাফসীরে মাযহারী ২য় খন্ড পৃঃ ১১৬

মোটকথা সাহাবায়ে কিরামের সত্যের মাপকাঠি হওয়ার বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, সাথে সাথে যুক্তি সংগতও। অথচ মওদূদী সাহেব তাঁর দলের জন্যে আইন প্রণয়ন করে গেলেন যে, রাসূলে খোদা ছাড়া আর কাউকে যেন সত্রের মাপকাঠি না বানানো হয়। কি দোষ করেছেন হযরত আবু বকর ও উমার (রাঃ), যাদেরকে সত্যের মাপকাঠি বানানো যাবে না। হযরত উমার বিন আব্দুল আযীযের রাষ্ট্র ব্যবস্থা, মুজাদ্দিদে আলফেসানীর সংস্কার,

{পৃষ্ঠা-৭২}

আঈম্মায়ে মুজতাহেদীনের ইজতেহাদ, হযরত আবদুল জিলানীর তাযকিয়া ও মা'রিফাতকে অনুসরণ করে যদি কোটি কোটি মানুষ হিদায়াতের ও নাজাতের আশা করতে পারে তাহলে রাসূলে আকরামের মত পরশ পাথরের ছোয়ায় ধন্য ও তার হাতে গড়া জামাআতের জীবনী, কথা ও কাজ কেন অনুসরনযোগ্য হবে না?

বস্তুতঃ রাসূল ছিলেন দ্বীন নামক দূর্গের নির্মাতা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন সে দুর্গের সুদৃঢ় প্রাচীন। তাদের উপর নির্ভর না করা হলে দ্বীনের ধ্বংস অনিবার্য। ইসলামের অতীত ইতিহাসের গোমরাহ দলগুলো সর্বদা এই প্রাচীরকেই ধ্বংস করতে চেষ্টা করেছে।

তাছাড়া মওদূদী সাহেব শুধু সাহাবাগণকে সত্যের মাপকাঠি স্বীকার করেননি তা নয় বরং বিভিন্ন ভাবে সাহাবায়ে কিরামের কুৎসা রটিয়েছেন। সে সূত্রে তিনি বলেনঃ بسا اوقات صحابہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا

অর্থঃ সাহাবাদের উপর প্রায়ই মানবিক দুর্বলতা প্রভাব বিস্তার করত।

– তাফ্হীমাত ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৯৬

সূত্রঃ মওদূদী ছাহেব আওর উন্‌কী তাহরীরাত ৮৫

তাছাড়া উহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের (মওদূদীর ভাষায়) বড় বড় কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনাব মওদূদী লিখেনঃ যে সমাজে সুদের প্রচলন থাকে সেখানে সুদ খোরীর কারণে দুই ধরনের নৈতিক রোগ দেয়া দেয়। সুদ গ্রহণ কারীর মধ্যে লোভ-লালসা, কৃপনতা ও স্বার্থান্ধতা এবং সুদ প্রদানকারীদের মধ্যে ঘৃণা-ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষ জন্মে নেয়। উহুদের পরাজয় এ দুই ধরনের রোগের কিছু না কিছু অংশ ছিল।

তাফহীমুল কুরআন বাংলা ৪র্থ পারা ২য় খন্ড ৬৫ পৃঃ আধুনিক প্রকাশনী ৩য় সংস্করণ।

চিন্তা করে দেখুন! উদ্ধৃত প্রথম বক্তব্য দ্বারা যে মানবিক দুর্বলতার কথা বলেছেন তারই সম্ভবতঃ কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন উহুদের ঘটনায় গিয়ে। অর্থাৎ মানবিক দুর্বলতাগুলো ছিলঃ লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা ও ঘৃণা ইত্যাদি। অথচ উহুদ যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন নবীজীর প্রথম সারির ছাহাবা। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসায় কত আয়াত নাযিল করেছেন। কিন্তু মওদূদী সাহেব নির্দ্বিধায় পাইকারী হারে তাদের

দোষচর্চা করে গেলেন। শুধু তাই নয় আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন) থেকে শুরু করে কাতেবে ওহী পর্যন্ত অনেকেই রেহাই পাননি মওদূদী সাহেবের
{পৃষ্ঠা–৭৩}
কলমের আক্রমন থেকে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ পাবেন মওদূদী সাহেবের লিখিত খেলাফত মূলুকিয়াত ও তার পাশাপাশি জাষ্টিস তকী উসমানীর লিখা "ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুআবিয়া" এবং হযরত শামছুল হক ফরদিপুরীর লেখা "ভুল সংশোধন" পড়ে দেখলে।
এসবের দ্বারা তিনি যেমন ছাহাবাদের পবিত্র জামাআতকে উম্মতের সামনে কলঙ্কিত করতে চেয়েছেন। অপরদিকে রাসূলের হাতে গড় স্বর্ণমানবদের দল ছাহাবাকে কলঙ্কিত করে স্বয়ং রাসূলকেও চরম ব্যথ্য প্রমাণ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। কেননা, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্যে রূহানী চিকিৎসক যদি বছরকে বছর তার সংস্পর্শে থাকা রোগীদেরকেই পূর্ণ চিকিৎসা করতে না পারেন। বরং তার সংস্পর্শীদের মাঝে "প্রায়ই সে রোগগুলো প্রভাব বিস্তার করে থাকে"। তাহলে এমন চিকিৎসককে সফল কে বলবে ?
অথচ স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাদের সম্পর্কে কটূক্তি কিংবা সমালোচনা করতে উম্মতকে বার বার এবং কঠোর ভাষায় নিষেধ করে গেছেন।
এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হল-
(ক) قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولانصيفه-
অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবাদের মন্দ বলবেনা কেননা তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়সম স্বর্ণ সদকা করলেও তাদের একসের বা আধাসেরের সমান হবে না। বুখারী মুসলিম – সূত্রঃ
মিশকাত পৃঃ ৫৫৩
(খ) عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم.....الخ.

অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমানঃ আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবদের বিষয়ে। তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাবে না। যারা তাদেরকে ভালবাসবে আমার মুহব্বতেই তা করবে। আর যারা তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে তারা আমার সাথেই শত্রুতাহেতু তাদের শত্রু হবে.....
তিরমিযী ২-২২৫ মিশকাত – ৫৫৪
(গ) عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم.
{পৃষ্ঠা–৭৪}
অর্থঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, তোমরা যখন ঐ সকল লোকদেরকে দেখবে যারা আমার সাহাবাদের মন্দ বলে তখন তোমরা বলবে তোমাদের অনিষ্টের প্রতি আল্লাহর লা'নত হোক। (তিরমিযী ২-২৫৫ মিশকাত ৫৫৪)
মোটকথা সাহাবায়ে কিরাম- আল্লাহ ও তাঁর রাসূরের দৃষ্টিতে অনেক সম্মানী জামাআত। আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। বিস্তরিত জানতে হলে দেখেন মুফতী শফী (রহ.) প্রণীত "মাকামে সাহাবা" নামক কিতাবটি।
আর এ কারণেই আকাইদের বিখ্যাত কিতাব "মুছায়রাতে" উল্লেখ করা হয়েছে যেঃ
واعتقاد اهل السنة و الجماعة تزكية جميع الصحابة وجوبا ......الخ.

অর্থঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হল যে, সকল সাহাবীকে নির্দোষ বলা ওয়াজিব। (মুসায়ারাহ পৃঃ ১৩২ দেওবন্দ। সূত্রঃ মাকামে সাহাবা – পৃঃ ৭৯)
তেমনিভাবে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া লিখেনঃ
ومن اصول اهل السنة و الجماعة سلامة قلوبهم و السنتهم لاصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم .
অর্থঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মৌলিক বিশ্বাস হল যে, রাসূলের সাহাবাদের ব্যাপারে নিজ অন্তর ও জিহ্বাকে পরিষ্কার রাখবে। (শরহে আক্বীদায়ে ওয়াসিত্বিয়্যাহ পৃঃ ৪০৩ সূত্র মাকামে সাহাবা পৃঃ ৭৯)
আল্লামা ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন –
لا يجوز لاحد ان يذكر شيئا من مساويهم ولا ان يطعن علي أحد منهم بعيب و لا نقص فمن فعل ذلك وجب تاديبه
অর্থঃ সাহাবাদের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা কারো জন্যেই জায়িয নাই। যে এমন করবে তাকে শাস্তি দেওয়া ওয়াজিব। (আস্‌সারিমূল মাস্‌লুল। সূত্রঃ মাকামে সাহাবা – ৭৭)
ইমামা নববী বলেনঃ الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم باجماع من يعتد به-
{পৃষ্ঠা–৭৫}
অর্থঃ গ্রহণযোগ্য সকলের এ ব্যাপারে ইজ্‌মা যে সকল সাহাবী নিরপরাধী, এমনকি যারা পরস্পর বিগ্রহে পতিত হয়েছেন তাঁরাও। (তাক্বরীব সূত্রঃ মাকামে সাহাবা – পৃঃ৭৭)
ইমাম মুসলিমের উস্তাদ ইমাম আবু যরআহ বলেনঃ
اذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق .
অর্থঃ যখন কাউকে কোন সাহাবীর দোষ-বর্ণনা করতে দেখ তাহলে জেনে নাও যে সে হল যেন্দীক্ব (ধর্মদ্রোহী)। আদ্‌দুররাতুল মুযিয়্যাহ। (সূত্রঃ মাকামে সাহাবা – ৭৯)
তেমনি ভাবে প্রসিদ্ধ আকীদার কিতাব শরহে আকীদাতুত্বাহাবিয়্যাহ। উল্লেখ আছে :.....
ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم......ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
অর্থঃ আমরা সকল সাহাবীকে ভালবাসী .... তাদের শুধুমাত্র ভালোর আলোচনাই করি। তাদের প্রতি ভালবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের পরিচায়ক আর তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ কুফর, মুনাফেক্বী ও অবাধ্যতার পরিচায়ক। আকীদা নং ৯৭-
উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে সাহাবারে সমালোচনাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত ও গোমরাহ দলের অন্তর্ভুক্ত।
৫। মওদূদী সাহেব যেমন সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি মানতে নারাজ তেমনি আম্বিয়ায়ে কিরাম, সম্পূর্ণ নিষ্পাপ বলতেও নারাজ; যথা আম্বিয়াকিরাম সম্পর্কে তিনি লিখেনঃ
عصمت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی لوازم ذات سے نہیں .... اور ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالارادہ ہر نبی سے کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دہ لغزیش ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجہیں اور جان لیں کہ یہ بہی بشر ہیں۔
{পৃষ্ঠা–৭৬}
অর্থঃ নিষ্পাস হওয়া আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্ত্বার জন্যে আবশ্যক নয় বরং নবুওয়াতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালনার্থে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে গুণাহ হতে হেফাজতে রেখেছেন। নতুবা ক্ষণিকের জন্যে সে হিফাজত উঠিয়ে নিলে সাধারণ মানুষের মত তাদেরও ভুল ভ্রান্তি হতে পারে, আর মজার কথা যে, আল্লাহ-তা'আলা ইচ্ছা করেই প্রত্যেক নবী থেকে কোন না কোন সময় এই হিফাজত উঠিয়ে দু-একটি গুণাহ হতে দিয়েছেন, যাতে লোকেরা তাঁদেরকে খোদা মনে না করে এবং বুঝে নেয় যে, তাঁরাও মানুষ। তাফহীমাত ২, পৃঃ ৫৭ ষষ্ঠ সংস্করণ তেমনি

ভাবে তর্জুমানুল কুরআন ৫৮-এপ্রিল ১৯৭৬ সংখ্যায় اسلام كس چيز كا علمبردار ہے শিরোনমে স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে লিখেনঃ

وہ نہ فوق البشر ہے۔ نہ بشری کمزوریوں سے بالاتر ہے۔

অর্থঃ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না মানব উর্দ্ধের ছিলেন, না মানবিক দুর্বলতা মুক্ত ছিলেন। মোটকথা তাঁর মতে আম্বিয়া কিরাম সত্বাগত দিক থেকে মা'সুম তথা নিষ্পাপ ছিলেন না। বরং প্রত্যেক নবীর দ্বারাই গুণাহ সংঘটিত হয়েছে। এমনকি স্বয়ং মুহাম্মত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মানবিক দুবলংতা মুক্ত ছিলেন না, আর আম্বিয়া কিরামের গুণাহ দেখানোর জন্যে তিনি তাফহীমুল কুরআন, তরজুমানুল ২৯ খঃ ও রাসায়িল মাসায়িল ১ম খে- হযরতে আদম, হরতে দাউদ, হযরতে ইউনুস, হযরত ইউসুফ ও হযরত মূসা আলাইহিমুসসলাম কর্তৃক গুনাহ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।

অথচ হযরত আদম (আঃ) এর গন্ধম খাওয়ার বিষয়টি দুনিয়ায়ে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ছিল। এছাড়া কোন নবী হতে ইহ জীবনে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন পাপ কাজ হয়েছে এমন প্রমাণ কোথাও নাই। আর হবেই বা কি করে। কারণ কুরআনে পাকের বহু আয়াতে উম্মতকে নবী-রাসূলের নিঃশর্ত ও দ্বিধাহীন আনুগত্যের হুকুম করা হয়েছে। তাঁদের দ্বারা কখনো কখনো গুনাহ হওয়ার সম্ভাবনা থাকাবস্থায় এ আনুগত্য কি করে সম্ভব?

আর খাওয়া পরা সংসার ধর্ম এগুলো হল মানবিক চাহিদা ও প্রয়োজন। মানবিক দুর্বলতা হল, হিংসা বিদ্বেষ, স্বজন প্রীতি অযথা ক্রোধ ইত্যাদি। রাসূল নিজে যদি এসব দুর্বলতা মুক্তই না হন উম্মতকে এ সব দুর্বলতা মুক্ত করবেন কি করে? নবীগণ মানুষজাতের একথা প্রমাণের জন্যে খাওয়া-পরা এজাতীয় মানবিক প্রয়োজনইতো যতেষ্ঠ, তা সত্বেও তাদেরকে দিয়ে গুণাহ সংঘটিত করিয়ে ও মানবিক দুর্বলতাযুক্ত রেখে মানুষ প্রমাণের কি দরকার আছে?

বস্তুতঃ আম্বিয়াকিরামের নিষ্পাপ হওয়া স্বয়ং কুরআনের ও খোদ নবুওয়তীর দাবী, গুণাহের প্ররোচক নফ্স ও শয়তানের কুমন্ত্রনা হতে আল্লাহ

{পৃষ্ঠা-৭৭}

তাদেরকেই সর্বদাই মুক্ত রেখেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এটাই বিশ্বাস করে এবং করতে বাধ্য।

৬। কুরআন সুন্নাহর অনুসরণের ক্ষেত্রে মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামদের তাকলীদ করা সম্পর্কে জনাব মওদূদী সাহেব লিখেনঃ

میرے نزدیک صاحب علم آدمی کیلئے تقلید نا جائز اور گناہ بلکہ اس سے بہی شدید تر چیز ہے۔

অর্থঃ আমার মতে একজন আলেমের জন্যে তাকলীদ নাজায়িয, গুণাহ রবং এর চেয়েও জঘন্যতম জিনিস। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ- পৃঃ ২৪৪ সূত্র মওদূদী ছাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ৯৯)

অন্যত্র লিখেনঃ

میں نہ مسلک اہل حدیث کو اسکی تمام تفصیلات کے ساتہ صحیح سمجہتا ہوں اور نہ حنفیت یا شافعیت ہی کا پابند ہوں۔

অর্থঃ আমি আহলে হাদীসের মতাদর্শকে যেমন পুরাপুরি সঠিক মনে করি না তেমনি আমি হানাফী বা শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীও নই। (রাসাইল মাসাইল ১ম খ- পৃঃ ২৩৫ –সূত্র-মওদূদী ছাহেব আওর উনকী তাহরীরাত ৯৮)

মোট কথা মওদূদী সাহেবের মতে আলেমের জন্যে ইমামদের তাকদীদ মারাত্মক গুণাহের কাজ, আর আলেম দ্বারা তাঁর মত অপূর্ণ আলেম ও উদ্দেশ্য। তাহলে আঈম্মায়ে কিরামের পর হতে মুকাল্লিদ উলামা মাশায়েখ বুযুর্গানে দ্বীন সকলেই তাকলীদ করে। তাঁর মতে মারাত্মক গুণাহার সাব্যস্ত হয়েছেন। কত জঘন্য কথা!

এ ছিল মওদূদী সাহেবের কতিপয় ভুল চিন্তধারা। উপরে যে কয়টি ভুলের কথা আলোচনা করা হয়েছে সে গুলো হল তাঁর মূল থিওরীর অন্তর্ভুক্ত। এ সব থিওরীর আলোকেই তিনি লিখেছেন, দল পড়েছেন ও গবেষণা করেছেন। চিন্তা

করলে বুঝতে পারবেন এসব থিওরীর আলোকে লেখা বই, তাফসীর ও গবেষণা কি পরিমাণ গোমরাহী'ও ভুলে পরিপূর্ণ হয়েছে। বিজ্ঞ ও হক্কানী উলামায়ে কিরাম সে সব ভুলের প্রতি মওদূদী সাহেব তাঁর দলকে আকৃষ্ট করলে হয়ত বা ইনিয়ে বিনিয়ে আরো কয়েকটি গলত যুক্তি দিয়ে সে ভুলকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন বা কোন ভাবে ভুল ঢাকা সম্ভব না হলে লিখনী হতে সেই অংশটুকু গায়েব করে দিয়েছেন, কিন্তু কখনো প্রকাশ্যে ভুল স্বীকার করেননি। একারণে হক্কানী উলামায়েকিরাম প্রায় শুরু থেকেই মওদূদী সাবেও তাঁর চিন্তা ধারায় বিশ্বাসী
{পৃষ্ঠা-৭৮}
জামাআতে ইসলামীকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত একটি গোমরাহ দল হিসাবে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এবং অন্যদেরকে তাদের থেকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।
নিম্নে জগতবিখ্যাত কয়েকজন আলেমের অভিমত উল্লেখ করা হল।
(ক) আকাবিরে দেওবন্দের সর্বসম্মত ফাতাওয়াঃ মওদুদী সাহেব ও জামাআত ইসলামীর বই-পত্র ও রচনাবলী পড়ার দ্বারা সাধারণ মানুষ আঈম্মায়ে হিদায়াতের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়ে, যা তাদের গোমরাহীর কারণ। তেমনি সাহাবায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধায়ও বাটা পড়ে। এছাড়া মওদূদী সাহেবের বহু গবেষণা সম্পূর্ণ ভুল। সার্বিক ভাবে মওদূদী সাহেব ও তাঁর দলের চিন্তাধারা একটি নতুন ফিৎনা, যা নিশ্চিত ক্ষতিকর। এ কারণে আমরা উক্ত চিন্তাধারা নির্ভর আন্দোলনকে গলদ ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে ক্ষতিকর মনে করি। এ দলের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই।
দস্তখত কারীঃ হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রঃ। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রঃ। হযরত কারী মুহাম্মাদ তৈয়্যেব রঃ (প্রিন্সিপ্যাল দারুল উলূম দেওবন্দ শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া রঃ হযরত মুফতী সাইদ আহমাদ মাঃ জিঃ মুফতীয়ে দেওবন্দ প্রমুখ। মাসিক দারুল উলূম যী-কাহাদ ১৩৭০ সংখ্যা। (দৈনিক আল জমিয়ত দিল্লী ৩রা আগষ্ট ১৯৫১ খৃঃ –সূত্রঃ মওদূদী ছাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ১৯)
(খ) মুফতীয়ে আযম মুফতী মুহাম্মদ শফী রঃ এর ফাতওয়াঃ আমার মতে মওদূদী সাহেবের মৌলিক ভুল এই যে, তিনি আক্বাইদ ও আহকামের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতেহাদের অনুসরণ করেন, অথচ তাঁর মধ্যে মুজতাহিদ হওযার শর্তাবলী অনুপস্থিত। এই মৌলিক ভুলের কারণে তাঁর রচনাবলীতে বহু কথা ভুল ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী (আরো একটু আগে গিয়ে বলেন) মওদূদী সাহেবের রচনাবলীই জামাআতে ইসলামীর চিন্তাচেতনার মূল পুঁজি। জামাআতের পক্ষ থেকে মওদূদী সাহেবের ভুল ভ্রান্তির সাধারণ পক্ষ পাতিত্ব একথাই প্রমাণ করে যে, মওদূদী চিন্তাধারা ও রচনাবলীর সাথে তারা একমত। কেউ একমত না হলে তা নিতান্তাই ব্যতিক্রম। (জাওয়াহিরুল ফিকহ-১ম খ- পৃঃ ১৭২)
(গ) গত শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ হাদীস গ্রন্থ ই'লাউসসুনানের সংকলক ও ঢাকা আলিয়ার প্রাক্তন হেড মুহাদ্দিস হযরত মাওঃ যাফর আহমাদ উছমানীর অভিমতঃ মওদূদী সাহেব বাহ্যত মুনকিরে হাদীস। ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত নয়, হবে গোমরাহ ও বেদআতী। এমন লোক হতে মুসলমানদের দূরে থাকা চাই। তাঁর কথায় মোটেও আস্থা না রাখা উচিত। এবং দ্বীন সম্পর্কে তাকে চরম মূর্খ মনে করা বাঞ্ছনীয়। (সূত্রঃ মওদূদী ছাহেব আওর উন্কী তাহরীরাত পৃঃ ২৫)
{পৃষ্ঠা-৭৯}
(ঘ) তাফসীরে হক্কানীর লেখক পেশোয়ার দারুল উলূম হক্কানীয়ার প্রতিষ্ঠাতা, শাইখুল হাদীস আব্দুল হক্ব রঃ এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের আক্বাইদ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী ও বিভ্রান্তিমূলক, মুসলমানগণ যেন এই ফিৎনা হতে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করেন।
সূত্রঃ মওদূদী সাহেব আওর উনকী তাহরীয়াত পৃঃ ২২

এছাড়া জনাব মওদূদী সাহেবের উত্থানের একেবারে প্রথম পর্যায়ে তার লেখা তরজুমানের একটি সংখ্যা হযরত হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী তানভীর সামনে পেশ করা হলে মাত্র কয়েকটি লাইন পড়েই হযরত থানভী ইরশাদ করলেনঃ

باتوں کو نجاست میں ملاکر کہتاہے، اہل باطل کی باتیں ایسی ہی ہواکرتی ہیں ۔

অর্থঃ এই লোকের বক্তব্যে নাপাকীর সংমিশ্রণ রয়েছে। বাতিল পন্থীদের কথা এমনই হয়ে থাকে। (তরজুমানুল ইসলাম লাহোর ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৫৭ খৃঃ)

তেমনিভাবে আশরাফুস্‌সাওয়ানেহ বাংলা অনুবাদ আশরাফ চরিত ৮৭৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে মাওঃ মঞ্জুর নো'মানী সাহেব জামাআতের সাথে নিজ সম্পৃক্ততার সময়ে হযরত থানভীর সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইলে, হযরত বলেন আমার দিল এই আন্দোলনকে কবুল করে না।

মাত্র কয়েক জন শীর্ষস্থানীয় আলেমে দ্বীনের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হল, তাছাড়া উপমহাদেশের অতীত বর্তমানের সকল হক্কানী আলেম গণের সর্বসম্মত মত হল যে, মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও তার উপর প্রতিষ্ঠিত জামাআতে ইসলামী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বহির্ভূত। এই হিসেবে শরীয়াতের দৃষ্টিতে তারা ফাসিক ও আকীদাগত ভাবে বিদ্‌আতী।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকীমের উপর কায়িম থাকার তাওফীক দান করুন, আমীন।

(২নং প্রশ্নের জবাব) মওদূদী সাহেবের লিখিত বই পুস্তকে এমন অনেক আলোচনা রয়েছে, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার পরিপন্থী। ইল্‌মে কালাম, ইল্‌মে ফিক্‌হ ও চিন্তা ধারার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী মত রয়েছে। তিনি সালফে সালেহীনের কারো অনুসারী নন। তার লিখিত কিতাবাদীতে মু'তাযিলা, খাওয়ারেজ, লা-মাযহাবী ও অন্যান্য বাতিল সম্প্রদায়ের কথাবার্তা পাওয়া যায়। তিনি দ্বীন-ইসলাম, ঈমান, তাওহীদ, রিসালত, তাকওয়া, ইবাদত ইত্যাদির বিশ্লেষণ করেছেন হাদীস ও আ-ছা-রে সাহাবা অনুসৃত আকাবিরে উম্মতের পথ ত্যাগ করে। অপরদিকে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজ হাতে গড়া ও নুযুলে কুরআনের প্রত্যক্ষদর্শী জামাআতে সাহাবার অনুসরণে

{পৃষ্ঠা-৮০}

প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী উলামায়ে উম্মাতের সূত্র পরম্পরায় দ্বীন, ইসলাম ও আনুসাঙ্গিক সকল বিষয়ের নির্ভুল ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে মওদূদী সাহেব ভুল ও বিকৃতি আখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন। এবং এসব হযম করাতে চেয়েছেন খুব চতুরতার সাথে যা একজন মুহাক্কিক আলেম ছাড়া ধরা মুশকিল।

তাই সাধারণ মানুষের জন্যে প্রথম মওদূদী সাহেবের রচনাবলী সংক্রান্ত হক্কানী উলামাদের লিখিত বই-পুস্তক পড়ে নেওয়া জরুরী। তা না করে প্রথমেই মওদূদী সাহেবের বই-পত্র, তাফসীর, ইত্যাদি পড়তে গেলে বিভ্রান্তি ও গোমরাহী অবধারিত। নিজের ঈমান-আমলের সংরক্ষণের স্বার্থেই এমন কাজ হতে বিরত থাকা জরুরী। এ ব্যাপারে যুগ শ্রেষ্ঠ কয়েকজন আলেমের অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. শাইখুল ইসলাম হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহঃ) এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের রচনাবলী ও কিতাবাদী দ্বীনের আঙ্গিকে এমন বেদ্বীনী ও অপব্যাখ্যা সম্বলিত যে, কম ইল্‌ম সাধারণ মানুষ তা ধরতে পারে না। তাই সাধারণ শ্রেণী তা পড়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনীত ইসলাম যার উপর সাড়ে তেরশত বৎসর উম্মাত আমল করে আসছে তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে ফেলে। (মওদূদীসাহেব আওর উনকী তাহরীরাত পৃঃ ১৫)

২. বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, করাচী নিউটাউন মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা ইউসূফ বিন্নুরী (রঃ) এর অভিমতঃ মওদূদী সাহেবের বই পুস্তক, রচনাবলীতে এমন মারাত্মক বিষয় বস্তু ও উক্তি সমূহ রয়েছে যেগুলো দ্বারা নিয়মিত দ্বীনী ইল্‌ম অর্জনে ব্যর্থ নতুন সমাজ শুধু গোমরাহী নয়, স্পষ্ট কুফরীতেও লিপ্ত হয়ে যেতে পারে। (মওদূদী ছাহেব আওর উনকী তাহরীরাত- পৃঃ ১১)

৩. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফ্তী হযরত মাওঃ মাহমূদ হাসান গাংগুহী (রহঃ) এর ফত্ওয়াঃ জনাব মওদূদী সাহেব যে সমস্ত বই পুস্তক লিখে প্রচার-প্রসার করেছেন, সে সমস্ত বই পুস্তকে অনেক বিষয় এমন ও রয়েছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাতদর্শ পরিপন্থী। তিনি ইল্মে ফিক্হ এর ক্ষেত্রে ভিন্ন মত রাখেন। আয়িম্মায়ে সলিফের কারো অনুসারী নন। তাঁর লিখিত বই-পুস্তকে মু'তাযিলা, খাওয়ারেজ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের কথাবার্তা পাওয়া যায়।
কাজেই তার কিতাবাদী অধ্যায়ন করা দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। ... শুধু ক্ষতিকরই নয় বরং ধ্বংসাত্মকও বটে। এবং সরাসরি গোমরাহীর মাধ্যম। এজন্যই জনসাধারণকে তার কিতাবাদী পড়া বা অধ্যয়ন থেকে বিরত রাখা হয়।আর এসমস্ত কিতাবাদী যখন লাইব্রেরীতে থাকবে তখন অধ্যয়নে আসবেই। আর লাইব্রেরীতে না থাকলে অধ্যয়নেও আসবে না। (সুতরাং লাইব্রেরীতেও এসমস্ত কিতাবাদী না থাকা চাই) (ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/২৪৭)

(সা'দাত গ্রুপড = ৮১-১১৪)

{পৃষ্ঠা-৮১}
৩নং প্রশ্নের জবাবঃ ১ম প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারা ও আকীদা অনেকাংশে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত পরিপন্থী। তন্মধ্যে অন্যতম হল তিনি সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চাকারী। তাঁর দলকেও সে কাজে তিনি উৎসাহিত করেছেন এবং বাস্তবে জামায়াতে ইসলামী তার চিন্তাধারার সাথে কার্যতঃ একমত, বিশেষ করে সাহাবাদের দোষচর্চায় তারা মওদূদী সাহেবের পদাংক অনুসারী। তাই মওদূদী সাহেবের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বর্তমান জামায়াতে ইসলামীর সদস্যরা শরীআতের দৃষ্টিতে ফাসিক। আর ফাসিকের ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী। তেমনি কোন ফাসিককে মুআয্যিন বানানোও মাকরূহে তাহরীমী।
প্রমাণঃ (১) উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুফ্তী জনাব মুফ্তী মুহাম্মদ শফী (রঃ) স্বীয় গ্রন্থ জাওয়াহিরুল ফিক্হে লিখেন .... নামায সম্বন্ধে শরী'আতের সিদ্ধান্ত হল এই যে, ইমাম এমন ব্যক্তিকে বানানো উচিত যিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অনুসারী। সুতরাং যারা মওদূদী চিন্তা ধারায় একমত তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইমাম বানানো জায়িয নাই। হ্যাঁ, কেহ তাদের পিছনে নামায পড়ে নিলে নামায হয়ে যাবে। (জাওয়াহিরুলফিক্হ ১/১৭২)
(২) মুজাহিদে আযম, আল্লামা হযরত মাওঃ শামছুল হক ফরীদপুরী (রহঃ) লিখেন, যাহারা সাহাবায়ে কিরামদের দোষচর্চায় লিপ্ত তাহারা যে কেহই হউন না কেন, তাহাদিগকে ইমাম বানাইয়া পিছনে নামায পড়া কিছুতেই জায়িয হইবে না। কারণ যেহেতু তাহারা সাহাবায়ে কিরামের দোষচর্চার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হইতে খারেজ হইয়া গিয়াছে। (ভুল সংশোধণ পৃঃ ১৪২)
(৩) প্রসিদ্ধ ফাতাওযার কিতাব আহসানুলফাতাওয়ার লেখক জনাব মুফ্তী রশীদ আহমদ (রহঃ) লিখেনঃ মওদূদী চিন্তাধারায় একমত এমন ব্যক্তির ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী।
(আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯১)

শিরক – বিদ'আত

কিয়ামতের সময় আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যাবেন বলে বিশ্বাস রাখা
জিজ্ঞাসাঃ কিয়ামত যখন সংঘটিত হবে, তখন নাকি আল্লাহ তা'আলা আড়াই লক্ষ বৎসর নিদ্রা যাবেন এবং কাফিররা শাস্তি ভোগ করার পর বেহেশতে যাবে। একথা দু'টি কতটুকু সত্য জানতে ইচ্ছুক।
জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত এ উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কুরআন-হাদীস বিরোধী। এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না।
{لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} [প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ, ২৫৫ # সূরা বায়্যিনাহ # আকীদাতুত্তাহাভী, ৩৪]

{পৃষ্ঠা-৮২}

নামায রোযা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা

জিজ্ঞাসাঃ নামায রোযার ব্যাপারে কেউ যদি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে বলে যে, কে যায় উঠক-বৈঠক করতে, যার ঘরে ভাত নেই সে রাখবে রোযা। এরূপ উক্তির দ্বারা কোন্ পর্যায়ের গোনাহ হবে?

জবাবঃ শরী‘আতের কোন সুস্পষ্ট হুকুমকে অস্বীকার করা যেমন কুফুরী তেমনিভাবে শরী‘আতের কোন অকাট্য ফরয হুকুম সম্পর্কে ঠাট্টা করাও কুফুরী এরূপ করার দ্বারা ঈমান চলে যাবে। তাই তার খালিস অন্তরে তাওবা করা ও বিবাহ দুহরানো জরুরী। [প্রমাণঃ জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১:২৩]

মুসলমান নিজ আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রেখে শী‘আ সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসলমানরে জন্য নিজের মাযহাব তথা আকীদা–বিশ্বাস ঠিক রেখে শী‘আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হওয়া জায়িয হবে কী-না?

জবাবঃ কোন মুসলমানের জন্য নিজের আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রেখেও শী‘আ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হওয়া কষ্মিনকালেও জায়িয হবে না। যেমন- কোন মুসলমান নিজের মাযহাব তথা আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রেখে কাদিয়ানী দলভুক্ত হতে পারে না। তদ্রূপ কোন মুসলমান নিজ আকীদা ঠিক রেখেও শী‘আ দলভুক্ত হতে পারবে না। এমনটি করলেও শরী‘আতের দৃষ্টিতে তা হারাম বিবেচিত হবে এবং পরিণতিতে তার দীন ও ঈমান বরবাদ ও নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা- শী‘আ সম্প্রদায়ের কোন কোন কিতাবে পবিত্র কুরবানের “তাহরীফ” বা বিকৃত সংঘটিত হয়েছে বলে লিখিত রয়েছে। ঐ লেখক এবং সে লেখার সাথে একমত পোষণকারী উভয়ে নিঃসন্দেহে কাফের।

এছাড়াও শী‘আ সম্প্রদায়ের এমন মতবাদ ও আকীদা রয়েছে, যা চরম গোমরাহী। বিশেষতঃ হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) সহ অনেক সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে এমন জঘন্য ও মিথ্যা অপবাদ তারা লাগিয়ে থাকে, যা নিঃসন্দেহে গোমরাহী।

অতএব, কোন মুসলমান যদি নিজের আকীদা বিশ্বাস খারাপ না করেও উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, তবে তা শরী‘আতের দৃষ্টিতে হারাম। [জাওয়াহিরুলফিকহ, ১:২৬]

কুরআন – হাদীসের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য পোষণ করা

জিজ্ঞাসাঃ স্বামী বসে তা’লীমুদ্দিন বই পড়ছিল। এমন সময় স্ত্রী পাশের রুম থেকে এসে স্বামীর হাত থেকে বইটি ছিনিয়ে নেয় এবং বলে এই সব আজে-বাজে বই পড়েই মাথা খারাপ করে ফেলেছে। স্বামী বলে এ সব তো কুরআন হাদীসের বই। (উল্লেখ থাকে, পাশেই কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য

{পৃষ্ঠা-৮৩}

ধর্মীয় বই ছিল।) স্ত্রী বলল হ্যাঁ, ঐ সব বইয়ের কথাই বলছি। স্বামী উক্ত কথা না বলার জন্য বাধা দিল। সে দ্বিতীয় বার বলে – এভাবে সে ঐ কথা তিন বার বলে। প্রশ্ন হচ্ছে-

১. মেয়েটি মুসলমান থাকবে কী?

২. স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঠিক থাকবে কী?

৩. উক্ত অবস্থায় (অর্থাৎ তাওবা ব্যতীত) মেয়েটির যদি অন্য ছেলের সঙ্গে বিবাহ হয়, তবে বিবাহ বৈধ হবে কি?

৪. এতে মেয়ের বাবা–ভাইদের করণীয় কি?

উল্লেখিত থাকে যে, আজ দীর্ঘ ৩ (তিন) বৎসর যাবৎ স্বামী–স্ত্রীর সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক ও যোগাযোগ নেই। এ সম্পর্ক এ কুরআন ও হাদীসের ফয়সালা কী?

(বিঃ দ্রঃ) মহিলা এ কথাটি বলার আগে মাঝে মাঝে নামায পড়ত।

জবাবঃ কোন মুসলমানের জন্য কুরআন-হাদীসের প্রতি তুচ্ছ ভাব পোষণ করা কুফুরী কাজ। এতে ঈমান চলে যাবার আশংকা থাকে। সুতরাং নতুন করে ঈমান গ্রহন করা উচিত।

যেহেতু ঈমান নবায়ন করা উচিত সেহেতু বিবাহ দুহরিয়ে নেয়া উচিত। শুধু তওবা করাই যথেষ্ট নয়।

স্বামী পক্ষ থেকে তালাক ব্যতীত অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে না। [প্রমাণঃ বাদায়িউস সানায়ি, ২:২৬৮]

অভিভাবকদের কর্তব্য, একদিকে নিজের সন্তান (যাকে একেবারে ফেলে দেয়া যায় না), অপর দিকে ঈমানের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (একমাত্র যার উপর আখিরাতে সন্তানের মুক্তি নির্ভরশীল), এ উভয় দিক বিবেচনায় রেখে সংশোধনের জন্য শরী'আত নির্দেশিত সকল পন্থা অবলম্বন করা। প্রয়োজনে আলেম উলামাদের সাথে পরামর্শ করে তার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

গত তিন বৎসর যাবৎ উভয়ের সম্পর্ক না থাকায় স্বামীর পক্ষ থেকে কোন তালাক পড়েনি। এখন তাকে রাখতে চাইলে ঈমান নবায়ন করতে হবে এবং সতর্কামূলক বিবাহ দুহরিয়ে নিতে হবে। আর রাখতে না চাইলে তাকে তালাক দিয়ে দিবে।

পীর-ওলীরা সন্তান দিতে পারে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ কোন পীর-ওলী কাউকে সন্তান দিতে পারে কি?

জবাবঃ সন্তান দেয়া, ধনী বানানো ও বিপদ থেকে উদ্ধার করা ইত্যাদি আল্লাহর কাজ। এটা আল্লাহর জন্য খাস। কোন নবী-রাসূলের হাতে পর্যন্ত এ ধরনের ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সুতরাং কোন পীর-ওলী সন্তান দিতে পারে কি-না এ

{পৃষ্ঠা-৮৪}

প্রশ্নই উঠতে পারে না। এরূপ বিশ্বাস রাখা সম্পূর্ণ শিরকী হবে। যদি কেউ এরূপ দাবী করে যে, সে ব্যক্তি সন্তান দিতে পারে, তাহলে সে দাজ্জাল প্রমাণিত হবে। কারণ- হাদীসে এসেছে যে, কিয়ামতের পূর্বে আসল দাজ্জাল যাহির হওয়ার পূর্বে তার ময়দান তৈরীর জন্য অনেক দাজ্জালের আর্বিভাব ঘটবে। তারা যত বড় আশ্চর্য জিনিস দেখাক না কেন, তাদের ভক্ত হওয়া যাবে না এবং তাদের দরবারে যাওয়া যাবে না। তবে কোন বুজুর্গ কারো সন্তান হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দূআ করতে পারেন। তেমনিভাবে কোন পারদর্শী ডাক্তার চিকিৎসা করতে পারেন। তাতে আল্লাহ চান তো কোন ব্যক্তির সন্তান হতে পারে। সন্তান লাভ হলে বুঝতে হবে সেটা আল্লাহই দিয়েছেন। ঐ বুজুর্গ বা ডাক্তারের সন্তান দেয়ার কোন ক্ষমতা নেই।

[প্রমাণঃ সূরা শুরা, ৪৯]

মানি ইজ দ্যা সেকেন্ড গড বলা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি টাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বির্তক করার সময় এমন কথা বলে যে, "রাখেন আপনি! অমুক দিন অমুক বলেছে, মানি ইজ দ্যা সেকেন্ড গড" তবে তার হুকুম কী? সেকি মুরতাদ হয়ে যাবে?

জবাবঃ উক্তিকারীর এই উক্তি "মানি ইজ দ্যা সেকেন্ড গড বলা" এটি কুফুরী বাক্য সমূহের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, খোদা একজনই। তিনি সমস্ত গুনাবলীর অধিকারী এবং তিনি বান্দাকে রিযিক দান করেন। সুতরাং টাকা-পয়সাকে দ্বিতীয় খোদা বলার কোন অবকাশ নাই। অতএব, অমুকের এই উক্তির সমর্থন বা উক্ত বাক্যকে সঠিক মনে করে তা বললে তা কুফুরী কালাম হয়ে যাবে। এবং সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির জন্য সতর্কতা হিসেবে ইস্তিগফার করে, নতুনভাবে কালেমা পড়ে স্ত্রী থাকলে বিবাহ দুহরিয়ে নেয়া উচিৎ।

[প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৭৩# আল-বাহরুর রায়িক ২:৫২০# খায়রুল ফাতাওয়া ১:২০২]

[البحر الراءق:520/2] و منها ان ظن ان الميت يتصرف فى الامور دون الله تعا لى واعتقاده ذلك كفر....الخ

পীর সাহেবকে সিজদা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার ভাই মাইজভান্ডার পীর সাহেবের মুরীদ। তিনি পীর সাহেবকে সিজদা করেন। এ ব্যাপারে তার সাথে আমার প্রায়ই তর্ক হয়। আমি বলি একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়িয নাই। কিন্তু তার কথা হচ্ছে, পীর সাহেব হচ্ছেন নায়েবে রাসূল। আর রাসূলের সম্পর্ক হচ্ছে সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে। আর নায়েবে রাসূলের সম্পর্ক রয়েছে রাসূলের সাথে। সুতরাং আমরা নায়েবে রাসূলকে সামনে রেখে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকেই সিজদা করি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ নিয়ত করে পীর সাহেবকে সিজদা করার দ্বারা কি সেই সিজদা আল্লাহর জন্য হবে?

{পৃষ্ঠা-৮৫}

জবাবঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা হারাম। তা যে নিয়তেই করা হোক না কেন। সেটা হারাম হিসাবেই গণ্য হবে। কারণ, সিজদার দু'টি নিয়ত রয়েছে। যথা- সিজদায়ে তা'যীমী অর্থাৎ সম্মানসূচক ও ইবাদতের নিয়তে সিজদা। আর উভয় প্রকার সিজদা হারাম। ইবাদতের নিয়তে অন্যকে সিজদা করা শুধুমাত্র হারামই নয়; বরং তা কুফুরী

প্রশ্নের ধারা অনুযায়ী যদি কাউকে মাধ্যম মেনে আল্লাহকে সিজদা করা জায়িয হত, তাহলে এর জন্য সবচেয়ে বেশী হক ছিল রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর। অথচ কুরআন-হাদীসের কোথাও এতদসংক্রান্ত কোন বর্ণনা নেই। শুধু তাই নয়, বরং এ ব্যাপারে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে গেছেন। সুতরাং আপনার ভাই যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, সেটা শয়তানী যুক্তি। এর দ্বারা হারাম ও কুফুরী কাজ হালাল হবে না।

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২৮২ # ফাতাওয়ায়ে শামী ৬:৩৮৩ # ইখতিলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম ৬৬]

عن قيس بن سعد ، قال : أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فقلت : رسول الله أحق أن يسجد له ، قال : فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إنى أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم ، فأنت يا رسول الله أحق أن نسجد لك ، قال : " أرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد له " ؟ قال : قلت : لا ، قال : " فلا تفعلوا ، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت النساء أن يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق " . [سنن أبي داود حـ:2140]

তা’বীয ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ: তা’বীয ব্যবহার করা শিরক কি-না? শরী‘আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

জবাব: একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সমস্ত কিছু করতে পারেন। তিনি দান করেন এবং তিনিই রোগ থেকে মুক্তি দান করেন। অন্তরে এ বিশ্বাস রেখে শুধুমাত্র অসীলা স্বরূপ শরী‘আত সম্মত তা’বীয ব্যবহার করতে পারে। এতে কোন রকম শিরক হবে না। তা’বীয, ঝাড়-ফুঁক এইটা শুধু এ যামানায় নতুন নয়, বরং আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম- এর যামানায় ছিল। তিনি ঝাড়-ফুঁক করেছেন। সাহাবাগণ থেকেও তা’বীয ব্যবহার প্রমাণিত আছে। তবে কেউ যদি তা’বীয সম্পর্কে এই ধারনা পোষন করে যে, তা’বীযের মধ্যে ক্ষমতা আছে। তা’বীয বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, তা’বীয ব্যবহার না করলে বা খুলে রাখলে বিরাট বিপদ হতে পারে, এ ধরণের বিশ্বাস

{পৃষ্ঠা-৮৬}

নিয়ে তা’বীয ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে শিরক হবে। ইলম বিহীন (অজ্ঞ) লোকেরা সাধারণতঃ এ ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস নিয়ে তা’বীয ব্যবহার করে থাকে। এটাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা চাই।

সহীহ আকীদার তা’লীম দিয়ে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা রক্ষার যিম্মাদারী উলামায়ে কিরামদের উপর। আজকাল বেশ কিছু নামধারী আলেমগণ মুসলমানদের ঈমান-আকীদা যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও নিজের

দুনিয়াবী স্বার্থে বরবাদ করছে। এ জন্য সাধারণ মুসলমানদের জন্য হক্কানী উলামাদের সাথে জুড়ে থাকা ছাড়া তাদের ঈমান রক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

عن اسامت بن شريك قال قالوا يا رسول الله افنداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد الصرم. -مشكوة)377/2(

আশুরার তাযিয়া মিছিল ও মাতম

জিজ্ঞাসাঃ: আশুরা তারিখে শী'আ ও রাফেযীরা তাযিয়া মিছিলের যে মাতম করে থাকে শরী'আতের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?

জবাব: আশুরার তারিখে শী'আ ও রাফেযীরা তাযিয়া মিছিলের যে মাতম করে থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তা মারাত্মক গুনাহের কাজ ও হারাম। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (রহঃ) বলেনঃ 'যদি হুসাইনের (রাযিঃ) শাহাদাতের দিনে মাতম ও শোক পালন করা হয়, তাহলে সোমবার দিন শোক পালনের বেশী উপযোগী। কারণ, এই দিনে স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ও প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ইন্তেকাল করেন।' অথচ এই দিনে কেউ শোক পালন করে না। হযরত ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) বলেনঃ "খবরদার! হায় হুসাইন! ইত্যাদি বলে কান্নাকাটি করো না। কারণ, এসব কার্যকলাপ মুসলমানদের শোভা পায় না।" মোটকথা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ও নবীগণের মৃত্যুতেই বার্ষিক শোক দিবস পালনের অনুমতি দেননি। তাহলে অন্য লোকের মৃত্যুতে শোক দিবস পালনের তো প্রশ্নই উঠে না। হ্যাঁ, তাদের রুহে সাওয়াব রিসানীর জন্য ব্যক্তিগতভাবে দু'আ কালাম পড়তে কোন অসুবিধা নেই।

শী'আ সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে "হায় হুসাইন", "হায় হুসাইন" বলে চিৎকার করতে থাকা, বুক চাপড়ানো, তাযিয়া স্থাপন, মর্সিয়া–ক্রন্দন প্রভৃতি প্রদর্শনের জন্য আশুরা মোটেও নয়। আশুরাতো পৃথিবীর বড় বড় ইতিহাসের সম্মিলনী। পৃথিবীর শুরু থেকে বিভিন্ন নবীগণের মহান ঘটনাবলী এ তারিখেই সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বের উম্মতের উপর রমযানের পরিবর্তে আশুরার রোযা ফরয

{পৃষ্ঠা–৮৭}

ছিল। সেই সকল ফযীলতের ভিত্তিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এদিন রোযা রাখতে বলেছেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রাযিঃ)–এর শাহাদাত ঐ ফযীলতের দিনে হওয়ায় তা আরও বেশী ফযীলতপূর্ণ হয়েছে। [প্রমাণঃ আল–বেদায়া ৮:৪০ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:৩৯০ # আহসানুলফাতাওয়া, ১:৩৯০ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২:২৭৩]

গর্দান মাসাহ করা কি বিদ'আত?

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার কিছু লা–মাযহাবী ভায়েরা বলেন যে, উযুর মধ্যে গর্দান মাসহে করা বিদ'আত। তাদের এ কথা ঠিক কি-না?

জবাবঃ আপনার এলাকার কিছু লোক উযুর মধ্যে গর্দান মাসেহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে তা ঠিক নয়। বরং এটা তাদের মনগড়া কথা। উযুর মধ্যে গর্দান মাসাহ সম্পর্কে অনেক সহীহ হাদীস বিদ্যমান আছে। গর্দান মাসাহের মধ্যে অনেক ফযীলতও রয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে, হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি উযু করলো এবং উভয় হাত দ্বারা গর্দান মাসাহ করলো, কিয়ামতের দিন তার গর্দান থেকে বেড়ী সরিয়ে দেয়া হবে। অর্থাৎ সে মহামুসীবত থেকে মুক্তি পাবে।"

[আততালখীছুল হাবীর, ১:৯৯]

গর্দান মাসাহ করার ব্যাপারে ইলাউস সুনান গ্রন্থের লেখক অনেক হাদীস রেফারেন্স সহকারে পেশ করেছেন। (ইলাউস সুনান ১:৬৬) লা-মাযহাবীগণ বুখারী ও মুসলিম শরীফ ব্যতীত আরও যে হাদীসের অনেক সহীহ কিতাব আছে তা মানতে রাজী নন। এজন্য তারা কথায় কথায় বলে যে, এ কথা কি বুখারী বা মুসলীম শরীফের কোথাও আছে? অথচ কুতুবে সিত্তার বাইরে হাদীসের অনেক সহীহ কিতাব আছে। এই একটা কথা তারা মানলে হানাফীদের সাথে তাদের অহেতুক ঝগড়া করার এবং ঈমানদার মুসলমানকে মুশরিক বানিয়ে নিজের ঈমান বরবাদ করার কোন প্রয়োজন পড়ত না।
তবে গর্দানের সাথে গলা জড়িত করে মাসাহ করা ঠিক নয়। গলা মাসাহ করা বিদ‘আত।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:১২৪#
তালখীসুল হাবীর লি ইবনে হাজর আল্ আসকালানী, ১:৯৯]

ومسح الر قبة بظهر يد يه لا الحلقوم لا نه بدعة- [شا ميه-123/1]

রবীউল আউয়ালে প্রচলিত প্রথা ও আমাদের করণীয়
জিজ্ঞাসাঃ ১২ই রবিউল আউয়াল নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্ম দিবস এবং ওফাত দিবস। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে দিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি জানতে চাচ্ছি এই দিনে বা মাসে শরী‘আতের পক্ষ থেকে
{পৃষ্ঠা-৮৮}
আমাদের জন্য কিছু করণীয় আছে কী? যদি থাকে তাহলে সেই কর্মসূচী কি? এটা এজন্য জিজ্ঞাসা করেছি যে, শুধু ঐদিনে কেউ যদি সীরাত মাহফিল করে। আবার কেউ মিছিল বের করে। আবার এক গ্রুপকে দেখলাম বিভিন্ন মহল্লায় এবং মোড়ে মোড়ে গযল পরিবেশন করছেন। এর কোনটাকে আমরা সহীহ মনে করব?
জবাবঃ এ কথা ঠিক যে ইসলামী শরী‘আত কর্তৃক কতিপয় সময়কে মুবারক ও ফযীলত ঘোষনা করা হয়েছে। যেমন লাইলাতুল কদর, লাইলাতুল বারা’আত, আশুরা ও আরাফার দিন ইত্যাদি। হাদীসের মধ্যে এসব দিন বা রাতের করণীয় আমল এবং তার অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু লাইলাতুল মি‘রাজ, রবীউল আউওয়াল ইত্যাদির ব্যাপারে করণীয় আমল বা ফযীলত কিছুই বর্ণিত হয় নাই। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর মি‘রাজটি লাইলাতুল কদরের মত প্রতি বৎসর হয় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর যিন্দেগীতে একবার হয়েছিল। এর আগে কোন দিন হয় নাই, পরেও কোন দিন হবে না। অনেকে এই দিনে রোযা রাখে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে এ রাত্রে ইবাদত করে। অথচ এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ দেয়া হয় নাই। সুতরাং এগুলো মনগড়া কাজ এবং দীনের মধ্যে নতুন সংযোজন এবং এর অর্থ হয় যে, এ গুরুত্বপূর্ণ দিনে শরী‘আতের পক্ষ থেকে ফযীলত ও কর্মসূচী ঘোষনা করার দরকার ছিল। কিন্তু শরী‘আতের পক্ষ থেকে যেহেতু করা হয় নাই, তাই আমরা দীনের উপর ইহসান করে শরী‘আতের অসমাপ্ত কাজটি পূর্ণ করে দিলাম। নাউযুবিল্লাহ। এটা কত বড় জঘন্যতম অপরাধ যে, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে বিধান দিতে শুরু করেছে এবং স্বঘোষিত বিধানদাতা সেজেছে। শরী‘আতে এ ধরনের কাজকেই বিদ‘আত বলা হয়। অর্থাৎ দীনের মধ্যে দীনের নামে এমন কোন কিছু সংযোজন করা বা যোগ করা যা কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর বিদ‘আত এত জঘন্য অপরাধ যে, তার থেকে সাধারণত তাওবা নসীব হয় না। কারণ, বিদ‘আত বাস্তবে দীন বহির্ভূত হওয়া সত্বেও বিদ’আতী লোকেরা তাকে দীন মনে করেই করে থাকে। সুতরাং সে ব্যক্তি তাওবা করতে চায় না।

ঠিক তেমনিভাবে, ১২ই রবীউল আউওয়াল এমন একটি দিন, যে দিনের ফযীলতের ব্যপারে কোন আয়াত বা হাদীস পাওয়া যায় না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে ঐ দিনের কর্মসূচী হিসাবে কোন আমল বা আমলের নির্দেশ পাওয়া যায় না। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর পরে ৩০ বৎসর পর্যন্ত রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাদের এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ১২ই রবীউল আউওয়ালে কোন

অনুষ্ঠান বা ভিন্ন কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদের অন্তরে নবীপ্রেম কি পরবর্তী লোকদের চেয়ে কম ছিল? তারা তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম–এর জন্য নির্দ্বিধায় জান দিয়ে দিতেন।
{পৃষ্ঠা–৮৯}
নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিনে প্রত্যেক মু'মিনের দিলে একটা আবেগ সৃষ্টি হয়। এটাই| কিন্তু সেই আবেগকে মু'মিন ইচ্ছামাফিক কাজে পরিণত করতে পারে না। কারণ, তারই নাম বিদ'আত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর মহব্বতকে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রকাশ করতে হবে। তাহলে সেটাই হবে সুন্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজ।
মোদ্দাকথা শরী'আতে আবেগ ও জযবার কারণে মনগড়া কোন কিছু করার সুযোগ নেই। আবেগকে কন্ট্রোল করে শরী'আতের হুকুম অনুযায়ী চলতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর সুন্নাত ও তাঁর আদর্শের আলোচনা এবং তাঁর উপর বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়া মু'মিনের আত্মার খোরাক এবং তার পাথেয়। শরীরের খোরাক প্রতিদিন দিতে হয়। বৎসরে একবার দিলে চলে না। ঠিক তেমনিভাবে আত্মার খোরাক প্রতিদিন দিতে হয়। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জীবন ও আদর্শের আলোচনা ও দরূদ শরীফ এমন জিনিস নয় যে, একমাস করলেই দায়িত্ব পালন হয়ে গেলো। এটা তো বারো মাসই করতে থাকতে হবে। এ ব্যাপারে রবীউল আউয়াল ও অন্য মাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং যারা সব মাসেই নবীর আর্দশ আলোচনা করে, শুনে আমল করে, বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়ে, তারা রবীউল আউয়ালেও করবে। আর যারা অন্য মাসে এগুলোর কিছুই করে না শুধু এ মাসেই করে এটা তাদের পক্ষ থেকে দীনের মধ্যে নব আবিষ্কার। ইসলামী শরী'আতে এগুলো বিদ'আত ও গর্হিত কাজ। সুতরাং প্রশ্নে যে কয়টি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে তার একটিও সহীহ ভাবে নবীপ্রেমের নিদর্শন নয় বরং গর্হিত ও অন্যায় কাজ।
[মিশকাত ২৭ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬:১৩৪ # আশরাফুল জাওয়াব ১২৭ # ইমদাদুল মুফ্তীন ১৭৪।]
খাত্না উপলক্ষে সাতদিনা পালন
জিজ্ঞাসাঃ দেশের অনেক জায়গায় এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, বাচ্চাদেরকে খাত্না করানোর পরে সপ্তম দিনে আত্মীয়–স্বজনদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো হয় এবং ঘরবাড়ী প্রয়োজন অতিরিক্ত আলোকসজ্জা করা হয় এবং মেহমানদের থেকে কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা হাদিয়া হিসেবে পাওয়া যায়। যদি এ রকম না করে, তাবে তাকে তিরস্কার করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা জায়িয কি-না?
জবাবঃ এ ধরনের প্রথার অনুসরণ কাবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল। কেননা- এর মধ্যে অনেক গুনাহের সমাবেশ ঘটেছেঃ
(ক) দাওয়াতের জন্য সপ্তম দিন নির্ধারিত করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা- শরী'আতে এরূপ নির্ধারণের কোন দলীল প্রমাণ নেই।
{পৃষ্ঠা–৯০}
(খ) খাত্না করার সময় মানুষদেরকে দাওয়াত দেয়া বা মুসলমানীতে খাওয়ানো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। কারণ- শরী'আতে এর কোন প্রমাণ নেই। তবে খাত্নার পরে যখন ঘা শুকিয়ে যায়, তখন বাচ্চাকে গোসল দিবে। তারপরে ইচ্ছা হলে, নিজের আত্মীয়–স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদেরকে নিজের শক্তি–সামর্থ মুতাবিক শরী'আতের গন্ডির মধ্য থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার জন্য দাওয়াত দিয়ে খাওয়াতে পারবে। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফ্তীন ২:২০১]
(গ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত লাল-নীল বাতি জ্বালানো, ঘর-বাড়ী আলোক সজ্জা করা ইত্যাদি শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। কারণ- এটা অপচয় এবং একেবারেই অনর্থক বেহুদা কাজ। আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৭ # শামী ২:২৪০ পৃঃ]

মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন খতম, মীলাদ, চল্লিশা ইত্যাদির আয়োজন করা।
জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক ইন্তিকাল করলে চতুর্থ দিনে টাকার বিনিময়ে কুরআন খতম, মীলাদ পড়ানো এবং চল্লিশ দিন পরে (চেহলাম উপলক্ষ্যে) আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব নিয়ে মহা ধুমধামের সাথে খাওয়া-দাওয়ার শরয়ী ভিত্তি কি? এতে কি মৃত ব্যক্তির উপকার হয়?
জবাবঃ কোন মানুষ ইন্তেকাল করার পর যে কোন দিনে তাঁর সাওয়াব রিসানীর উদ্দেশ্য কুরআন শরীফ পড়ে টাকা নেয়া বা বিনিময় গ্রহণ করা না-জায়িয। আর সেক্ষেত্রে যেহেতু কুরআন তিলাওয়াতকারীই উক্ত তিলাওয়াত করার দ্বারা কোন সাওয়াব পায় না, সুতরাং মুর্দা ব্যক্তির রূহে তিনি কি পৌঁছাবেন? মুর্দার রূহে সাওয়াব পৌঁছাতে হলে, প্রথমতঃ তিলাওয়াতকারীর সাওয়াব পেতে হবে। তারপর তিনি সেই সাওয়াবটা অন্যের রূহে বখশিয়ে দিবেন। কিন্তু তিনি বিনিময় গ্রহণ করার কারণে (যা শরী'আতে হারাম) যখন নিজেই সাওয়াব থেকে মাহরূম হচ্ছেন, তখন অন্যের জন্য সাওয়াব রিসানীর তো প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ধরনের তিলাওয়াত দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হবে বলে কোন আশা করা যায় না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৫:৩৯]

দিন-তারিখ জরুরী মনে না করে এবং বিনিময় গ্রহণ ছাড়া শুধুমাত্র ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কেউ কুরআন শরীফ পড়ে কোন মুর্দারের জন্য সাওয়াব রিসানী করলে তাতে অবশ্য মুর্দারের উপকার হয়। তবে মায়্যিতের আত্মীয়–স্বজন নিজেরাই কুরআন শরীফ পড়ে বখশিয়ে দিবে-এটাই উত্তম। এমনকি দিন-তারিখ জরুরী মনে না করে যে কোন একদিন স্বেচ্ছায় বালিগ ওয়ারিশগণ তাদের স্ব–স্ব মাল থেকে গরীব-মিসকীন ও গরীব আত্মীয়–স্বজনদেরকে খাওয়ালে
{পৃষ্ঠা–৯১}
তাতেও মুর্দারের উপকার হয়। বরং মায়্যিতের মাগফিরাতের জন্য মাঝে মাঝে গরীবদের এ ধরনের খাওয়ানো বা দান করা ভাল। তবে দিন-তারিখ ঠিক করে যেমন-তিন দিনা, সাত দিনা, ত্রিশা ও চল্লিশা ইত্যাদি প্রথা পালন করে গরীব-মিসকীনদেরকে খাওয়ানো না-জায়িয ও বিদ'আত। কারণ, শরী'আত কর্তৃক যা নির্ধারিত নাই তা নির্ধারণ করার অধিকার কারো নাই। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা জরুরী। ঈসালে সাওয়াবের নামে ধুমধামের সহিত ধনীদেরকে যিয়াফত খাওয়ানো বাঞ্ছনীয় নয়।
[প্রমাণঃ খাইরুল ফাতাওয়া ১০৮-২৪৪ # ইমাদাদুল আহকাম, ১:১১৪, ১১১# ফাতাওয়া রশীদিয়া, ১৩১, ১৬০, ৫১২ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ২:৩৩৩]
واخذ الاجرة على الذكر وقراءة القران وغير ذلك مما هو مشاهد هذه الازمان وما كان كذلك فلاشك فى حرمته وبطلان وصيته به ولاحول ولاقوة الا بالله- (2/241)
ত্রিশা ও চল্লিশা খাবারে অংশগ্রহণ।
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মৃত্যুর ৩০ দিন অথবা ৪০ দিন পর তার পরিবারের পক্ষ থেকে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। এতে দরিদ্র ও স্বচ্ছল উভয় শ্রেণীর লোকই অংশগ্রহণ করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে স্বচ্ছল ব্যক্তিরাও কি এ খাবারে অংশগ্রহণ করতে পারবে? আমরা শুনেছি যে, এ ধরনের খাবার খেলে অন্তর দুর্বল হয়ে যায়, এ ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি?
জবাবঃ আমাদের যে কোন কাজই আল্লাহ তা'আলার হুকুম ও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর তরীকা অনুযায়ী আদায় করতে হবে। এর দ্বারাই সাওয়াবের আশা করা যায়। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর তরীকা বহির্ভূত সকল কাজই পরিত্যাজ্য ও গোনাহের কাজ।
বর্তমানে মানুষ মৃত্যুর পরও গোনাহ থেকে নিস্তার পায় না। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনরা যে ত্রিশা ও চল্লিশার খাবারের আয়োজন করে রুসম পালন করে শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব কাজ বিদ'আত ও কুসংস্কার হিসেবে বিবেচিত। এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির রূহে সামান্য পরিমাণও সাওয়াব পৌঁছে না। ফাতাওয়া শামীতে উল্লেখ রয়েছে-

এর ধরনের প্রায় সকল কাজই অহংকার ও লৌকিকতার মনোভাব নিয়ে করা হয়। আর তখন এরূপ মনোভাব না থাকলেও পরবর্তীতে এ মনোভাব এসে যায়। মৃতের পরিবার ধনী হলে অধিকাংশ ধনীদেরকেই এতে দাওয়াত দেয়া হয়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে হয় না।
{পৃষ্ঠা-৯২}
এজন্য উত্তম হল, কোন দিন-তারিখের দিকে লক্ষ্য না রেখে গোপনীয়তা রক্ষা করে যে কোন দিন ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে গরীব ও ইয়াতীমদেরকে আহার করানো, লিল্লাহ বোর্ডিং-এ গরীব ছাত্রদের জন্য দান করায় (এতে সাওয়াব অনেক বেশী হয়) সদকায়ে জারিয়ার সাওয়াবও পাওয়া যায়।
তবে এ ধরনের খাবার মৃতের ওয়ারিসগণের ইজমালী সম্পত্তি থেকে খাওয়াবে না। বালিগ ওয়ারিসগণ নিজেদের মাল থেকে এ খাবারের ব্যবস্থা করবে। [প্রমাণঃ ইবনে মাজাহ্ ১:১১৬ # ফাতাওয়া শামী ২:২৪০ # ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১:১৬৭ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৫৪৭ # খাইরুল ফাতাওয়া ১:৫৯৬]

মীলাদের হুমুক ও তার উৎপত্তির ইতিহাস (বিস্তারিত)
জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে যে মীলাদ ও কিয়াম করা হয় তা জায়িয আছে কি না? যদি জায়িয থাকে তাহলে প্রমাণসহ জানতে চাই। আর যদি জায়িয না থাকে তাহলে দলীল-প্রমাণ দ্বারা জানতে চাই। মীলাদ-কিয়াম সাহাবারা করেছেন কি-না এবং বর্তমানে যে মীলাদ কিয়াম হয়ে থাকে তা কোথা থেকে কার থেকে সূচনা হয়েছে জানতে ইচ্ছুক। আর যদি ইজমা-কিয়াস দ্বারা সাবেত থাকে তা জানাবেন।
জবাবঃ মীলাদের শাব্দিক অর্থ জন্ম। মীলাদুন্নবী মাহফিল-এর উদ্দেশ্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা। মীলাদের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জীবনী আলোচনা করা এবং এর শেষে প্রত্যেকে দরূদ পড়ে দু'আ করে নেয়া, তাহলে এতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। দরুদ শরীফ দাড়ানো, বসা ও শোয়া- সর্বাবস্থায় পড়া জায়িয। এমনকি বিনা উযুতেও দরূদ শরীফ পড়তে কোন অসুবিধা নাই।
কিন্তু আমাদের দেশে মীলাদ ও কিয়াম সাধারণতঃ যে নিয়মে হয়ে তাকে, তাওয়াল্লুদ, কিয়াম কতগুলি আজগুবী বাংলা, উর্দূ, ফার্সী, কবিতা গাওয়া "ইয়ানবী সালামু আলাইকা" ধরনের শাব্দিক ও অর্থগত ভুল দরূদ সালাম পাঠ করা ইত্যাদি, তা বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর এবং কুরআন, হাদীস, ইজমা, ও কিয়াসের নীতি বহির্ভূত।
হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত মজলিসে মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ৬০৪ হিজরীতে ইরবিলের ফাসিক বাদশাহ আবূ সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুরী আবুল খাত্তাব উমর ইবনে দিহইয়া নামক জনৈক দরবারী আলেম দ্বারা রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় প্রথম মীলাদ মাহ্ফিলের ইন্তেজাম করে। এ থেকেই প্রচলিত মাহ্ফিলে মীলাদের সূত্রপাত। দ্রষ্টব্যঃ ওয়াফায়াতুল আ'য়ান, ৪:১১৭।
{পৃষ্ঠা-৯৩}
সে সময় থেকেই হক্কানী উলামায়ে কিরাম এ বিদ'আতের প্রতিবাদে কিতাবাদী রচনা করতে থাকেন। এর প্রতিবাদে আরবী, ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা প্রতিটি ভাষায় কিতাবাদী রচিত হয়েছে।
প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিল সম্পর্কে আল্লামা আবদুর রহমান মাগরিবী (রহঃ) লিখেন, প্রচলিত মীলাদ মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম উক্ত কাজের নির্দেশ দেননি বা তিনি তা করেন নি। এমনিভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবাগণ (রাযিঃ), আইম্মায়ে মুজতাহিদীনও তা করেন নি। (প্রমাণঃ আশ্শির'আতুল ইলাহিয়্যা ২৫৩ পৃঃ) আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মাদ মিসরী (রহঃ) লিখেন মাযহাব চতুষ্টয়ের উলামাগণ এ কাজ তথা মাহফিলে মীলাদের জঘণ্যতার উপর একমত পোষণ করেন। [প্রমাণঃ রাহে সুন্নাত ২৫৩ পৃঃ]

বিশেষতঃ উলামায়ে কিরাম এ কাজকে এজন্য বিদ‘আত বলছেন যে, যে কাজ দীন বলে প্রমাণিত নয় এমন কাজকে দ্বীনে অনুপ্রবেশ করানো তথা সাওয়াবের কাজ বলে মনে করা মারাত্মক অপরাধ। তা বিদা’আত ও অবশ্য বর্জনীয়। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন, “যদি কেউ আমার এই দীনের মধ্যে এমন কোন কিছু আবিষ্কার করতঃ অনুপ্রবেশ করায় যা দীনের কাজ নয়, তাহলে সে কাজ হবে প্রত্যাখ্যাত। কিছুতেই তা গ্রাহ্য হবে না।”

[বুখারী ও মুসলিম শরীফঃ মিশকাত, ২৭ পৃঃ]

উল্লেখ্য যে অনেকে মীলাদে কিয়ামও করে থাকে। মীলাদে এই কিয়াম কেন করা হয়- এ ব্যাপারে কারো কারো বিশ্বাস এই যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ঐ মাহ্ফিলে উপস্থিত হন। তাই তাঁর সম্মানার্থে কিয়াম করা হয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এতে শিরকের আশংকা রয়েছে।

আবার কেউ কেউ বলে থাকেন নবীজীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) জন্ম আলোচনার সম্মানার্থে কিয়াম করা হয়ে থাকে। একথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা, যদি তাই হয়ে থাকে, তাহলে যখন ওয়াযের মাহ্ফিলে হাদীস-তাফসীর পড়া ও পড়ানোর সময় ঘন্টার পর ঘন্টা নবীজীর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম) জন্ম আলোচনা করা হয়, তখন কেন কিয়াম করা হয় না? তখন কি সম্মান প্রদর্শনের প্রয়োজন থাকে না? তাই প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম নাজায়িয ও বিদ‘আত। যে কোন কাজ তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন তা শরী‘আত সমর্থিত পন্থায় তথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কর্তৃক প্রবর্তিত তরীকা মুতাবেক হয়। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর তরীকা মুতাবেক না হলে তা অগ্রাহ্য ও বাতিল বলে গণ্য হবে।

[প্রমাণঃ ই’তেসাম ১:১১৪ # তালবীসে ইবলীস, পৃঃ৯, আল-ফাতহুর রব্বানী, ১:১৪ # তাফসীরে কবীর, ৮:২৪৩]

{পৃষ্ঠা–৯৪}

তবে প্রচলিত পন্থা ছাড়া জায়িয পদ্ধতিতে কেউ মীলাদ পড়তে চাইলে তার নিয়ম এই যে, কোন একজন হক্কানী আলেম রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর জীবনাদর্শ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিকসমূহ আলোচনা করবেন। বিভিন্ন কাজের সুন্নাত তরীকা বর্ণনা করবেন এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর উপর দরূদ শরীফ পড়ার ফযীলত বর্ণনা করবেন। অতঃপর হাযেরীনগণ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ভাবে অন্তরে মুহব্বতের সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর উপর ঐ সকল দরূদ শরীফ পাঠ করবেন যা হাদীসে বর্ণিত আছে। যা হক্কানী উলামায়ে কেরামের আমল থেকে জানা গেছে। পরিশেষে আলেম সাহেব সকলকে নিয়ে দু’আ করবেন।

[প্রমাণঃ মিশকাত, ২৭ # মিশকাত ৪০৩ পৃঃ # ওয়াফায়াতুল আ’য়ান, ৪:১১৭ # ই’তেসাম, ১:১১৪ # মাজালিসে আবরার, ২১৩পৃঃ # ফাতাওয়ায়ে রাহিমীয়া, ২:২৮৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ১:৩৪৭ # ঐ ৩:৪৪৯ # ইমদাদুল আহকাম, ১:৯৫ # ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়্যাহ, ১:১৮৮ # জাওয়াহিরুল ফিকাহ, ১:২১১ # কিফায়াতুল মুফ্তী, ১:১৫০] ইবনে মাজাহ শরীফ ২ # মুসলিম শরীফ ২:৭৭ # আবূ দাঊদ শরীফ, ২:৭১০ # ফাতাওয়া রশীদিয়া ২২৯ # আযীযুল ফাতাওয়া ১:৯৮]

[مشكوة عن عائشة ر ضي الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد- شر يف-27]

সূরায়ে ইয়াসীন পড়ে সাওয়াব রিসানী ও তবারক বিতরণ করা।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইঞ্জিনিয়ারের ইন্তেকালের কয়েক দিন পর তাবলীগী মেহনতের দীনী মারকাযে (জামে মসজিদে) এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রনের মাধ্যমে একত্রিত করে আসর নামায বাদ তাদের সামনে হাফেজ সাহেব সূরা ইয়াসীন সশব্দে তিলাওয়াত করেন। অতঃপর ইমাম সাহেব দরূদ শরীফ (বালাগাল উলা) বিভিন্ন দু’আ ও তাসবীহ পাঠ করেন। উপস্থিত মুসল্লীগণ সূরায়ে ফাতিহা এক বার ও সূরা ইখলাস তিনবার পাঠ করার পর

মুনাজাত করেন। এর পর তবারক হিসেবে মিষ্টান্ন (জিলাপী) বিতরণ করা হয়। এই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত শুরু হওয়ার পূর্বেই একাধিক ব্যক্তি দু'আয় শরীক না হয়ে চলে যায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাফেজ সাহেব ও ইমাম সাহেব কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি। যদিও উভয়েই ওয়াক্তিয়া নামাযের ইমামতী করেন। এখন জিজ্ঞাসাঃ

(ক) এরূপে সাওয়াব রিসানী (মসজিদে) শরী'আত সম্মত কি-না?

(খ) উভয়ে ওয়াক্তিয়া নামাযের ইমামতী করার দরুন উক্ত দু'আর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে কি? তেমনিভাবে মৃতের জন্য দু'আ করার পর মিষ্টি মুখ করা (তবারক) ও ভোজন করা বৈধ কি?

{পৃষ্ঠা–৯৫}

(গ) যারা দু'আয় অংশ না নিয়ে চলে গেলেন, তারা ভুল করেছেন কি? ভুল হলে কাফ্ফারা কি হবে? প্রকাশ থাকে যে, উক্ত দু'আর মাহফিলে প্রচলিত কিয়াম হয়নি এবং নামাযের জন্য তারগীব দেয়ার পর আলিম সাহেব সকলকে নামাযের তাগিদ দিয়েছেন।

(ঘ) প্রচলিত কিয়াম ও মীলাদের তাবারক খাওয়াতে ক্ষতি আছে কি? কেউ কেউ বলেন, এতে ৬০/৭০ বছরের ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায় এবং দিলের নূর চলে যায়। সত্যিই কি তাই?

জবাবঃ (ক) উল্লেখিত পন্থায় অথবা শরী'আত সম্মত যে কোনো পন্থায় সাওয়াব রিসানী করা জায়িয আছে। তবে এতে কোন কিছু খাওয়ার আয়োজন করা নাজায়িয। কেননা, খাওয়া-দাওয়া, তাবারক বিতরণ করা ইত্যাদি পারিশ্রমিকের অন্তর্ভুক্ত। এর প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এ ধরনের মজলিসের পর মিষ্টি বা অন্য কিছু বিতরণ করা না হলে, অনেকেই এরূপ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না। আর যদি সাওয়াব রিসানীর উদ্দেশ্যে নিজের মাল দ্বারা কেউ খাওয়াতে চায়, তাহলে গরীবদের খাওয়াবে। তবে তাদের দ্বারা খতম অথবা সূরা ও কালাম পড়াবে না।

(খ) মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব রিসানীর উদ্দেশ্যে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে অথবা অন্য যে কোন ধরনের দু'আ করে টাকা-পয়সা নেয়া-দেয়া অথবা খাবার খাওয়া সবই নাজায়িয ও হারাম। সুতরাং ইমাম, মুআযযিনও কোন বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না। টাকা-পয়সা ইত্যাদির বিনিময়ে খতম পড়িয়ে ঈসালে সাওয়াব করলে এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে না। কেননা, টাকা-পয়সা অথবা যে কোন ধরনের বিনিময় গ্রহণ করে তিলাওয়াত করলে তিলাওয়াতকারী কোন সাওয়াব পায় না। তাহলে তিনি মৃত ব্যক্তির নিকট কি পৌঁছাবেন। সুতরাং মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য তার আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজন খতমে কুরআন, দান-সদকা ইত্যাদির মাধ্যমে সাওয়াব রিসানী করবে। আর খতম পড়াতে হলে এমন লোকের দ্বারা খতম পড়াবে, যাদের সাথে পূর্ব থেকে আন্তরিকতা রয়েছে। যাতে তারা পারিশ্রমিক ব্যতিরেকেই কুরআন তিলাওয়াত করতে রাজী হয়।

(গ) উক্ত অনুষ্ঠান বা দু'আর মাহফিলে শরীক হওয়া কারো উপর জরুরী নয়। বরং এটা প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন বিষয়। তবে প্রতিবেশী হিসেবে অবশ্যই উক্ত ব্যক্তির জন্য তাদের দু'আ করা উচিত। কিন্তু কেউ যদি মিষ্টি খাওয়ানোর এ রকম প্রথা থেকে বেঁচে থাকার জন্য চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ঠিকই করেছেন।

(ঘ) কারো যদি জানা থাকে যে, এটা প্রচলিত মীলাদের তাবারক, তাহলে তার জন্য সেটা খাওয়া জায়িয হবে না। কেননা, প্রচলিত কিয়াম ও মীলাদ

{পৃষ্ঠা–৯৬}

বিদ'আত ও গোনাহের কাজ। আর তাদের তাবারক গ্রহণের অর্থ হচ্ছে, তাদের মীলাদ ও কিয়ামে সহযোগিতা করা। সুতরাং এটাও বিদ'আত ও গোনাহের কাজ। গোনাহের কারণে অন্তরের নূর চলে যায়। একথা সম্পূর্ণ সঠিক। আর তা অজানা বশতঃ খেলেও কিছুটা প্রভাব পড়বেই। তাবে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামের তবারক খেলে 60/70 বৎসরের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় বলে যে কথা প্রচলিত আছে সেটা ভিত্তিহীন।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ ১৭৭# সূরা মায়িদাহ ২# রাদ্দুল মুহ্তার-শামী ২:২৪০-৪১ পৃঃ# ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩৪৩# আহসানুল ফাতাওয়া, ১:৩৬২# মুসনাদে আহ্মদ ৩:৪২৮# ফাতাওয়া শামী ৬:৫৬# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৪:২৫৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৪২৪]

মাইকে শবীনা, যিকির ও ওয়ায করার শরয়ী বিধান।

জিজ্ঞাসাঃ মাইকে শবীনা খতম, যিকির ও ওয়ায মাহফিলের শরয়ী বিধান কি? বিস্তারিত জানাতে মর্জি হয়।
জবাবঃ শরী'আতে এমন কোন কাজ করার অনুমতি নেই যা অন্যের জন্য জুলুম বা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর জুলুমের অর্থ শুধু সম্পদ লুন্ঠন বা শারীরিকভাবে কষ্ট দেওয়াই নয়, বরং আরবী ভাষায় জুলুমের অর্থ হচ্ছে "যে কোন জিনিসকে তার স্থান ব্যতীত অন্যত্র ব্যবহার করা"। কেননা, অন্যত্র ব্যবহার করলে সেটা অবশ্যই কারো না কারো জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আর যদি এতে কোন মানুষের কষ্ট হয় তাহলে সেটা জুলুমের সাথে সাথে কবীরা গুনাহও বটে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের সমাজে এরূপ হাজারো গুনাহ প্রচলিত রয়েছে। যার অনুভূতি পর্যন্ত আমাদের নেই। এমনকি এ ধরনের অনেক কাজ দীনের কাজ এবং সাওয়াবের কাজ হিসাবে করা হচ্ছে অথচ তা গুনাহে কবীরা। কষ্টদায়ক সেসব কর্মকান্ডের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিবেকহীনভাবে মাইকের ব্যবহার।
অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের সমাজে শবীনা খতমের নামে এবং দীনী ও রাজনৈতিক প্রোগ্রামের অধিকাংশ আয়োজকরা শরী'আতের এ গুরুত্বপূর্ণ হুকুমটির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করেন না। তাদের মাইক অনেক দূর পর্যন্ত লাগানো থাকে। এমতাবস্থায় এগুলোর বিকট আওয়াযে কোন মানুষ না পারে একটু আরামের সাথে ঘুমাতে, না পারে একাগ্রতার সাথে কোন যিকির ইবাদত করতে বা নিজের কোন কাজ করতে। না পারে অসুস্থ ব্যক্তিগণ একটু আরাম করতে। মাইকের সাহায্যে আযানের আওয়ায দূর পর্যন্ত পৌঁছানো তো ঠিক আছে। তাই বলে মসজিদের অনুষ্ঠিত ওয়ায-নসীহত, তিলাওয়াত, যিকির ইত্যাদির আওয়ায দূর পর্যন্ত পৌঁছানো মোটেও জায়িয নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মসজিদে অল্প সংখ্যক লোক আছে। যার জন্য ভিতরের সাউন্ড বক্সই যথেষ্ট। অথচ বাহিরের মাইক সমূহ পূর্ণ শক্তিতে খোলা থাকে। আর এগুলোর
{পৃষ্ঠা-৯৭}
আওয়ায মহল্লার প্রতিটি ঘরে এভাবে পৌঁছে যায় যে, প্রত্যেকটি মানুষ এতে আক্রান্ত হতে বাধ্য। আর অনেক জায়গায় খালি মসজিদে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে মাইক ছেড়ে দিয়ে পুরা এলাকাবাসীকে যবরদস্তীভাবে তা শোনার জন্য বাধ্য করা হচ্ছে। দীনের সঠিক বুঝ রাখেন এমন কোন ব্যক্তি কখনো এ ধরনের কাজ করতে পারেন না। এসব কর্মকান্ডের অধিকাংশ ঐ সকল মসজিদেই হয়ে থাকে যেগুলোর পরিচালনা ঐ সমস্ত লোকদের হাতে যারা ইলমে দীনের আলো থেকে দূরে বা ইলম থাকলেও সতর্ক দৃষ্টির অধিকারী নন। এসব কাজ সাধারণতঃ খুব ইখলাসের সাথে করা হয় এবং এটাকে দীনী খিদমত মনে করা হয়। আমাদের সমাজে প্রচলিত এ ধারণাটি নিতান্তাই ভুল যে, "নেক নিয়তে কোন মন্দ কাজ করলেও তা জায়িয হয়ে যায়"। কেননা কোন কাজ সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র নিয়ত ঠিক হওয়াই যথেষ্ট নয়। বরং তার নিয়মটাও সহীহ হওয়া আবশ্যক। আর মাইকের বে-ইনসাফী ব্যবহার শুধু যে দাওয়াত ও তাবলীগের নিয়ম বহির্ভূত তাই নয় বরং এর দ্বারা জনমনে দীনের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের দেশে যে শবীনা খতম, ওয়ায মাহফিল, যিকির ও তিলাওয়াত ইত্যাদিতে অনেক দূর পর্যন্ত মাইকের লাগানো হয় শরী'আতের দৃষ্টিতে এর কোন বৈধতা নেই। নিম্নে এর কিছু প্রমাণাদি প্রদত্ত হলো-
হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর ঘরের একেবারে সামনে এক ওয়ায়েয ওয়ায করতেন। সে যুগে মাইকের আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু তার আওয়ায এত উচু ছিল যে এর ফলে হযরত আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিজস্ব ইবাদতের মধ্যে

মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাতো। তখন ছিল খলীফা হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)-এর যুগ। তাই তিনি এ ব্যাপারে হযরত উমরের (রাযিঃ) দরবারে নালিশ করলেন। উমর (রাযিঃ) তাকে সেখানে ওয়ায করতে নিষেধ করে দিলেন। ফলে সেই ওয়ায়েয ওয়ায বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু কিছু দিন পর আবার শুরু করে দেন। এবার হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) সংবাদ পেয়ে তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে গ্রেফতার করেন এবং তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করেন। [আখবারুল মদীনা, ১:১৫]

একদিন হযরত আয়িশা (রাযিঃ) মদীনার এক ওয়ায়েযকে নসীহত করতে গিয়ে বলেন- তোমার কন্ঠকে মজলিসে উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে সীমিত রাখবে। আর তাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত দীনের কথা শুনাবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমার কথা শুনতে আগ্রহী থাকে। তারা শুনতে না চাইলে তুমি বন্ধ করে দিবে। [মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১:১৯১]

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ (রঃ) ইরশাদ করেন- "আলিমের জন্য উচিত, যেন তার কন্ঠ মজলিসের বাহিরে না যায়।" [আদাবুল ইমলা ওয়াল ইস্তিমলা-৫–৭]

{পৃষ্ঠা–৯৮}

এক হাদীসে আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে উচ্চ আওয়াযে কিরাআত পড়তে ছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর কারণ জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিলেন, ঘুমন্তদের জাগ্রত করার জন্য এবং শয়তানকে ভাগানোর জন্য আমি উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করে থাকি। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করলেন- তোমার কন্ঠকে আরেকটু আস্তে করে দাও। [মিশকাত শরীফ, ১:১০৭]

তাছাড়া হযরত আয়িশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতেন তখন বিছানা হতে খুব আস্তে উঠতেন। (যাতে কারো ঘুম নষ্ট না হয়।)

এই সমস্ত হাদীস ও আছারের ভিত্তিতে সমস্ত ফুকাহায়ে উম্মত এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, তাহাজ্জুদের নামাযে এমন জোরে কিরাআত পড়া জায়িয নেই যার দ্বারা কারো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। মানুষের ঘুমের সময় যদি তার ঘরের ছাদের উপর উচ্চ কন্ঠে তিলাওয়াত করে, তাহলে তিলাওয়াতকারী গুনাহগার হবে। [খুলাসাতুল ফাতাওয়া, ১:১০৩# ফাতাওয়ায়ে শামী ১:৪৪৩-৪৪৪]

উপরোল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই অনুধাবন করা যায় যে, শরী'আতে বান্দার হকের ব্যাপারে কতটুকু গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কুরআন তিলাওয়াত, শবীনা খতম, ওয়ায-নসীহত ও যিকির-আযকার ইত্যাদি পুণ্যময় কাজের মধ্যেও যখন শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত আওয়ায বড় করা যাবেনা, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হক বুঝা এবং তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন।

কবর পাকা বা তার উপর স্মৃতিসৌধ তৈরী করা।

জিজ্ঞাসাঃ অনেক পীর সাহেবের কবরের উপর লোকেরা ইমরাত তৈরী করে বা ছাদ করে সেখানে খুব সুন্দর করে মাযার বানায়। এসব শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ কবর পাকা করা বা কবরের উপর বিল্ডিং-স্মৃতিসৌধ তৈরী করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। সুতরাং তা হারাম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬৬২]

পীরের নামে পশু যবেহ করা ও ওরশ করা।

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মাযার ও পীরের দরবারে জলসা ও মাহফিলের নামে যে গরু, ছাগল ও মহিষ ইত্যাদি খাজা–বাবা, অমুক বাবা, অমুক পীর বাবার নামে যহেব করে খানার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে বা ওরশ করা হয়ে থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?

{পৃষ্ঠা–৯৯}

জবাবঃ কোন মাযারে বা কোন পীরের নামে বা তাদের মৃত্যু দিবসের কোন নির্দিষ্ট দিনে প্রতি বছর ওরশ করা, ঈসালে সাওয়াব বা শিরনী বিতরণ করা নাজায়িয এবং বিদ'আত। তদুপরি কোন পীরের নামে, খাজা বাবার নামে অথবা আল্লাহ ব্যতীত অন্য যে কোন মানুষ বা প্রাণীর নামে জানোয়ার যবেহ করলে, তা খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কারণ, গাইরুল্লাহর নামে কোন প্রাণী যবেহ করলে তা মুর্দার সমতুল্য। আর মুর্দা খাওয়া হারাম। সুতরাং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গকৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হারাম হবে। এমনকি যবেহ করার সময় আল্লাহর নামের সাথে মিলিত করে অন্য কিছুর নাম উল্লেখ করলে সেটা খাওয়াও হারাম। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুর্দা, প্রবাহিত রক্ত, শুকরের গোশ্ত এবং যেসব প্রাণী আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়েছে, তা ভক্ষণ করা তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম করা হলো।" [সূরা মায়িদা, আয়াতঃ ৩]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন- "যে সমস্ত প্রাণী আল্লাহর নামে যবেহ করা না হয়, অর্থাৎ যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়নি, তার গোশ্ত তোমরা ভক্ষণ করো না।"

আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝা গেল গাইরুল্লাহর নামে যবেহ করলে, তার গোশ্ত খাওয়া মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং বিভিন্ন মাযারে বা পীরের নামে ওরশ করা অথবা তাদের নামে জানোয়ার যবেহ করে শিরনী বিতরণ করা সম্পূর্ণ নাজায়িয। এতে কোন মুসলমানের অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়।

ويكره ان يذكر مع اسم الله شيءا غيره وان يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان- [الهدايت-432/3]

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৫:২১১# হিদায়া ৪:৪৩৬# ফাতাওয়া রশীদিয়া ১২৮]

মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

জিজ্ঞাসাঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে মৃত্যুবার্ষিকী পালন কতটুকু জায়িয? মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মৃতের আত্মার শান্তির উদ্দেশ্য ফকির-মিসকীনদের খাওয়ানো কতটুকু শরী'আত সম্মত? এ দিনে কি আমাল করলে মৃতের আত্মা শান্তি পাবে? অনুগ্রহ করে জানাবেন।

জবাবঃ শরী'আতে মৃত্যুবার্ষিকী পালনের কোন ভিত্তি নেই। সলফে সালেহীন তথা সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগে এর প্রচলন ছিল না। সুতরাং মৃত্যুবার্ষিকী রীতি পালন নিছক মনগড়া ও বিজাতীয় একটি কুসংস্কার। তাই মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিসকীন খাওয়ানো বা অন্য যে কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা ঠিক নয়। বরং শরী'আত পরিপন্থী কাজ।

উল্লেখ থাকে যে, মৃতের রুহের মাগফিরাতের জন্য দিন-তারিখ নির্দিষ্ট না রেখে বৎসরের যে কোন সময় অবস্থা, সুযোগ ও সামর্থ অনুযায়ী দান, সদকা ও

{পৃষ্ঠা–১০০}

নফল ইবাদত ইত্যাদির মাধ্যমে সাওয়াব রিসানী করা যায়। হাদীস শরীফের বর্ণনানুযায়ী মৃত ব্যক্তি সব সময়ই অপেক্ষায় থাকে তার কোন সন্তান বা আত্মীয় তার জন্যে কোন সাওযাব পাঠায় কি-না? তাই যখনই সুযোগ হয় তখনই যথা সম্ভব যে কোন আমলের মাধ্যমে ঈসালে সাওয়াব করা উচিৎ।

[ইমদাদুল মুফ্তীন ১:১৫৮ # মাজমু'আতুল ফাতাওয়া ১:৩৪১ # ইমদাদুল আহকাম ১:৯০ # ফাতাওয়া রশীদিয়া ১৬৬ # শামী ২:২৪০-৪১]

১২ই রবিউল আউয়ালে উৎসব করা।

জিজ্ঞাসাঃ ১২ই রবিউল আউয়ালে যে জশ্নে জুলূছে ঈদে মীলাদুন্নবী নামে অনুষ্ঠান করা হয়, মিছিল ইত্যাদি করা হয় শরী'আতের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?

জবাবঃ ১২ই রবিউল আউয়ালে জশ্নে জুলূছে ঈদে মীলাদুন্নবী নামে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়, দামী দামী ব্যানার তৈরী করা হয়, কয়েকদিন যাবত বিভিন্ন প্রোগ্রামসহ বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা হয, কুরআন ও হাদীসে এর

কোন মূল বা ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশেষ করে যেই তিন যুগকে (সাহাবা, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন) খাইরুল কুরুন বা সর্বোত্তম যামানা বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেই তিন যুগে এর কোন অস্তিত্বই ছিল না। বরং এগুলো বহু পরে ৬০৪ হিজরীতে আবিস্কৃত হয়েছে। সুলতান আবূ সাঈদ মুযাফফার ও আবূ খাত্তাব ইবনে দেহ্ইয়া এর উদ্ভাবক ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এ ব্যক্তিদ্বয়কে ফাসিক, কায্যাব ও মিথ্যাশ্রয়ী বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের উদ্ভাবিত এ প্রথা শরী'আতের দৃষ্টিতে বিদ'আত ও নাজায়িয কাজ।
সামান্য চিন্তা করলেও বুঝা যায় যে, এটাকে ঈদ বলে অভিহিত করা যায় না। কারণ-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যে ১২ই রবিউল আউয়ালে ইন্তিকাল করেছেন এ ব্যাপারে কোন প্রকার মতভেদ নেই। সুতরাং ১২ই রবিউল আউয়াল নিশ্চিতভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর মৃত্যুর তারিখ। আর কোন্ তারিখে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে ১২ই রবিউল আউয়াল ছাড়া অন্য কয়েক তারিখের কথাও ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায়। যেমন ৮ই রবিউল আউয়াল, ৯ই রবিউল আউয়াল তবে ১২ই রবিউল আউয়াল হলো প্রসিদ্ধত মত। অর্থাৎ, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্মগ্রহণ তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ১২ই রবিউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ উপরে বর্ণিত তারিখদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরলোক গমণের তারিখ সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। সকলেই ১২ই রবিউল আউয়াল বলেছেন। এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। এখন চিন্তা করুন, ১২ই রবিউল আউয়াল ঈদ (খুশী)-এর দিবস কিভাবে হতে পারে?
{পৃষ্ঠা-১০১}
বরং এটা মুসলমানদের জন্য ভীষণ শোকের এবং দুঃখের দিবস হলে তার কিছুটা যুক্তি ছিল। কারণ-এর দিবসেই হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্মের তারিখ হিসেবে তো আর ১২ই রবিউল আউয়াল নির্ধারিত নয়। কাজেই মৃত্যুর দিবসে খুশী প্রকাশ করা কত বড় বে-আদবী ও ধৃষ্টতা তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এগুলো যদি সত্যিকার দীনের কাজই হতো বা এতে যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর কোন সম্মান হতো, তাহলে খুলাফায়ে রাশেদীন বা সাহাবাগণও (রাযিঃ) এরূপ জশনে জুলুছের ঈদ করতেন। কিন্তু কোন হাদীসে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ কেউ দেখাতে পারবে না। বরং উলামায়ে কেরামগণ তো হাদীসে শুধু দুই ঈদের উল্লেখ পেয়েছেন। তা ছাড়া আর কোন ঈদের উল্লেখ পাননি।
সুতরাং এ জাতীয় বিদ'আত ও গর্হিত কাজ থেকে দীনদার মুসলমানদের বেঁচে থাকা কর্তব্য। [প্রমাণ: কিপায়াতুল মুফ্তী ১:১৪৫# ইখতিলাফে উম্মত ও সীরাতে মুস্তাকীম ৯০-১২৯ # মিশকাত ২৭ পৃঃ # ওফায়াতুল আয়ান ৪:১১৭ পৃঃ]
আয়াত লিখিত কাপড় দ্বারা মুর্দাকে ঢাকা।
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একটা প্রথা চালু আছে। তা হলো, কোন লোক মারা গেলে গোসল দেয়ার পর মক্কা শরীফ থেকে আনা আয়াতুল কুরসী বা অন্য কোন আয়াত লিখা কাপড় দ্বারা মুর্দাকে ঢেকে রাখা হয়। এমনটি করা শরী'আত সম্মত কি-না?
জবাবঃ এমন কোন কাপড় যাতে আয়াতুল কুরসী, কালিমায়ে তাইয়্যিবা কিংবা অন্য কোন আয়াত বা দু'আ লিখা থাকে তা দ্বারা মুর্দাকে ঢেকে রাখা নিষেধ। এতে কুরআন শরীফ ও আল্লাহর নামের সম্মান বিঘ্নিত হওয়ারও প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অসম্মান বা বেহুরমাতী হতেও দেখা যায়, যা জঘন্য অন্যায়। তাই এ প্রথা বর্জন করতে হবে।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২২০# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:৪০১]
শবে-বরাতে প্রচলিত প্রথা।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় প্রায় সর্বত্র শবে-বরাত উপলক্ষে হালুয়া, রুটি ও খিচুড়ী বিতরণ এবং মসজিদ আলোকসজ্জা করা হয়। খুব আতশবাজি করা হয়। ইসলামী শরী'আত মতে তা কতটুকু সঠিক।
জবাবঃ শবে-বরাতের ফযীলত "হাসান" হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু দীনী যে কোন বিষয় পালন করতে হলে তা অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের নির্দেশিত পদ্ধতিতে হতে হবে। মনগড়া ও ভিত্তিহীন পদ্ধতিতে দীনী কোন বিষয়ের উপর আমল করা বিদ'আত, গোমরাহী ও
{পৃষ্ঠা-১০২}
গোনাহের কাজ। শবে-বরাতে নামায, তিলাওয়াত, যিকির, দু'আ-ইস্তিগফার এবং দিনের বেলায় রোযা রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং শবে-বরাতের করণীয় কাজগুলোর মধ্যে আমাদের আমল সীমিত রাখা জরুরী। শবে-বরাতের হালুয়া, রুটি বা খিচুড়ী বিতরণ এসব কিছুই প্রমাণিত নেই। সুতরাং এসব কাজকে শবে-বরাতের করণীয় এবং সাওয়াবের কাজ মনে করলে গোনাহ হবে। তেমনিভাবে আলোকসজ্জা অগ্নিপুজকদের ধর্মীয় নির্দশন। সুতরাং তা পালন করা মুসলমানদের জন্য নাজায়িয। আর আতশবাজি তো অনেকগুলো গোনাহের সমষ্টি। যেমন- (ক) অপচয় (খ) আতংক সৃষ্টি (গ) লোকদের জান-মালের ক্ষতি (ঘ) নিজে বরকতের রাত্রে ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকা (ঙ) অন্যদের ইবাদত-বন্দেগীতে বাধা সৃষ্টি করা ইত্যাদি। এগুলোর প্রত্যেকটা হারাম এবং গোনাহে কাবীরা। সুতরাং মুসলমানদের জন্য এগুলো থেকে বিরত থাকা এবং সন্তানকে বিরত রাখা অপরিহার্য কর্তব্য।
[প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ, ১:৩৬১ # ফাতাওয়া বায্যাযিয়া, ৩:৩২৬ # তাতারখানিয়া, ১:২৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ১:৩৯১ # ইমদাদুল মুফ্তীন, ১৭৪ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১:৩০৬]
রবিউল আউয়ালের রোযা রাখা
জিজ্ঞাসাঃ (ক) রবিউল আউয়াল মাসে আমাদের বিশেষ কি করণীয়?
(খ) ১২ই রবিউল আউয়ালে রোযা রাখার বিধান শরী'আতে আছে কি?
জবাবঃ মাহে রবিউল আওয়াল নিঃসন্দেহে ফযীলতের মাস, এ মাসের ফযীলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, এ মাসে দু'জাহানের সরদার, সায়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লীল আলামীন, খাতামুন নাবিয়্যীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর এই পৃথিবীতে আগমন হয়েছে- যে সময় বা কাল যত বেশী ফযীলতপূর্ণ হয়, সে মাসের ইবাদত আল্লাহ তা'আলার নিকট তত বেশী পছন্দনীয় হয়, আর ঐ সময় বা কালে শরী'আত ও সুন্নাত বিরোধী কাজ ততবেশী অপছন্দীয়। এখন জানার বিষয় যে, 'ইবাদত' কাকে বলে? আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যে কাজ বা আমল করা স্বীকৃতি দিয়েছেন বা যা করা পছন্দ করেন সেটাকে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর অনুসৃত পন্থায় করার নামই 'ইবাদত'। এর ব্যতিক্রম যে কাজ তা সবই বিদ'আত ও বর্জনীয়।
(ক) রবিউল আউয়াল মাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর জন্ম ও ওফাতকে কেন্দ্র করে তেমন কোন ব্যতিক্রমধর্মী আমল কুরআন, হাদীস বা মুজতাহিদীনে উম্মত থেকে বর্ণিত আছে বলে জানা যায় নি।
(খ) ১২ই রবিউল আউয়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর জন্ম বা ওফাতকে কেন্দ্র কের রোযা রাখার কোন বিধান শরী'আতে নেই।

{পৃষ্ঠা-১০৩}

বরযখ ও আখিরাত

অমুসলিম পরকালে নাজাত পাবে কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ কোন অমুসলিম যদি উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সমাজ সেবামূলক কাজ করে, তাহলে সে পরকালে নাজাত পাবে কি-না?
জবাবঃ পরকালের নাজাত পাওয়ার বিষয়টি ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং যদি কেউ ঈমান ব্যতীত দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ করে তাহলে যত ভালো কাজই করে থাকুক না কেন সে নাজাত পাবে না। কেননা, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআন ইরশাদ করেছেন– {إِنَّ الدِّينَ: عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}
"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" (সূরাহ আল-ইমরান)
অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে– {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}
"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করে কষ্মিনকালেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না। আর আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা আলে ইমরান– ৮৫]
একটি উদাহরণ দ্বারা উক্ত বিষয়টি আরো স্পষ্ট রূপে বুঝা যাবে বলে আশা করি। যেমন, এক ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। কিন্তু কোন কারণে সে আইন পরিপন্থী কাজ যেমন– জুয়া, চুরি, বা অসামাজিক কাজ ইত্যাদি করে বসে। তাহলে এরূপ ব্যক্তির অন্তরে যেহেতু রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রয়েছে তাই তার প্রতি দেশদ্রোহীর শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না এবং তাকে দেশান্তরিত করাও হবে না। বরং তার শাস্তি হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। শাস্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পুনরায় সে সরকারের অনুগত প্রজাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র চরিত্রের অধিকারী হয় এবং কোন প্রকার অসামাজিক কাজে লিপ্ত না হয়। কিন্তু সরকারকে ও দেশকেই সে অমান্য করে তাহলে তাকে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করে দেশান্তরিত করা হবে অথবা ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলানো হবে। ইসলামী আইনের বিষয়টি অনুরূপ।
[প্রমাণঃ আশরাফুল জাওয়াব, ৩৭৬]

কবরের আযাব মাফ হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ শোনা যায় যে, মক্কা ও মদীনার মাঝে এমন একটি স্থান রয়েছে যেখানে কবরের আযাব হয় না। আবার কেউ বলেন, সে স্থানটি নাকি জান্নাতুল বাকী, তাদের এ বক্তব্য কতটুকু সত্য?
জবাবঃ এমন কোন জায়গা আছে বলে কোথাও প্রমাণ পাওয়া যায় না, যেখানে দাফন করা হলে কবরের আযাব হবে না। তবে হাদীসের কিতাব সমূহ
{পৃষ্ঠা–১০৪}
অন্বেষণ করে যা পাওয়া গেছে তা হলো- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সক্ষম হয় সে যেন মদীনায় মৃত্যুবরণ করার চেষ্টা করে।" কেননা, যে মদীনায় মৃত্যুবরণ করবে আমি তাঁর জন্য সুপারিশ করব। হযরত উমর (রাযিঃ) মদীনায় ইন্তিকালের জন্য দু'আ করতেন।
উপরোক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মদীনা মুনাওয়ারায় দাফনের বিশেষত্ব অবশ্যই রয়েছে। এজন্যই অনেক বুযুর্গানে দীনকে দেখা গেছে যে, শেষ জীবনে তারা মদীনায় চলে যেতেন এবং মদীনায় ইন্তিকালের আশায় বাকী জীবন সেখানেই অবস্থান করতেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, কবরের আযাব হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহর রহমতের উপর নির্ভরশীল। এর সাথে তার আমলেরও বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا}

অর্থঃ যে ব্যক্তি একটি নেক কাজ করবে তাকে উক্ত কাজের বিনিময়ে দশগুণ সাওয়াব দান করা হবে। যে ব্যক্তি একটি অসৎ কাজ করবে তাকে উক্ত কাজের বিনিময়ে সমানই প্রতিদান দেয়া হবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না।
অন্যত্র ইরশাদ করেন- {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}

অর্থঃ কেউ অনু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অনু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তা-ও দেখতে পাবে।
[প্রমাণঃ কানযুল উম্মাহ ১১/২৬২ ও ১১/২৬২ # তিরমিযী শরীফ, ২/২২৯]
জান্নাতের জন্য ইবাদত করা
জিজ্ঞাসাঃ এক লেখক লিখেছেন, "যারা পরকালে দোযখ থেকে মুক্তি এবং জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে ইবাদত করেন, তারা শিরক করেন। তাদের ইবাদত বরবাদ হবে।" কুরআন-হাদীসের আলোকে লেখকের বক্তব্য কতটুকু ঠিক?
জবাবঃ এরূপ কোন কথা কুরআন-হাদীসে পাওয়া যায় না। বরং কুরআনুল কারীমে মহান রাব্বুল 'আলামীন জান্নাতের নিয়ামতের কথা বর্ণনা করেছেন, তারপর জান্নাত পাওয়ার জন্য আমল করতে আদেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা সাফফাতে ইরশাদ হচ্ছে- "নিশ্চয় ইহা (জান্নাত পাওয়া) মহা সাফল্য, এরূপ সাফল্যের জন্য আমলকারীদের আমল করা উচিত।"
এ ছাড়া হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত মু'আয (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, তরজমাঃ "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এরূপ কিছু আমলের কথা বলে দিন যা
{পৃষ্ঠা–১০৫}
আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থকে দূরে রাখবে।" রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলরেন, "নিশ্চয় তুমি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ। ইহা ঐ ব্যক্তির জন্য সহজ- যার জন্য আল্লাহ পাক সহজ করে দেন। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন- আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং নামায কায়ম করবে। যাকাত আদায় করবে। রামাযানের রোযা রাখবে এবং হজ্ব করবে।"
অত্র হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম জান্নাত পাওয়ার ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আমল বলে দিলেন। যদি জান্নাত পাওয়ার উদ্দেশ্যে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে শিরক হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম মু'আযকে (রাযিঃ) অবশ্যই বলে দিতেন যে, তুমি জান্নাত পাওয়ার এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ইবাদত করো না। কেননা, এটা শিরক। যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম একথা বলেননি, তাই এই হাদীসই এবং এ ধরণের আরও অনেক হাদীস উক্ত লেখকের কথা ভিত্তিহীন প্রমাণ করে। তবে একথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি মু'মিন জান্নাত ও জাহান্নামের উর্ধ্বে ওঠে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করতে পারলে সেটা ইখলাসের অনেক উঁচু স্তর হবে। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হয়ে গেলে জান্নাতও হাসিল হবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হবে। অবশ্য সর্ব অবস্থায় আল্লাহর দরবারে জান্নাতের কামনা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য দু'আ করতে হবে। এটা রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম নির্দেশ। রামাযানে যে দু'টি কাজ বেশী বেশী করার জন্য রাসূলুল্লাহ পরামর্শ দিয়েছেন। এ দু'টিই হল- জান্নাতের জন্য দু'আ এবং জাহান্নাম থেকে পরিত্রানের জন্য দু'আ করা।
[সূরা সাফফাত, ৬০-৬১ # মা'আরিফুল কুরআন, ৭/৪৩৩ # মিশকাত শরীফ, ১/১৪]
কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে?
জিজ্ঞাসাঃ কিয়ামত বলে একটি দিন আছে তা অবশ্যই হবে। হাদীস ও অন্যান্য কিতাবসমূহে পাওয়া যায় ১০ই মহররম এবং শুক্রবার কিয়ামত সংঘটিত হবে। তাহলে আমাদের তুলনায় অন্যান্য দেশের সময়ের সংগে অনেক পার্থক্য রয়েছে এবং আরবদেশে ১দিন আগে এই পবিত্র দিন (১০ই মুহররম) পালন করা হয়। ফলে আরব দেশে কি আগে কেয়ামত সংঘটিত হবে। দয়া করে সঠিক উত্তর দিলে খুব খুশী হব।
জবাবঃ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ক্ষমতার বাইরে কোন কিছুই নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সারা বিশ্বে একই দিন ১০ই মুহররম কায়েম করে কিয়ামত কায়েম করতে পারেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। হাদীস

{পৃষ্ঠা-১০৬}
শরীফে বর্ণিত আছে, দাজ্জাল দুনিয়ায় ৪০ দিন অবস্থান করবে। তার ১ম দিন হবে ১ বছরের সমতুল্য। ২য় দিন হবে ১ মাসের সমতুল্য। ৩ দিন হবে ১ সপ্তাহের সমতুল্য। বাকী দিনগুলো সাধারণ দিনের মত হবে। সুতরাং হতে পারে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিনকে অনেক বড় করবেন, সারা বিশ্বে একই দিনে ১০ই মহররম হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে অসম্ভব নয়।
তাছাড়া এটা এমন কোন বিষয় নয় যেটা জানা শরী'আত আমাদের উপর ওয়াজিব বা ফরয করেছে। বরং আমাদের তো সর্বদা এই চিন্তায় থাকা দরকার। আমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছি। হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে?
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তার উত্তরে বললেন, (তুমি কিয়ামতের কথা জিজ্ঞাসা করছ?) তোমার ধ্বংস হোক; তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? উত্তরে লোকটি বলল; আমি কোন প্রস্তুতি নিতে পারি নাই। তবে আমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালবাসি। মোদ্দাকথা, আমাদের এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন থেকে বিরত থাকা উচিত এবং সেই বিচারের দিনের জন্য সর্বক্ষণ ফিকির রাখা এবং সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি নেয়া কর্তব্য। [প্রমাণঃ মিশকাত, ২/৪৭৩ ও ৪২৬]
জান্নাতী ও জাহান্নামীদের দেহের আকৃতি
জিজ্ঞাসাঃ পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের দেহের আকৃতি গঠন কি একই রকমের হবে নাকি পার্থক্য থাকবে?
জবাবঃ পরকালে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের দেহের আকৃতি এক ধরণের হবে না। বরং ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন- জান্নাতীদের শরীর ষাট হাত লম্বা হবে এবং সে অনুপাতে অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হবে। আর জাহান্নামীদের শরীর কত গজ লম্বা হবে তার স্পষ্ট বর্ণনা আমরা কোন হাদীসে পাইনি। তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন, তার দ্বারা অনুমান করা যায় যে, জাহান্নামীদের দেহ বিশাল হবে। যাতে করে তারা বেশী করে আযাবে ভুগতে পারে। যেমন- হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন- কাফেরদের এক একটা দাঁত উহুদ পাহাড়ের মত বড় হবে এবং রানগুলো হবে বাইযা পাহাড়ের মত বৃহৎ, আর তাদের বসার স্থান হবে দ্রুত বেগে তিন দিন তিন রাত চলার পথের সমান। হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন কাফিরের জিহ্বা টেনে তিন মাইল অথবা ছয় মাইল পর্যন্ত লম্বা করে বিছানো হবে। মানুষ তার উপর দিয়ে
{পৃষ্ঠা-১০৭}
পায়ে হেঁটে চলাচল করবে। হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন- কাফিরদের চামড়ার পুরুত্ব হবে ৪২ হাত। দাঁত হবে উহুদ পাহাড়ের মত, বসার স্থান হবে মক্কা হতে মদীনা পর্যন্ত পথের সমান।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আযীযী, ৩০ # তিরমিযী শরীফ, ২/৮৫ # হায়াতে আদম, ৫০]
বেহেস্তে লাইলী-মজনুর বিবাহে বরযাত্রী
জিজ্ঞাসাঃ লোকমুখে শোনা যায় যে, যারা কোনদিন দাড়িতে ক্ষুর লাগায়নি, তারা নাকি বেহেশ্তের মধ্যে লাইলী-মজনুর বিবাহের বরযাত্রী হবে। একথাটা কি সত্য?
জবাবঃ এ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবান্তর। এটা মনগড়া কথা। কুরআন-হাদীসে এমন কোন কথা নেই। তবে যারা কোন দিন দাড়ি কটেনি, তারা বড় ভাগ্যবান। আল্লাহ তা'আলা শুরু যিন্দেগী থেকেই দীনদারী গ্রহণকারী এ ধরনের পরহেযগার ব্যক্তিদের জন্য হাশরের ময়দানে আরশের ছায়ার ব্যবস্থা করবেন।
বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যের দ্বারা সাওয়াব রিসানী

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজন মৃত ব্যক্তির মাগফিরাত কামনার্থে উলামায়ে কিরামদের দ্বারা কুরআন খতম বা বিভিন্ন ইবাদতের মাধ্যমে দু'আ করায়ে থাকে এবং এতে তাদের জন্য খানাপিনার ব্যবস্থা ও টাকা পয়সার লেনদেন করে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?
জবাবঃ কোন মানুষের ইন্তেকালের পর তার সাওয়াব রিসানীর উদ্দেশ্যে কুরআন শরীফ পড়িয়ে টাকা দেয়া-নেয়া, খানা খাওয়া সবই নাজায়িয। আর যেহেতু টাকা বা কোনরূপ বিনিময় নিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে স্বয়ং তিলাওয়াতকারীই উক্ত তিলাওয়াতের কোন সাওয়াব পায় না। তাহলে তিনি মৃত ব্যক্তির রূহে কি পৌঁছাবেন? কেননা-মৃতের রূহে সাওযাব পৌঁছাতে হলে প্রথমতঃ তিলাওয়াতকারীর সাওয়াব পেতে হবে। তারপর তিনি সে সাওযাব মৃতকে বখ্‌শিয়ে দিবেন। কিন্তু তিনি বিনিময় গ্রহণ করার কারণে (যা শরী'আতে হারাম) সাওয়াব থেকে মাহরূম হচ্ছেন, তাই অন্যের জন্য সাওয়াব রিসানীর প্রশ্নই উঠে না। তাই ঈসালে সাওযাবের জন্য খতম পড়ার বিনিময়ে টাকা পয়সার লেন-দেন ও দাওয়াত খাওয়া সবই নাজায়িয। সুতরাং খতম নিজেরা পড়বে এবং এমন লোক দ্বারা পড়াবে, যাদের সাথে আগে থেকে মুহাব্বত আছে। যাতে করে তারা বিনিময় ছাড়া কুরআন শরীফ পড়ে দেন। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ৫/৩৯ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৩/৩৮৫]
{পৃষ্ঠা-১০৮}
হুর মহিলা নাকি পুরুষ
জিজ্ঞাসাঃ বেহেশতে যিনি প্রবেশ করবেন তাকে খেদমতের জন্য হুর দেয়া হবে। হুর মহিলা নাকি পুরুষ? হুর যদি মহিলা হয়ে থাকে তাহলে মহিলা বেহেশতীকে কি দেয় হবে?
জবাবঃ হুর মহিলাই হবে, পুরুষ নয়। বেহেশতী মহিলাকে বেহেশতে তার স্বামীকেই দেয়া হবে। তবে যদি কোন মহিলার দুনিয়াতে কারো সঙ্গে বিবাহ না হয়ে থাকে, তাহলে তাকে পছন্দ করার অধিকার দেয়া হবে। সে যাকেই পছন্দ করবে, তার সঙ্গেই বেহেশতে তার বিবাহ হবে। যদি সে কাউকে পছন্দ না করে, তাহলে বেহেশতের মধ্যে তার জন্য একজন পুরুষ তৈরী করে আল্লাহ তা'আলা তার সঙ্গে বিবাহ দিবেন। [প্রমাণঃ মাজমু'আতুল ফাতাওয়া, ৩/২৬৮ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৫/২৯০]
সওয়াল-জওয়াবের পর রূহের অবস্থান
জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি মানুষের মৃত্যুর পর তার রূহ আল্লাহ পাকের নিকট চলে যায়। উক্ত ব্যক্তির দাফনের পর রূহকে কবরে এনে সাওয়াল-জওয়াব করা হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, তারপর রূহ কি পুনরায় কবর হতে নিয়ে যাওয়া হয়? আর সেখান থেকে রূহ নেয়া না হলে উক্ত রূহ আমাদেরকে দেখতে পায় কি-না? অনেকে বলে, মৃত ব্যক্তির রূহ বৃহস্পতিবার দিন তার আত্মীয়-স্বজনদের নিকট দু'আর জন্য আসে। তা কতটুকু সঠিক জানতে ইচ্ছুক। যেসব বিধর্মীকে দাফন করা হয় না তাদের বিধান কি?
জবাবঃ মানুষের মৃত্যুর পর রূহ অন্য এক জগতে চলে যায়। যাকে শরী'আতের ভাষায় 'আলমে বরযখ' বলা হয়। সেখানেকার পূর্ণ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে হাদীস শরীফের আলোকে বলা যায় যে, মৃত ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তাহলে তার রূহকে সাত আকাশের উপরে অবস্থিত ইল্লিয়্যীন নামক স্থানে পৌঁছানো হয়। আর যদি বদকার বা কাফির হয়, তাহলে তার রূহকে সাত যমীনের নীচে সিজ্জীন নামক স্থানে জেলখানায় মারাত্মক কষ্ট দিয়ে বন্দী করে রাখা হয়। ওখান থেকে মৃত ব্যক্তির রূহকে শরীরের সাথে, চাই শরীর যেকানেই হোক না কেন, বিশেষ একটা সম্পর্ক করে দেয়া হয়। যার দ্বারা তার কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং সে প্রশ্নের উত্তর দেয় বা আফসোস করতে থাকে। সেখানকার সুখ-দুঃখ, একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ এবং তাদের সালামের উত্তর দেয়ার মত ক্ষমতা দান করা হয়। আর কোন কোন নেককারের রূহকে বরযখী জগতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিচরণের অনুমতি দেয়া হয়। উল্লেখিত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, মানুষের রূহকে স্ব-স্ব স্থানে নিয়ে যাওয়ার পর তা মৃত ব্যক্তির শরীরে দ্বিতীয় বার ফিরিয়ে দেয়া হয় না। বরং শুধু শরীরের সাথে রূহের
{পৃষ্ঠা-১০৯}

এক প্রকার বিশেষ সম্পর্ক করে দেয়া হয়। যাদ্বারা তার প্রশ্নোত্তর সংশ্লিষ্ট কার্যাদি ফেরেশতাগণ সমাধা করে নেন এবং এর দ্বারা একথাও প্রতীয়মান হয় যে, মৃত ব্যক্তি সে অবস্থায় আমাদেরকে চিনেন, কবরে সালাম দিলে উত্তরও দেন। যেহেতু রুহকে কবরে ফিরিয়ে দেয়া হয় না। সুতরাং তা দ্বিতীয় বার নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আবার অনেকে যে বলে থাকে, প্রতি বৃহস্পতিবার রুহ আত্মীয়–স্বজনের নিকট সাওয়াবের জন্য এসে থাকে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও ভিত্তিহীন। এ ধরনের আকীদা থাকলে তাওবা ইস্তিগফার করে নেয়া জরুরী। উল্লেখ্য যে, শরীরের সাথে রুহের ক্ষীণ সম্পর্কের জন্য শরীর সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় বহাল থাকা জরুরী নয় এবং পানাহারের প্রয়োজন হওয়াও জরুরী নয়।

[প্রমাণঃ সূরা আলে ইমরান, ১৭০ # মা'আরিফুল কুরআন, ২/২৩৬ # মিশকাত শরীফ, ১/২৪ # ফাতাওয়া রশীদিয়া, ২৫৫ # আপকে মাসায়িল, ১/৩১ # আত-তারগীব ওযাত-তারহীব, ৪/৩৬৭-৩৬৯]

নাবালেগ সন্তান মারা গেলে জান্নাতি হবে না জাহান্নামী

জিজ্ঞাসাঃ নাবালিগ শিশু যারা শিশু অবস্থায়ই মারা যায়, তারা কি সকলেই বেহেশতে যাবে?

জবাবঃ মুসলমানদের নাবালেগ সন্তানদের বেহেশত যাওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, তারা বেহেশতে যাবে।

কিন্তু অমুসলিমদের নাবালেগ সন্তানদের ব্যাপারে মতভেদ আছে। পিতা-মাতার অনুগামী হিসেবে কেউ কেউ তাদেরকে জাহান্নামী বললেও অনেকে তাদেরকে জান্নাতী হওযার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। অনেকে মন্তব্য করেছেন যে, তারা জান্নাতীদের খাদিম হবে। এ ব্যাপারে প্রত্যেকের নিকট স্ব–স্ব মতের পক্ষে দলীল-প্রমাণ আছে। কেউ মনগড়া মন্তব্য ব্যক্ত করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর সর্বশেষ সিদ্ধান্ত কি, তা অনেক সময় স্পষ্ট না থাকায় পরবর্তী উলামাগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। তবে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মত এটাই বলা হয় যে, তাদের সকলকে জান্নাতী বা সকলকে জাহান্নামী বলে স্থির মন্তব্য না করে কেবল এতটুকু বলা যায় যে, হাশরের ময়দানে বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের কিছু সংখ্যক জান্নাতী হবে, আর কিছু সংখ্যক জাহান্নামী হবে। এতটুকুর উপর বিশ্বাস রাখা আমাদের কর্তব্য। এর চেয়ে বেশী বুঝতে চেষ্টা করা বা এ ব্যাপারে আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করা ঈমানের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরুপ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি সাফ উত্তর দেন– "এ ব্যাপারে কোন স্থির সিদ্ধান্ত আমার জানা নেই।"

[প্রমাণঃ তীবী শরহে মেশকাত, ১/২৬২ # মেরকাত, ১/১৬৬ # ফাইযুল বারী শরহে বুখারী, ৪/৪৩৬ # আশরাফুত তাওজীহ-মিশকাতুল মাসাবীহ, ১/২৪১]

{পৃষ্ঠা–১১০}

বেহেশতীগণের আফসোস হওয়ার কারণ। বেহেশতের বাগিচা কি?

জিজ্ঞাসাঃ বেহেশতীগণ কি জন্য আফসোস করবেন?

দুনিয়াতে বেহেশতের বাগিচা কি?

জবাবঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে গিয়ে নেক আমলের আফসোস করবে, আর ঐ মুহূর্তটার জন্য আফসোস করবে-যা আল্লাহ তা'আলার যিকির ছাড়া কাটানো হয়েছে। (অর্থাৎ ঐ মুহূর্তটায় মহান আল্লাহর যিকির করলে, বেহেশতে আরও বড় মর্তবা পেতাম।) আর দুনিয়াতে বেহেশতের বাগিচা হলো মসজিদ আর যিকিরের মজলিস।

জান্নাতে নারীদের বিশেষ প্রতিদান

জিজ্ঞাসাঃ পুরুষরা যদি জান্নাতে যায়, তাহলে সেখানে তাদের জন্য হুরের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মেয়েদের জন্য কিসের ব্যবস্থা রয়েছ? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ জান্নাতবাসী মহিলার জন্য তার দীনদার স্বামীকেই দেয়া হবে এবং তাকে জান্নাতের হুরদের সরদার বানিয়ে দেয়া হবে। মোট কথা, হুরদের চেয়ে দুনিয়ার জান্নাতী মহিলাদের মর্যাদা বেশী হবে। তবে দুনিয়ার কারো সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পূর্বে যে মহিলার ইন্তিকাল হয়, তাকে দুনিয়ার পুরুষদের মধ্যে হতে যে কোন একজনকে বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হবে। যাকে সে পছন্দ করবে, তার সঙ্গেই সেখানে তার বিবাহ হবে। যদি সে কাউকে পছন্দ না করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা একজন পুরুষ সৃষ্টি করে উক্ত মহিলাকে তার সঙ্গে বিবাহ দিবেন। উল্লেখ্য জান্নাতের মধ্যে সকলের সব ধরনের খাহেশ পূর্ণ করা হবে সত্য, কিন্তু মহিলাদের তবীয়তের মধ্যে যেহেতু একাধিক স্বামীর কোন খাহেশই থাকে না, বরং এটাকে তারা দোষণীয় মনে করে এবং এটাকে তারা মেয়েদের নষ্ট চরিত্র বলে বিশ্বাস করে। সুতরাং তাদেরকে একাধিক স্বামী দিয়ে জান্নাতের মধ্যে আযাব দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। [প্রমাণঃ কানযুল উম্মাহ, ১৪/৪৭৮ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ১/১০৪ # আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল, ১/৩৪৬]

একাধিক স্বামী থাকলে বেহেশতে কাকে পাবে?

জিজ্ঞাসাঃ কোন মেয়েলোকের পূর্বের স্বামী মারা যাওয়ার পর যদি দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে, তাহলে সে বেহেশতী হলে বেহেশতে কোন্ স্বামীকে পাবে?

জবাবঃ যদি উক্ত দুই স্বামীর মধ্যে হতে একজন বেহেশতী হয়, তাহলে সেই বেহেশতী স্বামীকেই পাবে। আর যদি উভয় স্বামী বেহেশতী হয়, তাহলে উক্ত মহিলাকে এ ব্যাপারে ইখতিয়ার দেয়া হবে। অর্থাৎ, তার ইচ্ছা অনুযায়ী সে প্রথম অথাবা দ্বিতীয় স্বামীর মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে গ্রহণ করতে পারবে। তবে কোন হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সে দ্বিতীয় স্বামীকেই পাবে।" আর যদি দু'জনের কোন স্বামীই বেহেশতী না হয়, তাহলে এদের কাউকেই পাবে না। তখন অন্য কোন বেহেশতী পুরুষের সঙ্গে সেই মহিলার বিবাহ দেয়া হবে।   [প্রমাণ / ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ১/১০৪]

{পৃষ্ঠা-১১১}

কবরের আযাব সত্য কি-না?

জিজ্ঞাসাঃ একটি বাংলা দৈনিক পত্রিকায় একজন কলামিষ্ট যিনি প্রায়ই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয় লিখে থাকনে। তিনি সম্প্রতি কবরের আযাব সম্বন্ধে লিখেছেন, "পবিত্র কুরআনে কবরের আযাবের কথা সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। মৃত্যু যন্ত্রণার উল্লেখ আছে। কবরে মাটির মধ্যে মৃত মানুষের যে আযাব হয়, তার উল্লেখ কুরআনের কোথাও নেই।" তিনি আবার নিজের পান্ডিত্য যাহির করার জন্য কবরের আযাব সম্পর্কে ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস আছে কি-না সে সম্পর্কেও উদ্ধৃতি দিয়েছেন।" সুতরাং এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ কবরের আযাবের আলোচনার পূর্বে কবরের সংজ্ঞা জানা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলবী (রহঃ) বলেন- কবর দ্বারা আলমে বরযখ তথা মৃত্যুর পর থেকে নিয়ে কিলামতের পূর্ব পর্যন্ত কাল উদ্দেশ্য। মানুষকে যেভাবে গর্ত করে দাফন করা হয়, কবর দ্বারা ঐ গর্ত উদ্দেশ্য নয়। কারণ, অনেক মানুষ পানিতে ডুবে ও আগুনে পুড়ে মারা যায়। তাদেরকেও তো পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হয়। সুতরাং কবর দ্বারা গর্ত উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ কবরের শাস্তি সরাসরি তাঁর রুহের উপর এবং পরোক্ষভাবে তার শরীরের উপর হয়ে থাকে। শরীর যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন এবং শরীরের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে অনু-পরামানু হয়ে গেলেও তার প্রত্যেক অংশে আযাব দেয়া আল্লাহর জন্য কোন কঠিন ব্যাপার নয়। তবে বরযখের বিষয় দুনিয়াতে দেখা যায় না। তাই আমরা দেখতে পাই না। দশটি আয়াত ও ৭০ টি হাদীসে মুতাওয়াতেরা দ্বারা কবরের আযাব প্রমাণিত। সুতরাং এখানে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এমনিভাবে ইজমা-কিয়াস দ্বারাও কবরের আযাব ছাবেত আছে। সুতরাং কবরের আযাব অস্বীকারকারী মুরতাদ হয়ে যাবে। [আরও জানার জন্য দেখুন মিশকাত শরীফ ১/২৪, ২৫ ২৬ # বুখারী শরীফ, ১/১৮৩ # মুসলিম শরীফ, ১/৩০২ # তিরমিযী শরীফ, ১/২০৫ # সূরা ইবরাহীশ ২৭ নং আয়াতের তাফসীর দেখুন। তাফসীরে

মা'আরিফুল কুরআন ও তাফসীরে মাযহারী, তাফসীরে ইবনে কাসীর, রুহুল বায়ান, রুহুল মা'আনী, বয়ানুল কুরআন, তাফসীরে হক্কানী।]

একই সঙ্গে একাধিক কবরে সওয়াল-জবাব হওয়া
জিজ্ঞাসাঃ হাদীস শরীফে আছে মুরদাকে কবরে রেখে ৪০ কদম চলে আসার পর দুই জন ফেরেশতা আসে সওয়াল জবাব করার জন্য। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই সময় যদি এক হাজার মুরদা দাফন করে তাহলে এক সাথে সবার সাওয়াল জবাব কিভাবে নিবেন। বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।
{পৃষ্ঠা-১১২}
জবাবঃ একই সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে কিংবা একই স্থানে অনেক মৃতকে দাফন করা হলে মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয় মৃতদেরকে কিভাবে প্রশ্ন করবেন? এ কৌতুহল নিরসনে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়।
১। মুনকার-নকীর উভয় ফেরেশতার সাথে এ কাজে নিমিত্তে আরও অসংখ্য ফেরেশতা সহায়ক হিসেবে থাকেন। হযরত আযরাইল (আঃ) যেমন তাঁর সহযোগী অন্যান্য ফেরেশতার দ্বারা জান কবযের কাজ নেন, তদ্রুপ মুনকার-নকীর ফেরেশতাদ্বয় নেতৃত্ব দিয়ে তাদের সহযোগী ফেরেশতা বাহিনী দ্বারা মৃতদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব সমাধা করেন।
২। অনেকে বলেন- সমগ্র দুনিয়া মুনকার-নকীরের নখদর্পনে উদ্ভসিত এবং দৃষ্টি ও ক্ষমতার আওতায়। যেমন– মালাকুল মউত হযরত আযরাঈল (আঃ)-এর ক্ষেত্রে। সুতরাং তাদের জন্য একই সময়ে অনেক মৃতকে সওয়াল করা অসম্ভব বা কঠিন কিছু নয়। [প্রমাণঃ মিরকাত ১/২০০]
উল্লেখ্য, এ ধররেন প্রশ্ন যেহেতু ঈমান-আকীদার সাথে কোনই সম্পর্ক নাই এবং কবরে-হাশরে এ ব্যাপারে কোন প্রশ্নও করা হবে না বা এগুলো জানলে কোন সাওয়াব হবে না সুতরাং এ চেয়ে জরুরী যেসব বিষয় রয়েছে তা জানার জন্য এবং আমল করার জন্য সময় ব্যয় করা উচিৎ।
হাশরের ময়দানে মানুষ উলঙ্গ থাকবে কি-না?
জিজ্ঞাসাঃ হাশরের ময়দানে সমস্ত মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে কি? তখন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্‌রাম-এর পরনে কাপড় থাকবে কি-না? এরূপ অন্যান্য নবীগণের পরনে কোন কাপড় থাকবে কি?
জবাবঃ হাশরের ময়দানে সবাই উলঙ্গ অবস্থায় থাকবে না। বরং কবর থেকে উঠার সময় সবই উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে। পরবর্তীতে সবপ্রথমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে কাপড় পরিধান করানো হবে এবং সাথেই হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কে কাপড় পরিধান করানো হবে। তারপরে অন্যান্য নবী এবং ওলীগণকে কাপড় পরিধান করানো হবে।
উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে সর্বাগ্রে কাপড় পরিধানের সম্মান এ জন্য দেয়া হবে যে, তাকে নমরুদ কর্তৃক সর্ব প্রথম দীনের জন্য উলঙ্গ করে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। [প্রমাণঃ মিরকাত, ১০/২৫২]
রূহে সাওয়াব রিসানী
জিজ্ঞাসাঃ আমরা যে মৃত ব্যক্তি বিশেষ করে পিতা-মাতা ও আত্মীয়–স্বজনদের জন্য ইসতিগফার ও দান-সদকা দ্বারা সাওয়াব রিসানী করে থাকি, এর কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীসে আছে কি?

{পৃষ্ঠা-১১৩}
জবাবঃ কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তিদের জন্য ইসতিগফার ও দান সদকা দ্বারা সাওযাব রিসানী করলে এতে তাদের ফায়দা হয় এবং তাদের গুনাহ মাফ হয়। বরং হাদীস শরীফে রয়েছে, তারা আত্মীয়-স্বজনদের নিকট

থেকে এগুলো পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। সুতরাং আত্মীয়–স্বজনরা যখন সাওয়াব রিসানী করে, তখন সেগুলোকে আল্লাহ তা‘আলা বহুগুণে বৃদ্ধি করে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেন।

নিম্নে এতদসংক্রান্ত কুরআন-হাদীসের দলীল প্রদত্ত হলঃ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

"যারা তাদের (মুহাজির ও আনসার) পরে আগমন করেছে, তারা বলে– "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ও ঈমানে অগ্রগামী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখোনা। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি দয়ালু, পরম করুণাময়।" [সূরা হাশরঃ ১০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "কবরে মৃত ব্যক্তির এমন অবস্থা হয় যেমন অথৈ পানিতে নিমজ্জিত সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তি। (সে নিজেকে উদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে কাউকে ডাকতে থাকে) তেমনিভাবে উক্ত মৃত ব্যক্তি সর্বদা অপেক্ষা করতে থাকে যে, তার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের পক্ষ হতে তার মুক্তির জন্য কোন দু’আ ও ইস্‌তিগফার পৌঁছে কি-না? যখন তাদের কারো পক্ষ থেকে কোনো দু’আ পৌঁছে, তখন সেই দু’আ তাদের দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যস্থিত সমগ্র জিনিস হতে অধিক আনন্দ দান করে। আর আল্লাহ তা‘আলা কবরবাসীদের নিকট দুনিয়াবাসীদের দু’আকে পাহাড় সমপরিমাণ করে (বহুগুণে বৃদ্ধি করে) এর সাওয়াব পৌঁছিয়ে থাকনে। তাই মৃতদের জন্য জীবিতদের পক্ষ হতে উত্তম উপঢৌকন হচ্ছে, তাদের জন্য দু’আ ও ইসতিগফার করা।"

[মিশকাত শরীফঃ ২০৫ পৃষ্ঠা]

হযরত সা’দ ইবনে উবাদা (রাযিঃ)-এর আম্মা যখন ইনতিকাল করেন, তখন তিনি মায়ের থেকে দূরে (কোথাও) ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর নিকট বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার আম্মার ইনতিকালের সময় আমি তার থেকে দূরে ছিলাম। এখন আমি তাঁর পক্ষ থেকে কোন কিছু সদকা করলে এর দ্বারা তার উপকার হবে কি? নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, অবশ্যই উপকার হবে। তিনি বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে স্বাক্ষী রেখে বলছি, আমার ‘মিখরাফ’ নামক বাগানটি মায়ের সাওয়াব রিসানীর জন্য সদকা করে দিলাম। [বুখারী শরীফ, পৃঃ ১/৩৮৬]

{পৃষ্ঠা–১১৪}

হযরত মা’কিল ইবনে ইয়াসার (রাযিঃ) বলেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মৃতদের উপর সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত কর।" [মিশকাত শরীফঃ ১৪১ পৃষ্ঠা]

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ "আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে (অনেক) নেক বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন। (তা দেখে সেই) বান্দা আশ্চার্যান্বিত হয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট আরয করবে- হে আল্লাহ! এ মর্যাদা আমার জন্য কোথা হতে এবং কিভাবে নসীব হলো? আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, "এটা তোমার সন্তানাদির ইসতিগফারের বিনিময়।"

[মিশকাত শরীফঃ ২০৫-২০৬]

হযরত জাবের (রাযিঃ) বলেন, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কুরবানীর দিনে দু’টি ভেড়া যবেহ করলেন। যবেহের পূর্বে তা কবুল হওয়ার জন্য দু‘আর মধ্যে বলরেন, "তোমার দেয়া সম্পদ হতে তোমারই জন্য আমার ও আমার উম্মতের মধ্যে যাদের কুরবানীর সামর্থ নেই, তাদের পক্ষ হতে তোমার নামে কুরবানী করছি। [মিশকাত শরীফঃ ১২৮ পৃষ্ঠা]

বাতিল সম্প্রদায়

কাদিয়ানীরা কাফের

জিজ্ঞাসাঃ মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং তার আকীদায় বিশ্বাসী লোকজন মুসলমান, না কাফের, এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।
জবাবঃ বিশ্বের সমস্ত হাক্কানী উলামায়ে কিরাম ও মুফতীগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও তার অনুসারী গোষ্ঠি খতমে নবুওয়াত অর্থাৎ, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করার দরুন কাফির এবং একটি অমুসলিম বাতিল ফিরকাহ।
কোন মুসলমান তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে ঐক্যমত পোষন করলে সাথে সাথে তার ঈমান চলে যাবে।
বর্তমানে বাংলাদেশে এদের প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধভাবে এসব কাফির ও ঈমান ধ্বংসকারীদের প্রতিহত করা জরুরী এবং ঈমানী দায়িত্ব।
এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য কাদিয়ানীদের সম্পর্কে হক পন্থী উলামায়ে কিরামের লিখা বই পুস্তক পড়া জরুরী।

دعوة النبوة بعد نبينا صلي الله عليه وسلم كفر بالاجماع. سمعت بعضهم يقول اذا لم يعرف الرجل ان محمدا صلي الله عليه وسلم اخر الانبياء عليهم و علي نبينا السلام فليس بمسلم (شرح فقه اكبر: 202)
[ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ১২ ঃ ৩৩৪]

সাদাত দেখেছে এই পরযন্ত

নুরুল ইসলাম প্রুফ
নুরুল ইসলাম প্রুফ
নুরুল ইসলাম প্রুফ
নুরুল ইসলাম প্রুফ

{পৃষ্ঠা-১১৫}

বাতিল প্রতিরোধের সহজ উপায়, খতমে নবুওয়াত, ইসমতে আম্বিয়া ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম আলিমুল গাইব না হওয়ার দলীলঃ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে ইসলামের নামে বিভিন্ন বাতিল ফিরকা ও মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলোর প্রতিরোধে উত্তম পন্থা কি হতে পারে ? খতমে নবুওয়াতের দলীল কি ? নবীগণ মাসুম কি-না ? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম আলিমুল গাইব ছিলেন কি ?

জবাবঃ এর জন্য প্রয়োজন-সহীহ আকায়িদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার । বাস্তবক্ষেত্রে এটা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের চেয়ে বেশি কার্যকর হবে বলে আমাদের বিশ্বাস । এজন্য প্রত্যেক মসজিদে 'আকীদাতুত্ ত্বাহাবী' কিতাব অথবা হযরত থানবীর (রহঃ) 'বেহেশতী যেওর' বা 'তালিমুদ্দীনের আকায়িদ' অধ্যায়ের তা'লীমের ব্যবস্থা করা যেতে পারে । হক্কানী ওলামায়ে কিরামগণ তাঁদের ওয়ায মাহফিল সমূহে আকায়িদ বিষয়ক বয়ান বেশী বেশী করবেন ।

এভাবে মুসলমানদের মাঝে সহীহ্ আকায়িদের প্রচারকে ব্যাপক করার দ্বারা বাতিল আকীদা ও বাতিল আন্দোলন সমূহ আপনা আপনিই মুখ থুবড়ে পড়বে এবং মিটে যাবে । কেননা-সত্যের আলো এলে, বাতিলের অন্ধকার দূরীভূত হতে বাধ্য । উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে- রাতের অন্ধকারে ইঁদুর, ব্যাঙ, সাপ ইত্যাদির বিড়ম্বনার শিকার হয়ে গৃহস্বামী যদি একটি একটি করে মারতে থাকে, তাহলে সারা রাত জেগেও সেগুলো শেষ করতে পারবে না । কিন্তু ঘরে যদি বাতি জ্বালানো হয়, তাহলে এক নিমিষেই সব লেজ গুটিয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে । তেমনিভাবে দিকে দিকে হকের মশাল প্রজ্জ্বলিত করা হলে সমস্ত বাতিল মতবাদ ও বাতিল প্রচারকারী সংস্থা ও সংগঠনগুলোও জনসমর্থন না পেয়ে আপন আপন লেজ গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে । চাই তা যত বড় শক্তিশালী ও সুসংগঠিত হোক না কেন ।

যেমন- সহীহ্ আকায়িদের তা'লীম জারী হলে, তাতে সর্ব প্রথমেই কুফরী কথা ও কাজ, শিরকী কাজ, বিদ'আত সহ সর্বপ্রকার কুসংস্কারমূলক কাজ, ধ্যান ধারণা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহের এক এক করে সবিস্তারিত ভাবে আলোচিত হবে । তাতে সর্ব প্রকার ভন্ডামী, ভন্ডপীরদের অবৈধ ব্যবসা, মাজার পূঁজা, দরগাহ পূঁজা ও মসজিদ পূঁজা ইত্যাদি বন্ধ হবে । তারপর খতমে নবুওয়াতের (অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-ই সর্বশেষ নবী -তাঁর পরে আর কোন নবী নেই) আলোচনাও আসবে । জনমনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দিতে পারলে অমুসলিম কাদিয়ানী আন্দোলন মাটিতে মিশে যাবে ।

খতমে নবুওয়াতের দলীল এই যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা (যার হাতে নবুওয়তের উত্স এবং যিনি সমস্ত নবীর প্রেরক) তার কালামে পাকে স্পষ্টভাবে

{পৃষ্ঠা-১১৬}

ঘোষণা করেছেনঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম তোমাদের কোন পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী । (সূরা আহযাবঃ ৪০) খতমে নবুওয়াত সম্পর্কে শতাধিক আয়াত এবং দুই শতাধিক সহীহ্ হাদীস মুফতী শফী (রহঃ) তাঁর লিখিত 'খতমে নবুওয়াত' নামক কিতাবে একত্রিত করেছেন ।

হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করে গেছেন-"আমি সর্বশেষ নবী, আমার পর আর কোন নবী নেই ।" (মিশকাত ২ : ৫১১ ও ২ : ৪৬৫) সাথে সাথে তিনি এ বলেও

সতর্ক করে গেছেন যে",আমার পরে একাধিক মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারের আবির্ভাব ঘটবে । তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থেকো ।"

সহীহ্ আকায়িদের বর্ণনায় আছে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম মা'সুম বা নিষ্পাপ । এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা । এটা কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য আয়াত ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত । সুতরাং এর বিপরীত কোন আকীদা পোষণ করা জায়িয হবে না ।

কুরআনের অসংখ্য আয়াত এবং অগণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম আলিমুল গায়েব নন অর্থাৎ সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত ভাবে তাঁর স্বত্বার মাঝে এ সিফাত বা গুণ নেই যে, তিনি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সহ কুল মাখলূকাত তথা আল্লাহ তা'আলার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম সকল সৃষ্টি জগত সম্পর্কে নিজে নিজে সর্বদা
অবগত । এ গুণ এবং এ শান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাস । আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র স্বত্বা যার হুকুম ও ইলম ছাড়া গভীর অরণ্যের একটি পাতাও নড়ে না । পক্ষান্তরে মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম অতীত ও ভবিষ্যতের শুধুমাত্র ঐ সকল বিষয়ই অবগত ছিলেন যেগুলো স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তার মু'জিযা স্বরূপ তাকে অবগত করিয়াছিলেন । কিন্তু শুধু এর ভিত্তিতে তাঁকে আলিমুল গায়েব বা সর্ব বিষয়ে নিজে নিজেই সর্বজ্ঞ বা তিনি সর্বত্র হাযির-নাযির এ বিশ্বাস নিতান্তই মূর্খতা ও ভন্ডামি বৈ কিছু নয় । কেননা - যে সকল বিষয় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অবগত করাননি, সেসকল বিষয়ে তিনি জ্ঞাত বা আলিমুল গায়িব ছিলেন না । কুরআন ও হাদীস ঘাটলে এতদসংক্রান্ত ভূরি-ভূরি স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় । যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেনঃ (হে নবী মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন- আমি নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যান সাধনের মালিক নই । কিন্তু আল্লাহ যতটুকু চান । আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম । ফলে আমার কোন অমঙ্গল কখনো হতে পারত না । আমি তো শুধু একজন ভীতি প্রদর্শক ও ঈমানদারদের জন্য সুসংবাদ দাতা । (সূরা আ'রাফঃ ১৮৮)

{পৃষ্ঠা-১১৭}

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেনঃ "তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন (সূরা যুহা)"। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম ১ মাস পেরেশান ছিলেন । এমনকি হযরত আয়িশাকে তালাক দিবেন কি-না এ ধরনের চিন্তাও করছিলেন । হযরত আয়িশাকে তওবাও করতে বলেছিলেন । তারপরে আল্লাহ তা'আলা সূরা নূর নাযিল করে হযরত আয়িশার পবিত্রতা বর্ণনা করার পর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম চিন্তামুক্ত হলেন ।(বুখারী শরীফ ২ : ৬৬৩)

তিনি আলিমুল গায়িব হলে এ পেরেশানীর কোন অর্থই হয় না । বিদ'আত সংক্রান্ত এক হাদীসে উল্লেখ আছে- হাশরের দিন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম তার একদল বিদ'আতী উম্মতকে হাউযে কাউসারে নিয়ে যেতে চাইলে ফেরেশতাগণ তাকে এই বলে বাধা প্রদান করবেন যে, আপনি জানেন না তারা আপনার পর কি সকল বিদ'আত আবিষ্কার করেছিল ।(বুখারী শরীফ ২ : ৯৭৪) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম গায়িবজান্তা নন । তাহলে তিনি কখনোও বিদ'আতীদের হাউযে কাউসারে নিতে চেষ্টা করতেন না । শাফা'আতে কুবরার হাদীসে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ তখন আমি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সিজদায় পড়ে এমনসব অতি উচ্চমানের শব্দাবলী দ্বারা আল্লাহ তা'আলার হামদ ও প্রশংসা করবো,

যা আমি এখন অবগত নই, তখন আল্লাহ তা'আলাই আমাকে তা শিখিয়ে দিবেন । (মিশকাত শরীফ ২ : ৪৮৮)

তাছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম যদি সত্যিই আলিমুল গায়িব হতেন, তাহলে তাঁর উপর সুদীর্ঘ তেইশ বত্সর যাবত যে সকল ওহী আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছিলেন, তার কোন প্রয়োজন ছিল না । কেননা তিনি যদি আলিমুল গায়িব হন, তাহলে পূর্ব হতে তা অবগত থাকতেন । আর জ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান দান অনর্থক । সুতরাং আজকে যা নাযিল হয়েছে, গতকাল নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম তা অবগত ছিলেন না । হাদীসের কিতাবসমূহে একটি ঘটনা সবিশেষ উল্লেখ আছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় হিজরত করে দেখতে পেলেন যে, তথাকার খেজুর চাষীরা খেজুরের মৌসুমে তা'বীর করেন অর্থাৎ নর গাছের ফুল মাদী গাছের ফুলে ঢুকিয়ে দেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম এটাকে নিষ্প্রয়োজন মনে করে তা না করার পরামর্শ দেন । ফলে দেখা যায় যে, সে মৌসুমে খেজুরের ফলন কম হয় । অতঃপর সাহাবায়ে কিরামগণ (রাঃ) তাঁকে তা অবহিত করলে, মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম বললেন-তোমাদের দুনিয়াবী এ সকল বিষয় তোমরাই বেশী জান ।

বাস্তবিক এগুলো অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে । এ কারণেই দুনিয়ার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মদীনাবাসীদের একটি বিষয় জানা ছিল যা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম জানতেন না । এটা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর কোন ত্রুটি নয় । যেমন বাড়ীর চাকরানী খানা পাকানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল জানে । অথচ সেগুলো বাড়ীওয়ালা এমন কি রাষ্ট্র প্রধান বা বড় কোন আলেম তা জানেন না । অথচ এটা তাদের জন্য দোষনীয় নয় । (মিশকাত শরীফ ১ : ২৮)

{পৃষ্ঠা-১১৮}

وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى نبيه المجتبى ورسوله المرتضى وخاتم الانبياء. لقوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب : 40] [عقيدة الطحاوي:47]

ত্রিশ হাজার যাহেরী ও ষাট হাজার বাতেনী কালামের বাস্তবতা

জিজ্ঞাসাঃ অনেক লোক বলে কালাম নব্বই হাজার । ত্রিশ হাজার যাহেরী ও ষাট হাজার বাতেনী । কথাটা কতটুকু সত্য ?

জবাবঃ নব্বই হাজার কালামের কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা । কুরআন হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই । বস্তুতঃ নব্বই হাজার কালামের ব্যাপারটা হলো- ইসলামের নামে একটি ভ্রান্ত বাতিল ফেরকা আছে, তাদেরকে বলা হয় শি'আ । তারা এ ধরনের বহু আজগুবি কথা হযরত আলী রাঃ এর নামে প্রচার করে থাকে যে, এ বাতেনী কালাম নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রাঃ) কে শিক্ষা দিয়েছিলেন । অথচ এগুলো একেবারেই মিথ্যা । হযরত আলীকে (রাঃ) তাঁর হায়াতে লোকেরা এ বিষয়ে জানতে চেয়েছিল । তিনি পরিষ্কারভাবে উত্তর দিয়েছিলেন যে, "যেই কুরআন সকলের নিকট আছে ঐ কুরআনের বাইরে তাঁর কাছে কোন কালাম নেই ।"

তাছাড়া আমাদের দেশে তাসাউফের ব্যবসায়ী একদল ভন্ড পীর-ফকির আছে, তারা এরূপ কথা বলে থাকে যে, আমাদের এসব কথা আলেমরা বুঝে না । কারণ তারা বাতেনী কালাম সম্পর্কে কিছুই জানে না । তাই আলেমগণ আমাদের বিরোধিতা করেন । মোদ্দাকথা বর্ণিত কথার কোন দলীল নেই ।

বাতিল ও ভন্ড লোকেরা তাদের মনগড়া মতবাদকে জাহিলদের মধ্যে চালু করার জন্য এ ধরনের অনেক আজগুবি কথার জন্ম দিয়েছে ।
[প্রমাণঃ খইরুল ফাতওয়া ১ : ২৯৩]

কথিত শেখ আহমদের ভিত্তিহীন ওসীয়াতনামার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমরা মুন্সিগঞ্জের রামপাল ইউনিয়নের লোক বড় সমস্যায় আছি । বড় সমস্যাটা একটি প্রচারপত্র নিয়ে । প্রচারপত্রটি নিম্নে উল্লেখ করা হল । এর সত্য মিথ্যা জানালে কৃতজ্ঞ হবো । প্রচার পত্রটি এই -
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
একটি জরুরী সংবাদ
নিজে পড়ুন ও অন্যকে পড়ে শোনান ।

এটা একটা সত্য ঘটনা । মদিনা শরীফ থেকে শেখ আহম্মদ এই ওসীয়ত নামা লিখে পাঠিয়েছেন । তিনি জুম‘আর দিন রাত্রে কুরআন মাজীদ পড়তে পড়তে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন । স্বপ্নে তিনি দেখতে পান যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম তাঁর
{পৃষ্ঠা-১১৯}
সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ৭,০০০ লোক মারা গেছেন । কিন্তু উহাদের মধ্যে একজনও ঈমানদার লোক পাওয়া যায়নি । তিনি আরো বলেন- এখন খুব খারাপ সময় এসেছে । এখন স্ত্রী স্বামীকে খেদমত করে না । মেয়েরা পর্দা মত চলাফেরা করে না । মা বাবা ও গুরুজনদের সম্মান করে না । ধনী লোকেরা গরীবদের দেখে না । দান খয়রাত করে না । যাকাত দেয় না । তিনি আরও বলেন, শেখ আহমদ! তুমি দুনিয়ার লোকদেরকে বলে দাও তারা যেন নেকী করে, নামায পড়ে, রোযা রাখে ও দান খয়রাত করে । কারণ কিয়ামত খুব কাছে । আকাশে একটা তারা দেখা দিবে, তখন সংগে সংগে তওবার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে । কুরআন মাজীদের অক্ষর উঠে যাবে । সূর্য সোয়া গজ উপরে থাকবে ।হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক এই ওসীয়ত নামা অন্য জনকে পড়ে শোনাবে, রোজ কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য এর উসীলায় জান্নাতে জায়গা করে দিব এবং যে লোক এর বিপরীত চলবে, সে খোদার রহমত হতে বঞ্চিত হবে । গরীব লোক এই পত্রকে ছাপিয়ে বিতরণ করলে, তার অনেক পূণ্য হবে । শেখ আহমদ বলেন যে, এই পত্রখানা যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার মৃত্যু যেন কাফেরের মত হয় । রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম বলেছেন- রোযা রাখ, নামায পড়, গরীবদের ভালবাস ।

জবাবঃ এ ধরনের খাবের বা কথার কোন ভিত্তি নেই । এটা একদল ভন্ড লোকেরা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর নামে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে । এরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের এজেন্ট ছাড়া আর কিছুই নয় । বিগত অনেক বছর যাবত তারা বিভিন্ন সময় কম বেশ করে এ ধরনের লিফলেট বা প্রচারপত্র ছেপে আসছে । অনেকে সম্পদের লোভে বা মুসীবতের ভয়ে এ লিফলেট ছাপছে বা বিতরণ করছে ।
কিন্তু আসলে এ সবই গাজাখোরী গল্প । নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব তিনি তাঁর হায়াতেই সম্পন্ন করেছেন । স্বপ্নে বলার জন্য কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি । এ থেকে মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত । এ জাতীয় লিফলেট ছাপিয়ে বিতরণ করলে সওয়াব তো নয়, বরং গুনাহ হবে ।

ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতার অভিন্নতা

জিজ্ঞাসাঃ ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মহীনতা কি একই জিনিস ? সাধারণতঃ উলামাগণ ও ধর্মপ্রাণ লোকেরা উভয়টার মধ্যে কোন পার্থক্য মানতে চান না । এ ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি ?

জবাবঃ ভাষাগত ও আভিধানিক দিক থেকে এ দুয়ে পার্থক্য দেখানোর চেষ্টা করা হলেও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের মূল চরিত্র ও আসল মতলব এবং ক্রমাগত কার্যকলাপ যে ধর্মহীনতা ও ইসলাম বিরোধীতা, তা আজ সচেতন

{পৃষ্ঠা-১২০}

কোন ব্যক্তির নিকটই অস্পষ্ট নয় । তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী ইসলাম বিদ্বেষীরা যেন এ ব্যাপারে আর রাখ-ঢাক রাখতে চাচ্ছে না । তাই যদি না হয়, তাহলে ওরা কেন আজ নিজেরা মুসলমানদের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করে, দাঁড়ি টুপিওয়ালা সাচ্চা মুসলমান ও আলেমদের মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজ বলে গালি দেয় ? আর নিজেরা মঙ্গল প্রদীপ জালানোর ন্যায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি সহ ইসলাম বিরোধী সবধরনের অপসংস্কৃতি পালনে তত্পর হয় ? তসলিমা নাসরীন কুরআন সংশোধনের দাবী জানালো । সাথে সাথে বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলার আবদার করলো । তখন ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তো টু শব্দটিও করলো না । কোন প্রতিবাদও করলো না । আর সরকার তো তাকে লাইসেন্স দিয়েই রেখেছে । শুধু তাই কি ? এরপর এ পরিস্থিতিতে হক্কানী ওলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে ধর্মপ্রাণ দ্বীনদার আপামর জনসাধারণ যখন তার এ সমস্ত খোদাদ্রোহী কথা-বার্তার প্রতিবাদ জানাতে হরতাল আহবান করলো, তখন এ সমস্ত ধর্ম-নিরপেক্ষতার দাবীদাররা সেই হরতাল প্রতিরোধের জন্য দেশবাসীর নিকট আহবান জানালো । ভাবখানা এমন যে, তসলিমা কুরআন অবমাননা করে অপরাধ করেনি । বরং যারা কুরআন অবমাননার প্রতিবাদে হরতাল ডেকেছে তারাই কুরআন রক্ষার কথা বলে অপরাধ করেছে । তাই তাদের সেই ধর্মনিরপেক্ষভাবকে আরো চমকপ্রদ করে ফুটিয়ে তোলার জন্য কুরআন রক্ষাকারীদের বিরুদ্ধে পাল্টা হরতাল ডাকল । এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, ধর্মনিরপেক্ষতার মূলরূপ হচ্ছে ধর্মহীনতা ?

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মিথ্যা নামে সেই ধর্মনিরপেক্ষরা ইসলাম বিরোধী এবং ইসলাম বিধ্বংসী সকল কার্য-কলাপের সমর্থন দিতে তত্পর হল । তাদের অবস্থা আরো চরমে উঠে এ পর্যায়ে পৌছল যে, যারা ইসলামের পক্ষে কথা বলবে, কুরআনের পক্ষে কথা বলবে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এন,জি,ও, ভারত, লন্ডন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে সঠিক তথ্য তুলে ধরবে এবং তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিবে, তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী, দেশের শত্রু, ফতোয়াবাজ, মৌলবাদী, উন্নয়ন কর্মকান্ডে বাধাদানকারী ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করে জঘন্য ভাষায় গালাগালি দিয়ে সমাজে ইসলাম, মুসলমান ও আলেম-উলামাগণ সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে । তাই বাস্তব সত্য এই যে, তাদের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা ধর্মহীনতারই বাহ্যিক লেবেল মাত্র । সুতরাং সেই সকল ইসলাম বিদ্বেষীদের ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মহীনতার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই । প্রবাদই আছে- "বৃক্ষ তোমার নাম কি ? ফলে পরিচয় ।" [প্রমাণঃ মা'আরিফুল কুরআন ২ : ৩৭]

{পৃষ্ঠা-১২১}

তাসলিমা নাসরীনের শরীয়তের বিধান সম্পর্কে কটূক্তির হুকুম এবং মুরতাদের সংজ্ঞা ও হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে তথাকথিত তসলিমা নাসরীন নামী মহিলারা ইসলামের বিভিন্ন আহকাম সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম মন্তব্য করে থাকে । যেমনঃ "পুরুষেরা একাধিক স্ত্রী রাখতে পারে, তেমনিভাবে মেয়েরাও একাধিক পুরুষ রাখতে পারবে ।" অনুরূপভাবে সে পর্দা প্রথার সমালোচনা করে বলেছে, "পর্দা প্রথায় পৃথিবীর কোথাও নারী হরণ, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা রোধ হয়নি ।" ধর্ম বিশ্বাসকে সে বলেছে "ভুল বিশ্বাস ।" অর্থাৎ সে কুরআন-হাদীসের অনেক হুকুম-আহকামকে অনুরূপ জঘন্য ন্যক্কারজনক ভাষায় গালি গালাজ করে থাকেন । অতএব, কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে এ ধরনের মন্তব্য কারীদের হুকুম জানতে আপনাদের একান্ত মর্জি হয় ।

জবাবঃ ইসলাম আল্লাহ্ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম । ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান । এর প্রতিটি বিধি-বিধান সর্বযুগে ও সর্বদেশে সর্বস্তরের মানুষের জন্য প্রযোজ্য । ইসলাম যেহেতু মহান রাব্বুল 'আলামিন কর্তৃক মনোনীত জীবন-বিধান, তাই এর বিধিবিধান চির শাশ্বত ও অলংঘনীয় । ইসলামের সূচনা লগ্নে যে কানুন ছিল, আজ দেড় হাজার বছর পরেও সেই কানুনই জারী আছে । ভবিষ্যতেও বলবৎ থাকবে । এর মধ্যে কোন রকমের পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের চেষ্টা করা, অথবা তার দাবী তোলা ধর্মদ্রোহীতার শামিল ।

সুতরাং ইসলামের ছোট বড় প্রতিটি মৌলিক আক্বায়িদ ও আহকাম প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য মেনে নেয়া ফরয । এর কোন একটাকে অস্বীকার করা বা তুচ্ছ জ্ঞান করা অথবা ইসলামের কোন বিষয় নিয়ে বিদ্রুপ-উপহাস করা মানুষকে ইসলামের গন্ডি থেকে বের করে দেয় ।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী: ৪ : ২২২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১২ : ৩৫৫]

কোন মুসলমান যদি ধর্মীয় হুকুম-আহকাম ও আচার অনুষ্ঠান পালন না করে, কিন্তু সে কোন ধর্মীয় বিধি-বিধানকে অস্বীকার বা কটাক্ষও করে না, তাহলে সে 'ফাসিক (অপরাধী ও গুণাহগার) বলে গণ্য হবে । এ অবস্থাতেই যদি সে ফাসিক মারা যায়, তাহলে নিয়ম মাফিক তার জানাযা পড়তে হবে । তবে বিশিষ্ট আলিম-উলামা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গের এতে অংশগ্রহণ না করা উচিত । যাতে করে এ ধরনের মানুষের কিছুটা বোধোদয় হয় এবং এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে স্বীয় অবস্থা থেকে ফিরে আসে ।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল আহকাম ১ : ১৩৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৫ : ৩৪৯]

কিন্তু ধর্মদ্রোহীতার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ । সেই বিষয় জানার আগে ধর্মদ্রোহী বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী)-এর পরিচয় বিস্তারিতভাবে জানা প্রয়োজন । তা নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

{পৃষ্ঠা-১২২}

উল্লেখ্য মু'মিন হওয়ার জন্য সকল আক্বীদায় বিশ্বাসী হওয়া জরুরী । কিন্তু কাফির বা মুরতাদ হওয়ার জন্য সবগুলি অস্বীকার করা জরুরী নয় । যে কোন একটি বিষয় অবিশ্বাস করা যথেষ্ট । যদি মুসলমান নামধারী কেউ ইসলামের মৌলিক আক্বীদা যথাঃ কবর, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, বেহেশত, দোযখ, পুনরুত্থান, নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত প্রভৃতির কোন একটি অস্বীকার বা অবিশ্বাস করে, তাহলে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) বলে গণ্য হবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া তাতার খানিয়াহ ৫ : ৫০০]

আল্লাহপাক সম্বন্ধে যে কটূক্তি করে, বা তাঁর কোন বিধানের সমালোচনা করে সে মুরতাদ ।

[প্রমাণঃ
ফাতাওয়া তাতার খানিয়াহ ৫ : ৪৬১]
যে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কটূক্তি করে, ধর্মকে গালি দেয় এবং অশালীন মন্তব্য করে সে মুরতাদ ।
[প্রমাণঃ
ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১০ : ১০৭]
কুরআন পাকের সাথে কেউ যদি বেয়াদবী করে বা তার সম্বন্ধে আপত্তি জনক কথা বলে সে মুরতাদ ।

[প্রমাণঃ
ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১২ : ৩৬৩]
যেমন কেউ বলে থাকে- কুরআন সাম্প্রদায়িকতা ছড়ায় ইত্যাদি (নাঊযুবিল্লাহ)

নারী জাতির পর্দা ব্যবস্থাকে কেউ যদি কটাক্ষ করে এবং এ সমন্ধে বর্ণিত কুরআন-হাদীসের আহকাম অস্বীকার করে, তাহলে সেও মুরতাদ হয়ে যাবে ।

[প্রমাণঃ
ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১২ : ৩৩৯]
এ তো গেল মুরতাদের পরিচয় । কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত মন্তব্য সমূহ দ্বারা মুরতাদ হওয়ার পরও আরও মারাত্মক রূপ ধারণ করে ধর্মদ্রোহীর ভূমিকা নিয়েছে ।

অতএব ধর্মদ্রোহীর হুকুম অনুযায়ী ঐ ধরনের মন্তব্য কারী সম্পর্কে শরীয়তের ফায়সালা হলঃ

(১) রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে বন্দী করা হবে এবং প্রকাশ্য তওবার জন্যে বাধ্য করা হবে । তওবা করতে অস্বীকার করলে চরম ধর্মদ্রোহী কর্মকান্ডের জন্যে তাকে ফাঁসী দিয়ে দিবে ।

(২)তওবার আগ পর্যন্ত তার স্বামী, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কোন মুসলমানদের জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা, উঠা-বসা করা, কথা-বার্তা বলা, লেনদেন করা জায়িয হবে না । বরং হারাম হবে । শরীয়তের আরো ফায়সালা হল- তার স্বামীর সাথে তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে বিধায় উভয়ের দেখা সাক্ষাত, মিলা-মিশা হারাম হবে । তারা সহবাস করলে, তা অবৈধ বা যেনা হবে । সন্তান জন্মিলে হারাম জাদা বা জারজ বলে গণ্য হবে ।
[প্রমাণঃ আদ্ দুররুল মুখতার, ৩ : ১৯৩]
{পৃষ্ঠা-১২৩}

(৩) ঐ মহিলার মৃত্যু হলে, তার জানাযা পড়া হারাম হবে ।
[ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৫ : ২৯]

(৪) আত্মীয় স্বজন কর্তৃক তার জানাযার ব্যবস্থা করাও হারাম হবে । [ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ৫ : ২৯০]

(৫) মুসলমানদের কবরস্থানে তাকে মাটি দেয়া হারাম হবে । বরং কোন গর্তের মধ্যে ফেলে তাকে মাটি চাপা দিতে হবে । [প্রমাণঃ আদ্ দুররুল মুখতার পৃঃ ২ : ২৩০ # দারুল উলূম, ৫ : ২৯১]
এতো হল-দুনিয়াবী দিক দিয়ে তার উপর বর্তিত শরীয়তের হুকুম । পরকালীন ভয়াবহ চির শাস্তির কথা বলার অপেক্ষাই রাখে না ।

من انكر القيامة او الجنة...او الصحائف المكتوبة فيها اعمال العباد يكفر. (تاترخانية:500/5)

বর্তমান “এনজিও”-ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর অভিন্ন রূপঃ

জিজ্ঞাসাঃ উলামাগণ সাধারণতঃ বর্তমান অমুসলিমদের তত্বাবধানে পরিচালিত এনজিওগুলোকে ভারতবর্ষের তদানীন্তন ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে তুলনা করে থাকেন । এটা কি বাস্তবিক ?

জবাবঃ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে বর্তমান এনজিওদের সবদিক দিয়ে মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে । যেন একই গাছের ২টি মাকাল ফল- যার উপরিভাগের দৃশ্য কতই না সুন্দর মনোরম আর ভিতরের অবস্থার দিকে একটু দৃষ্টি পড়লেই রুচি নষ্ট হয়ে যায় ।
সেই সামঞ্জস্যর কয়েক দিক নিম্নে পেশ করা হলঃ

(১) ইন্ডিয়া কোম্পানী এসেছিল বাণিজ্যের নামে, উদ্দেশ্য ছিল দেশের কতৃত্ব দখল । এনজিওরা এসেছে শিক্ষা ও সেবার মুখোশ পড়ে । উদ্দেশ্য দেশের কতৃত্ব দখল ।

(২) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী স্থানে-স্থানে কুঠি তৈরি করেছিল । সেগুলো পরে অস্ত্রাগার ও সেনা ছাউনীতে রূপান্তরিত করেছিল ।
এনজিও'রাও দেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি তৈরি করেছে । এনজিও কর্মীরা এ সকল কুঠিতে থাকে । নীচ তলায় পুরুষ ও উপর তলায় মহিলা কর্মীরা । সেখানকার পরিবেশ ও হাবভাব বড়ই সন্দেহজনক ।

(৩) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বিভিন্ন প্রলোভনের মাধ্যমে বড় বড় এলাকায় তাদের তাবেদার তৈরি করেছিল । যেমন- জগত শেঠ, উর্মিচাঁদ ও মানিক চাঁদ ।
এনজিওরাও এদেশে তাদের তাবেদার শ্রেণী তৈরি করার জন্য ধনাঢ্য, বুদ্ধিজীবী ও বড় বড় পেশার লোকদের প্রলোভন দিয়ে নিজেদের এজেন্ট বানাচ্ছে । আর তারা বিভিন্ন দল-উপদল গড়ে তুলছে । {পৃষ্ঠা-১২৪}

(৪) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী নবাবদের সরকারী বড় বড় কর্মকর্তাদের বড় বড় পদ ও মোটা অংকের বিনিময়ে খরিদ করেছিল ।
এনজিওরাও আপাততঃ মোটা অংক এবং রিটায়ার্ডের পর এনজিও'র বড় বড় পদের প্রলোভন দেখিয়ে সরকারী কর্মকর্তাকে খরিদ করছে ।

(৫) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের সুবিধার জন্য মুসলমানদের চাকুরী না দিয়ে বেছে বেছে বিশেষ গোষ্ঠির লোকদেরকে চাকুরী দিতো ।
এনজিওরাও প্রায় নাস্তিক, খৃষ্টান, বামপন্থী নেতা ও ছাত্র সংগঠনের বিশেষ বিশেষ সদস্য, হিন্দু বা হিন্দু মনোভাবাপন্ন মুসলমানদেরকে চাকুরী দিচ্ছে ।

(৬) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী ব্যবসার নামে শোষণ করেছিল । এনজিওরাও ২০% থেকে ৬০% হারে সুদ নিয়ে শোষণ করছে । কেউ সময়মত ঋণ পরিশোধে অপারগ হলে তার উপর মানবাধিকার লংঘনের পর্যায়ের নির্যাতন চালাচ্ছে ।

(৭) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী গরীব কৃষকদের নিজেদের স্বার্থে নীল চাষে বাধ্য করেছিল । এনজিওরাও নিজেদের লাভবান হওয়ার জন্য গরীব লোকদের দ্বারা তুঁত গাছের চাষ করাচ্ছে ।

(৮) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বহু স্থানে জায়গা খরিদ করেছিল । এনজিওরাও দেশের বিভিন্ন স্থানে এ যাবত বহু জায়গা খরিদ করেছে । যার হিসাব সম্ভবতঃ সরকারও রাখে না ।

(৯) ঔপনিবেশিক কোম্পানী ধর্মীয় মূল্যবোধ খতম করার জন্য মাদ্রাসাগুলো বন্ধ করেছিল এবং ওলামাদেরকে ওহাবী ও ধর্ম ব্যবসায়ী ইত্যাদি আখ্যা দিত ।

এনজিওরাও ধর্মীয় মূল্যবোধ খতম করার লক্ষ্যে উলামা সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার তাদেরকে ধর্মান্ধ, ধর্ম ব্যবসায়ী ও ফতোয়াবাজ আখ্যা দিচ্ছে ।

(১০) ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানীর খুঁটি ছিল ফ্রান্স, ইটালী ও বৃটেনে । এনজিওদের খুঁটিও ফ্রান্স, ইটালী ও আমেরিকায় ।

সুতরাং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী ও বর্তমান ইহুদী খৃষ্টানদের মদদ পুষ্ট এনজিওর মধ্যে কোন ব্যবধান নেই । এদেশের লোক সমাজ যাতে করে ওদের চিনতে না পারে এবং ওদের কুমতলব যাতে করে ফাঁস না হয়ে যায়, এজন্য তারা শাড়ি বদল করেছে মাত্র । কিন্তু বউ সেই একটাই । লেবাস বদল করার কারণে আজ অনেকেই না চিনে এদেরকে কল্যাণকর মনে করছে । কিন্তু ভুক্তভোগী উলামায়ে কিরাম ওদের ঠিকই চিনেছেন । তাই তারা শত বাধা বিপত্তি, জেল-জুলুম বরদাস্ত করেও দেশ ও জাতীয় স্বার্থে দেশবাসীর সামনে ওদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়েছেন ।

{পৃষ্ঠা-১২৫}

এজন্যই এনজিওরা ওলামাগণের বিরুদ্ধে দারুন ক্ষ্যাপা । আর সে কারণেই ওরা ওলামাগণকে মৌলবাদী ও ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বলে গালি দিচ্ছে । তাদের সাথে এদেশীয় কিছু নির্বোধ, হুজগী বা দালাল টাইপের লোক পত্র-পত্রিকায় আলেম-উলামাকে ফতোয়াবাজ বলছে । এই নির্বোধ বা দালাল অনুচরদের হিদায়াত করা এবং বুঝানো দেশপ্রেমিক সকল নাগরিকের দায়িত্ব । শুধু উলামায়ে কিরামের দায়িত্ব মনে করলে নেহায়েত ভুল হবে । যা সংশোধন করতে আবারো দুইশত বত্সর সময় লাগবে ।

বাংলাদেশে এনজিওদের অগ্রযাত্রার ভূমিকা

জিজ্ঞাসাঃ জানা যায় বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরপরই পশ্চিমা দেশের খৃষ্টান ধর্মযাজকদের একটি গোপনীয় মিটিং হয় । যেখানে তারা বাংলাদেশে দারিদ্র ও আপোষিক মতনৈক্যকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে সেখানে খৃষ্টবাদ কায়িমের ষড়যন্ত্র আঁটে । সেই ষড়যন্ত্রের নক্সা অনুযায়ী বিভিন্ন পশ্চিমা দেশ এদেশে এনজিও খুলেছে এবং বাংলাদেশকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে এক এক ধর্ম যাজকের আওতায় এক এক বিভাগ সোপর্দ করেছে এবং পরোক্ষভাবে ঐ সব ধর্মযাজকের নিয়ন্ত্রণে সুপরিকল্পিতভাবে এনজিওদের কর্মসংস্থান ভাগ করা হয়েছে । যেমন -অমুক নামের এনজিও অমুক জিলায় কাজ করবে । এ ব্যপারে আপনাদের কতটুকু জানা ?

জবাবঃ আমাদের জানামতে "অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট মিশনারী সংস্থা" বাংলাদেশে তাদের কার্যালয়ে একটি পরিকল্পনা লিখিত আকারে প্রেরণ করে । এটি অতীব গোপনীয় থাকা সত্ত্বেও জনৈক সচেতন মুসলমানের নযরে পড়ে যায় । আলহাজ্ব সৈয়দ আহমদ চৌধুরী সাহেব তার লিখিত "প্রচলিত খৃষ্টবাদ ও বার্ণাবাসের ইঞ্জিল" সেই গোপন পরিকল্পনা কপির অনুবাদ উদ্ধৃত করেছেন । তা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

"একটি নতুন দেশের জন্ম হয়েছে"- যার নাম বাংলাদেশ । মুসলমানদের মধ্যে খৃষ্টের প্রচারের অপূর্ব সুযোগ এসেছে । ইসলাম আর এদেশের রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই । জনগণের মনে চিন্তার স্বাধীনতা ও নব অনুসন্ধিত্সার আবির্ভাব ঘটেছে । তাছাড়া জনমনে এবং বিশেষ করে ছাত্র সমাজে ইসলামের প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা দিয়েছে । গত ১৯৭১- এর যুদ্ধে মুসলমানরা মুসলমানদের হত্যা করেছে । তাছাড়া গত যুদ্ধে এ দেশীয় কতিপয় ধর্মীয় নেতা পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীর সংঙ্গে

যোগাযোগ করেছে । পশ্চিম পাকিস্তানীগণ তাদের পূর্ব পাকিস্তানী মুসলমান ভাইদের ঈমান নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে । আজ এই বাংলাদেশে খৃষ্টবাদের চেহারা অতি সমুজ্জ্বল । যেহেতু গত স্বাধীনতা যুদ্ধে খৃষ্টান যুবকগণ নেতৃত্ব দিয়েছে এবং খৃষ্টানগণ যুদ্ধ পীড়িত জনগণকে তাদের বাড়ী ঘরে আশ্রয় দিয়েছে এবং খৃষ্টানদের

{পৃষ্ঠা-১২৬}

চার্চ রিলিফ অপারেশনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করেছে । তাই আসুন! আমারা দু'আ করি- যেন প্রভু (যীশু) বাংলাদেশে নতুন নতুন দম্পতি প্রেরণ করেন । তাদের কাজ হবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টান ধর্মে রূপান্তরিত করা । তারা কাজ করবে এমন জায়গায় যেখানে আগে কোন খৃষ্টান ছিল না । যেমন জামালপুর, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ ।

তারা যে শুধু ধর্মান্তরিত করবে তা নয় । এমন সব লোকদেরকে ধর্মান্তরিত করবে যারা অন্যদেরকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হবে । এটাই হবে আমাদের লক্ষ্য এবং এ কাজ করতে হবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে । আমাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা হবে, যেন নতুন দম্পতিগণ এ কাজের এবং সুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে ।

এই খৃষ্টবাদের প্রসারের জন্য যে অর্থের দরকার হবে, তা আমাদের অস্ট্রেলিয়ার ব্যাপটিস্ট ব্যবস্থা করবে । ঈশ্বর মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার খৃষ্টের বানী গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন । আর মিশনারীগণ এভাবে এদেশীয়দেরকে যীশুর শিষ্য বানিয়ে আমাদের পবিত্রতার জয়গানে আনন্দ করবে ।

এভাবে বর্তমান দুনিয়ার প্রায় ১৩/১৪ টি প্রধান খৃষ্টান দেশ তাদের নিজ নিজ কর্মপন্থানুযায়ী বাংলাদেশে মিশন পাঠিয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছে ।

জনাব আলহাজ্ব এ, বি, এম, নুরুল ইসলাম তার লিখিত "বাংলাদেশের অমুসলিম মিশনারী তত্পরতা" বইতে লিখেছেন- "প্রায় একশতটি মিশনারী সংস্থা বাংলাদেশে কার্যরত রয়েছে ।" তবে ৮৪টি সংস্থার নাম তিনি উল্লেখ করেছেন । অবশিষ্টগুলোর নাম সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি । মানুষের চোখে ধুলো দিতে তারা ধারণ করেছে ভিন্ন ভিন্ন রূপ । কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন । যুক্তরাষ্টের ১৯টি, অস্ট্রেলিয়ার ৩টি, আন্তর্জাতিক ৩টি, বৃটিশের ৪টি, সুইডেনের ৭টি, নেদারল্যান্ডের ২টি, ডেনমার্কের ২টি এবং সুইজারল্যান্ডসহ আরো কয়েকটি দেশের ১টি করে মিশনারী সংস্থা বাংলাদেশে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে অপতত্পরতা চালাচ্ছে ।

কাদিয়ানীদের পরিচয় ও তাদের সংঙ্গে মুসলমানের সন্তানের বিবাহ

জিজ্ঞাসাঃ কাদিয়ানীরা কি মুসলমান? যদি মুসলমান না হয় তাহলে তাদের সাথে মুসলমানের সন্তানদের বিয়ে-শাদী হয়ে থাকলে এখন কি করতে হবে ?

জবাবঃ সারা পৃথিবীর আলিম, মুফতী, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম দেশের ইসলামী আদালতের রায় হল কাদিয়ানী সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম কর্তৃক "খাতামুন্নাবিয়্যিন" শব্দের ব্যাখ্যা অস্বীকার করার দরুন এবং তাদের স্বতন্ত্র আক্বীদা ও বিশ্বাসের কারণে কাফির । তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-কে শেষ নবী মানে না । তারা খাতামুন নাবিয়্যিন শব্দের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে খতমে

{পৃষ্ঠা-১২৭}

নবুওয়াত অস্বীকার করে । আর এতটুকুই তাদের কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট । তারা সহীহ মুসলমানদের ঘরে ঘরে গোপনে তাদের সে সব প্রচার পত্র বিলি করে । তার মধ্যে সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য মদীনার মুনাফিকদের মত (যার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা মুনাফিকীন এ রয়েছে) কালিমা তাইয়্যিবা লিখে এবং উচ্চারণ করে তারা লিখে থাকে যে, আমরাও খাতামুন নাবিয়্যিন বিশ্বাস করি । এতবেশী বিশ্বাস করি যে, হাক্কানী আলিমগণ আমাদের বিশ্বাসের একশ ভাগের এক ভাগও করে না । যে ব্যক্তি খতমে নবুওয়াত বিশ্বাস করে না, তাকে কাফির মনে করি । এ কথা বলার পর অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরক্ষণেই তার লেখার চাতুরতার মধ্যে দিয়ে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহী ওয়া সাল্লাম-এর শেষ নবী হওয়াকে অস্বীকার করে এই বাহানায় যে খাতামুন্নাবিয়্যিন আমরা জানি কিন্তু এ ব্যপারে মোল্লাদের অপব্যাখ্যা আমরা মানি না ।

অথচ মাওলানা-মুফতীগণ উক্ত শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন তা কখনও তাদের মনগড়া নয় । বরং কুরআনের প্রায় ১০০ আয়াত এবং দুই শতাধিক সহীহ হাদিস এবং সাহাবা (রাযিঃ) গণের ইজমা দ্বারা তা প্রমাণিত ।

সুতরাং মুসলমানদের সতর্ক থাকা উচিত । মুসলিম শব্দ দেখে ধোকা খাওয়া ঠিক নয় এবং মনে করা উচিত নয় যে, এরাও মুসলমান । হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান যেমন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম এসব ধর্মের অনুসারীরা যেমন অমুসলিম, কাফির, তেমনিভাবে কাদিয়ানী মতবাদও ভিন্ন ধর্ম ও অমুসলিম জামাত এবং কাদিয়ানীরা কাফির । তারা তাদের ভন্ড নবী কর্তৃক ইংরেজ গভর্মেন্ট এর তরফদারী করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ হারাম হওয়ার ফাতাওয়া দেয়ার কারণে জিহাদ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদীস অস্বীকার করেছে ।

তাই আহমদীয়া জামা'আত (কাদিয়ানীরা) নিশ্চিতভাবে কাফির । সুতরাং কোন মুসলমানের সাথে কাফিরদের বিবাহ-শাদী যেমন কখনও জায়িয নয়, তেমনিভাবে কাদিয়ানীদের সাথেও বিবাহ জায়িয নয়- সম্পূর্ণ হারাম । যদি না জেনে কেউ তাদের সাথে বিবাহ-শাদী করে থাকে বা বিবাহ দিয়ে থাকে, তাহলে পৃথক হয়ে যেতে হবে এবং তওবা করে নিতে হবে । উল্লেখ্য কাদিয়ানী কাফিররা নিজেদের বর্ণনায় ও লেখনীতে নিজেদের কাদিয়ানী বলে উল্লেখ করে না বরং "আহমদী মুসলিম জামাত" বলে থাকে ।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারা আয়াত ২২১ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ২ : ২৬৩ # শামী ৩ : ১৯৩]

অমুসলিম এনজিওদের বিরোধিতার কারণ

জিজ্ঞাসাঃ উলামায়ে কিরামগণ অমুসলিম এনজিও সমূহের বিরোধিতা করেন কেন ? এনজিওদের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের দৃষ্টিভঙ্গি কি ?

জবাবঃ আমাদের দেশে অমুসলিম এনজিও বলতে মূলতঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টান দেশসমূহের অর্থে পরিচালিত এনজিও সমূহই বুঝায় । আর কুরআন-হাদীসের

{পৃষ্ঠা-১২৮}

আলোকে এবং ইসলামের আবির্ভাবের পর হতে এ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের সংঙ্গে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের আচরণের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটা দিবালোকের চেয়ে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইয়াহুদী-খৃষ্টানরা কখনো মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করে নাই এবং কস্মিনকালেও তারা মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী হতে পারে না । তাই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ "হে মুমিনগণ!

তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তারা একে অপরের বন্ধু ।”
[সূরা মায়িদাহ আয়াতঃ ৫১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ ”তোমরা মু’মিনদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না ; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না । তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ । শত্রুতা প্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ ফুটে বেরোয় । আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো বেশী জঘন্য । তোমাদের জন্য নিদর্শন বিষদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হল । যাতে তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও । দেখ! তোমরাই তাদের ভালবাস । কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদভাব পোষণ করে না । আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাসী । অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে- আমরা ঈমান এনেছি । পক্ষান্তরে তারা যখন তোমাদের হতে পৃথক হয়ে যায় তখন তোমাদের উপর রোষ বশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে । বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক । আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন । তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে । আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না । নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে, সে সমস্তই আল্লাহর আয়ত্বে আছে ।”

[সূরা আল-
ইমরান ১১৮-১২০]

আরেক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা সতর্কবাণী উচ্চারণ পূর্বক ইরশাদ করেনঃ ”ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা কখনই আপনার (তথা মুসলমানদের) প্রতি সন্তুষ্ট হবে না । যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন । যদি আপনি (তথা মুসলমানরা) তাদের আকাঙ্খা সমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার (তথা মুসলমানদের) উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই ।”

[সূরা বাকারাহঃ ১২০]

আরেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্ট বলেছেনঃ ”তারা (ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা) বলে- তোমরা ইয়াহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে ।”
[সূরা বাকারাহঃ ১৩৫]

আল্লাহ তা‘আলার এ সকল চিরসত্য বাণীসমুহের প্রতি করো দৃঢ় বিশ্বাস বা আস্থার অভাব থাকলে আমরা তাদের আহবান জানাই –আপনারা ইসলামের প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বত্সরের ইতিহাসে এমন কোন নযীর পেশ করুন যদ্বারা বুঝা
{পৃষ্ঠা-১২৯}
যায় তারা যে, স্বার্থ ছাড়া মুসলমানদের কোন কল্যাণ কামনা করছে । আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি এমন দৃষ্টান্ত কেউ কখনো পেশ করতে পারবে না ।

বর্তমানে আমাদের এই ইসলামী ঐতিহ্যবাহী বাংলাদেশে এনজিওদের নানা রকম প্রকাশ্য চরম অশালীন অপকর্মসমূহ ছাড়াও সেবার নামে রোগীদেরকে ফ্রি ঔষধ প্রদান, শিশুদের বিনা বেতনে শিক্ষা ও শিক্ষা সামগ্রী প্রদান, গরীবদেরকে ঋণ প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচীসমূহ পরিচালনায় তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মূর্খ ও ধর্ম জ্ঞান শূন্য মুসলমান ও তাদের সন্তানদের মাঝে খৃষ্টীয় ভাবধারা সৃষ্টি করা । খৃষ্টীয় ধর্ম প্রচার করে মুসলমানদের খৃষ্টান বানানো,গরীব জনগণের মাঝে স্থায়ী ভাবে দারিদ্র্য

লালন করা । আর দেশের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের সাহায্য করে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে- আমাদের দেশের প্রচুর সম্ভাবনাময় উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের সকল খাত ও পথ রুদ্ধ করে রাখা । বাংলাদেশকে স্থায়ীভাবে বিদেশী তথা ইংরেজদের সাহায্য নির্ভর রেখে এদেশের সরকারের উপর নযরদারী ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খবরদারীর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গকে চিরতরে নিজেদের আজ্ঞাবহ রেখে, তাদের মাধ্যমে শতকরা ৯০% মুসলমানের দেশে পশ্চিমা ও খৃষ্টীয় কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়ে মুসলমানদেরকে সেগুলোর অন্ধ অনুকরণে মোহিত করে রেখে এদেশের মুসলিম সমাজ হতে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনকে চিরতরে দূরে সরিয়ে রাখা । যাতে মুসলমানরা কখনই তাদের ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হতে না পারে এবং দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়িমের কোন পরিবেশ বা সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে না পারে । এতে করে মুসলমানরা চিরতরে ঘুনে ধরা কাষ্ঠের ন্যায় দুর্বল হয়ে থাকবে এবং তাদের গোলামীর জিঞ্জিরে চিরকাল আবদ্ধ থাকবে ।

তাই তাদের সাহায্য-সহযোগিতায় বাহ্যিক কিছু উপকার দেখে নিজেদের চিরস্থায়ী বিপদের মুখে না ফেলে এবং স্থায়ীভাবে পরনির্ভরশীল না থেকে দেশের সম্পদ দিয়েই সম্ভব পরিমাণ স্বনির্ভরতা অর্জন করার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে ।

ব্র্যাকের স্কুলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে খৃষ্টধর্ম প্রচার

জিজ্ঞাসাঃ ব্র্যাকের স্কুলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে খৃষ্টধর্ম প্রচার সংক্রান্ত প্রশ্নপত্র নাকি করা হয় । এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে ইচ্ছুক ।

জবাবঃ ব্র্যাকের স্কুলের প্রশ্নপত্র মাসিক ‘জাগো মুজাহিদ’ জানুয়ারী’ ৯৪ সংখ্যায় ছাপা হয়েছে । ব্র্যাকের প্রশ্নপত্রের একটি নিম্নে দেয়া হল-

১. (ক) যীশুর মায়ের নাম কি?

(খ) যীশু কত বত্সর বয়সে উপাসনা ঘরে গিয়েছিলেন ?

(গ) বড় উপাসনা ঘরটি কোথায় ছিল ?

{পৃষ্ঠা-১৩০}

(ঘ) তারা যীশুকে কি বলে ডাকত ?

(ঙ) যীশু ঈশ্বরকে কি বলে ডাকতেন ?

এ ধরনের আরো অনেক প্রশ্ন ব্র্যাক প্রকাশ করেছে ।

সেবার নামে এনজিও ব্র্যাক-এর খৃষ্টধর্ম প্রচারের নিমিত্ততা এত স্পষ্ট হওয়ার পরও কি বিবেচনার জন্য সময় ক্ষেপণের সুযোগ আছে ?

ভন্ডের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান যুগে অনেক ভন্ডপীর বা ভন্ড নবীর কথা শোনা যায়, আসলে ভন্ড শব্দের অর্থ কি ?

জবাবঃ ভন্ড শব্দের আভিধানিক অর্থ হল- নষ্ট, ভানকারী, শঠ, কপট, ঠকবাজ ও প্রবঞ্চনাকারী ।

পরিভাষায় ভন্ড বলা হয় তাকে যে স্বীয় হীনস্বার্থ হাসিল করার জন্য সত্যকে গোপন করে কোন অবাস্তব জিনিসকে মানুষের সামনে পেশ করে ।

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী ভন্ডের পরিচয় স্পষ্ট যে, বর্তমানে অনেক লোক দুনিয়াবী হীন স্বার্থে ধর্মের নামে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সঠিক শরীয়ত ও মারেফতকে গোপন করে ভ্রান্ত মতবাদ মানুষের সামনে পেশ করে চলছে । তাদের খপ্পর থেকে মুসলামানদের বেঁচে থাকা জরুরী । [প্রমাণ মিশকাত শরীফ, ৪৬১]

ভন্ডপীরের আলামত

জিজ্ঞাসাঃ আমি এক পীর সাহেবের দরবারে উপস্থিত হয়ে নিম্নে বর্ণিত আলামত সমূহ দেখতে পাইঃ

১. দেয়াল ঘেরা বাড়ির একটি কক্ষে কথিত পীর সাহেব উপবিষ্ট । কক্ষটির মেঝে বাড়ির স্বাভাবিক আঙ্গিনা থেকে আনুমানিক ৪ ফুট উঁচু । কতিপয় ভক্তকে দেখতে পেলাম কক্ষটির কাছে আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে কক্ষটির মেঝের একপ্রান্তে দু'হাত বিছিয়ে দু'হাতের মাঝে মেঝেতে কপাল ঠেকিয়ে সিজদা করছে ।

২. অনেককে দেখতে পেলাম- পীর সাহেবের দরবার থেকে ফেরার সময় দু'হাত জোড় করে ঐ কক্ষটি সামনে রেখে (না ঘুরে আস্তে আস্তে, পিছিয়ে) আসছে । এভাবে পিছায়ে আনুমানিক ২০ গজ আসার পর মেইন রোডে উঠে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটছে ।

৩. দরবারে যাওয়ার পর দূরে ঐ রাস্তার পাশে কোথাও জুতা খুলে রেখে খালি পায়ে যাচ্ছে ।

৪. পুরুষ ও মহিলা একই সাথে একই আঙ্গিনায় উপবিষ্ট । তবে মহিলা একদিকে, পুরুষ অপর দিকে । মাঝে পর্দার কোন ব্যবস্থা নেই । মহিলারা স্বাভাবিক পোষাক পরিহিতা । কাহারো গায়ে বোরখা নেই । অনেকের গায়ে চাদর পর্যন্ত নেই ।

{পৃষ্ঠা-১৩১}

জানতে পারলাম এখানে কোন নামাজের জামা'আত হয় না । প্রতি শুক্রবার বাদ মাগরিব মাহফিল হয় । পীর সাহেব ওয়ায-নসীহত করেন । দু'আ-কালাম পাঠ ও সওয়াব রিসানী হয় ।

উক্ত পীরের দরবারে যাওয়া বা তার নিকট বাই'আত হওয়া জায়িয কি-না ? যদি কেউ মনে করে উপরোল্লেখিত বিষয় সমূহে শরীক না হয়ে শুধু ওয়ায নসীহত শুনবে, দু'আয় শরীক হবে ও শরীয়ত সম্মত সবক গ্রহণ করবে, তবে তার ঈমান আকীদার কোন প্রকার ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি-না ?

জবাবঃ আপনার বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত পীরের যে সকল কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই শরীয়ত বিবর্জিত নাজায়িয ও হারাম কাজ ।

নুরুল ইসলাম প্রুফ

নাঈম হাসান এর প্রুফ দেখা

এ সকল কর্মকান্ড তার গোচরে হওয়া সত্ত্বেও সে কোন বাঁধা প্রদান না করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে উক্ত পীর সম্পূর্ণ ভন্ড, বিদ'আতী ও গোমরাহ। সুতরাং তার দরবারে যাওয়া বা তার নিকট বাই'আত হওয়া জায়িয হবে

না। তার নিকট শুধু ওয়ায-নসীহত শুনা ও দু'আর জন্য শরীক হওয়াও শরী'আত সম্মত হবে না। বরং ঈমান-আকীদা যতটুকু আছে তাও নষ্ট হওয়ার আশংকা আছে। পীরের নিকট বাই'আত হওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইসলাহ্। উক্ত পীরের নিকট কোন প্রকার ইসলাহের আশা করা যায় না। কারণ শরী'আতের দৃষ্টিতে সে হক্কানী পীর নয়। বরং ভন্ড ও ভ্রষ্ট। হক্কানী পীর হওয়ার জন্য হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) দশটি শর্ত উল্লেখ করেছেন- যার বিবরণ 'কসদুসসাবীল' নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঐ সমস্ত শর্তগুলো পাওয়া গেলে তার নিকট বাই'আত হওয়া জায়িয আছে। আপনার বর্ণিত পীরের দরবারে যে সিজদা করা হয়, সেটি যদি তার সম্মানার্থে হয় তাহলে হবে হারাম। আর যদি ইবাদতের নিয়তে হয় তাহলে সেটি হবে শিরকী ও কুফরী কাজ। আর তিনি যে বিনা পর্দায় মেয়েদেরকে মুরীদ করেন এবং নারী পুরুষ তার দরবারে একই সাথে উঠাবসা করে এসবই ফাসেকী কাজের অন্তর্ভুক্ত।

[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী, ১:২২৩ # জাওয়াহিরুল ফিকাহ ৪:২৬৪ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১: ১৩৩ # আযীযুল ফাতাওয়া, ১৪৫]

والتواضع لغير الله حرام كذا في الملتقط. (الفتاوى العالمغيرية:368/5)

হক ও বাতিল পীরদের পরিচয় এবং বিভিন্ন অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ হক্কানী পীর ও বাতিল পীরের পরিচয় কি ?
বাতিল পীরের দরবারে কোন কাজগুলো ভন্ডামী ? বাঙালী জাতি হিসেবে আমরা যে সকল সংস্কৃতি বা উৎসব পালন করে থাকি, তা কি ভন্ডামী পর্যায়ে পড়ে ?

{পৃষ্ঠা-১৩২}

জবাবঃ এদেশের মানুষ সাধারণত ধর্মপরায়ণ। তাদের এ ধর্ম পরায়ণতার সুযোগ নিয়ে সমাজে বেশ কিছু ব্যবসায়ী পীরের আবির্ভাব ঘটেছে- যাদের ভিতর হক্কানী পীর (যারা আল্লাহর রাস্তায় সঠিক পথ প্রদর্শক)-এর দশটি আলামতের কোন একটিও পাওয়া যায় না। হক্কানী পীরের দশটি আলামত এইঃ

(১) পীর সাহেব তফসীর, হাদীস, ফিকহ ও ধর্মীয় যাবতীয় ব্যাপারে অভিজ্ঞ আলিম হওয়া আবশ্যক। অন্ততঃপক্ষে মিশকাত শরীফ ও জালালাইন শরীফ বুঝে পড়েছেন পরিমাণ ইলম থাকা জরুরী।

(২) পীরের আকীদা ও আমল শরী'আতের মুআফিক হওয়া অপরিহার্য। তাঁর স্বভাব-চরিত্র ও অন্যান্য গুণাবলী যেমন শরী'আতে চায়, সেরকম হওয়া বাঞ্জনীয়।

(৩) পীরের মধ্যে লোভ (টাকা-পয়সা, সম্মান-প্রতিপত্তি, যশঃ ও সুখ্যাতির লিপ্সা) থাকবে না। নিজে কামিল হওয়ার দাবী করবে না। কেননা এটাও দুনিয়ার মুহব্বতেরই অন্তর্ভুক্ত।

(৪) তিনি কোন কামিল পীরের খিদমতে থেকে ইসলাহে বাতিন (অন্তঃকরণে পরিশুদ্ধতা) এবং তরীকত অর্জন করেছেন এরকম হতে হবে।

(৫) সমসাময়িক পরহেযগার-মুত্তাকী আলেমগণ ও সুন্নত তরীকার ওলীগণ তাকে ভাল বলে মনে করেন- এমন হতে হবে।

(৬) দুনিয়াদার অপেক্ষা দীনদার লোকেরাই তাঁর প্রতি বেশি ভক্তি রাখে- এমন হওয়া আবশ্যক।

(৭) তাঁর মুরীদের মধ্যে অধিকাংশ এরকম হতে হবে যে, তারা প্রাণপণে শরী'আতের পাবন্দি করেন এবং দুনিয়ার প্রতি মোহ-লালসা রাখেন না।

(৮) তিনি এমন হবেন যে, মনোযোগের সাথে মুরীদদের তা'লীম-তলকীন করেন এবং অন্তর দিয়ে এটা চান যে, তারা ভাল হোক। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পায়রবী করুক। তিনি মুরীদদের মতলব মত স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারেন না। তাদের মধ্যে যদি কোন দোষ দেখতে বা শুনতে পান, তবে তা যথারীতি (কাউকে নরমে কাউকে গরমে) সংশোধন করেন।

(৯) তাঁর সুহবতে কিছুদিন যাবৎ থাকলে, দুনিয়ার মুহব্বত কমে যায় এবং আখেরাতের চিন্তা-ফিকির বাড়তে থাকে।

(১০) তিনি নিজেও রীতিমত যিকির শোগল করেন। অন্ততঃপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা রাখেন। (কেননা, নিজে আমল না করলে, অন্ততঃপক্ষে করার পাক্কা ইরাদা না থাকলে, তা'লীম তলকীনে বরকত হয় না)। [প্রমাণঃ কসদুল সাবীল, পৃঃ ৯]

{পৃষ্ঠা-১৩৩}

সমাজের যে সকল পীর সাহেবানের মধ্যে এ আলামতগুলো পাওয়া যাবে, তারাই হক্কানী পীর। যাদের মধ্যে এগুলো পাওয়া যাবে না; এরপরও পীর নাম ধারণ করে বসবে, তারা বাতিল, ভন্ড ও ব্যবসায়ী। বর্তমানে তাদের দ্বারা মুসলমানদের অবশিষ্ট ঈমানটুকুও বরবাদ হয়ে যাচ্ছে। পীরের চরণে সিজদা করা বা মাথা নুইয়ে কদমবুসী করা, পীরের নামে মান্নত করা, পীরের কবরে সিজদাহ করা, পীরের কবরে গিলাফ চড়ানো, আলোক সজ্জা করা, পীরের নামে বাৎসরিক উরস করা, পীরকে মাকসুদ পূরনকারী ও হাজতরাওয়া-মুশকিলকুশা মনে করা প্রভৃতি শিরক, বিদ'আত ও হারাম পর্যায়ের। বর্তমানে এসব কুসংস্কার দ্বারা ঈমান আক্বীদার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। যেসব পীর-ফকির এসকল শরী'আত বিবর্জিত কাজের মধ্যে লিপ্ত বা এগুলোকে অনুমোদন করে থাকে, তাদের পথভ্রষ্ট হওয়া সুস্পষ্ট। ভন্ড পীরদের এসকল ভন্ডামী ছাড়াও আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণী ঈমান ও মুসলমানী জলাঞ্জলী দিয়ে কতিপয় হিন্দুয়ানী রুসুমকে বাঙালী সংস্কৃতি বা রীতিনীতি রূপে দাঁড় করিয়েছে। তারা শহীদগণের মাযারে কুরআন তিলাওয়াত ও দু'আ পাঠ ইত্যাদির পরিবর্তে সঙ্গীত পরিবেশন, পুষ্পার্ঘ অর্পণ প্রভৃতির রেওয়াজ করেছে। অথচ এসব যা কিছু করা হচ্ছে এর কোনটার প্রমাণ কুরআন-হাদীসে নেই। বরং এসকল কাজকে শরী'আতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তেমনিভাবে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনসহ বৈশাখী মেলার নানা অনুষ্ঠানাদিও শরী'আত বিরোধী।

[প্রমাণঃ শামী ২ : ৪৩৯, দুররে মুখতার ৬ : ৩৮৩]

وكذا ما يفعلونه من تقبيل الارض بين يدي العلماء والعظماء فحرام....الخ. (الدر المختار:383/6)

ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। মুসলমানদের দীন-দুনিয়ার সবকিছুই শরী'আত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। কোথাও খামখেয়ালী বশতঃ শরী'আতের বরখিলাপ কিছু করার অনুমতি তাকে দেয়া হয়নি। দীন দুনিয়ার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তাকে কুরআন হাদীসের আলোকে গ্রহণ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে তার জন্য একথার সুযোগ নেই যে, "এটা আমি বাঙালী জাতির সংস্কৃতি হিসেবে করছি। এ ব্যাপারে আল্লাহ-রাসূল কি বলেন, তা আমার দরকার নেই।" (নাঊযুবিল্লাহ) বরং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছুর উর্ধ্বে। দেশ-জাতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সবই আল্লাহর নির্দেশের গন্ডির মধ্যেই হতে হবে। মুসলমানগণের সংস্কৃতিও শরী'আতের ধাঁচেই গঠিত হবে। সুতরাং কোন মুসলমান কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করে এ দীন-ঈমান বিরোধী কাজগুলোর কোনটাই করতে পারে না। সে একজন মুসলমান এটাই বড় কথা এবং এটা তার প্রথম পরিচয়।

তারপরে সে বাঙালী, পাকিস্তানী, আরবী ইত্যাদি বিষয়ে পরিচিত হবে তার মুসলমানিত্ব ঠিক রেখে। ইসলামে এরূপ চিন্তার কোনই অবকাশ নেই।

{পৃষ্ঠা-১৩৪}

দিল্লুর রহমান সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

জিজ্ঞাসাঃ ঢাকার রাজারবাগে অবস্থানরত দিল্লুর রহমান নিজেকে পীর বলে প্রচার করে থাকে। এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় খেতাব নেই, যা ঐ ব্যক্তির নামের সাথে ব্যবহার করা হয় না। অথচ লোকটির কথাবার্তা শুনলে এবং তার আস্তানা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা আল-বাইয়্যেনাত-এ তার বক্তব্যের প্রতি নযর বুলালে যা বুঝে আসে, তাতে মনে হয়- লোকটি সহীহ ইলমের অধিকারী কোন আলেম নয়। কোন দীনি বিশেষজ্ঞ লোকের সাথে আলোচনা করলে, তারা তাকে "এনজিওদের গৃহপালিত দালাল মুন্সী" বলে মত পেশ করেন।

এখানে আমার জানার বিষয় হচ্ছে-

(ক) লোকটির নাম 'দিল্লুর রহমান'। নামের শুরুর হরফ দাল হলে এর অর্থ হয় নাকি রহমান তথা আল্লাহর দিল। আর যদি শুরুর হরফ যোয়াদ হয়, তাহলে এ নামের অর্থ হয় আল্লাহ কর্তৃক গোমরাহকৃত। এ ধরণের নাম রাখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ ? আর যদি বৈধ না হয়ে থাকে, তবে লোকটি এ নামটি পরিবর্তন না করে ব্যবহার করছে কেন?

(খ) লোকটির শিক্ষাগত যোগ্যতা কি? আসলেই কি সে কোন মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলেম ?

(গ) সে লোকটি ফাতাওয়া দিয়েছে লাল-সাদা রুমাল ব্যবহার নাকি জায়িয নয়। তার ফাতাওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য ?

জবাবঃ আপনি যে লোকটি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, তার ব্যাপারে আমাদের নিকট বিভিন্ন স্থান থেকে এ ধরনের আরো প্রশ্ন এসেছে। তবে আমাদের প্রশ্ন উত্তরের বিভাগটি আমরা যথেষ্ট প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি বিধায় ঐ ধরনের অজ্ঞ লোক সম্পর্কে আলোচনা এখানে ততটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। আমাদের পত্রিকাসহ বড় বড় কওমী মাদ্রাসার মুখপত্র সহীহ দীনি পত্র-পত্রিকা নিয়েও সে অনেক আপত্তিকর কথা বলে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু ওসবকে আমারা পাগলের প্রলাপ ভেবে তার জওয়াব দিতেও যাইনি। তবে বিভ্রান্তির হাত থেকে সাধারণ লোকেরা যাতে রক্ষা পায়, সে জন্য আপনার প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেয়া হচ্ছেঃ

(ক) আপনি দিল্লুর রহমান নামের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তার প্রথমটিকে গ্রহণ করে তার প্রকাশিত বাইয়্যিনাত পত্রিকার একটি সংখ্যায় লোকটি নিজেও স্বীকার করেছেন। কিন্তু আপত্তি হল- আরবীতে দিল্লুন এর অর্থ দিল আসে না, আর যদি ফারসী ধরা হয়, তাহলে হবে দিলে রহমান। সেক্ষেত্রে দিল্লুন সহীহ হবে না। তাছাড়া রহমানের দিল একথাটা বলাও সহীহ না। এসব দিক বিবেচনা করলে, এ অর্থে কোন নাম রাখা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয। প্রকৃতপক্ষে দিল

{পৃষ্ঠা-১৩৫}

বুঝাতে আরবীতে দিল্লুন কোন শব্দ নেই। তথাপি এ হুকুম হচ্ছে তার প্রদত্ত ব্যখ্যার ভিত্তিতে। আপনি জানতে চেয়েছেন- নামটি অবৈধ হলে, সে এটি পরিবর্তন করে না কেন ? এ বিষটি আমরা কিভাবে বলবো ? এটি আপনি সরাসরি তাকে বা তার দরবারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আর আপনি তার নামের দ্বিতীয় যে অংশটি প্রকাশ করেছেন, "পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ" মূলতঃ এটিই যথার্থ মনে হয়। আর এজন্য তার কর্মকান্ডে গোমরাহী প্রকাশ পাওয়াটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে তার নামের সাথে তার কর্মকান্ডের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

(খ) আপনি জানতে চেয়েছেন- তার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ? এ ব্যাপারে আমরা নির্ভরযোগ্য সূত্রে খোঁজ-খবর নিয়ে যা জানতে পেরেছি, তা হচ্ছে- লোকটি আদৌ কোন মাদ্রাসায় পড়ুয়া আলেম নয়। জেনারেল লাইনে ইন্টারমিডিয়েট পাশ। সে একজন মাওলানা সাহেবের কাছে প্রাইভেট ভাবে মাদ্রাসার প্রাথমিক পর্যায়ের দু'চারটা কিতাব পড়েছে মাত্র। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য তার সামনে যে কোন একটি তাফসীর বা ফিকাহর কিতাব যেমন, তাফসীরে বায়যাবী শরীফ, ফাতাওয়ায়ে শামী ইত্যাদি খুলে ধরলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন- তার নামের টাইটেলের বহর নিতান্তই অন্তঃসার শুন্য ।

(গ) রুমাল ব্যবহার নাজায়িয সংক্রান্ত তার ফাতাওয়া কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তা তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করলেই বুঝা যাওয়ার কথা। ফাতাওয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ইলম ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। সেমতে দীনী ব্যাপারে একটা চরম অনভিজ্ঞ, মূর্খ ও আনাড়ী টাইপের লোক ফাতাওয়া দিলেই তা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে তা আমরা বলি কিভাবে ? আপানারা নিঃসংকোচে সাদা-লাল মিশ্রিত রুমাল ব্যবহার করুন। এতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই। পুরুষের জন্য শরীয়াত যে লাল রঙের ব্যবহার মাকরুহে তানযীহী করেছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- খালিস লাল রং। যার মধ্যে অন্য কোন রংগের মিশ্রণ নেই। এ রুমালে যেহেতু সাদা রংগের মিশ্রণ আছে, সুতরাং তা ব্যবহার করা জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪ : ১২৫ # কিফায়াতুল মুফতী ৯ : ১৪৬-১৫৪ # আলমগীরী ৫ : ৩৩২]

অল্পবিদ্যা ভয়ংকর বলে যে একটা কথা আছে, এখানে সে প্রবাদটি বাস্তবায়িত হয়েছে। লোকটি হয়ত কারো থেকে শুনেছে যে, শরী'আতে পুরুষদের জন্য লাল রং-এর লেবাস মাকরূহ করা হয়েছে। আর তার উপর ভিত্তি করেই ফাতাওয়া মেরে দিয়েছে। এর মধ্যে যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে, তা আর তলিয়ে দেখার সুযোগ তার হয়নি। হবেই বা কেমনে, তার তো সেই যোগ্যতা নেই।

আসল ব্যাপার হল- ইসলাম আজ বিজাতীয়দের দ্বারা চরমভাবে আক্রান্ত। ইসলাম বিদ্বেষীরা বিভিন্ন কৌশলে ইসলামের ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করছে।

{পৃষ্ঠা-১৩৬}

কখনো আবার ওরা ইসলামের বহুরূপী শত্রুদের অল্প মূল্যে ভাড়া করে তাদের থেকে কাজ নিচ্ছে। আর সেজন্য ব্যবহার করছে দিল্লুর রহমান টাইপের কিছু লোককে।

তার নামের সাথে তাজুল মুফাসসিরীন, মুফতীউল আযম ও রঈসুল মুহাদ্দেসীনসহ এ জাতীয় অন্ততঃ ২৫/৩০টা আবার কখনো আরো বেশী টাইটেল ব্যবহার করে থাকে। নিজের নামে সেচ্ছায় এ ধরনের টাইটেল ব্যবহার করা- যে ধরনের যোগ্যতা তার মধ্যে নেই, এটা নিতান্তই প্রতারণা, অহংকার ও তাকাব্বুর সুলভ কাজ। হাদীস শরীফে আছে- যে ব্যক্তি এমন বিষয় প্রকাশ করবে যা তার মধ্যে নাই সে ব্যক্তি মিথ্যার দুটি পোষাক পরিধানকারীর ন্যায়। [বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ, ২৮১]

এহেন ভন্ডামিকে বৈধতার জামা পড়াতে সে এগুলোকে সুন্নাত বলে প্রচার করে থাকে। এ সুন্নাত নবীজীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাত নয়। বরং এটি শয়তানী স্বভাবের নিয়মনীতি মাত্র।

এগুলো যদি সুন্নাত হয়, তবে সুন্নাতে নববীর নির্ভেজাল অনুসারী সাহাবা, তাবেয়ী, মুহাদ্দিস ও মুফতিয়ানে কেরামসহ যুগে যুগে আবির্ভূত বুযুর্গানে দীন কেন এ সুন্নাতটাকে পালন করেননি। তারা তো তাদের নামের সাথে এতগুলো টাইটেল ব্যবহার করতেন না।

তার উপাধিগুলোর মধ্যে নিজেকে রঈসুল মুহাদ্দিসীন বলে যাহির করে থাকে। এ জাতীয় ভন্ডদের শায়েস্তা করার সব চাইতে সহজ ও মোক্ষম হাতিয়ার হচ্ছে - ওদের সামনে যে কোন একটি হাদীসের কিতাব খুলে দিয়ে শুধু ইবারত পড়তে বলুন। দেখবেন মুহূর্তেই ওদের থলের বিড়াল বেরিয়ে পড়বে।

দেশের সঠিক দীন ও রুচিশীল সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ খিদমতে নিয়জিত মাসিক মদিনা, আত-তাওহীদ, আর রশীদ, মঈনুল ইসলাম, কা'বার পথে প্রমুখ মাসিকী সমূহ এবং এসব দীনী পত্রিকার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ও মিথ্যা, ভিত্তিহীন আজে বাজে প্রলাপ বকাই ওর এবং ওর বাইয়্যেনাত পত্রিকার দায়িত্ব বলে মনে হয়।

মাযারে ওরস, বিশ্বজাকের মঞ্জিল ও বিশ্ব ইজতেমায় যাওয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বাংলাদেশের ভাবপ্রবণ মানুষ বিভিন্ন মাযারে, ওরশে, বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে এবং প্রতি বৎসর টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমাতে উপস্থিত হয়ে থাকে। টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমায় উপস্থিত হওয়া বাস্তবে কোন গুরুত্ব রাখে কি ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে ওরস ও মাযারে সমবেত হওয়া বিদ'আত ও নাজায়িয। কারণ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্বে উম্মতকে তাঁর মাযারে অনুষ্ঠান করা থেকে কঠোর ভাবে নিষেধ করে গেছেন। সুতরাং একজন মুসলমানের জন্য

{পৃষ্ঠা-১৩৭}

ঐসব অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া কোনভাবেই জায়িয নয়। আর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য হক্কানী পীর বা বুজুর্গের নিকট যাওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে আবশ্যিক কাজ। কারণ, নিজের কলব থেকে দুনিয়ার মোহ, রাগ, হিংসা, ফখর ও রিয়া ইত্যাদি খারাপ খাসলতগুলো দূর করে আখিরাতের মুহব্বত, নম্রতা, ইখলাস, শোকর, সবর প্রভৃতি ভাল খাসলত হাসিল করা জরুরী। এগুলো হাসিল না করলে দিলের রোগের কারণে সারা যিন্দেগীর আমল বরবাদ হয়ে যেতে পারে। যেমন- হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম যে তিন ব্যক্তিকে হাযির করা হবে, তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নেকীর পাহাড় নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু ইখলাস না থাকার কারণে তাদের সমস্ত নেকী বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান যামানায় হক্কানী পীর তাকে বলা হয়, যার মধ্যে দশটি আলামত পাওয়া যায় - বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন।
[থানবী (রঃ)-এর লিখিত কসদুস সাবীল নামক গ্রন্থ]

অপরদিকে দুনিয়াদার ও ব্যবসায়ী পীরের সংখ্যা বর্তমানে খুবই বেশী। বিনা পুঁজিতে ব্যবসা হিসেবে জনসাধারণের ধর্মীয় জ্ঞানের সল্পতার সুযোগ নিয়ে বহু ব্যবসায়ী পীর আস্তানা গেড়ে সাধারণ মানুষের অবশিষ্ট দীন-ঈমানটুকু বিনষ্ট করার ফাঁদ পেতে বসেছে। তাই তাদের দরবারে যাওয়া কিছুতেই জায়িয হবে না। এসব পীরের মধ্যে ১০টি আলামতের একটিও পাওয়া যায় না। যারা যায়, তারাও পীরের দরবারে যে একমাত্র আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যেতে হয় তা জানে না। তারা সেখানে গিয়ে পীরের পায়ে সিজদা করে, কবরে তাওয়াফ করে, পীরের পা বা কবর চুম্বন করে, পীর বা মাযারের নামে মান্নত করে প্রভৃতি শরী'আত গর্হিত কাজ করে

থাকে। এরা পীরের কাছে মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি ও রোগ-শোক থেকে মুক্তি লাভের জন্য গিয়ে থাকে। সাধারণ মুসলমানদের উচিত, হক্কানী উলামায়ে কিরামের নিকট জিজ্ঞাসা করে জেনে শুনে কোন বুযুর্গের নিকট যাতায়াত করা।

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. (سنن الترمذي حـ:320)

তাবলীগী মেহনত সকল হক্কানী উলামায়ে কিরামের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের বিশেষ করে সাধারণ মুসলামান ভাইদের দীন ও ঈমান শিক্ষার জন্য বর্তমান যামানায় তাবলিগী জামা'আতের কর্মসূচী খুবই সুন্দর। এ ব্যাপারে সমস্ত হক্কানী উলামায়ে কিরাম একমত । হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ ধরনের পদ্ধতিতে মেহনত করেই দীন ও ঈমান শিখতেন ও শিখাতেন।

{পৃষ্ঠা-১৩৮}

এ ধরণের দাওয়াত যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন সেই এলাকার জনসাধারণ থেকে দীনও বিদায় নিতে থাকবে। স্পেন ও রাশিয়া ইত্যাদি তার নযীর।

আজ আমাদের দেশসহ সকল বিশ্বে অসংখ্য বিধর্মী এই দাওয়াতের উসীলায় ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। এ দাওয়াতে বহু স্থানের গির্জা ও মন্দির মসজিদে পরিণত হচ্ছে। বহু নামধারী মুসলমান এই মেহনতের উসিলায় পূর্ণ দীনদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করছে। সেই জবরদস্ত মেহনতকে আরো ব্যাপক করার জন্য টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই ইজতেমায় বিদেশ থেকে বুযুর্গানে দীন তাশরীফ আনেন। বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের অসংখ্য লোক তাদের বয়ান শুনে। সেই ইজতিমা আর ওরস, মাযারকে এক সমান মনে করা মারাত্মক ভুল। দুটোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একটা হিদায়াতের পথ। আর অন্যটা গোমরাহীর পথ । আল্লাহ তা'আলা সকলকে সহীহ সমঝ দান করুন।

সুন্নী ও বিদ'আতীর পরিচয় এবং উলামায়ে হক্কানীদের ওহাবী বলার রহস্য

জিজ্ঞাসাঃ ওহাবী ও সুন্নীর অর্থ কি ? আমাদের দেশের অনেক এলাকায় ওহাবী-সুন্নী নামে ঝগড়া-মারামারি হয়। তার রহস্য কি ?

জবাবঃ 'সুন্নী' বলা হয় ঐসকল লোককে যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পথের হুবহু অনুসারী। অর্থাৎ যারা আক্কাইদ ও আমল-আখলাক ইত্যাদির দিক দিয়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের পুরোপুরি অনুসারী।

আর যারা আহলে সুন্নত ওয়াল জামা'আতের সাথে একমত পোষণ করে না, বরং শরী'আতের মধ্যে নতুন নতুন আক্কীদা ও আমল জুড়ে দেয় এবং সেগুলো নেকীর কাজ মনে করতে থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদেরকে বিদ'আতী বলা হয়। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাযির-নাযির। তিনি আলিমুল গায়িব- এরূপ বিশ্বাস করা। মাযার পূজা করা, কবরে গিলাফ দেয়া, আগরবাতি ইত্যাদি দেয়া, পীরের পায়ে বা পীরের নামে সিজদা করা, পীরের কবরে ওরশ করা, মিলাদ ও কিয়াম করা, রবিউল আউয়াল মাসে জশনে জুলূশে ঈদে মিলাদুন্নবী নামে বর্ণাঢ্য মিছিল বের করা ইত্যাদি সকল কাজ গর্হিত বিদ'আতের অন্তভূক্ত। এসকল কাজ যারা করে, শরী'আতের ভাষায় তারা বিদ'আতী নামে অভিহিত। আফসোস-বর্তমান যামানায় বিদ'আতী লোকেরা নিজেদেরকে সুন্নী বলে দাবী করে। আর প্রকৃতপক্ষে যারা সুন্নী, বা আহলে সুন্নত ওয়াল

জামা'আতের অনুসারী, যারা উল্লেখিত শিরক-বিদ'আতকে প্রশ্রয় দেয় না এবং এসবের প্রতিবাদ করে, তাদেরকে 'ওহাবী' বলে গালি দেয়।

{পৃষ্ঠা-১৩৯}

এর উদাহরণ এমন, যেমন চোর নিজেই "চোর" বলে সাধুকে ধাওয়া করল। বিদ'আতীরা প্রকৃত সুন্নীদেরকে ওহাবী এজন্য বলে যে, আরব দেশে মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নামে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হন। তিনি অনেক শিরক বিদ'আতের মূলোৎপাটন করে সুন্নাত কায়িম করেছিলেন। তবে তার ভিতর কঠোরতা ছিল অত্যাধিক। তাই তিনি বিভিন্ন মাসআলার জন্য অতিরিক্ত কঠোরতা করে সুন্নতের খিলাফও করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা কোন নবী-ওলীদের কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়িয। নবী-ওলী বা কোন বুযুর্গ ব্যক্তির উসীলা ধরে দু'আ করা নাজায়িয প্রভৃতি। এসব বাড়াবাড়ির কারণে অনেক মানুষ তার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করে, তা অনেক লম্বা ইতিহাস।

তার আন্দোলন ওহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত।

কিন্তু আমাদের দেশে ওহাবী নামের প্রয়োগ সেই ওহাবীদের সহিত কোন যোগসূত্রে নয়। বরং হক্কানী ওলামাগণকে ঘায়েল করার জন্য বিদ'আতীদের একটি অপপ্রয়োগ।

ওহাবী বলে এ বিদ'আতীরা দেওবন্দী উলামা-মাশায়েখ ও তাদের অনুসারীগণকে বুঝিয়ে থাকে।

স্মর্তব্য যে, উলামায়ে দেওবন্দ যখন বৃটিশ ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়েন, তখন তাদের আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ইংরেজ সরকার ভারতের উল্টা বাঁশ বেরেলীর আহমদ রেজাখান নামে এক ব্যক্তিকে বহুরকম প্রলোভনে তারা হাত করে। সে জনগণকে উলামায়ে দেওবন্দ থেকে বিমুখ করার জন্য তাদের প্রতি "ওহাবী" নামের প্রয়োগ প্রবর্তন করে। এর স্বপক্ষে পুঁজি তৈরির জন্য দেওবন্দী উলামাগণের কিতাবাদি হতে সহীহ ইবারত নিয়ে কাটছাঁট করে কুফুরী কালাম রূপে প্রচার শুরু করে এবং নিরীহ মানুষকে দেওবন্দী উলামাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে ওহাবী বলে গালি দিতে প্রয়াস চালায়। কিন্তু আল্লাহপাক স্বীয় মেহেরবাণীতে মুসলমানদেরকে তার খপ্পর হতে হিফাজত করেন। মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া মুসলমানগণ উলামায়ে দেওবন্দের বলিষ্ট পদক্ষেপ ও সুন্নতী তা'লীম তরবিয়্যত ও আমল-আখলাকের বদৌলতে তার প্রতারণা বুঝতে পারেন এবং নিজেদেরকে তার বিদ'আতী বেড়াজাল থেকে রক্ষা করেন বর্তমানে আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে যে ওহাবী-সুন্নী সংক্রান্ত ঝগড়া-মারামারি হয়, তা সেই আহমদ রেজাখানেরেই জন্ম দেওয়া ব্রটিশ গোলামীর ফসল।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১: ১৫৮ # কিফায়াতুল মুফতী, ১: ১৯৭]

اهل السنة والجماعة هي الجماعة التي قامت على طريق ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واصحابه. (عقيدة الطحاوي:4)

{পৃষ্ঠা-১৪০}

শরী'আতে মাযহাব মানার গুরুত্ব এবং মাযহাব না মানার কুফল।

জিজ্ঞাসাঃ আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবী মুসলমানদের সম্পর্কে ইসলামী শরী'আতের রায় কি ? শরী'আতে মাযহাব অনুসরনের গুরুত্ব কতটুকু ?

জবাবঃ বর্তমান ইলমী কমযোরী ও প্রবৃত্তি পূজার যামানায় সকল মুসলমানদের জন্য ইমাম চতুষ্টয়ের যে কোন এক ইমামের তাক্বলীদ করা অর্থাৎ চার মাযহাব সমূহের কোন এক মাযহাবের অনুসারী হওয়া ওয়াজিব।

বর্তমানে শরী'আতের উপর চলার আর কোন বিকল্প নেই। বাস্তব প্রমাণে দেখা গিয়েছে যে, যারা কোন ইমামের অনুসরণ না করে নিজেরা সরাসরি কুরআন-হাদীস বুঝে আমল করতে তৎপর হয়েছেন, তারা শেষ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামীর পরিবর্তে নিজের নফস বা মনের গোলামী করে শরী'আত বিবর্জিত পথে পরিচালিত হয়েছেন। মাযহাব মানা জরুরী হওয়ার কারণ হল- পবিত্র কুরআন মানুষের হিদাআতের নিমিত্তে প্রকৃত মূল কিতাব। এর ব্যাখ্যার জন্য আল্লাহপাক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করেছেন।তাই রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গোটা জীবনাদর্শ তথা তার সকল কথা ও কাজ কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা স্বরূপ। ঈমাম শাফি'ঈ (রাহঃ) বলেন, "যদি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা ও কাজ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান না থাকত, তবে কারো পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভবপর ছিল না। উদাহরণস্বরূপ কুরআনে নামাযের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু কোন ওয়াক্ত কত রাকা'আত ? এর ব্যাখ্যা কুরআনে দেওয়া হয়নি। হাদীসে এর ব্যাখ্যা এসেছে। অনুরূপভাবে যাকাত প্রদানের নির্দেশ এসেছে। কিন্তু কি মালের কি পরিমাণ যাকাত কতদিন মাল হাতে থাকলে দিতে হবে ? এসবের ব্যাখ্যা কুরআনে দেওয়া হয়নি। হাদীসে এর ব্যাখ্যা এসেছে। সে ব্যাখ্যা অনুযায়ী মুসলমানগণ আমল করে আসছেন।

তবে এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয়, তা হলো-আমলী হুকুমের ব্যাপারে প্রায় ক্ষেত্রেই এমন একাধিক হাদীস বিদ্যমান, যে সবের ভাবধারা বাহ্যতঃ পরষ্পর বিরোধী। এর কারণ হল- শরী'আতের হুকুম-আহকাম সবগুলো একত্রে নাযিল হয়নি। বরং তখন মানুষের ক্রমানুগতিতে ইসলাম গ্রহণ ও আমলী দৃঢ়তা অর্জনের প্রেক্ষিতে হুকুম-আহকাম পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে নাযিল হয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেমন- ইসলামের প্রথম যুগে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ছিল না। আবার যা ছিল তাও দু' রাকা'আত করে ছিল। উপরন্তু তখন নামাযের ভিতর কথা-বার্তা বলা জায়িয ছিল। অতঃপর পর্যায়ক্রমে হুকুম নাযিল হয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্বের হুকুম রহিত হয়ে বর্তমান স্বরূপে এসে পৌঁছে। তেমনিভাবে হিযরতের পরে প্রথম যখন রোযার হুকুম নাযিল হয় তখন রোযা রাখা অবধারিত ফরয হিসেবে সাব্যস্ত ছিল না। বরং তখন রোযা না রেখে এক
{পৃষ্ঠা-১৪১}
একটি রোযার পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে দু'বেলা খানা খাওয়ানোরও অনুমতি ছিল। অতঃপর পরবর্তীতে রোযা রাখাকেই অবধারিত ফরজ ঘোষণা করে পূর্বের হুকুম রহিত করা হয়। এমনিভাবে বিভিন্ন হুকুম-আহকামে পর্যায়ক্রমে রদবদল হলো, কোনটা আগের কোনটা পরের এবং কোন হাদীস সর্ব বিবেচনান্তে আমলের অধিক যোগ্য এ পরবর্তী যামানায় সকল বিষয়ের সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন কাজ ও দুঃসাধ্য ব্যাপার। এসব বিষয়ে যে সকল আহলে ইলমগণ সমাধান দিয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে অনেক মত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এ অবস্থায় এখন কি সকলেই নিজেদের ইচ্ছামাফিক মত গ্রহণ করে আমল করবে, না রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী যামানার কোন বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন অধিক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্বের গবেষণার ভিত্তিতে ফয়সালার উপর আমলকারী হবে ? নিজের ইচ্ছামত আমল গ্রহণ করলে তা তো শরী'আত পালন হলো না বরং নিজের নফসের গোলামীই করা হয়। তাই এ সকল মতভেদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমল করতে হবে নিশ্চই কোন যোগ্য মুজতাহিদ আহলে ইলমের গবেষণালব্ধ পথ অবলম্বন করে। তাই এখন সেই নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ আহলে ইলমকে বেছে বের করতে হবে। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের মুজতাহিদ ইমামগণ উলামায়ে

উম্মাতে মুহাম্মদীর নযরে সর্বসম্মতিক্রমে যোগ্য মুজতাহিদ আহলে ইলম হিসেবে গ্রহণীয় হয়েছেন। কারণ–প্রথমতঃ তারা যামানায়ে রিসালাতের নিকটতম ইলমী জোয়ারের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। দ্বিতীয়ত তারা প্রত্যেকেই মজতাহিদে কামিল, পবিত্র কুরআন–হাদীস ও ইজমা সম্পর্কে অনন্য গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের যুগে তাঁদের পরবর্তী যুগ হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাদের মত কুরআন ও হাদীসে পারদর্শী মুজতাহিদ দ্বিতীয় আর পয়দা হয়নি। তাই তাদের গবেষণা ইজতিহাদে নির্ণীত কুরআন–হাদীসের সার–আমলই পরবর্তী সকল মুসলমানদের জন্য পালনীয় সাব্যস্ত হয়েছে। তাঁরা আজীবন গবেষণা করে ইসলামের নিয়ম–নীতির যে রূপরেখা উপস্থাপন করেছেন, তা সকলের নিকট গ্রহণীয় হিসেবে স্থির পেয়েছে। তারা হুকুম–আহাকাম ও মাসায়িলের ব্যাপারে এমন কতগুলো মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যে, সেগুলোর নিরিখে কিয়ামত পর্যন্ত উদ্ভুত সকল মাসায়িলের সমাধান করা যেতে পারে। এজন্য মুতাআখখিরীন উলামায়ে কিরামগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, ইমাম চতুষ্টয়ের পরবর্তী যামানার লোকদের জন্য তাঁদের যে–কোন এক ইমামের তাক্বলীদ (অর্থাৎ তার গবেষণার ভিত্তিতে শরয়ী হুকুম–আহকাম পালন করা ওয়াজিব। এ কারণেই বর্তমান চার মাযহাবের মধ্য হতে কোন এক মাযহাবের তাক্বলীদ ও অনুসরণ ওয়াজিব।)

{পৃষ্ঠা–১৪২}

অতএব, বর্তমানে এরূপ যারা মাযহাব বর্জন করে সরাসরি কুরআন–হাদীস বুঝে আমল করতে তৎপর হবেন, তারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী সাব্যস্ত হবেন। আহলে হাদীস নামধারী লোকেরা কিভাবে শুধু কুরআন–হাদীসের যাহিরী বিষয়বস্তুর উপরে আমলকারী হতে চান, আমাদের তা বোধগম্য নয়। কারণ– বর্তমান আধুনিক যামানায় এমন অনেক বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, যার হুকুমের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ উল্লেখ কুরআন–হাদীসের কোথাও নেই। যেমন উড়োজাহাজে নামায পড়া যাবে কি–না ? বীমা ইন্সুরেন্স জায়িয হবে কি–না ? এ ধরনের প্রচুর বিষয় রয়েছে। অতএব এ সকল মাসাইলের ব্যাপারে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনগণের উসূলভিত্তিক ও গবেষণালব্ধ ফায়সালা মেনে নেওয়া ব্যতিরেকে গত্যান্তর আছে কি ? তাই নফসানী খাহিশাতের ইত্তিবা না করে কোন এক মাযহাব গ্রহণ করে নেয়াই কর্তব্য। নতুবা শরী'আত মানার নামে নিজের নফসের গোলামী করা হবে–যা গোমরাহীর পথ তা কখনোও কাম্য নয়। কারণ মানুষ স্বাভাবিকতঃ যেটা সহজ, যা তার স্বার্থের অনুকূলে সেটাকেই গ্রহণ করতে চেষ্টা করে। বর্তমানে আহলে হাদীসগণ তাই করে আসছে। চার মাযহাবের কোন মাযহাবের অনুসারী নন বলে তারা ওয়াজিব তরককারী হয়েছেন এবং বর্তমান যামানার আহলে হাদীসগণ আকাবীরগণকে গালী গালাজ ও মুকাল্লিদীনদের প্রতি কুধারণা রাখার কারণে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত থেকে খারিজ। তবে তারা ইসলামের গন্ডি বহির্ভূত বলে পরিগণিত হবেন না।

[আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৪১১]

অধুনা আরেক শ্রেণীর আধুনিক আলেমের আবির্ভাব ঘটেছে। তাদের দাবী–তাক্বলীদ তো করতে হবে। কিন্তু কোন এক ইমামের তাক্বলীদ করতে হবে, এটা কোন জরুরী নয়। বরং তাদের রিসার্চ ও গবেষণা অনুযায়ী যে মাসআলায় যে ইমামের মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হবে, সেটাই তারা গ্রহণ করবেন। নির্দিষ্ট কোন ইমামকে তারা মানতে প্রস্তুত নন। গভীর ভাবে চিন্তা করলে এদের মধ্যে আর আহলে হাদীসদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য দেখা যায় না। শুধু নামের পার্থক্য। কারণ, তাদের এ মতের কারণে অনেক ক্ষেত্রে শরী'আতের ইত্তেবার নামে নফসের গোলামীর শিকার হওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। যেমন ধরুন–উযু করার পরে কারোর শরীর দিয়ে

রক্ত প্রবাহিত হল, তিনি বললেন- যে, যদিও ইমাম আবূ হানিফার (রহঃ) মাযহাবে এতে উযু ভঙ্গ হয়ে যায় । কিন্তু এ ব্যাপারে আমার নিকট ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মাযহাব নির্ভরযোগ্য মনে হয় । সুতরাং তিনি উযু করলেন না । কিছুক্ষণ পরে কোন কারণ বশতঃ কোন বেগানা মহিলাকে স্পর্শ করে ফেললেন এবং মন্তব্য করলেন যে যদিও এতে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মাযহাবে উযু নষ্ট হয়, কিন্তু এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মাযহাব আমার নিকট নির্ভরযোগ্য মনে হয় ।

{পৃষ্ঠা-১৪৩}

সুতরাং এক্ষেত্রেও তিনি উযু না করে বেঁচে গেলেন এবং নামায আদায় করলেন । এখন যদি উভয় ইমামের নিকট এ ব্যক্তির নামায সম্পর্কে ফাতাওয়া চাওয়া হয়, তাহলে নিশ্চয় উভয় ইমাম এই ফাতাওয়া দিবেন যে, ঐ ব্যক্তি বিনা উযুতে নামায পড়েছে । সুতরাং তার নামাযই হয় নি । অথচ ঐ ব্যক্তি দাবী করছে যে, সে উভয় ইমামকে মান্য করেছে এবং মাযহাব মতে নামায পড়েছে । তাই নির্দিষ্ট কোন এক ইমামের ইকতিদাই জরুরী ।

[{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل : 43

[প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন, ১ : ১৫১ # জাওয়াহিরুল ফিকহ, ১ : ১২৭ # কিফায়াতুল মুফতী ১ : ৩২৫]

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মুখোশ উন্মোচন এবং তাদের ভ্রান্তি নিরসন

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় কিছু লোক আছেন যারা নিজেদেরকে আহলে হাদীস বা সালাফী বলে দাবী করেন । নিজেদেরকে সঠিক আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অভিহিত করে থাকেন । তারা চার মাযহাবের ইমামগণের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা রাখেন । ইমামগণের তাকলীদ করাকে শিরক বলে মন্তব্য করেন । তারা বলে বেড়ান যে, হাদীসের সাথে হানাফীদের নামাযের মিল নেই । বরং তাদের অধিকাংশ আমল হাদীস ও সুন্নতের খিলাফ; যেমন-হানাফীরা রফয়ে-ইয়াদাইন করেন না, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়েন না, জোড়ে আমিন বলেন না ইত্যাদি । এ ব্যাপারে আপনাদের মতামত একান্তভাবে কামনা করছি— যাতে করে এলাকার ভিতরে বিভ্রান্তি না ছড়ায় এবং সকলে শান্তিমত ইবাদত করতে পারি ।

জবাবঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কথা, কাজ ও সমর্থনমূলক যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, তা সবই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত । যদিও তার সবটা উম্মতের আমলের জন্য নয়, যেমন- রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে একসাথে নয় জন বিবি রেখেছেন । এটা হাদীস তবে হাদীস হওয়া সত্ত্বেও উম্মতের জন্য এর অনুসরণ জায়িয নাই । কারণ এর অনুসরণ অন্য দলীলের ভিত্তিতে উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছে । উম্মতের করণীয় হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু রেখে গেছেন, সেগুলো সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত । তবে সে প্রেক্ষিতে গাইরে মুকাল্লিদদের আহলে হাদীস নাম গ্রহণ করাটাই আপত্তিকর । কেননা আহলে হাদীসের অর্থ হল হাদীসের অনুসারী অথচ সব হাদীস উম্মতের আমলের জন্য নয় । বরং মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন রিওয়ায়াতে আমাদেরকে সুন্নাহর অনুসরণ করারই আদেশ দিয়েছেন । যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- তোমরা আমার ও আমার সুপথপ্রাপ্ত খলিফাগণের সুন্নাতকে অবলম্বন কর । তোমরা তাঁদের আদর্শ শক্তভাবে ধারণ কর ও দাঁত দিয়ে কামড়ে ধর । [আবূ দাঊদ শরীফ ২ : ৬৩৫]

{পৃষ্ঠা-১৪৪}

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন- আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা শক্তভাবে আঁকড়ে রাখবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব (আল্-কুরআন) ও অপরটি হচ্ছে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত-আদর্শ।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই হক পন্থীগণকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে অভিহিত করা হয়। চার মাযহাবের ইমাম ও ফিকহের অন্যান্য মুজতাহিদ ফকীহ ইমামগণ এ উম্মতের মধ্যে অতি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। সমগ্র আহলে হক তাদের মর্যাদা মেনে নিয়েছেন। সুতরাং তাদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য জায়িয নয়। একজন সাধারণ মুসলমানকে গালি দেয়া শরী'আতে হারাম। সে ক্ষেত্রে এত বড় উঁচু দরজার উলামায়ে কিরাম এবং বুযুর্গগণকে গালী দেয়া বা বিরূপ ভাব রাখা অমার্জনীয় অপরাধ বৈকি।
জটিল বা অস্পষ্ট বিষয় সমূহে ইমামগণের কোন একজনের তাকলীদ বা অনুসরণকে শিরক বলা মহা অন্যায় এবং মুর্খতার বহিপ্রকাশ। কারণ-মাযহাবের অনুসারীগণ কখনও আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের মত এসব ইমামকে অনুসরণ করেন না। বরং জটিল ব্যাপার সমূহে বা যে ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে আয়াত বা হাদীস পরস্পর বিরোধী মনে হয়, শুধু সেক্ষেত্রেই তাদের ব্যাখ্যা অনুসরণ করা হয়। যা মূলতঃ আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ। আর এক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমল করা নিরাপদ। কেননা তারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যামানার খুব নিকটবর্তী ছিলেন। যাদের অনেকে একাধিক সাহাবাগণের দর্শন লাভ করেছেন। যারা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর সর্বশেষ আমল বা অভিমত সরাসরি সাহাবা (রাঃ) মারফত জানতে পেরেছিলেন। সেই প্রজ্ঞাশীল ফকীহ মাযহাবী ইমামগণের ব্যাখ্যা ও অভিমত আমাদের দীর্ঘ পিছনের সারির লোকগণের ব্যাখ্যার চেয়ে উত্তম ও বরণীয় হবে। তাই উল্লেখিত পন্থাটি অত্যন্ত সুন্দর, যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ। তা কোন বিবেকবান মানুষের নিকট অস্পষ্ট থাকতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আলেমের অনুসরণ করার ধারা সাহাবাদের যুগ থেকে চলে আসছে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর হায়াতে তো সকলেই নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে বা তাকে দেখে আমল করতেন। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরাম থেকে মাত্র সীমিত সংখ্যক সাহাবা (রাঃ) মাসাআলা-মাসায়িল ও ফাতাওয়া দেওয়ার খিদমত আঞ্জাম দিতেন। সাধারণতঃ এক এক এলাকার লোকজন একজন ফকীহ সাহাবীর (রাঃ) ফাতাওয়া অনুযায়ী আমল করতেন। হাদীসের কিতাবে এর একাধিক বর্ণনা এসেছে। যেমন কূফাতে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ), মদীনায় যাইদ বিন ছাবিত (রাঃ) প্রমুখ।

{পৃষ্ঠা-১৪৫}

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের ভাইয়েরা এ তাকলীদ বা অনুসরণকে কি শিরক বলবেন। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের সাতজন ক্বারীর কিরাআতে সাব'আ প্রসিদ্ধ। তারা নিজেরা নিশ্চয়ই সাত কিরাআতের কোন নির্দিষ্ট একটা কিরাআত অবলম্বন করে কিরাআত করে থাকেন। অর্থাৎ সাত কারীগণের থেকে শুধুমাত্র একজন কারীকে অনুসরণ করে থাকেন। তাদের কথামত এটা কি শিরক হবে? যাই হোক ইমামের তাকলীদ বা অনুসরণ সাহাবাগণের (রাঃ) যামানা থেকে চলে আসছে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। দুনিয়ার দিক দিয়েও আমরা সাধারণতঃ প্রত্যেক ব্যাপারে ঐ বিষয়ের পারদর্শী লোকদের তাকলীদ বা অনুসরণ করে থাকি। ইচ্ছামত কাজ করি না। যেমন বিল্ডিং তৈরি করতে হলে ইঞ্জিনিয়ারের স্মরণাপন্ন হতে হয়। যে কোন কাজ বুঝতে একজন

নির্দেশক মানতে হয়। তেমনিভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল-দীন । এ দীন তথা কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে সবচেয়ে যারা বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাদের ব্যাখ্যা মেনে নেওয়াটাই তো নিরাপদ। আর মহান আল্লাহ তা'আলা তো সেই নির্দেশই দিয়েছেনঃ "তোমরা না জানলে, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর।" এছাড়া বিভিন্ন হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাবিরে সাহাবাগণের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইমামগণের মতামত বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত কুরআন হাদীসের ব্যাখ্যা দেয়া এবং মাযহাব মানাকে অস্বীকার করা শরী'আতের মধ্যে মারাত্মক বিদ'আত বলে আহলে হকগণ উল্লেখ করেছেন। কারণ, কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ৫৪২ হিজরীর পর হয়েছে। বরঞ্চ অনেকে তো তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মধ্যে গণ্য হওয়া দীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার রাস্তা বা মাধ্যম হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং তাদের নিজেদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলে দাবী করা অবান্তর। মোদ্দাকথা, ফকীহ সাহাবাগণের তাকলীদ স্বয়ং অন্যান্য সাহাবাগণ করে গেছেন। ঐ সব ফকীহ সাহাবাগণের সমস্ত ফাতাওয়া ও আলোচনার বিবরণ-সারবস্তু আয়িম্মায়ে মুজতাহিদগণ সংরক্ষণ করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐ সকল ফকীহ সাহাবাগণের বর্ণনার আলোকে বুনিয়াদী কানুন ও বিস্তারিত মাসায়িল পেশ করেছেন। সুতরাং ইমামগণের তাকলীদ প্রকৃতপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ ও ফকীহ সাহাবাগণের ব্যাখ্যারই তাকলীদ বা অনুসরন। এটা কখনও ঐসব উলামাগণের ব্যক্তিত্বের তাকলীদ নয় যে, তাকে শিরক গণ্য করা হবে। যদি তা শিরক সাব্যস্ত হয়, তবে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের জনসাধারণতো তাদের উলামাগণের কথামতই সব আমল করে থাকেন। সরাসরি কুরআন-হাদীস বুঝার ক্ষমতা নিশ্চয় তাদের নেই। তাহলে তাদের দৃষ্টিতে তারা নিজেরাই কি শিরকের শিকার গণ্য হবেন না। আহলে

{পৃষ্ঠা-১৪৬}

হাদীস দাবীদাররা প্রায় মাযহাব ওয়ালাগণের ব্যাপারে কটাক্ষ ও বিরূপ সমালোচনা করতে থাকেন। যা কোন শরীফ সম্ভ্রান্ত লোকের শান নয়। অপরদিকে হানাফীগণ একান্ত নিরুপায় হয়ে তাদের ভুল তথ্যের জবাব দিতে বাধ্য হন।

হাদীসের সাথে হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের নামাযের সামঞ্জস্য না থাকার অভিযোগ ভিত্তিহীন, অবান্তর ও তাদের স্থূলদৃষ্টির পরিচায়ক। কেননা, সহীহ বিশুদ্ধ একাধিক হাদীসে রফ'য়ে ইয়াদাইন একবার শুধু তাকবীরে তাহরীমা করার সময় উল্লেখ আছে। অনেক সহীহ হাদীসের ইমামের পিছনে কিরাআত বা সূরাহ ফাতিহা পড়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর নামাযে আমীন নিঃশব্দে পড়েছেন বলে উল্লেখ আছে। এ সম্পর্কে কতিপয় হাদীস শরীফ নিম্নে উদ্ধৃত হলঃ

(ক) "হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা) বলেন- (নামাযের মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন- তোমাদের কি হল যে, তোমাদেরকে দেখতে পাচ্ছি-তোমরা রফ'য়ে ইয়াদাইন করছ দুর্দান্ত ঘোড়ার লেজের ন্যায় ? নামাযের মধ্যে শান্ত ও ধীর হও। [প্রমাণঃ সহীহ মুসলিম, ১ : ১৮১ # সুনানে আবূ দাউদ, ১ : ১০৯ # সুনানে নাসায়ী ১ : ১১৭]

(খ) "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নামায সম্পর্কে অবগতি দেবো না ? একথা বলে তিনি নামায পড়ে দেখালেন এবং

নামাযের তাকবীরে তাহরীমার সময় একবার রফ'য়ে ইয়াদাইন করলেন (দুহাত উত্তোলন করলেন) । নামাজের আর কোথাও তিনি রফ'য়ে ইয়াদাইন করলেন না। [প্রামাণঃ সুনানে নাসায়ী, ১: ১১৭]

(গ) "হযরত আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) বলেন নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে ওয়ায-খুতবাহ শুনিয়েছেন। আমাদের জন্য সুন্নাত তরীকা বর্ণনা করেছেন এবং আমাদেরকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- তোমরা স্বীয় কাতার সমূহ সোজা কর। অতঃপর তোমাদের একজন তোমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তোমরাও তাকবীর বলবে। আর তিনি যখন কিরাআত পড়বেন, তখন তোমরা চুপ থাকবে।

[প্রমাণঃ সহীহে মুসলিম, ১: ১৭৪ # সুনানে আবু দাউদ, ১: ১৪০]

(ঘ) হযরত জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- যার ইমাম আছে, সেই ইমামের কিরাআতই তার কিরাআত। [প্রমাণঃ সুনানে ইবনে মাজাহ, ৬১]

(ঙ) হযরত 'আলক্বামা ইবনে ওয়াইল (রাঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা শেষ করলেন তৎপর বললেন-আমিন। তখন আমীন আস্তে বললেন। [তিরমিযী]

{পৃষ্ঠা-১৪৭}

এখানে কতিপয় দৃষ্টান্ত পেশ করা হল । এরূপে হানাফীগণের প্রত্যেক আমলের মূলেই সহীহ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব ত্বাহাবী শরীফ হানাফী মাযহাবের অনুসরণীয় হাদীস সমূহ দ্বারাই সমৃদ্ধ। এতে বুঝা গেল-হানাফীগণের নামাযের প্রত্যেকটা আমল সহীহ রিওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত জানতে চাইলে, "নসবুর রায়াহ" ,"আওজাযুল মাসালিক", "ই'লাউসসুনান" প্রভৃতি কিতাব সমূহ দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِى صَلاَتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ «إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ............فقال هو صحيح يعني وإذاقرأ فانصتوا فقال هو عندي صحيح. (صحيح مسلم - (2 / 15)931)

ইজমা, ক্বিয়াস পরিত্যাগ করে কেবলমাত্র কুরআন-হাদীসের অনুসরণ করা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র কুরআন ও হাদীস মান্য করে এবং সে অনুসারে আমল করে। আর ইজমা-ক্বিয়াসের ক্ষেত্রে নিজের বিবেককে প্রাধান্য দেয়, তাহলে ব্যাপারটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে?

জবাবঃ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। কুরআন ও হাদীসে প্রতিটি বিষয়ে সমাধান পাওয়া যায়। এমন কোন বিষয় নেই, যার সমাধান কুরআন-হাদীসে নেই। তবে কুরআন-হাদীসে কিছু আহকাম বা বিষয় এমন রয়েছে, যেগুলো বুঝতে কারো কোন অসুবিধা হয় না। যারা আরবী অর্থ বুঝতে সক্ষম, তারা কুরআন হাদীসের সে সব স্পষ্ট আহকাম ও বিষয়গুলো বুঝতে পারেন এবং সর্বসাধারণও যদি এর বাংলা অর্থ পড়ে বুঝতে চায়, তাহলে তারাও সেগুলো বুঝতে পারবে। এর জন্য কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না বা কারো অনুসরণ-অনুকরণ করার প্রয়োজনও হবে না।

আবার সেখানে এমন কিছু বিষয়ও রয়েছে, যার শুধু দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আর কিছু বিষয় আছে যার একাধিক অর্থ রয়েছে; তার কোন ব্যাখ্যা বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করা হয়নি এবং কুরআন-হাদীসে এমনও কিছু বিষয় রয়েছে, যা বাহ্যিকভাবে পরষ্পর বিরোধী বুঝা যায়; কিন্তু বিস্তারিত ব্যাখ্যা করলে তাতে কোন বিরোধ থাকে না। এগুলোর সমাধানের জন্য হয়তো প্রত্যেকে নিজের জ্ঞান অনুযায়ী ফায়সালা বা সমাধান করে সে অনুযায়ী আমল করবে।

{পৃষ্ঠা-১৪৮}

অথবা নিজেরা কোন ফায়সালা না করে আমাদের পূর্বসূরী মুজতাহিদীন (যাঁদের কুরআন ও হাদীসের সার্বিক বিষয়ে গভীর জ্ঞান ছিল) এ সমস্ত বিষয়ের কি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এগুলোর কি সমাধান দিয়েছেন, সে ফায়সালা অনুযায়ী আমল করবে। এ দুটির যে কোন একটি পথ অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। তবে স্মরণীয় বিষয় হল, এসমস্ত বিষয়ের নিজে নিজে সমাধান বের করে আমল করা আমাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। কারণ, কুরআন-হাদীসের সার্বিক বিষয়ের ইলম আমাদের নেই এবং ইজতিহাদ করে সমাধান বের করার মত যোগ্যতাও আমাদের নেই।

সুতরাং মুজতাহিদীনের পদাংকানুসরণ আমাদের করতে হবে। আর এ ব্যাপারে তাদের অনুসরণ মূলত কুরআন-হাদীস তথা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলেরই অনুসরণ করার নামান্তর। কুরআন-হাদীসে মুজতাহিদীনে কিরামের অনুসরণ করার নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-"তোমরা আহলে যিকিরদের কাছে জিজ্ঞাসা কর; যদি তোমাদের জানা না থাকে।"

অর্থাৎ যারা বিধি-বিধানের জ্ঞান রাখে না তারা, যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিবে এবং তাদের কথামত আমল করবে।

অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "তোমরা আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল এবং তোমাদের মধ্যে যারা উলূল আমর, তাদের অনুসরণ কর।" [সূরা নিসাঃ ৫৯]

বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ), জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এবং বিশিষ্ট তাফসীরকারগণ উক্ত আয়াতে "উলূল আমর" -এর দ্বারা উদ্দেশ্য মুজতাহিদ ইমাম বলে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, যেসব বিধান কুরআন-হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই অথবা যেগুলো কুরআনী আয়াতে বা হাদীসে বাহ্যতঃ পরষ্পর বিরোধী বলে মনে হয় সেসব বিধি-বিধান এর ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সাধারণ লোক থেকে শুরু করে নিজে মুজতাহিদ নয়-এমন আলিমের জন্য একজন মুজতাহিদের অনুসরণ করা জরুরী।

ব্যক্তিগত অভিমতের (কিয়াসের) ভিত্তিতে একটি আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করা এবং অন্য আয়াত বা হাদীসকে বর্জন করা ও তার উপর আমল ছেড়ে দেয়া তাদের জন্য বৈধ হবে না।

কেননা, কুরআন-সুন্নাহ এ যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে উল্লেখ নেই, সেগুলো কুরআন-সুন্নাহের বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা হয়েছে। আর এই মহান কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন এমন মুজতাহিদীন যারা আরবী ভাষায় ও কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত দক্ষতাসম্পন্ন। তাদের

{পৃষ্ঠা-১৪৯}

আল্লাহ ভীতি ও পরহেযগারী ছিল বর্ণনাতীত। এসব যোগ্যতা, দক্ষতা ও মর্যাদার বিষয় বিবেচনা করে উলামায়ে কিরাম প্রসিদ্ধ চারজন ইমামকে অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে মনোনীত করেছেন।

কেননা আল্লাহ তা‘আলা তাঁদেরকে নবুওয়াত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবেয়ীগণের সংসর্গের বরকতে শরী‘আতের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বুঝার বিশেষ জ্ঞান দান করেছেন। বর্ণিত বা স্পষ্ট বিধানের উপর যা বর্ণিত হয়নি বা অস্পষ্ট রয়েছে, সেগুলোকে কিয়াস করে শরী‘আত সম্মত নির্দেশ বা বিধান বের করার মত অসাধারণ যোগ্যতা দান করেছিলেন। একারণেই পরবর্তীতে বড় বড় আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহগণও আরবী ভাষা ও শরী‘আত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তারা ইজতিহাদী মাসআলার ব্যাপারে সর্বদা উপরোক্ত ইমামগণের অনুসরণ করে গেছেন।

সুতরাং বর্তমান যুগে আলিমদেরকেও ইজতেহাদী মাসআলার ব্যাপারে যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ করা অপরিহার্য কর্তব্য। ইমামগণের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা বৈধ হবে না। কেননা, বর্তমানে ইলমের গভীরতা অনেকগুণ হ্রাস পেয়েছে। এমনিভাবে তাকওয়া, পরহেযগারী ও খোদাভীতিও পর্যায়ক্রমে বিদায় নিচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ইমামদের অনুসরণ না করে দীনের উপর টিকে থাকা বা চলা সম্ভবপর নয়।

এমন মুহূর্তে নির্দিষ্ট একজনের অনুসরণ না করে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন জনের অনুসরণ করাও বৈধ হবে না। কারণ, এ অনুমতি থাকলে মানুষ প্রবৃত্তি বা স্বার্থের অনুসারী হয়ে যাবে। যেখানে যার দ্বারা তার স্বার্থসিদ্ধী হবে, সে বিষয়ে তাকেই অনুসরণ করবে। কাজেই চার ইমামের যে কোন একজন ইমামের অনুসরণ করার উপর উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে একজনকে অনুসরণ করে বাকী ইমামদেরকে হক বা সত্য বলে মেনে নিতে হবে।

সুতরাং আজ যারা কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার দাবী তুলে কারো অনুসরণ করা জরুরী মনে করছে না বা কারো অনুসরণ করাকে শরী‘আত বিরোধী মনে করে, তারা বিভ্রান্তিতে রয়েছে। আর দীনের নামে তারা মূলতঃ তাদের কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে এবং ভ্রান্ত মতবাদ মানুষের মাঝে ছড়ানোর প্রয়াস চালাচ্ছে। এদের থেকে সকলের সতর্ক থাকা একান্ত কর্তব্য।

واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه وما صححوه كما افتوا في حياتهم. (الدر المختار:77/1)

[প্রমাণঃ সূরা নিসা আয়াত নং ৫৯ : ৫৯-৭৫ # তাকলীদ কী শরয়ী হাইসিয়্যাত, ১৬-২৫ # ফাতাওয়া শামী, ১ : ৭৭]

{পৃষ্ঠা-১৫০}

এক ভন্ড পীরের উদ্ভট বিশ্বাসের জাওয়াব ও তার কিছু বিদ‘আতী বক্তব্য সম্বন্ধে শর‘ঈ সমাধানের আবেদন জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় এক লোক আছে তাকে সবাই ভান্ডারীর নেতা ডাকে। ঐ লোক নামায পড়ে না। নিম্নলিখিত কথা বলে।

১। আমাদের নবী কিতাবী নবী না।

২। যিকির দ্বারা কলব জারী করলে নামায পড়া লাগে না।

৩। দুরূদ ও যিকির দ্বারা রহমত হাসেল করতে পারলে ঐটাই নামায।

৪। নামায যিকির দুরূদ সবই ফরয।

৫। কা'বা হল ৫টি (১) সেজদাই কা'বা (২) হাক্বি কা'বা (৩) কলবী কা'বা (৪) প্রেম কা'বা (৫) কা'বায়ে কাওসাইন। দয়া করে তার কথাগুলির শর'ঈ সমাধান অতি সত্তর দিতে মর্জি হয়।

জবাবঃ (১) "আমাদের নবী কিতাবী নবী না" এই কথার অর্থ যদি এই হয় যে, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপরে কোন কিতাব নাযিল হয় নাই। (নাঊযুবিল্লাহ) অথবা যা নাযিল হয়েছে তা কিতাব নয়। এরূপ কথা যে বলবে বা বিশ্বাস করবে সে কুরআনের অসংখ্য আয়াতকে অস্বীকারকারী হবে। আর কুরআনের যে কোন একটি আয়াত কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যায়। আর যে একাধিক আয়াত অস্বীকার করে তার অবস্থাতো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর উপর কুরআন নাযিল করা হয়েছে এ সম্পর্কে কুরআনের কয়েকটি আয়াত রয়েছে। মহান রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ
করেনঃ..

অর্থঃ আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ে বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের মন্দ কর্ম সমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করে দেন। [সূরা মুহাম্মদঃ ২]

অন্যত্র মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- ....

অর্থঃ পরম কল্যাণময় তিনি, যিনি তার বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি ফুরকান তথা কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হন। [সূরা ফুরকান আয়াতঃ ১]

অন্যত্র আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন- .... অর্থঃ এ কিতাবের অবতরণ বিশ্ব পালনকর্তার নিকট থেকে। এতে কোন সন্দেহ নেই। তারা কি বলে এটা মিথ্যা রচনা করেছে ? বরং এটা আপনার পালনকর্তার পক্ষ হতে সত্য। যাতে আপনি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন, যাদের কাছে আপনার পূর্বে কোন সতর্কবাণী আসেনি। সম্ভবতঃ এরা সুপথ প্রাপ্ত হবে। [সূরা সিজদাহঃ ১-২]

{পৃষ্ঠা-১৫১}

(২) "যিকির দ্বারা কলব জারী করলে নামায পড়া লাগে না" এটাও একটা কুফরী কথা। কারণ, প্রত্যেক মুসলিম সাবালক নারী-পুরুষের উপর নামায ফরয। সুতরাং তা অস্বীকার করা কুফরী। স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। সুতরাং ঐ ভান্ডারীর কাছে আমাদের প্রশ্ন যে, তাদের কলব কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কলবের চেয়ে বেশী জারী হয়ে গেল ? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এক ওয়াক্ত নামাযও বাদ দেন নাই। এমনকি অসুস্থ অবস্থায় হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর কাঁধের উপর ভর করে মসজিদে গমন করেছেন। হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাঃ) বর্ণনা করেন ইন্তেকালের চারদিন পূর্বে বৃহস্পতিবার যখন যোহরের নামাযের সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- তোমরা পানি ভরা সাত মশক আমার মাথার উপর ঢাল। হযরত আয়িশা (রাঃ) বলেন আমরা পানি ঢালতে আরম্ভ করলাম। তিনি তখন হাতের ইশারায় ক্ষান্ত করতে নির্দেশ দিলেন। তখন আমরা পানি ঢালা বন্ধ করলাম। অতঃপর তিনি হযরত আলী ও হযরত আব্বাস (রাঃ)- এর কাঁধের উপর ভর করে মসজিদে গেলেন। তখন তিনি পায়ের উপর ভর করতে পারছিলেন না। মাটির উপর তার পদদ্বয় হেঁচড়ে যাচ্ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তার দিল বা কলব জারী হলো না ? তিনি ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত নামায পড়লেন। আর এই ভান্ডারী সাহেবের এবং তাঁর অনুসারীদের কলব এতই উন্নত যে, তাদের কলব জারী হয়ে গেছে। এখন তাদের নামায লাগে না। তাদের এ ধরনের কথাই তাদের গোমরাহ হওয়ার বড় দলীল। [প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ২ : ৬৩৯]

(৩) দুরূদ আর যিকির পৃথক দু'টি ইবাদত। এ দুটির দ্বারা রহমতও হাসিল হয় বটে, কিন্তু এ দুটি দ্বারা রহমত হাসিল করতে পারলে নামায হয়ে যাবে, এটা নিঃসন্দেহে কুফরী কথা। বরং "নামায", দুরূদ ও যিকিরের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বতন্ত্র ফরয। যার ধরণ এবং বিস্তারিত হুকুম আহকাম আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দিয়ে কার্যতঃ বাতলে দিয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আলিমুল গায়িব। তিনি জানতেন যে, এমন কিছু ভন্ডের আবির্ভাব ঘটবে। যারা নামাযকে বিকৃত করে ফেলবে । তাই নামায ফরয হওয়ার পর হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে নামাযের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। ২ দিনে ১০ ওয়াক্ত নামায হযরত জিব্রাঈল (আঃ) রাসূলকে দেখিয়েছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ে সাহাবাদেরকে দেখিয়ে বলেছেন, তোমরা এরূপভাবে নামায পড় যেরূপভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখ। তাই তো এক সাহাবী নামাযের মধ্যে রুকূ-সিজদা একটু তাড়াতাড়ি করেছিলেন বলে

{পৃষ্ঠা-১৫২}

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন- তুমি আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামাযই পড় নাই। রুকূ-সিজদায় সামান্য ত্রুটি হলে যখন নামায হয় না তাহলে শুধুমাত্র দুরূদ আর যিকিরের দ্বারা নামায হয় কিভাবে ? এই সমস্ত ভন্ডদের উপর কি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর চেয়ে বেশী রহমত নাযিল হয় ? যিকির ও দুরূদের দ্বারা রহমত হাসিল করাই নামায। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবা কেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও বুযুর্গানে দীন কেউ বুঝলেন না। শুধুমাত্র এই সমস্ত ভন্ডরাই বুঝল ?

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১ : ৫৯, ৭৫]

(৪) হ্যা, নামায যিকির-দুরূদ সবগুলো ফরয। তন্মধ্যে নামায এমন ফরয যার মধ্যে যাকির-দুরূদও রয়েছে। নামায পড়লে যিকির-দুরূদের ফরযও আদায় হয়ে যাবে। এরপর পৃথকভাবে যিকির ও দুরূদের আমল সাওয়াবের কাজ বটে তবে ফরয নয়। আর নামায না পড়ে শুধু দুরূদ ও যাকির করতে থাকলে নামাযের ফরয আদায় হবে না। বরং নামায তরক করে যিকির করতে তাকলে উল্টা গুনাহ হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- অর্থাৎ, যে নামায তরক করল সে কুফরী করল।

(৫) "কা'বা ৫টি" কথাটি নিরেট মূর্খতা প্রসূত। যার প্রামাণ .... কে .... কা'বায়ে কাওছাইন বলা। শরী'আতে এমন বেহুদা কথার কোন ভিত্তি নেই। [প্রমাণঃ সূরা বাকারা ৪৩, ১১০,২৯৯ # সূরা আল ইমরান ৪১ # মিশকাত ১ : ৫৮ # শামী ১ : ৫১৮]

খোমেনী ও শিয়া ইছনা আশারিয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমি শুনেছি ইরান বিপ্লবের রাহবার আয়াতুল্লাহ খোমেনী ও তার দল ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় নাকি কাফের, তারা নাকি হযরত আলীকে শেষ নবী মনে করেন ? তাদের নাকি অনেক কুফরী আকীদা রয়েছে, এসব কথা কতটুকু বাস্তব ?

জবাবঃ ইরানের ইসলামী বিপ্লবের নেতা "খোমেনী" শিয়া ইমামিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম শাখা দল ইছনা আশারিয়া এর একজন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মীয় নেতা। খোমেনী ও তার ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের অনেক কুফরী আকীদা রয়েছে। তবে আলী (রাঃ) কে সরাসরি শেষ নবী মনে করার আকীদা শিয়াদের অপর একটি দলের, যারা আলাবিইয়্যাহ নামে পরিচিত। খোমেনী গ্রুপ অবশ্য এ আকীদা পোষণ করে না। আলমিলাল ওয়ান নিহাল নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ১৫৬ পৃষ্ঠায় আলবাহাইয়্যাহ সম্প্রদায়ের এ আকীদার কথা উল্লেখ আছে।

{পৃষ্ঠা-১৫৩}

খোমেনী ও ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের কিছু গোমরাহ ও কুফরী আকীদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো

১. এ সম্প্রদায়ের ভিত্তি হলো ইমামতের আকীদার উপর। ইমামগণ সম্পর্কে খোমেনী লিখেছেন যে, আমাদের ইমামগণের এমন মর্তবা ও পজিশন অর্জিত আছে, যে পর্যন্ত কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও নবী-রাসূলগণও পৌছতে পারেন না। (আল-হুকুমাতুল ইসলামিয়া ৫২)

উক্ত গ্রন্থের অন্য স্থানে লিখেছে যে, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি কণার উপর ইমামগণের আধিপত্য রয়েছে। (প্রাগুক্ত)

২. হযরত শাইখাইন অর্থাৎ আবূ বকর ও উমর (রাঃ) এবং যিননুরাইন হযরত উসমান (রাঃ) এবং অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে খোমেনীর মন্তব্য হচ্ছে- আবূ বকর, উমর আন্তরিক ভাবে মুসলমান ছিলেন না। রাজত্ব ও ক্ষমতা লাভের আশায় কেবল বাহ্যত ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এ উদ্দেশ্য সফল না হলে তারা ইসলামের বিরুদ্ধেই দল তৈরি করে ফেলতেন। এবং ইসলামের শত্রু হয়েই মাঠে নামতেন। (কাশফুল আসরার ১১৩/১১৪)

তার মতে আবূ বকর, উমর কুরআনের বহু আয়াতের সরাসরি বিরোধিতা করেছেন এবং নিজেদের পক্ষ থেকে হাদীস বানিয়ে বর্ণনা করেছেন। (কাশফুল আসরার ১১৩/১১৪)

সে হযরত উসমান (রাঃ) এবং মুয়াবিয়া (রাঃ) কে যালিম ও দুশ্চরিত্র বলে আখ্যা দিয়েছে।

৩. শিয়াদের একজন ইমাম উচ্চ পর্যায়ের মুজতাহিদ বাকের মজলিসী, যার পুস্তকসমূহ পাঠ করতে স্বয়ং খোমেনী কাশফুল আসরারের ১২১ পৃষ্ঠায় পাঠকগণকে অনুরোধ জানিয়েছেন। এই মজলিসী নিজ কিতাবে লিখেছে যে, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা ও হাফসা মুরতাদ এবং তারা দুজনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষপানে শহীদ করেন। (হায়াতুল কুলূব ৭৪৫)

বাকের মজলিসীর মতে তিনজন ব্যতীত সকল সাহাবা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিলেন। সে তিনজন হলেন, সালমান ফারসী, মিকদাদ ও আবূ যর। (হায়াতুল কুলূব ২ : ৮৩৭)

৪. শিয়া ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের বহু কুফরী আকিদার মধ্যে একটি হচ্ছে-কুরআন পরিবর্তনের আকিদা। বাকের মজলিসী (যার কিতাব পাঠের জন্য খোমেনী অনুরোধ জানিয়েছে) নিজ গ্রন্থে লিখেছে যে, কুরআনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত দুই হাজারেরও বেশী রেওয়ায়েত রয়েছে, সেগুলো মশহুর পর্যায়ের। (ফসলুল খেতাব ২২৭)

{পৃষ্ঠা-১৫৪}

খোমেনী ও তার ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায়ের এ সকল ভ্রান্ত আকীদার মাধ্যমে কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মুতাওয়াতিরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। একারণে প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কিরামগণ শিয়া ইছনা আশারিয়া

ফেরকাকে কাফির বলে ফাতাওয়া দিয়েছেন। যেমন- ইবনে তাইমিয়া হাম্বলী, কাজী ইয়াজ মালেকী, বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী, কামাল ইবনে হুমাম হানাফী, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী, শাহওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দীসে দেহলবী এবং মুফতী মাহমূদ দেওবন্দী (রঃ) প্রমূখ উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা খোমেনী ও ইছনা আশারিয়া উল্লেখিত বাতিল আকীদাসমূহের কারণে কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে উম্মাতের দৃষ্টিতে ইছনা আশারিয়া সম্প্রদায় ইসলাম থেকে খারিজ এবং ইরানের বিপ্লব কোন ইসলামী বিপ্লব নয়। বরং সেটা নির্ভেজাল শিয়া বিপ্লব।

আমরা তাদের ভ্রান্ত আকিদাসমূহ হতে মাত্র হাতেগোনা কয়েকটি আকীদা উল্লেখ করেছি। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন

হেদায়াতুশ শিয়া, লেখকঃ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রঃ)

ইরানী ইনকেলাব ইমাম খোমেনী ও শিয়া মতবাদ, লেখকঃ আল্লামা মনযূর নোমানী। মাওলানা মুহিউদ্দীন খান কর্তৃক অনুদিত।

জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, লেখকঃ মুফতী আব্দুস সালাম সাহেব চাটগামী, ১ : ৩৬৮-৫০৫।

তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া, লেখকঃ শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী (রঃ)

(ফাতাওয়া শামী ৬ : ৩৭৮, ফাতহুল কাদীর ১ : ৩০৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ২ : ২৬৪, আল ফছল লি-ইবনে হাযাম ২ : ৭৮)

الرَّافِضِيُّ إذَا كَانَ يَسُبُّ الشَّيْخَيْنِ وَيَلْعَنُهُمَا وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ،...... وَلَوْ قَذَفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِالزِّنَا كَفَرَ بِاَللَّهِ،........ مَنْ أَنْكَرَ إمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَهُوَ كَافِرٌ،......... وَيَجِبُ إكْفَارُ الرَّوَافِضِ فِي قَوْلِهِمْ بِرَجْعَةِ الْأَمْوَاتِ إلَى الدُّنْيَا،...... وَبِقَوْلِهِمْ فِي خُرُوجِ إمَامٍ بَاطِنٍ وَبِتَعْطِيلِهِمْ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إلَى أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ الْبَاطِنُ وَبِقَوْلِهِمْ إنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَلِطَ فِي الْوَحْيِ إلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُونَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَهَؤُلَاءِ الْقَوْمُ خَارِجُونَ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامُهُمْ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ . (الفتاوى الهندية:264/2)

{পৃষ্ঠা-১৫৫}

প্রচলিত গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের বিধান

জিজ্ঞাসাঃ গণতন্ত্র একটি কুফুরীতন্ত্র, একথা সর্বস্বীকৃত। সে মতে বর্তমানে আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি যাদের গণতন্ত্রের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে। এই ভিত্তিতে তাদেরকে কাফির বলা যাবে কিনা ? এবং সে সমস্ত দলগুলিকে ভোট দেয়া জায়িয হবে কিনা ? যদি ভোট দেয় তাহলে গণতন্ত্রের সমর্থন করার কারণে তাদেরকে কাফির বলা যাবে কিনা ? গণতন্ত্র যে কুফরী ঐ বিষয়ে কুরআন হাদীসের আলোকে প্রমাণ জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ গণতন্ত্রের দু'টি দিক রয়েছে (এক) গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা (দুই) গণতান্ত্রিক কর্মসূচী।

(এক) গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা

গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় জনগণকে ক্ষমতার মূল উৎস মনে করা হয়। সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে জনতার যে কোন সিদ্ধান্ত এ মন্ত্র মতে চুড়ান্ত ও অপরিহার্য। এক কথায় সংখ্যাগরিষ্ঠের মতকে (নাঊযুবিল্লাহ) খোদায়ী ফয়সালার স্থান দেয়া হয়, যার কোন সিদ্ধান্তই অগ্রাহ্য করা যাবে না।

শরী'আতের দৃষ্টিতে এসব চিন্তাধারা সবই হল কুফরী চিন্তাধারা। যে ব্যক্তি বুঝে শুনে এসবের প্রতি আস্থাশীল হয় তার ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল আশংকা রয়েছে। অবশ্য কেউ যদি গণতন্ত্রের এসব মূলমন্ত্র না

জেনে অপরের দেখাদেখি গণতন্ত্রকে সমর্থন করে তাহলে সে কুফরী তন্ত্রের সমর্থনকারী হিসাবে মারাত্মক গুণাহগার হবে।
পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের মূল মন্ত্রগুলো কুফরী হওয়ার প্রমাণ হল যে, এগুলো কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল।
আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, {ان القوة لله جميعا} "নিশ্চয়ই সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই।" (সূরা বাকারা ১৬৫)

অন্যত্র ইরশাদ ফরমান :, "{ان الحكم الا لله} আল্লাহ তা'আলাই বিধানদাতা।" (সূরা ইউসুফ ৪০)

অপর আয়াতে ইরশাদ করেন, "নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার নিকট ধর্ম একমাত্র ইসলাম।" (সূরা আল ইমরান) আরো ইরশাদ হচ্ছে,
{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران : 85]

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম তালাশ করে (গ্রহণ করে) কস্মিনকালেও তা মেনে নেয়া হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্থ।" (আল-ইমরান ৮৫)
{পৃষ্ঠা-১৫৬}
অন্য আয়াতে ঘোষিত হচ্ছে,
{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب : 36]

"আল্লাহ ও তার রাসূল কোন বিষয় নির্ধারণ করলে, কোন ঈমানদার নর-নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন মত অবলম্বনের অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" (সূরা আহযাব ৩৬)

(দুই) গণতান্ত্রিক কর্মসূচী

(ক) গণতান্ত্রিক রাজনীতির কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হল ভোটের মাধ্যমে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে দেশের উষ্চ দায়িত্বশীল পদের নির্বাচন।

শরী'আতের দৃষ্টিতে গণভোটের এ পদ্ধতি সম্পূর্ণ অসার ও অযৌক্তিক। সুতরাং তা নাজায়িয। কুরআনে পাকের বহু আয়াতে এ পদ্ধতির অসারতা প্রমাণ করতঃ বিরোধিতা করা হয়েছে, যার কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,
[{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام : 116
"আপনি যদি পৃথিবীর অধিকাংশের কথা মেনে নেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে দিবে। তারা কেবল অলিক কল্পনার অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক কথা বলে।" (সূরা আল-আনআম ১১৬)

অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,
{وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} [يونس : 36]
"তাদের অধিকাংশই শুধু অনুমানের উপর চলে, অথচ অনুমান সত্যের মোকাবেলায় কোন কাজেই আসে না। (সূরা ইউনুস ৩৬)

অপর আয়াতে বলেন, "আপনি বলে দিন, অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয় যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে বিস্মিত করে।" (সূরা আল-মায়িদা ১০০)

উক্ত আয়াত সমূহের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, জনগণের অধিকাংশ হবে মূর্খ, বোকা ও দায়িত্বহীন। আর প্রচলিত গণতন্ত্রে এদের অধিকাংশ রায়ের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সুতরাং তা নিশ্চিতভাবে ভুলই হবে। সুতরাং বাছ-বিচার ছাড়া সংখ্যাধিক্যকে মাপকাঠি বানালে তা সুনিশ্চিতভাবে ভ্রষ্ট হবে। বর্তমানে তাই হচ্ছে। তবে যেহেতু প্রতিনিধি নির্বাচনের উক্ত নাজায়িয পদ্ধতি এদেশ থেকে ইংরেজ বিতারণের সময় ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে কৌশলে আমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টা ছাড়া ব্যক্তি বিশেষের জন্য এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মুশকিল ব্যাপার। সেজন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক না হয়ে শুধু ভোটের সময় প্রার্থীদের মাঝে তুলনামূলক ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলজনক বা এমন লোকের অবর্তমানে কমপক্ষে অন্যের তুলনায় কম ক্ষতিকর প্রার্থীকে ভোট প্রদান করা জায়িয আছে। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় হল সকল সৎ মানুষেরা ভোট প্রদান

{পৃষ্ঠা-১৫৭}

থেকে বিরত থাকলে অসৎ লোকেরা অসৎ প্রার্থীকেই নির্বাচন করে নিবে। তখন সকলেরই অসৎ লোকের ফেতনায় পড়তে হবে। তখন ইসলামের আরো বেশী ক্ষতি হয়ে যাবে।

তাছাড়া এ পদ্ধতি ভুল হলেও ভোট প্রদান মূলত সাক্ষ্য প্রদান করা, আর ন্যায়ের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করা জরুরী, তাই উযর ছাড়া যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দান হতে বিরত থাকলে গুনাহ হবে।

যারা গণতান্ত্রিক ভোট পদ্ধতিকে ইসলাম সম্মত নয় জেনেও প্রয়োজনের খাতিরে তুলনামূলক সৎ কোন প্রার্থীকে ভোট দেবে তাদেরকে কাফির বা ফাসিক কিছুই বলা যাবে না বরং নিজেরাও এসব ক্ষেত্রে ভোট দান হতে বিরত না হওয়া উচিত।

(খ) গণতন্ত্রের অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মিছিল, মিটিং, সভা-সেমিনার, প্রচার-বিজ্ঞাপন, বিবৃতি, হরতাল, বয়কট, অনশন, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদি।

এসবের মধ্য হতে প্রচলিত হরতাল ও মিথ্যা বিবৃতি এবং আমরণ অনশন শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয নেই। এছাড়া অন্যসব কর্মসূচি মূলত বৈধ। তবে যদি নিছক দলীয় ও নেতৃত্বের লোভে করা হয় তাহলে তা জায়িয হবে না। তেমনিভাবে কাউকে বা জনগণকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া না হয় কিংবা তাদের আর্থিক ক্ষতি করা না হয় বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সম্মতিতে পালন করা হয় তাহলে তা সম্পূর্ণ জায়িয। বরং যে মুসলমান মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এতে শরীক হবে সে সওয়াবের ভাগী হবে। এক্ষেত্রে সকলের যার যার সাধ্যানুযায়ী সহায়তা বা সমর্থন করা চাই উল্লেখ্য যে, গণতন্ত্র সহ ঈমান বিধ্বংসী অন্যান্য বাতিল মত ও বিশ্বাস সম্পর্কে জানার জন্য মুফতী মাওঃ মনসূরুল হক সাহেবের প্রণীত কিতাবুল ঈমান পড়ুন। ইনশাআল্লাহ ঈমান-আমল হিফাজতে বড় সহায়ক হবে। [আহসানুল ফাতাওয়া ৬ : ২৪ # জাওয়াহিরুল ফিকহ ১ : ৩৬ # ফিকহী মাকালাত ২ : ২৮৬]

ان الحكم الا لله: إن المبتدأ الأول من ميادي الاحكام السياسية للاسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا الكون إنما هو لله سبحانه وتعالى وهو احكم الحاكمين........ وإن هذا المبتدأ هو الذي يميز النظام السياسي الاسلامي من كل من الديموقراطية والدكتاتورية, فإن الديموقراطية تفوض الحكم إلى الشعب دون أي قيد.

إن نصب الخليفة أو الامام يكون في الاسلام من قبل أهل الحل والعقد. فليست الخلافة وراثة كما في الأمبراطورية. ولا مبنية على أساس القوة العسكرية كما في الدكتاتورية الفاشية, ولا مفوضة إلى رأي الجهال الحمقي كما في الديموقراطية الحديثية. وإنما هي مفوضة إلى اهل العلم والخبرة والتجربة الذين لهم عقل ورأي في الأمور الاجتماعية. (تكملة فتح الملهم:273/3)

{পৃষ্ঠা-১৫৮}

অপসংস্কৃতি

টেলিভিশনে ইসলামী গান-গযল ও খবর শোনা

জিজ্ঞাসাঃ মাসিক মুজাহিদ বার্তা অক্টোবর '৯৯ সংখ্যায় ২৭ নং প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন, বাদ্য ব্যতীত ইসলামী গান, গযল ও খবর রেডিওতে পরিবেশন ও শুনা যাবে। টেলিভিশনে মহিলা ব্যতীত পরিবেশিত খবর ও ইসলামী অনুষ্ঠান ও শিক্ষামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখা যাবে। অথচ মাসিক রাহমানী পয়গাম অক্টোবর '৯৯ সংখ্যায় লিখেছেন কোন অবস্থায়ই টেলিভিশনের কোন অনুষ্ঠান দেখা জায়িয হবে না। সঠিক উত্তর জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মুজাহিদ বার্তায় যে টেলিভিশনের কথা বলেছে তা আজ কোথায় আছে? স্যাটেলাইট ও ইন্টারনেটের এ যুগে মুজাহিদ বার্তার মাসআলা কল্পনা বিলাস ছাড়া আর কি হতে পারে। তাছাড়া টিভি দেখা না জায়িয হওয়ার উল্লেখযোগ্য একটি কারণ হল ধারণকৃত প্রাণীর ছবি। কারণ, শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রাণীর ছবি ধারণ করে রাখা অংকনের নামান্তর। আর ধারণ করা যেমন না জায়িয, তেমনি ইচ্ছাকৃত ভাবে তা দেখাও না জায়িয। কারণ, এতে ছবি দেখার সাথে সাথে হারাম কাজের সহযোগিতা করা হয়। অথচ কিছু খেলাধুলা ছাড়া টিভির প্রোগ্রাম সাধারণত পূর্ব থেকে ধারণকৃতই হয়ে থাকে। সুতরাং সর্বাবস্থায় এটা রাখা ও দেখা হারাম।

সর্বক্ষণ যার মধ্যে চরম বেহায়াপনা সহ হারাম প্রোগ্রাম চলতে থাকে তার মধ্যে সামান্য কিছু সময় ইসলামী প্রোগ্রাম করা দীন অবমাননা এবং দীন নিয়ে ঠাট্টা তামাশার শামিল। এর দৃষ্টান্ত এরূপ যে, নাচ-গানের ফাঁকে-ফাঁকে দীনের নসীহত করা, ওয়াজ করা বা নর্দমা দিয়ে মিষ্টান্ন ভেসে আসা। সুতরাং টিভিতে দীনী প্রোগ্রাম করা নিঃসন্দেহে দীন কে অপমান করা। যা স্বয়ং কুরআনেই নিষেধ করা হয়েছে এবং এটাকে ইয়াহুদীদের চরিত্র বলা হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে টিভিতে দীনী প্রোগ্রাম জায়িয হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

{পৃষ্ঠা-১৫৯}

অবশ্য রেডিওতে গান-বাজনা না শুনে খবর বা কোন বৈধ প্রোগ্রাম শোনা সম্ভব বিধায় শরী'আতে তার অবকাশ আছে। তাও এ শর্তে যে তা ঘরের দায়িত্বশীলগণ সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখবে। নিয়ন্ত্রণহীন ভাবে ঘরে রেখে দিলে এর দ্বারাও ঘরের পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। [প্রমাণঃ তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম ৪ : ১৬৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪ : ২৫৮ # জাওয়াহিরুল ফিক্বহ, ৩ : ৮৪ # ইমদাদুল মুফতীন ৯৯১ # আহসানুল ফাঃ ৮ : ১৭৩]

টেলিভিশন, ভি.সি.আর দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ টেলিভিশন দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কিরূপ গুণাহ এবং টেলিভিশন ঘরে রাখা জায়িয হবে কি ? আর যদি আমি টিভি বিক্রি করে দেই তাহলে ঐ টাকা আমি খরচ করতে পারব কি ?

জবাবঃ (ক) প্রচলিত টিভি, ভিসিআর দেখা বা ঘরে রাখা সম্পূর্ণরূপে নাজায়িয, হারাম ও কবীরা গুণাহ। দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই এসবের মধ্যে বহু ক্ষতি রয়েছে। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য একটি পুস্তক রচনার প্রয়োজন। ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজ সাধারণতঃ এগুলোতে যা কিছু প্রদর্শিত হচ্ছে,

এসবের মাধ্যমে সমাজে হাজারো অপকর্ম ও গুনাহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে পুরো সমাজটাকে ধ্বংস করে মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এসব চরিত্র বিধ্বংসী উপকরণ কোন ঘরে প্রবেশ করলে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, সে ঘর থেকে কালক্রমে দীন-ঈমানের অস্তিত্ব মুছে যেতে বাধ্য। এখানেই শেষ নয়, এর কারণে আমাদের সমাজ থেকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিদায় নিয়ে বিজাতীয় নোংড়া সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যার চরম বিষক্রিয়ায় আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ নির্লজ্জ ও নৈতিকতাহীনতার চরম বিপর্যয়ে নিপতিত হচ্ছে। সার্বক্ষণিক অসংখ্য নোংরামীর মাঝে কখনো এক আধটু ধর্মীয় কিংবা সভ্যতার বাণী প্রচার করা হলেও তা অপবিত্র নোংরা ড্রেনের দুধের প্রস্রবন সদৃশ। সে দুধ যেমন কোন রুচিশীল মানুষ পান করতে পারেনা, তেমনি ওদের এসব প্রচারণা জাতীয় কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। আর এগুলোতে যে চিত্র দেখানো হয় তা মূলতঃ ফিল্মের স্থির চিত্র- যা যন্ত্রের সাহায্যে চলমান করা হয়। আর এ ধরনের ফিল্ম চিত্র ফটোর শামিল। কোন মানুষ বা প্রাণীর ছবি যেমন ঘরে সাজিয়ে রাখা, লটকানো বা প্রদর্শিত করা যায় না। তেননিভাবে এগুলোও নাজায়িয। সুতরাং বাহ্যিকভাবে ভালো কোন অনুষ্ঠান-চিত্র যেমন- সংবাদ, তিলাওয়াত, ওয়ায ও ইসলামী কোন প্রোগ্রাম-চিত্রও টিভিতে দেখা জায়িয নয়। এর দ্বারা গুণাহের কাজে সহযোগিতা করা হয়।
{পৃষ্ঠা-১৬০}

(খ) টিভি, ভিসিআর ইত্যাদি যদিও হালাল পন্থায় তথা অশ্লীল প্রোগ্রাম বা কোন প্রাণীর ছবি না দেখে ব্যবহার করাও সম্ভব। কিন্তু বর্তমানে যেহেতু এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই এবং এগুলো সাধারণতঃ নাজায়িয কাজেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে বরং সাধারণত কোন মানুষের ক্ষেত্রে বৈধ উপায়ে ব্যবহারের আশাও করা যায় না। তাই কোন মুসলমানের জন্য এগুলোর বিক্রি বা মেরামতের ব্যবসা অবলম্বন করা জায়িয নয়। আর যদি কেউ টিভির ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এর থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে এগুলো বিক্রি করে দিতে চায়, তাহলে তার জন্য করণীয় হলো সম্ভব হলে যে কোম্পানী বা দোকান থেকে এ জিনিস ক্রয় করেছিল সেখানে অথবা এ ধরনের যে কোন দোকানে ক্রয় মূল্যে বা তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করে দিবে। অথবা যদি টিভির বিভিন্ন অংশ সমূহ পৃথকভাবে এমনভাবে বিক্রি করে যে, সে ব্যক্তি নিজস্ব যন্ত্রপাতি ও শ্রম যোগ না করে ব্যবহার করতে পারবে না, তাহলে এরও অবকাশ আছে।

اما التلفزيون والفديو فلاشك في حرمة استعمالها بالنظر الى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة من الخلاعة والمجون والكشف عن النساء والمتبرجات او العاريات وما الى ذلك من اسباب الفسوق. (تكملة فتح الملهم:164/4)

[প্রমাণঃ সূরায়ে মায়িদা, ২ # আহকামুল কুরআন (থানভী) ৩ : ৭৮-৮৯ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৮ : ৩০৬ # জাওয়াহিরুল ফিক্বহ ২ : ৪৫৩]

লাশ বা কফিনে ফুল দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে কোন রাজনীতিবিদ বা সরকারী কোন বড় অফিসার মারা গেলে তার লাশ বা কফিনের উপর ফুলের মালা দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়। এটা শরী‘আতের দৃষ্টিতে বৈধ কি-না ?

জবাবঃ মৃত ব্যক্তিকে ফুলের মালা বা তোড়ার মাধ্যমে যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়, শরী‘আতের দৃষ্টিতে তার কোন ভিত্তি নেই। কেন নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন বা কোন বুযুর্গের লাশকে এমন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কোন প্রমাণ নেই। এতে যদি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হতো, তাহলে অবশ্যই নবী-রাসূল ও বুজুর্গানে দীন এর নির্দেশ দিতেন। যেহেতু শরী‘আতে এর কোন অস্তিত্ব নেই, অতএব পরিত্যায্য। মৃত ব্যক্তির জন্য ইস্তিগফার, তিলাওয়াত ও দু‘আয়ে মাগফিরাত করা এবং তার কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে হাজির হওয়া এটাই তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের উত্তম ও একমাত্র পদ্ধতি। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহিমীয়া, ৫ : ৯৮ # ফয়জুল বারী, ১ : ৩১১]

{পৃষ্ঠা-১৬১}

মৃত্যুর পর ধুমধাম করে খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান করা

জিজ্ঞাসাঃ পিতা-মাতা বা আত্মীয়-স্বজনদের মৃত্যুর পর বর্তমানে যে সাক্ষাতকারীদের কয়েকদিন পর্যন্ত খাওয়ানো হয় বা ধুমধাম করে গরীব-ধনী সকলকে দাওয়াত করে খাওয়ানো হয়, শরী'আতে তা জায়িয কি-না ?

জবাবঃ এখানে দু'টি বিষয় লক্ষণীয়, একটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির পরিবার পরিজনকে সান্তনা দিতে বা তাদের প্রতি সমবেদনা জানাতে যারা আসে তাদেরকে মৃত ব্যক্তির বাড়িতেই খানা খাওয়ানো। আর অপরটি হচ্ছে ঈসালে সাওয়াবের নামে অনুষ্ঠান করে লোকদেরকে খাওয়ানো।

প্রথমটির ব্যাপারে শরী'আতের হুকুম হল কারো মৃত্যুর পরপরই তার পরিবার পরিজনদের কাছে যেয়ে তাদের প্রতি সমবেদনা জানানো। বিভিন্ন সান্তনার বাণী শুনানো, এটা বড় সাওয়াবের কাজ। অবশ্য উযর থাকলে বিলম্বেও যেতে পারে। আর সান্তনা সমবেদনা জানাতে যারা আসবে তারা নিজেরাই মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্যে খানাদানা তৈরি করে নিয়ে আসা সুন্নাত।

কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে বদ রুসুম হয়ে গেছে যে, আত্মীয়-স্বজন যারা সান্তনা দেয়ার জন্য আসে তাদেরকে মৃত ব্যক্তির ঘর থেকেই দাওয়াতের ন্যায় খানা পাকিয়ে খাওয়ানো হয়, এটা মাকরূহ ও নাজায়িয। আর ঈসালে সাওয়াবের নামে আমাদের দেশে অনেক গর্হিত কাজ রয়েছে, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিদ'আত ও মনগড়া। নির্দিষ্ট কোন দিন তারিখ, যেমন ত্রিশা, চল্লিশা ইত্যাদি উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সহ ধনী-গরীব সকলের জন্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, টাকার বিনিময়ে কুরআন শরীফ খতম করানো, মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন না করে ইয়াতিমদের সম্পদ থেকে দান-খয়রাত করা ইত্যাদি। এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন ও তাতে যোগদান করা উভয়টাই বিদ'আত ও নাজায়িয।

বরং সাওয়াব রিসানীর সহীহ তরীকা হচ্ছে মৃতব্যক্তির ওয়ারিসগণ ব্যক্তিগতভাবে সাওয়াব পৌছানোর নিয়্যতে সময়ে সময়ে কুরআন খতম করে দু'আ- দরুদ পাঠ করে বা নামায পড়ে সাওয়াব রিসানী করে দিবে। আর যখন যার সামর্থ হয়, নিজের মাল দ্বারা গরীব-মিসকীন, ইয়াতিম-অসহায়দের খানা খাওয়াবে, কাপড়-চোপড়, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দান করবে। আর মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে সদকায়ে জারিয়াহ সহ অন্যান্য নেক কাজ করে তাকে সাওয়াব রিসানী করতে থাকবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৬১ # ফাতাওয়ায়ে শামী ২ : ২৪০]

ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من اهل الميت لانه شرع في السرور لا في الشرور وهي بدعة مستحقة. (فتاوى الشامي:240/2)

{পৃষ্ঠা-১৬২}

গানের উৎপত্তি কোথেকে ? তার হুকুম কি ?

জিজ্ঞাসাঃ গান-বাজনা জায়িয না নাজায়িয ? এসবগুলো কুরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে বেশ খুশী হব।

জবাবঃ গান–বাজনা সম্পূর্ণ নাজায়িয, হারাম ও নিষিদ্ধ। কেননা, গান দ্বারা অন্তরে নেফাক বৃদ্ধি পায় যেমন– পানি দ্বারা ফসল বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গানের দ্বারা অন্তরে যিনার চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং মানুষ বিপথগামী হয়। [প্রমাণঃ সূরা লোকমান, ২ # তাফসীরে আহমদিয়্যাহ ৪০০ পৃঃ # ইমদাদুল মুফতীন, ১০০৩ পৃঃ # দুররে মুখতার মাআশ্ শামী ৬ : ৩৪৯]
دلت المسألة ان الملاهي كلها حران ......قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات.
(الدر المختار:349/6)

ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কোন কিছু ভিডিও করা

জিজ্ঞাসাঃ ইসলাম প্রচারের স্বার্থে কোন প্রাণীর ছবি বা দৃশ্য ভিডিও করে সিনেমা ও টেলিভিশন দ্বারা ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে নাটক/ছায়াছবি করে দেখানো জায়িয আছে কি–না ?

জবাবঃ শরী‘আত যে সমস্ত জিনিসকে হারাম ঘোষণা করেছে, তা সর্বাবস্থায় হারাম। চাই দুনিয়ার কাজের জন্য হোক। চাই দীনের কাজের জন্য হোক। দীনের প্রচারের জন্য আল্লাহ তা‘আলা কোন হারাম কাজের সাহায্য নিতে বলেননি। তাছাড়া হারামের সাহায্যে কোন দিন দীনের প্রচার হতে পারে না। বরং দীনের দাফন হতে পারে। সুতরাং ইসলাম প্রচারের স্বার্থে হলেও কোন প্রাণীর ছবি বা দৃশ্য ভিডিও করা বা তা সিনেমা–টেলিভিশনে দেখানো নাজায়িয। [ইমদাদুল মুফতীন ৯৯১ # ফাতাওয়ায়ে শামী ৬ : ৩৪৯]

শীষ বাজালে, গান গেলে ইবাদত নষ্ট হয় কি–না ?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনলাম– মুখ দিয়ে ইচ্ছাকৃত শীষ বাজালে (গান গাইলে) নাকি তার ইবাদত বন্দেগী কবুল হয় না। কথাটি কতটুকু সত্য ?

জবাবঃ মক্কার কাফেররা শীষ বাঁজানো, তালি দেয়া ইত্যাদিকে ইবাদত মনে করতো। মুসলমানদের জন্য বিধর্মীদের ধর্মীয় ঐতিহ্য এবং রীতি–নীতি অনুসরণ, অনুকরণ করা যেহেতু নাজায়িয, তাই হাতে তালি দেয়া এবং শীষ বাজানো কাফেরদের ধর্মীয় ঐতিহ্য হওয়ার কারণে তা অবশ্যই গোণাহের কাজ।

{পৃষ্ঠা–১৬৩}

অতএব, গোণাহের কাজ (শীষ বাজানো) পরিহার করে তাওবা করা উচিত। তবে এর দ্বারা ইবাদত কবুল হয় না, বা বাতিল হয়ে যায়– এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়। [প্রমাণঃ তাফসীরে কুরতুবী ৭ : ৪০০ # তাফসীরে কাবীর ১৫ : ১৫৯ # তাফসীরে রুহুল মা’আনী ৫ : ২০৩]
وقال ابن عباس كانت قريش تطوف بالبيت عراة يصفقون ويصفرون فكان ذلك عبادة في ظنهم. (التفسير للقرطبي:400/2)

চামচ বা ছুরি দিয়ে খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ চামচ দিয়ে খাদ্য খাওয়ায় কোন দোষ আছে কি ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোও চামচ দিয়ে খাদ্য খেয়েছেন কি–না ? এরূপে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে গোশত খাওয়ার কি হুকুম।

জবাবঃ রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোও চামচ দিয়ে খাদ্য খাননি। তাই বিনা প্রয়োজনে চামচ, কাটা চামচ, ইত্যাদি দিয়ে খাওয়া সুন্নাতের খিলাফ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাত দিয়ে খেতেন। খাওয়ার শেষে আংগুল চেটে পরিষ্কার করতেন। গোশত ইত্যাদি ছুরি দিয়ে না কেটে দাঁত দিয়ে ছিড়ে খাওয়া সুন্নাত। তবে একান্ত জরুরতের বেলায় চামচ দিয়ে খাওয়া বা ছুরি দিয়ে কেটে গোশত খাওয়ার অনুমতি আছে। তবে এক্ষেত্রে বিধর্মীদের সামঞ্জস্য থেকে পরহেয করতে হবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

নিজে কোন কোন সময় ছুরি দিয়ে কেটে গোশত খেয়েছেন। কারণ, গোশত খুবই শক্ত ছিল। দাঁত দিয়ে কাটার উপযোগী ছিল না। [জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, ১৮০ # আলমগীরী, ৫ : ৩৩৭]

ইংরেজী লাইনে পড়া-লেখা ও উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিভংগী

জিজ্ঞাসাঃ ইংরেজী লাইনে পড়া-লেখার ব্যাপারে উলামাদের দৃষ্টিভংগী কি ? এ লাইনে যারা পড়াশুনা করছেন তাদের কি নিয়তে বা কিভাবে পড়াশুনা করা উচিত।

জবাবঃ ইংরেজগণ অত্যন্ত ধূর্ত জাতি। ইংরেজগণ কখনো মুসলমানদের তারাক্কী ও উন্নতি পছন্দ করে না। এজন্য তারা উপমহাদেশে এমন এক সিলেবাস চালু করেছে যা দ্বারা একজন মুসলিম সন্তান কোন ভাবেই বুঝতে সক্ষম না হয় যে, কি তার পরিচয় ? কেন তাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সারা বিশ্বের কল্যাণে কি তার ভুমিকা ? অত্যন্ত সুক্ষভাবে এ সমস্ত বিষয়সমূহ থেকে তাকে একেবারে অন্ধ রাখা হয়। তার যিন্দেগীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ দূরে রেখে পৃথিবীর অন্যান্য কাফির-বেদীনের ন্যায় তার ব্রেনে এ বুঝ সৃষ্টি করা হচ্ছে যে, তুমি এ লাইনে ভালো পড়াশুনা করলে এবং ভালো ডিগ্রি হাসিল করলে বড় বড় চাকুরী ও

{পৃষ্ঠা-১৬৪}

পদ পাবে। এমন কি মন্ত্রী-মিনিস্টারও হতে পারবে। গাড়ী-বাড়ী সহ মহা আরাম-আয়েশে তোমার যিন্দেগী কাটবে। ব্যস, এতটুকুর মধ্যেই তার লেখাপড়া ও কর্মজীবন সীমাবদ্ধ। এর বাইরে তাঁর আর কোন দায় দায়িত্ব নাই। মন্ত্রী-মিনিষ্টার থেকে আরম্ভ করে একজন চেয়ারম্যান ও চাকুরীজীবীর কর্মকান্ডের দিকে লক্ষ্য করলে এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। এক জন এম,পি চিন্তাই করে না যে, তার এলাকার লোকদের ঈমান-আকীদা সম্পর্কে হাশরের ময়দানে তাকে প্রশ্ন করা হবে। কুরআনে কারীম তা'লীমের ব্যাপারে তার কি ভুমিকা ছিল ? এ সম্পর্কে তাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কারণ তারা যে সিলেবাস পড়ে শিক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে এসব কথার কোন আলোচনা নেই। মুসলমান জাতি আল্লাহ তা'লার একমাত্র মনোনীত জাতি এবং আল্লাহ তা'আলার খাস বাহিনী। এদের আর দশটা বেদীন সম্প্রদায়ের ন্যায় আরাম-আয়েশ আর ভোগ বিলাসের জন্য দুনিয়াতে পাঠানো হয় নাই। বরং তাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণের জন্য। পথভ্রষ্ট লোকদের পথের দিশারী হিসাবে। এরই মধ্যে রয়েছে তার ইযযত-সম্মান দুনিয়াতে ও আখেরাতে। ইংরেজদের সিলেবাস সেই চক্ষুস্মান জাতিকে অন্ধ বানিয়েছে। বীরের জাতিকে মেষ শাবক বানিয়েছে। মুসলিম সন্তানকে বেদীনদের অন্ধ অনুসারী ও তোষামদ কারী বানিয়েছে। এসব দিকে লক্ষ্য করে উলামায়ে কিরাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কিছু শর্তের সাথে এ লাইনে পড়াশুনা করতে পারবে। আর যারা শর্ত পালন করবে না তাদের জন্য হিতে বিপরীত এবং তার ঈমান-আমল ধ্বংসের আশংকার কারণে জায়িয হবে না।

শর্তগুলি নিম্নরূপ

(ক) ইংরেজী লাইনে পড়াশুনা করে ইংরেজদেরকে দীন-ইসলাম এর দিকে আহবান করার এবং তাদেরকে দীন-ইসলাম বুঝানোর নিয়তে পড়াশুনা করবে।

(খ) এর দ্বারা হালাল চাকুরী করে হকের উপরে থেকে হালাল রিযিক উপার্জন করবে এ নিয়ত রাখবে। হালাল রিযিক উপার্যন করা শরী'আতের নির্দেশ।

(গ) উলামাদের সাথে উঠাবসা রেখে এবং ছুটির সময় দাওয়াত ও তাবলীগের সাথে শিক্ষা সফর করে নিজে পাক্কা মু'মিন হওয়ার এবং নিজের দীনদারীকে মজবুত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। বিশেষ করে সকল কাজে

নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাতের অনুসরণ করবে। কোন ক্ষেত্রে তার সুন্নাত তরক করবে না। অন্যদেরকে দীনের দিকে দাওয়াত দিতে থাকবে।

(ঘ) কোন ক্ষেত্রে কোন ক্রমে ইয়াহুদ-খৃষ্টান হিন্দু তথা অমুসলিমদের অনুকরণ অনুসরণ করবে না। কুরআনে কারীমে সূরায়ে মায়েদার ৭২ নং আয়াতে

{পৃষ্ঠা-১৬৫}

আল্লাহ তা‘আলা এদের পরিচয় এবং ইসলাম বিদ্বেষী মনোভাব তুলে ধরেছেন। সুতরাং এদের লেবাস-পোষাক, বেশভূষা, চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র কোন কিছুই গ্রহণ করবে না। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুলো থেকে দূরে থাকবে।

অত্যন্ত আফসুসের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমানে যারা ইংরেজী লাইনে পড়াশুনা করছে তাদের অধিকাংশই এ সব শর্তের ব্যাপারে একেবারেই গাফেল। তারা ইংরেজদের কি দাওয়াত দিবে, তারাই বরং ইংরেজদের দাওয়াত গ্রহণ করে। তার মধ্যে নিজের কামিয়াবী দেখছে। তারা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ইমাম না বানিয়ে খৃষ্টান বেদীনদেরকে ইমাম বানিয়েছে। হালাল রিযিকের কোন নিয়ত তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এ জন্য সুদ-ঘুষ খেতে কোন দ্বিধা করছে না। ধোকা-ফাকী থেকেও পরহেয করছে না। ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারসহ অন্যান্য পেশাজীবীদের ফি/চার্য দেখলে বুঝা যায় জনসেবার কোন নিয়তই তাদের মধ্যে নেই। শুধু নিজের গাড়ী-বাড়ী, আরাম আয়েশই তাদের উদ্দেশ্য। দেশের সর্বোচ্চ দায়িত্বে যারা আছেন তাদের অনেকে দুর্নীতিকে নীতি বানিয়ে শুধু নিজের আখের গুছাচ্ছেন। না আছে জাতীয়তা বোধ, না আছে দেশপ্রেম ও জনগণের দরদ। তাদের অধিকাংশই আলেম-উলামাদের সুহবত ইখতিয়ার করা তো দূরের কথা বরং তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তাদেরকে ইযযত সম্মান করাতো দূরের কথা তাদেরকে সমাজের বোঝা ভাবে। দীনী ইলম বা আসল জ্ঞানকে তারা তুচ্ছ মনে করে। দাওয়াত ও তাবলীগের ফরযিয়্যাতের কোন গুরুত্ব তাদের মধ্যে নেই। যিন্দেগীর অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা খৃষ্টান ও হিন্দু ইত্যাদি অমুসলিমদের অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করে। যেমন ধরুন আল্লাহ তা‘আলার স্পেশাল বাহিনীর ইউনিফর্ম হলো মাথায় টুপি, চুল সুন্নাত তরীকায়, মোচ ছোট ছোট, দাড়ী একমুষ্টি পরিমাণ ও সুন্নতী লেবাস যা টাখনুর উপরে থাকবে। ইংরেজদের অনুকরণ করতে যেয়ে এখন ইংরেজী শিক্ষার্থী বা ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানগণ হয়তো মাথা খালি রাখে নতুবা ইংরেজদের টুপি পড়ে। চুল সামনে লম্বা রাখে অধিকাংশই দাড়ী তো রাখেই না অথচ এটা শরী‘আতে ওয়াজিব এবং ঈমানের আলামত। আবার অনেকে বড় বড় মোচ রাখে যা হিন্দুদের তরীকা ।টাই, টাখনুর নিচে পাজামা বা প্যান্ট যা অমুসলিমদের লেবাস, সেটাই পরিধান করতে ভালবাসে। এমন কি জুতাটা পর্যন্ত ইংরেজী জুতা। যা পরা ও খোলা দুনিয়াতে এক আযাব। এ সবই ইংরেজী শিক্ষার কুফল এবং তাদের অন্ধ অনুকরণের ফসল। সব চেয়ে মারাত্মক কথা যে, তাদের ঈমান-আকীদা ধ্যান-ধারণা ও কৃষ্টি কালচার সবই ইসলামী ভাবধারা থেকে সরে যেয়ে ইংরেজদের মত হয়ে যাচ্ছে। এমন কি শেষ পর্যন্ত অনেকে নাস্তিক হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে পত্র-পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছে। যার ডজন ডজন নমুনা সমাজের

{পৃষ্ঠা-১৬৬}

সামনে বিদ্যমান। ইংরেজী শিক্ষার এটাই যে পরিণাম এটা ধূর্ত ইংরেজগণ ভালো ভাবে জানতো যা লর্ড ম্যাকল এবং উইলিয়ম হান্টারের লেখায় একদম স্পষ্ট। এ জন্য এ শিক্ষার কুফল থেকে জাতীকে বাঁচাতে হলে এ

সিলেবাসকে ইসলামী ভাবধারায় ঢেলে সাজাতে হবে যা সরকারের উপর ফরয। আর জনগণের দ্বায়িত্ব সরকারকে এটা বুঝানো। আর ছাত্র অভিবাবকদের দ্বায়িত্ব তারা যেন এ শিক্ষার কুফল থেকে নিজেদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বাঁচানোর জন্য এন্টিবায়েটিক হিসাবে নিজে সাথে করে ছেলেকে হক্কানী উলামাদের সুহবতে নিয়ে যাবে। তাদের ছুটির সময় দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে নিয়ে যাবে। নূরানী পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের কুরআন সহীহ ভাবে শিক্ষা দিবেন। বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের উযু, নামায, আযান, ইকামত ইত্যাদি সহীহ করায়ে দিবেন। মেয়েদেরকে দীনদার মহিলাদের মাধ্যমে কুরআন ও নামায শিখিয়ে দিবেন। তাহলে তারা সন্তানের হক আদায় করলেন। নতুবা কুশিক্ষার কারণে সন্তানের ধ্বংসের সাথে অভিভাবকও আযাবের সম্মুখীন হবেন।

খৃষ্টধর্ম প্রচারে পাশ্চাত্যের তৎপরতা

জিজ্ঞাসাঃ আমেরিকা এবং পাশ্চাত্য জগত সারা বিশ্বে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের ব্যাপারে এত তৎপর কেন? তারা ইসলামকে কেন এত ভয়ের নযরে দেখে?

জবাবঃ পাশ্চাত্য জগত সারা বিশ্বে তাদের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বিস্তার ও প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নে বিভোর। আর কমিউনিজমের মৃত্যুর পর এখন তারা একমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদেরকে তাদের প্রতিপক্ষ ভাবছে। সুতরাং বিশ্ব প্রভুত্ব কায়িম করতে হলে তাদের একমাত্র পথ সারা বিশ্বে থেকে ইসলামকে মুছে ফেলে খৃষ্টবাদ কায়িম করা। কারণ খৃষ্টানরাই তাদের একান্ত নিজস্ব লোক। এ জন্যই শিক্ষা ও সেবার মুখোশ পড়ে পৃথিবীর সকল এলাকায় বিভিন্ন ধর্মের লোকদের তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এ কাজে তাদের নারী-পুরুষ সকলেই তৎপর। একজন মুসলমান তার সহীহ দীন প্রচারে যতটুকু না তৎপর, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশী তৎপর একজন খৃষ্টান। কারণ, তারা সকলেই বিশ্ব প্রভুত্ব মনে প্রাণে কামনা করে। আর তাদের এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একমাত্র বাধা হচ্ছে দীনে হক ইসলাম এবং মুসলমানগণ। অন্যসব ধর্ম বাতিল। কাজেই সেগুলোকে আয়ত্বে আনা তাদের নিকট কোন ব্যাপার নয়। ইসলাম ধর্মই তাদের একমাত্র আদর্শিক প্রতিপক্ষ। সেহেতু ইসলামের উপর আঘাত হানা ও ইসলামকে ধ্বংস করা তাদের জন্য সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য হয়ে পড়েছে। এ জন্যই সারা দুনিয়াতে তারা ইসলামকে মিটানোর জন্য এবং খৃষ্টবাদ ও নাস্তিক্যবাদ কায়িম করার জন্য সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এ লক্ষ্যে বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদিতে তারা সরাসরি দখল দিতে সচেষ্ট। যাতে করে পর্যায়ক্রমে ইসলামের

{পৃষ্ঠা-১৬৭}

শিক্ষা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুনকে আস্তে আস্তে খতম করে দিয়ে তাদের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার, বেহায়াপনা ও পশুত্ব সব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়। আর এ একই উদ্দেশ্যে বিশ্বের হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইয়াহুদী ইত্যাদি কাফিরদেরকে মুসলিম ধ্বংস কাজে লেলিয়ে দিয়ে তারা পর্দার আড়াল থেকে পরোক্ষ মদদ দিয়ে যাচ্ছে। আর মুসলমানদের সান্তনা ও ধোকা দেয়ার জন্য মাঝে মাঝে জাতিসংঘের মাধ্যমে কিছু নিন্দা প্রস্তাব বা মায়াকান্না দেখাচ্ছে। বার্মা, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন ও বসনিয়ার দিকে লক্ষ্য করলে এ সত্য দ্বিপ্রহরের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। আর কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়বে না।

"এনজিও" উলামায়ে কিরামের দৃষ্টিতে ও ফাতওয়া নিয়ে এনজিওর গাত্রদাহ

জিজ্ঞাসাঃ শিক্ষা ও সেবার নামে খৃষ্টান মদদপুষ্ট এনজিওরা এদেশের মানুষের ঈমান ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হরণ করে চলেছে এবং এনজিওরা এদেশ ও জাতির জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর” এ হলো খৃষ্টান এনজিওরা এদেশ ও জাতির জন্য মারাত্বক ক্ষতিকর” এ হলো খৃষ্টান এনজিওগুলো সম্পর্কে এদেশের হক্কানী উলামাগণের মন্তব্য। কিন্তু একটি জাতীয় দৈনিক উলামাদের এ সতর্কবাণীকে ফাতাওয়াবাজী বলে আখ্যায়িত করছে। এমন কি গত কিছুদিন আগে সে দৈনিকটি “ফতোয়া” শিরোনামে একটি বিশেষ ক্রোড়পত্র বের করেছে। এ ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই।

জবাবঃ খৃষ্টান এনজিওরা যে এদেশের স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের জন্য নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তা আজ এদেশের সচেতন জনতার বুঝার বাকী নেই। কিন্তু এনজিওদের এ অপতৎপরতা আড়াল করার জন্যে এদেশের কতিপয় জ্ঞানপাপী, বাম ও রাম বাবুদের নিকট মগজ বেচা কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে তারা পয়সার বিনিময়ে হাত করে নিয়েছে। তারা উলামায়ে হক্কানীর এ সতর্কবাণীকে নস্যাত করে উল্টো তাদেরকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে আধা-পানি খেয়ে মাঠে নেমেছে। তবে আল্লাহ তা'আলার অশেষ শোকর যে, দীনদার জনসাধারণ এসব এনজিও পুষ্ট বাম কলামিষ্ট ও তাদের সংবাদপত্রে বিভ্রান্ত না হয়ে বরং ঈমান ও দেশের স্বার্থে সারা দেশময় আজ তারা সোচ্চার হচ্ছেন। সে সকল বাম কলামিষ্টদের সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করব না। তবে এনজিওরা যে আসলেই এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকী স্বরূপ আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত সে দৈনিকের ক্রোড় পত্রটির একজন নিবন্ধকার জনাব বদরুদ্দীন উমরের কলাম থেকেই তা অকপটে বেরিয়ে এসেছে। আমরা হুবহু তা পেশ করছি। তিনি লিখেন-

“এনজিও তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য হলো- মূলতঃ গ্রামাঞ্চলের গরীব জনগণকে ঋণ দিয়ে তাদের কোন না কোন ধরনের ছোট খাটো সমবায় গঠনে

{পৃষ্ঠা-১৬৮}

সাহায্য করা। প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করে নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টা করে এবং অনেকভাবে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করে তাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে, এসব প্রচেষ্টার মাধ্যমেই তাদের জীবন-জীবিকার উন্নতি সাধান সম্ভব। এটাই হলো তাদের পুঁজির আসল পথ। এ কাজ তারা করে পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যা হলো জনগণকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল, কৃষক দল ও গ্রামীন শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদির থেকে সরিয়ে রেখে এ দেশে শোষণ মুক্তির জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশ রুদ্ধ করা। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সংস্থা এবং অন্যান্য এজেন্সীগুলো ঠিক এই উদ্দেশ্যেই আমাদের দেশের গরীব জনগণের জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে এনজিও নামে পরিচিত এই সব সংস্থা খাড়া করে। শুধু আমাদের দেশেই নয়। বিশ্বের অসংখ্য দেশে তারা এ কাজ করে থাকে। এ কাজ করতে গিয়ে যে সব প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করা দরকার, এনজিওরা সে সব কৌশল বাধ্য হয়েই অবলম্বন করে। এই কৌশলগুলোর মূল দিক হলো, আপাতঃদৃষ্টিতে কিছু জনহিতকর কাজ এমনভাবে করা যাতে তাদের আসল উদ্দেশ্য আড়ালে রেখে তারা নিজেদের তৎপরতা বজায় রাখতে পারে।

এই জনহিতকর কাজগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কোন কোন এলাকায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করে প্রাথমিকভাবে ছোটদের এমনকি বয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। ছোট খাটো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। সাস্থ্য নিয়ম সম্পর্কে মানুষকে কিছুটা সচেতন করার চেষ্টা করা। মেয়েদেরকে ঋণ দিয়ে তাদের জন্য ছোটখাটো কর্মসংস্থান করা। এগুলি করার মধ্য দিয়ে এনজিওগুলি খুব চাতুর্যের সাথে তাদের রাজনৈতিক কাজ করে চলে । যাদেরকে তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা দেয়, তাদেরকে রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে বিরত রাখার জন্য তাদের মধ্যে প্রচার কাজ

চালায়। এ কাজ চালাতে গিয়ে তারা আবার জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করার চেষ্টাও করে থাকে। সে কাজ করতে গিয়ে তাদেরকে বোঝায় যে, জনগণের মুক্তি কোন রাজনৈতিক দলের দ্বারা সম্ভব নয়। সম্ভব একমাত্র তাদের কর্মে। অর্থাৎ স্থানীয়ভাবে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে।
কিন্তু এনজিওদের এই তৎপরতা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক হলেও এর ফলে গ্রামাঞ্চলে সামাজিক ক্ষেত্রে কিছু ইতিবাচক দিক সৃষ্টি হয়। যেমন গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্রাক ইত্যাদি ১৮% হারে অর্থাৎ অতিরিক্ত উচ্চ হারে সুদ ভিত্তিক ঋণ দেয়। প্রত্যেকের থেকে কঠোরভাবে নিয়মিত সুদে-আসলে তাদের পাওনা আদায় করে মুনাফার পাহাড় করতে থাকলেও এর মাধ্যমে গ্রামের নারীদের এক ধরণের কাজের সংস্থান হয়। সেটা সাময়িকভাবে হলেও এর দ্বারা তারা চিন্তার দিক থেকে এবং কার্যক্ষেত্রে কিছুটা স্বনির্ভর হতে শেখে। এ পরিবর্তন গার্মেন্ট শিল্পে নিযুক্ত নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও ঘটে। গৃহভৃত্য থেকে গার্মেন্টস শিল্প শ্রমিক হিসেবে
{পৃষ্ঠা-১৬৯}
নিযুক্তির ফলে একজন নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও চিন্তাগত জীবনের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। যদিও গার্মেন্টস শিল্প মালিকরা নারীদেরকে কাজ দেয় তাদের উপকারের জন্য নয়। নিজেদের মুনাফার হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই। নারী শ্রম পুরুষ শ্রমের থেকে সস্তা হওয়ার করণে তারা নারী শ্রমিক নিযুক্ত করতেই বেশী আগ্রহী। গ্রামীণ ব্যাংক ও ব্র্যাক ইত্যাদি সংস্থাগুলি গ্রামীণ নারীদেরকে ঋণ প্রদান করে তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে, এই প্রচার জোরেশোরে চালালেও তাদের এই ঋণনীতির মূল উদ্দেশ্য যে গ্রামাঞ্চলের সস্তা নারী শ্রমকে ব্যবহার করে নিজেদের মুনাফার হার যথাসম্ভব বেশী রাখা তাতে সন্দেহ নেই।
কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, এনজিওরা এসব কাজ করার সময় বাধ্যতাবশতঃ এমন কিছু কাজ করে যার একটা সীমিত ইতিবাচক দিক আছে। নারীদের কিছুটা স্বনির্ভরতা অর্জন অথবা সে স্বনির্ভরতা অর্জনের আকাঙ্খা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া। স্কুলে গরীব পরিবারের ছেলেমেয়ে ও ক্ষেত্রবিশেষে বয়স্কদেরও কিছুটা শিক্ষা এবং অক্ষর জ্ঞান, স্বাস্থ্য নিয়ম সম্পর্কে কিছুটা সচেতনতা ইত্যাদি হল তার এই ইতিবাচক দিক। এই ইতিবাচক দিকগুলিকে সামনে রেখেই আড়ালে ও পরোক্ষভাবে তারা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কাজ করে এবং এ দেশে প্রগতিশীল রাজনৈতিক বিকাশ রুদ্ধ করার জন্য সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তৎপর থাকে। (দৈনিক জনকন্ঠ) ২৫ চৈত্র, ৫পৃঃ

এ হল বাম কলামিষ্টদের বক্তব্য। আশা করি এবার এদেশের সকল স্তরের জনগণ বিশ্বাস করতে বাধ্য হবেন যে, এনজিওরা এদেশের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। দীনদার লোকেরা তো উলামাগণের সতর্ক বানীর দ্বারা পূর্বেই এ সত্যে উপনীত হয়েছেন। আর অবশিষ্ট জনাব বদরুদ্দীন উমরের নিবন্ধ পাঠে এ সত্যে উপনীত হবেন বলে আমরা আশাবাদী। সুতরাং আজ দেশপ্রেমিক যে কোন সচেতন নাগরিকের জন্য কর্তব্য ইসলামের জন্য বা অন্ততঃ দেশের জন্যে হলেও এনজিওদের ওকালতী বন্ধ করা।

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে অনুদান

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসলিম রাষ্ট্রের অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের জন্য হিন্দুদের পূজায় বা অন্য কোন ধর্মের লোকদের ধর্মীয় কাজে আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা জায়িয আছে কি-না? যদি জায়িয না থাকে, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিম রাষ্টের কিংবা ইসলামী রাষ্টের অমুসলিম নাগরিকরাও তো মুসলমানদের ন্যায় সরকারী তহবিলে ট্যাক্স আদায় করে থাকে। তাহলে উভয় শ্রেণীর মাঝে পার্থক্যের কারণ কি?
{পৃষ্ঠা-১৭০}

জবাবঃ ইসলামী রাষ্টের অথবা মুসলিম রাষ্টের অমুসলিম নাগরিকরা জিযিয়া বা কর করার শর্তে যিম্মী হিসেবে সেখানে বসবাস করবে। নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদের ও মুসলমানদের সমান অধিকার থাকবে। একজন মুসলমান নাগরিকের জান মাল সংরক্ষণের ব্যাপারে সরকারের যতটুকু দ্বায়িত্ব, একজন যিম্মী নাগরিকের জান-মাল সংরক্ষণের ব্যাপারেও ততটুকু দ্বায়িত্ব।

তবে এমন রাষ্ট্রে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার অনুমতি থাকলেও তা করতে হবে গোপনে। প্রকাশ্যভাবে জাঁক-জমকের সাথে ধর্মীয় কোন অনুষ্ঠান তারা করতে পারবে না। কেননা, পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-

"নিশ্চয় ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম।"

[সূরা আলে ইমরানঃ ১৯]

সুতরাং ইসলাম ছাড়া যত ধর্ম রয়েছে, সবগুলোই বাতিল ও মিথ্যা। হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও ইয়াহুদী সহ সব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে প্রতিমা পূজা আর গান বাদ্য ছাড়া কিছু নেই যা সম্পূর্ণরূপে শিরক ও হারাম। এ সকল আচরণ অনুষ্ঠান যাদের ধর্ম, তারা নিঃসন্দেহে কাফের। এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর কাফেররা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকাশ্য শত্রু। ইসলামকে মিটানোর জন্য তারা বিভিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

সুতরাং কোন মুসলমান কিংবা মুসলমান রাষ্টের সরকারের জন্য বিধর্মীদের কোন কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করা কিছুতেই শরী'আত সম্মত হবে না।

আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন- "তোমরা কল্যাণ ও তাকওয়া তথা খোদা ভীরুতার কাজে একে অপরের সহযোগিতা কর, গোনাহ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো না।" (সূরায়ে মায়িদাঃ ২) উক্ত আয়াতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, শরী'আত বিরোধী কোন কাজেই সেটা যত ছোটই হোক না কেন, কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করা যাবে না। আর হিন্দুদের মূর্তিপূজা তো হচ্ছে প্রকাশ্য কুফরী ও ইসলাম পরিপন্থী। সুতরাং এরূপ কাজে সহযোগিতা করার প্রশ্নই উঠে না।

কিন্তু মসজিদ, ঈদগাহ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং কোথাও এর ব্যবস্থা না থাকলে তার ব্যবস্থা সরকার প্রধানের দায়িত্ব। তাই বলে হিন্দু বা অমুসলিম কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করার অনুমতি নেই। এসব কাজে সাহায্য-সহযোগিতা করতে হবে এমন দায়িত্বও মুসলিম সরকারের নেই। তবে মুসলমান কর্তৃক অমুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা বাধা দিলে সরকার তার ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। কিন্তু নতুনভাবে তাদের কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান করতে দেয়া যাবে না।

{পৃষ্ঠা-১৭১}

এখন কথা হলো, তারাও তো দেশের নাগরিক। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যায়, তারা যেহেতু এ দেশের নাগরিক সুতরাং এ হিসেবে ধর্মীয় কাজে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে মুসলমানদের ন্যায় মনে হতে পারে। কিন্তু এ জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বনের কোন সুযোগ ইসলামে নেই। কেননা, কোন মুসলিম রাষ্ট্রে বা ইসলামী রাষ্ট্রে বিজাতীয় সম্প্রদায়ের কোন লোক বসবাস করতে আগ্রহী হলে, হয়তো তাকে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কর আদায় করে মুসলমানদের অধীন হয়ে থাকতে হবে। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বন করার কোন সুযোগও ইসলামে নেই। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতা অবলম্বনের অর্থই হল 'অন্যান্য ধর্মগুলোও সত্য। কোন ধর্মই বাতিল নয়।' একথা মেনে নিয়ে সকল ধর্মের সমন্বয়ে একটি মতবাদ

দাঁড় করানো। যে মতবাদে সকল ধর্মের অনুসারীরা সমান অধিকারী হবে। সরকার সকল শ্রেণীর দাবী সমানভাবে আদায় করবে। এ ধরনের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করে বিজাতীয় কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কাজে সহযোগিতার কোন প্রশ্নই আসে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ৪ : ২০৪]

এপ্রিল ফুল পালন করা ও এপ্রিল ফুলের ইতিহাস

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে এপ্রিল ফুল পালনের নামে যে প্রথার প্রচলন রয়েছে, তা শরী'আত সম্মত কি ? এপ্রিল ফুল অর্থ কি এবং এর তাৎপর্যগত ইতিহাস কি ?

জবাবঃ এপ্রিল ফুল অর্থ হল- এপ্রিলের বোকা।

আমাদের দেশে এপ্রিল ফুল পালনের নামে যে প্রথার প্রচলন রয়েছে, এটা তদানীন্তন ইংরেজদের কু-চক্রন্তমূলক হীন তৎপরতার প্রতীক। তারা মুসলমানদেরকে বোকা বানাতে পেরে এ দিনটিকে 'স্বরণ উৎসব' হিসেবে জিইয়ে রাখছে 'এপ্রিল ফুল' এর মাধ্যমে। তাই এপ্রিল ফুল উদযাপন করা কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নয়। স্মর্তব্য যে স্পেনের মুসলিম স্থাপত্য ও জগোৎকর্ষিত ঐতিহ্য দেখে খৃষ্টান ও ইংরেজদের প্রাণে আর সইল না। তাই তারা স্পেনকে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলল। পরিশেষে অবরুদ্ধ ও পরাজিত মুসলমানদের বলা হল মসজিদে অবস্থান করলে তাদেরকে নিরাপত্তা দেয়া হবে। প্রাণের মায়ায় স্পেনের রাজধানী গ্রানাডার মসজিদে আশ্রয় নিলো স্পেনের মুসলমানরা। অমনি ঘটাল ইংরেজরা যুগের ভয়াবহ বিভৎস কান্ড। মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারী নর-নারী ও শিশুদেরকে বাহিরদিয়ে তালাবদ্ধ করে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে মারল প্রতারক খৃষ্টান রাজা ফ্যার্ডিন্যান্ড। আর যারা পালানোর চেষ্টা করেছিল তাদেরকে হত্যা করলো নির্মমভাবে। সেই কঠিন দিনটি ছিল ১৪৯২ সনের পহেলা এপ্রিল। সেদিন থেকে

{পৃষ্ঠা-১৭২}

ইংরেজ প্রতারকরা মুলমানদের বোকা বানানোর এ কাহিনীকে চাংগা রাখার জন্য এ দিবসটিকে ঘোষনা করলো- "এপ্রিল ফুল" তথা "এপ্রিল মাসের বোকা" দিবস হিসেবে। নিতান্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আজ অনেক মুসলমানের সন্তানরা না বুঝে এ দিবসটি পালন করে যাচ্ছে। তাদের এ ব্যাপারে বোধদয় হওয়া উচিত। ঐতিহাসিক কারণেও এ দিবস পালন করা মুসলমানদের জন্য মোটেও বৈধ নয়। শরী'আতের দৃষ্টিকোণেও এর যেহেতু 'এপ্রিল ফুল' ধোকা দেয়ার একটা রীতি মাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-"যে ব্যক্তি মানুষকে ধোকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।" তাই ধোকা দেয়া হারাম।

অতএব, এপ্রিল ফুল উদযাপন কোন মুসলমানের জন্য কোনক্রমেই জায়িয হতে পারে না।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. (صحيح مسلم:70/1)

[জাদীদ ফিক্বহী মাসায়িল, ১ : ২৬৯]

ফতোয়াবাজ শব্দেরঃ অপপ্রচারের বিশ্লেষণ

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা ইসলামকে মিটানোর লক্ষ্যে সমাজের বরেণ্য উলামাগণকে হেয় করার উদ্দেশ্যে "ফতোয়াবাজ" শব্দটির খুব অপপ্রচার চালাচ্ছে। এদের সম্পর্কে আপনাদের প্রতিক্রিয়া কি ?

জবাবঃ মুসলমান সন্তানদের মন ও মস্তিষ্কের দিক দিয়ে ইসলাম বিরোধী করে গড়ে তোলার সুদূর প্রসারী লক্ষ্য নিয়ে বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে গেছে তার প্রভাব, বর্তমান পাশ্চাত্য জগতের অপসংস্কৃতির প্রভাব, মানবতার মুক্তির মিথ্যা মরিচিকা মার্কসবাদ- লেলিনবাদের মিথ্যা আশাবাদের বুলির প্রভাব, প্রভৃতি কু-প্রভাবসমূহের কারণে আজ দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলমানদের ঘরেই জন্ম নেয়া ইসলাম বিদ্বেষী

সাম্রাজ্যবাদের দালাল–নাস্তিকদের ক্ষুদ্র একটি দল সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিভিন্নভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী নানা কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়েছে। দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরাম যখন ইসলাম ও দেশের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ খুলে দেন, তখনই সেই কুখ্যাত চক্রটি এদেশে ইসলামের রক্ষাকারী আলিম সমাজকে মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বলে গালাগালি করে। আলেম সামাজের প্রতি ধর্মীয় ব্যাপারে এদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনসাধারণের যে অবিচল আস্থা রয়েছে, তাতে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে সেই চক্রান্তকারী দল আজ নতুন করে আলেম সমাজকে বিষোদগার করে সাধারণ মুসলমানদের আস্থা বিনষ্টের মানসে ফাতাওয়ার ন্যায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও ইসলামের একটি অতি পবিত্র বিষয়ের প্রতি জঘন্য কটাক্ষ করে তাকে জনসমক্ষে কলংকিত ও জঘন্য বিষয় হিসাবে
{পৃষ্ঠা–১৭৩}
উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে ফতোয়াবাজ শব্দের উৎপত্তি ঘটিয়েছে। তারা নিজেদের ব্যর্থতার অন্ধকার দেখে ইসলামের চরম ক্ষতিকারক ভন্ড পীর–ফকিরদের ভন্ডামী, গ্রাম্য ভুল শালিশ ও হিন্দু ঠাকুরদের ভুল সিদ্ধান্ত ইত্যাদি– যা ফাতাওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়– এমন সব খারাপ জিনিসগুলোকে ফাতাওয়া নামে আখ্যায়িত করে ইসলামের বিধানগত ব্যাখ্যা ফাতাওয়াকে অবমাননা করার মিথ্যা আশ্রয় নিচ্ছে।

এরা এতকাল মস্কো–রাশিয়ার চাটুকার সেজে দেশ ও জনগণের স্বার্থবিরোধী বহু কার্য সম্পাদন করেছে। এদের চরিত্র ছিল মস্কোতে বৃষ্টি হলে ঢাকায় ছাতা ধরা। সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে খান খান হওয়ার পরে তারা রাশিয়ার দালালী বাদ দিয়ে এদেশের রাশিয়ার হুমকি নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী খৃষ্টান মদদ পুষ্ট এনজিওদের তরফদারী করে তাদের থেকে আর্থিক সুবিধা ভোগ করছে। তাই আলেম সমাজ যখন তাদের গুরু এনজিওদের ইসলামী ও স্বাধীনতা বিরোধী অপতৎপরতা সমূহের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন, তখন তাদের মাথা ব্যথা হওয়া স্বাভাবিক। এনজিওরা উৎখাত হয়ে গেলে ওদের ভিক্ষা দেয়ার দুনিয়াতে আর কেউ থাকবে না, এ ভীতি তাদের। কিন্তু মজার ব্যাপার হল– তাদের কোন নীতি আছে বলে মনেই হয় না। পয়সাই যেন তাদের নীতি। তাই একদিকে তারা এনজিওদেরকে দেশের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করছে। যেমন– উদয়পালের সভাপতিত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট আয়োজিত আলোচনা সভায় বামপন্থী বক্তারা বলেছেন– “সাধারণ মানুষের সংগ্রাম যাতে গড়ে উঠতে না পারে, এ লক্ষ্যে এনজিওরা গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে। এদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতা নস্যাত করা।” দৈনিক জনকন্ঠ, ২২ শে এপ্রিল, শেষ পৃঃ। অপরদিকে ঐসব বাম নেতারাই আবার এনজিওদের তরফদারী করে দেশ বরেণ্য উলামায়ে কিরামকে ফতোয়াবাজ বলে হেয় প্রতিপন্ন করে ইসলামকে মিটানোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু দেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ধর্মীয় ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের উপর এতই আস্থাশীল যে, সেসব বিজাতীয় চেলা–চামুন্ডাদের কথা দেশের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণের গা ছুতেও পারে না।

টেবিলের উপরে খানা খাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে ডাইনিং টেবিল ও চেয়ারে বসে খানা খাওয়ার যে পদ্ধতি চালু আছে তা সুন্নাত বিরোধী এবং বিজাতীয় অনুকরণ বলে আমরা জানি। কিন্তু যদি টেবিলের উপরে দস্তরখান বিছিয়ে তার উপরে বর্তনে খানা রেখে এবং চেয়ারে বা বেঞ্চে সুন্নাতী কায়দায় বসে খানা খাওয়া হয়, তা জায়িয হবে কি–না ?

জবাবঃ বর্তমানে বিজাতীয় স্টাইলে যে খানাপিনার নিয়ম চালু হয়ে গেছে, এটা অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ শরী‘আতে আমাদেরকে ইয়াহুদী খৃষ্টানদের রীতিনীতি অনুসরণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। নবী

{পৃষ্ঠা-১৭৪}

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেঝের মধ্যে দস্তরখান বিছিয়ে খানা খেতেন। আমাদের সেভাবে খানা খাওয়ার অভ্যাস করা উচিত। মাঝে মাঝে বিশেষ জরুরতে বা ঠেকায় চেয়ার টেবিলে বসে খেতে হলে, তখন সুন্নাত তরীকায় বসে টেবিলের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে খেতে পারবে। তবে সর্বদার জন্য এটাকে নিয়ম বানানো ঠিক নয়।

عن انس رضي الله تعالى عنه قال ما اكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا سكرجة.....الخ (سنن الترمذي:1/2)

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৫ : ১১৬ # তিরমিযী শরীফ, ২ : ১ # মিশকাত শরীফ ১ : ৩৬৩]

ছেলে-সন্তান টিভি-ভি.সি.আর দেখায় অভ্যস্ত হলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ নামায-রোযা করে না এমন লোকদের হাদিয়া ও ঘরে পাকানো খানা খাওয়া এবং তাদেরকে সালাম দেয়া জায়িয হবে কি-না ? আমার ছেলে মেয়েরা নামায পড়ে না। টিভিতে নাটক-গান দেখে ও শুনে। নামায পড়ার জন্য এবং টিভিতে গান দেখা হতে বিরত থাকার জন্য অনেক দিন যাবত দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন কথা শোনে না ও মানে না । ছেলে মেয়েদের থেকে আমরা আলাদা হয়ে বসবাস করবো, নাকি তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে দীনের পথে চলতে বলতে থাকব ? উল্লেখ্য যে, টিভি নিষেধ করা সত্ত্বেও ছেলের রোজগারের টাকা দিয়ে ছেলেই টিভি কিনেছে। খবর ও অন্যান্য ভাল শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান টিভিতে দেখা যাবে কি-না ?

জবাবঃ হ্যা, আপনাদের জন্য এখন তাদের থেকে ভিন্ন হয়ে বসবাস করা ভাল, যেন এ বিচ্ছেদে তারা ব্যথিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের ভুল থেকে ফিরে আসতে সক্ষম হয়। তবে এর সাথে সাথে তাদেরকে বুঝাতে থাকবেন। আল্লাহর নিকট তাদের তাওবার তাওফীকের জন্য দু'আ করবেন। [ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২ : ২১৫ পৃঃ]

প্রচলিত টিভির কোন অনুষ্ঠানই দেখা জায়িয নয়। এর সকল প্রকার অনুষ্ঠান দেখা গুনাহের কাজ এবং গুনাহের সহযোগিতা। সুতরাং দীনদারীর উপর কায়িম থাকতে হলে, এর থেকে দুরে থাকা একান্ত জরুরী।

اما التلفزيون والفيديو فلا شك في حرمة استعماله. (تكملة فتح الملهم:164/4)

[নিযামুল ফাতাওয়া, ২ : ৯৯]

অনৈসলামিক তরিকায় নাম রাখলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামী নাম ছাড়া অন্য কোন নাম যেমন, নয়ন, স্বপন, বাদল, নুপুর ও পাপ্পু ইত্যাদি রাখা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন ? যদি রেখেই ফেলে এবং সেই নামের উপর পরিচিতি লাভ করে, তাহলে তার জন্য করণীয় কি ?

{পৃষ্ঠা-১৭৫}

জবাবঃ হাদীস শরীফে আছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফরমায়েছেন- তোমাদের সন্তান হলে, সর্বপ্রথম তোমরা এ সন্তানের সুন্দর একটা নাম রাখ। [প্রমাণঃ আবূ দাউদ শরীফ ৩৯২]

এর দ্বারা ইসলামী নাম রাখার প্রতি গুরুত্ব বুঝা গেল। আর এটাই সন্নাত তরীকা। কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে বিশেষ করে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে হিন্দুয়ানী প্রথা হিন্দি ও সাংস্কৃতির প্রভাব আস্তে আস্তে বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশী মুসলমানদের উপর চাপতে শুরু করে। অপর দিকে ধর্মীয় ইলম শিক্ষা করা, যা সব চেয়ে গর্বের বিষয় ছিল, বাঙালীরা তা শুধু পরিহার নয়, বরং ওগুলোকে রীতিমত হেয় মনে করে এবং আল্লাহর দুশমনের বিদ্যাকে খুবই উঁচু নযরে দেখতে থাকে। তখনই এসব ইসলামী তাহযীব ও তামদ্দুন রীতি-নীতি তাদের থেকে বিদায় নিতে থাকে। আর তাদের মধ্যে বিজাতীয় অন্ধ অনুকরণের পরিণতিতে বিজাতীর নগ্ন সভ্যতা, তাদের কৃষ্টি কালচার ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং পরিণতিতে ইসলামী নামের স্থলে এসব উদ্ভট,

উৎকট ও বিশ্রী-কুশ্রী হিন্দুয়ানী নাম মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়ে পড়ে। এ প্রথার পরিবর্তন মুসলমান মিল্লাতের জন্য একান্ত জরুরী। কারণ, এসব প্রথা এভাবে চলতে থাকলে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সুন্নত সমূহ বিদায় নিতে থাকবে, হিন্দুয়ানী বা বিজাতীয় প্রথা প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে মুসলিম মিল্লাত নীতিহীন এক কাংগাল জাতিতে পরিণত হয়ে পৃথিবীর মধ্যে লাঞ্চিত ও পদদলিত হতে থাকবে।

অতএব কোন মুসলমান না জানার কারণে এ ধরণের নাম স্বীয় সন্তানের জন্য রাখে এবং ঐ নামেই সে পরিচিতি লাভ করে, তবুও ঐ নাম পরিবর্তন করে ইসলামী নাম রাখতে হবে। যেমন হুযূর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক সাহাবায়ে কেরামগণের নাম এরূপভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। [প্রমাণঃ মিরকাত ১: ৬৯ # বুখারী ২: ৯১৪]

عن جبر ابن شيبة قال جلست الى سعيد بن المسيب فحدثني ان جده حزنا قدم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ما اسمك قال اسمي حزن قال بل سهلٍ قال ما انا لمغير اسما سمانيه ابي قال ابن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. (صحيح البخاري:914/2)

বিভিন্ন মেলায় যাওয়া ও জিনিস খরিদ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের মেলা বসে থাকে। যেমন- বৈশাখী মেলা ও পৌষী মেলা ইত্যাদি। ঐসব মেলায় যাওয়া জায়িয হবে কি? ওখান থেকে আসবাব পত্র কেনা জায়িয হবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-১৭৬}

জবাবঃ বর্তমানে আমাদের দেশে যে মেলা বসে থাকে, তা আমাদের জানা মতে বিভিন্ন ধরনের নোংরা, অশ্লীল ও অবৈধ কার্যকলাপের উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে। মুসলমানদের মেলা হোক, কিংবা বিধর্মীদের মেলা হোক, বর্তমানে কোন মেলাতে অংশগ্রহণের কিংবা তথায় ক্রয়-বিক্রয় কোনটার জন্য উপস্থিত হওয়া জায়িয হবে না। কেননা, ঐ সমস্ত মেলাতে আপনার উপস্থিতি মেলার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক বৃদ্ধির সহায়ক হবে। যা প্রকারান্তরে তাদের অশ্লীলতা ও অবৈধ কার্যকলাপের ব্যাপারে উৎসাহ যোগাবে। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ "ভাল ও তাকওয়ার কাজে তোমরা সহায়তা করো, গুণাহ ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে সহায়তা করো না।" [প্রমাণঃ সূরা মায়িদা, ২ # ফাতাওয়া রশীদিয়া, ২৪৯]

তদুপরি গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ উপস্থিত হয়ে কোন বস্তু সঠিক পদ্ধতিতে ক্রয় করে, তাহলে তার বেচা-কেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে। [ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৪৫৫]

সারকথা, এ সব মেলায় মুসলমানদের জন্য অংশগ্রহণ না করা এবং না যাওয়া নৈতিক ও ঈমানী কর্তব্য।

নাঈম হাসান এর প্রুফ দেখা

পহেলা বৈশাখের কুসংস্কার

জিজ্ঞাসাঃ আজকাল অনেককে দেখা যায়-পহেলা বৈশাখীর নামে কাল বা বর্ষবরণ করে নিতে। যাতে করে তারা সুখে থাকতে পারে। এ ধারণা কি ঠিক? ইসলাম এ ব্যাপারে কি বলে?

জবাবঃ পবিত্র কুরআনে সূরা আল-জাসিয়া ২৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ কাফির-মুশরিকদের আক্বীদা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন- "কাফির-মুশরিকরা বিশ্বাস করে যে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ। আমরা মরি ও

বাঁচি মহাকালেরই কারণে । আর মহাকালইতো আমাদের ধ্বংস করে।” কাফির-মুশরিকরা মহাকালের চক্রকেই সৃষ্টি জগত ও সমস্ত অবস্থার কারণ সাব্যস্ত করত। অথচ এগুলো সব প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক নিয়ম বলতে কোন কিছুর নিজস্ব অস্তিত্ব নেই। কারণ-প্রাকৃতিক নিয়ম বা প্রাকৃতিক আবর্তন বিবর্তন দুর্যোগ ইত্যাদি দ্বারা যা বুঝানো হয়, সবই আল্লাহ তা‘আলার নিয়ন্ত্রণে। সবই আল্লাহর কুদরত এবং সবই আল্লাহর সৃষ্টি। এগুলোর নিজেদের ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নেই । সুতরাং দীনের জ্ঞান শূন্য লোকেরা বিভিন্ন অভিনব পদ্ধতিতে যে কালকে বরণ করার প্রথা চালু করেছে, তা মারাত্মক ভ্রান্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ। যা আগের যামানার এবং কাফির-মুশরিকদের আক্বীদার সহিত সামঞ্জস্যশীল। এছাড়াও তা বর্তমান হিন্দু

{পৃষ্ঠা-১৭৭}

সম্প্রদায়ের সাথেও সংগতিপূর্ণ। তা নিঃসন্দেহে শিরক ও গুনাহর কাজ। প্রত্যেক মুসলমান এসব থেকে দূরে থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

ক্যাসেটে তিলাওয়াত ও গান শোনার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ক্যাসেটে কুরআন তিলাওয়াত শুনলে, সাওয়াব হবে কি-না ? এবং ক্যাসেটে ধারণকৃত গান শুনলে গুনাহ হবে কি-না ?

জবাবঃ টেপরেকর্ডারের আওয়াজ পাঠকের নিজস্ব আওয়াজ নয়। বরং প্রতিধ্বনির ন্যায় পাঠকের স্বরের নকল মাত্র। এজন্যই ধারণকৃত ক্যাসেটের তিলাওয়াত প্রকৃত তিলাওয়াত নয়।

সুতরাং টেপরেকর্ডারের সাহায্যে ক্যাসেটে বাজানো কুরআন তিলাওয়াত শুনলে, তাতে প্রকৃত তিলাওয়াত শুনার সাওয়াব হয় না । তবে তা শ্রবণ করা নাজায়িয নয়। কিরাআত সহীহ করার জন্য সহীহ ক্বারীদের তিলাওয়াত ক্যাসেটে শোনা যায়। পক্ষান্তরে গান-বাদ্য ইত্যাদি, যার আওয়াজ মানবাত্মাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী করে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ বিস্মৃত মানুষের ঐ অন্তরে অভিশপ্ত শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে প্রয়াস পায়। যে কারণে ইসলাম গানবাদ্যকে অবৈধ তথা হারাম ঘোষনা করেছে। আর গান-বাদ্য শ্রবণ অবৈধতায় সরাসরি কিংবা যন্ত্রের মাধ্যমে যেমন, গ্রামফোন, রেডিও, টিভি এবং ক্যাসেট ইত্যাদির মধ্যে শরী‘আত কোন পার্থক্য করেনি। গান গাওয়া এবং শ্রবণ করা সর্বাবস্থায়ই হারাম। কাজেই ক্যাসেটে ধারণকৃত তিলাওয়াত শ্রবণে সাওয়াব না হওয়ার উপর ধারণকৃত ক্যাসেটের গান-বাজনা শ্রবণে গুনাহ না হওয়ার যুক্তি প্রদর্শনের কোন অর্থই হতে পারে না। কারণ গানের অস্তিত্বই যে শরী‘আত অবৈধ ঘোষনা করেছে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ৬ : ৩৪৮,৪৯ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫ : ৩৫১,৩৫২ # আলাতে জাদীদাহ, ২২২]

وفي التاترخانية عن العيون ان كان السماع سماع القران والموعظة يجوز وان كان سماع غناء فهو حرام باجماع العلماء.
(الفتاوى الشامي: 349/6)

শিখা চিরন্তন

জিজ্ঞাসাঃ শিখা চিরন্তন কি ? শিখা চিরন্তনকে সম্মুখ করে সম্মান প্রদর্শনকারী অগ্নিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি ?

শিখা চিরন্তনকে কেন্দ্র করে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে লংমার্চ বা জিহাদের ডাক দেয়া কতটুকু শরী‘আত সম্মত ? জিহাদ কোন অবস্থায় কখন ফরয হয়। বর্তমান বাংলাদেশ সেই অবস্থায় নিপতিত হয়েছে কি ?

{পৃষ্ঠা-১৭৮}

জবাবঃ শিখা চিরন্তন অগ্নি পূজকদের একটি প্রতীক। অগ্নি পূজকরা আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তার পূজা করে, তার সামনে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করে থাকে এবং তা থেকে প্রেরণা লাভ করে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের পূর্বে পারস্যবাসীরা অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করে তার পূজা করে আসছিল। সেই অগ্নিশিখা হাজার হাজার বছর ধরে জ্বলছিল। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর জন্মের সময় সেই অগ্নিশিখা আল্লাহর কুদরতে নিভে যায়। আল্লাহ ছাড়া কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে মাথা নত করে সিজদা করা বা স্যালুট দেয়া, তাতে পুষ্পস্তবক দিয়ে প্রেরণা লাভ করা শিরক ও কুফরী। কারণ, বিধর্মী বা বিজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতীকী অগ্নিশিখা মুসলমানদের আনন্দ উৎসব বা কোন বিশেষ দিনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা, তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য স্যালুট, পুষ্পস্তবক ইত্যাদি প্রদান করা অগ্নি পূজারই নামান্তর। কেননা, হাদীসে উল্লেখ হয়েছেঃ

من تشبه بقوم فهو منهم. “অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশেষ কাজ বা বিশেষ আচরণের দিক দিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা রাখবে সে তাদেরই দলভুক্ত হবে।”

সুতরাং বিজাতীয় সম্প্রদায়ের যে কোন প্রতীকীকে যে কোনভাবেই হোক, সম্মান প্রদর্শন করা মুসলমানদের জন্য হারাম ও নাজায়িয।

দ্বিতীয়তঃ শিখা চিরন্তন নামের মধ্যেই কুফরী বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই চিরন্তন ও চিরঞ্জীব।আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তু চিরন্তন বা চিরঞ্জীব হতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে- {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة : 255]

“আল্লাহ মহান সত্ত্বা-তিনি ছাড়া আর কোন মাবূদ নেই। তিনি চিরন্তন ও চিরঞ্জীব।” সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে চিরন্তন ও চিরঞ্জীব মনে করা বা এ ধরনের আকীদা ও বিশ্বাস রাখা শিরক ও কুফরী। আর যে কোন কুফরী কাজ মুসলমানদের জন্য হারাম ও নাজায়িয। এর দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা রয়েছে।

* وفي الملتقط: التواضع لغير الله حرام . (الدر المختار:384/6)
* فارادوا ان يتخذوا دارا منها كنيسة او بيعة او بيت نار يجتمعون في ذلك لصلوتهم منعوا عن ذلك .
(الفتاوى التاترخانية:449/5)

[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী, ১: ২২৪ # তাতারখানিয়া, ৫: ৪৪৯ # শামী, ৬: ৩৮৪ # ফতহুল কাদীর, ৫: ২৯৯]

কোন মুসলিম রাষ্ট্রে যদি কেউ শিরক বা কুফরী কাজ অথবা শরী‘আত বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে এবং ব্যাপকভাবে চালু করতে চায়, তাহলে ঐ রাষ্টের মুসলমানদের ঈমানী দ্বায়িত্ব হয়ে পড়ে যে, তারা ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিবাদ

{পৃষ্ঠা-১৭৯}

জানাবে এবং তা বন্ধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে তা বন্ধ করতে বাধ্য করবে। এর জন্য অবস্থার প্রেক্ষিতে হরতাল, লংমার্চ ও অবরোধ ইত্যাদির প্রয়োজন হলে করবে এবং তা জিহাদের অন্তভুক্ত হবে। কারণ, যে যামানায় যেভাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তা বন্ধ হবে, ঐ যামানায় ঐ ভাবেই প্রতিবাদ করতে হবে। আর তা এক প্রকার জিহাদ হবে। কারণ, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়ার নামই শুধু জিহাদ নয়; বরং

এর বিভিন্ন রূপ হতে পারে। তাছাড়া এগুলো দীনের দুশমনদের প্রতিহত করার জন্য এক প্রকার হাতিয়ার বিশেষ। আর দুশমনদের তৈরি হাতিয়ার দ্বারা দুশমনদের মুকাবিলা করা নাজায়িয নয়। অনেক মূর্খ লোক এ তথ্য না বুঝার কারণে আপত্তি করে থাকে। [প্রমাণঃ সূরা হজ্ব, ৪০ # জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১ : ৬০৫]

একটি কুসংস্কারের অপনোদন

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে প্রচলিত একটি কথা আছে- কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির নাম বলার সাথে সাথে সে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে আমরা বলে থাকি- "আপনি অনেক দিন বাঁচবেন। কারণ, আমরা এই মাত্র আপনার নাম বলতেছিলাম। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর কোন বাস্তবতা আছে কি-না ?

জবাবঃ আসলে এগুলো লোক সমাজের কল্পকথা। এমনিভাবে সমাজে অনেক আজব কথা প্রচলিত আছে। কুরআন হাদীসের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, শরী'আতে এর কোন বাস্তবতাও নেই। বিশেষ করে অজ্ঞ মেয়েরা এসব কুধারণা বানানোতে পটু।

বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রবেশ দ্বারে গেইট নির্মাণ

জিজ্ঞাসাঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে সুসজ্জিত গেইট নির্মাণ করে বর পক্ষের লোকজনের সেখান দিয়ে প্রবেশকালে তাদের নিকট থেকে টাকা আদায় করা জায়িয আছে কি-না ? তেমনিভাবে যদি বর পক্ষের লোকজনের নিকট থেকে টাকা আদায়ের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কেবলমাত্র তাদের সম্মানার্থে এই গেইট নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেটা জায়িয হবে কি ?

জবাবঃ এভাবে গেইট নির্মাণ করায় অপব্যয় ও অপচয় হয়। তাছাড়াও কারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে টাকা উসূল করা হারাম। এগুলো বর্বরতা ও কু-প্রথা মাত্র। এসব থেকে পরহেয করা জরুরী। টাকা উসূল না করা হলেও অপচয়ের কারণে এবং বিজাতীয় প্রথার অনুকরণের দরুণ বিবাহ উপলক্ষে গেট নির্মাণ নিষিদ্ধ।

لايحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. (السنن الكبرى:100/6)

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১২ : ৩৯৪ # আস-সুনানুল কুবরা, ৬ : ১০০ # সূরা বনী ইসরাঈল, ২৬ # তারগীব তারহীব ৩ : ১৯]

{পৃষ্ঠা-১৮০}

গান শ্রবণ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমি জানতে আগ্রহী যে, শরী'আতের দৃষ্টিতে গান বাদ্য শ্রবণ করা কতটুকু জায়িয ? অনেকে বলে থাকে বাদ্য ছাড়া গান শ্রবণ করা জায়িয আছে।

জবাবঃ গান-বাজনা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম ও মহাপাপ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামত সংঘঠিত হওয়ার পূর্বে পাপকার্য ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। নর্তকী এবং বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপকতা এর অন্যতম। (তিরমিযী শরীফ) অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাকে বাদ্যযন্ত্র ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করেছেন। [মুসনাদে আহমদ]

পবিত্র কুরআনে সূরায়ে লুকমান আয়াত নং ৬ এবং সূরায়ে বনী ইস্রাইল আয়াত নং ৬৪, উক্ত আয়াতদ্বয়ে গান এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানো হারাম। যারা পাপ কাজে জড়িত হবে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য এই মহাপাপ থেকে বিরত থাকা ফরয। যেহেতু গান গাওয়া এবং বাদ্যযন্ত্র

বাজানো ইত্যাদি শরী‘আতের দৃষ্টিতে হারাম ও মহাপাপ সুতরাং গান শোনা জায়িয হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না। অবশ্য যদি বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ইসলামী হয় এবং তার সাথে কোন বাদ্যযন্ত্র না থাকে এবং কোন পুরুষ তা পড়ে, যাকে গযল বলা হয় এটা জায়িয আছে ।

استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر. (نيل الاوتار:100/8)
وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغناء ينبت النفاق كما منبت الماء الزرع. (مشكاة المصابيح:411)
[প্রমাণঃ সূরা লোকমান, ৬ # রুহুল মাআনী, ১১ : ৬৭-৬৮ # লিসানুল আরব ৪ : ২-৪ # দুররে মুখতার, ৫ : ২৪৫ # নাইলুল আওতার, ৮ : ১০০ # মিশকাত, ৪১১]

{পৃষ্ঠা-১৮১}
পবিত্রতা / ত্বাহারাত
পানি

ব্যবহৃত পানির সংজ্ঞা ও তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ব্যবহৃত পানির সংজ্ঞা কি ? তার হুকুম কি ? যদি কোন ব্যক্তির উযুর অথবা গোসলের পানি অন্যের গায়ে লাগে, তাহলে ঐ ব্যক্তি নাপাক হবে কি ?

জবাবঃঐ পানিকে শরী‘আতের পরিভাষায় ব্যবহৃত পানি বলা হয়, যা নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য অথবা নেকী অর্জনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। পানি ব্যবহার করার পর যখন শরীর থেকে পৃথক হবে, তখন ব্যবহৃত পানি হিসেবে গণ্য হবে। ব্যবহৃত পানির হুকুম হলো- উক্ত পানি পাক। তবে তার দ্বারা উযু-গোসল করা যাবে না। ব্যবহৃত পানি যেহেতু পাক, তাই যদি কাহারো শরীরে লাগে, তাহলে তার শরীর নাপাক হবে না। সুতরাং ধোয়ার প্রয়োজন নেই। [প্রমাণঃ কানযুদ্দাকাইক-৭]

ভাল পানিতে ব্যবহৃত পানি পড়লে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ভাল পানিতে ব্যবহৃত পানি পড়লে, সেই পানির দ্বারা উযু করলে পবিত্রতা হাসিল হবে কি-না ?

জবাবঃ ব্যবহৃত পানি নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। সুতরাং ভাল পানিতে যদি ব্যবহৃত পানি পড়ে যায় এবং ব্যবহৃত পানি যদি ভাল পানি থেকে কম হয়, তাহলে সেই পানি দ্বারা উযু-গোসল ইত্যাদি জায়িয আছে। তবে ব্যবহৃত পানির পরিমাণ যদি ভাল পানি থেকে বেশী বা সমপরিমাণ হয়, তাহলে সেই পানি দ্বারা উযু-গোসল ইত্যাদি জায়িয হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম, ১ : ১৬৪ # ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ : ৩৪, ৩৫]

গোসলের অবশিষ্ট পানির হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ গোসলের পর পাত্রে যে অবশিষ্ট পানি থাকে, তা দিয়ে উযু করা জায়িয আছে কি-না ?

জবাবঃগোসলের পর পাত্রে যে অবশিষ্ট যে পানি অবশিষ্ট থাকে তা পাক। সুতরাং উক্ত পানি দ্বারা উযু-গোসল ইত্যাদি করা জায়িয আছে। [আদদুররুল মুখতার, ১ : ১৮১ পৃঃ # হিদায়া, ১ : ৩৩ ও ৩৯]

{পৃষ্ঠা-১৮২}

ব্যবহৃত পানির ছিটা পাত্রের অব্যবহৃত পানিতে পড়লে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ছোট পাত্রে পানি নিয়ে ফরয গোসল করার সময় ব্যবহৃত পানির ছিটা পাত্রে পড়লে, পাত্রের পানি নাপাক হবে কি-না ?

জবাবঃ শরী'আতের বিধান মুতাবিক সুন্নাত তরীকায় গোসল করলে, গোসলকারীর শরীরে বা কাপড়ে নাপাক থাকতে পারে না। সে অবস্থায় ড্রাম বা বালতিতে পানি দিয়ে ফরয গোসল করার সময় শরীরের ব্যবহৃত পানির ছিটা উক্ত ড্রাম বা বালতির পাক পানিতে পড়লে, পাক পানি নাপাক হবে না। কারণ স্বল্প পরিমাণ ব্যবহৃত পানি পাক পানিতে পড়লে, পাক পানি নাপাক হয় না। তবে হাঁ, গোসলের পূর্বে শরীর ও কাপড় থেকে বাহ্যিক নাপাকী দূর না করে সুন্নাত তরীকার খেলাপ গোসল করলে শরীরের নাপাকী বা কাপড়ের নাপাকী হতে ছিটা পড়লে, ছোট পাত্রের পানি নাপাক হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ ফাতওয়া আলমগীরী, ১ :২৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১ : ১৫৯]

হাউজে নাপাক পড়লে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ হাউজ কিংবা ট্যাঙ্কিতে কোন নাপাক বস্তু পতিত হলে উক্ত হাউজ কিংবা ট্যাঙ্কি নাপাক হয়ে যায় কিনা ? যদি নাপাক হয়ে যায় তাহলে পাক করার পদ্ধতি কি ?

জবাবঃ হাউজ কিংবা ট্যাঙ্কি যদি বড় তথা ১০০ বর্গহাত বা তদুর্ধ হয় অথবা এমন হাউজ কিংবা ট্যাঙ্কি হয় যে, পানি একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য দিক দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে তাহলে নাপাকী পতিত হওয়ার দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত পানি দুর্গন্ধ না হবে বা রং কিংবা স্বাদ পরিবর্তন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ট্যাঙ্কি নাপাক হবে না। আর যখন তিনটি বিষয়ের কোন একটি পরিবর্তন হয়ে যাবে তখন ট্যাঙ্কি নাপাক হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পাক করার সুরত হল সমস্ত পানি নিষ্কাষণ করা।

আর যদি ট্যাঙ্কি ১০০ বর্গহাত না হয়ে তার চেয়ে ছোট হয় অথবা তাতে পানি একদিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে প্রবাহিত না হয় তাহলে নাপাকী পড়লে সাথে সাথে তা নাপাক হয়ে যাবে। চাই স্বাদ, রং বা গন্ধের কোন একটি পরিবর্তন হোক বা না হোক। এমতাবস্থায় উক্ত ট্যাঙ্কি পাক করার পদ্ধতি ২ টি।

১. সমস্ত পানি নিষ্কাষণ করা ও ২. কোন পদ্ধতিতে পানিকে জারী তথা প্রবাহিত করে দেয়া।

[ফাতওয়া শামী ১ : ১৯৫, আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৪৯, আলাতে জাদীদা কী শরঈ আহকাম (মুফতী মুহাম্মাদ শফী রঃ) ১৯৬]

{পৃষ্ঠা-১৮৩}

উযু

গোসলের পর নতুন উযু করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ গোসল করার পূর্বে আমরা যে উযু করি, গোসল করার পরে নামায পড়ার জন্য আবার নতুন উযু করতে হবে কি-না ? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব ।

জবাবঃ গোসল করার পূর্বে উযু করা হোক বা না হোক, গোসল করার পরে নামায পড়ার জন্য আবার নতুন করে উযু করতে হবে না। গোসলের পূর্বের উযু বা শুধু গোসল দ্বারা নামায হয়ে যাবে। কেননা গোসলের মধ্যে উযুর অঙ্গ ধৌত হয়ে যায়। এ কারণে গোসলের পরে আবার নামাযের জন্য উযু করলে অপব্যয় হওয়ার কারণে মাকরূহ হবে। তবে উযু থাকা অবস্থায় আবার উযু করতে চাইলে, সেখানে মাসআলা হল- প্রথম উযু দ্বারা এমন কোন ইবাদত করবে যা উযু ব্যতীত করা যায় না। যেমন কমপক্ষে দু'রাকাআত নামায পড়া।

অবশ্য যদি কেউ পবিত্রতার নিয়্যত ব্যতীত গোসল করে এবং পূর্বে উযু না করে তাহলে সে ক্ষেত্রে উযুর সওয়াব প্রাপ্তির জন্য পুনঃ উযু করা মুস্তাহাব।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৯, আপকে মাসাইল আওর উনকা হল,২ : ২৭, রদ্দুল মুহতার ১ : ১১৯]

لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب بل يكره لما فيه من الاسراف . (رد المحتار:191/1)
الوضوء إذا لم يؤد به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلوات وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي ان لايشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون اسرافا محضا. (رد الحتار:119/1)

উযুর পানির ছিটা অন্যের গায়ে লাগলে

জিজ্ঞাসাঃ একজনের উযুর পানির ছিটা অন্য জনের গায়ে পড়লে, যার গায়ে পড়ে তার উযু কি ভঙ্গ হয়ে যাবে ?

জবাবঃ উযুর ব্যবহৃত পানি যদিও অন্যকে পাক করতে পারে না, কিন্তু নিজে পাক। সুতরাং তা অন্যের গায়ে লাগলে, তাতে শরীর নাপাক হওয়া বা উযু ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কারণ নেই। উযুকারীর শরীরে বাহ্যিক নাপাকী থাকার কারণে উযুর পানি নাপাক হলেও যার গায়ে ছিটা লাগে, তার উযু ভাঙ্গবে না। বরং শুধু নাপাক ছিটার জায়গা পাক করে নিলেই চলবে। [প্রমাণঃ কানযুল উম্মাল, ১ : ১৭]

{পৃষ্ঠা-১৮৪}

হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠে সতর খুললে উযু ভাঙ্গবে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ অনিচ্ছাকৃতভাবে হাঁটুর উপরে লুঙ্গি উঠে গেলে উযু ভেঙ্গে যাবে কি-না ?

জবাবঃ এতে ফরয তরক হবে। অবশ্য অনিচ্ছাকৃত হলে গুনাহ হবে না। তবে কোন অবস্থায় এতে উযু ভাঙ্গবে না। কারণ উযু ভাঙ্গার নির্দিষ্ট কিছু কারণ আছে। যেমন শরীর থেকে নাপাক বের হওয়া বা ঘুমানো ইত্যাদি। সতর খুলে যাওয়া উযু ভঙ্গের কারণের মধ্যে পড়ে না। [ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ১ ৩৫]

সন্তানকে দুধ পান করালে উযু ভাঙ্গবে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ উযু থাকা অবস্থায় যদি সন্তানকে দুধ পান করানো হয়, তাহলে উক্ত উযু দ্বারা নামায আদায় কিংবা কুরআন তিলাওয়াত জায়িয হবে কি-না ?

জবাবঃ সন্তানকে দুধপান করানো দ্বারা উযু ভঙ্গ হয় না। সুতরাং সন্তানকে দুধপান করানোর পরও উক্ত উযুতে নামায আদায় করা ও কুরআন তিলাওয়াত জায়িয হবে। [ফাতওয়া দারুল উলূম ৫ : ৪০৮]

গুপ্তাঙ্গে তরল পদার্থ জমা থাকলে উযু ভাঙ্গবে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির প্রস্রাবের রাস্তায় অনেক সময় তরল জাতীয় একপ্রকার পদার্থ জমা থাকে। হাত দ্বারা চাপ দিলে তা বের হয়। এতে উযু ও নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি ? তেমনিভাবে এমতাবস্থায় ইমামতি করা যাবে কি-না ?

জবাবঃ যদি কারো পরিপূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং বাস্তবেও এই হয় যে, এ তরল পদার্থ প্রস্রাবের রাস্তার ভিতরে রয়েছে এবং চাপ না দিলে বাইরে বের হয় না, তাহলে এক্ষেত্রে করণীয় হল কুলুখ নিয়ে পর্দা সহকারে ৮/১০ কদম হাটাহাটি করবে বা কাশি দিবে। এতেই যা বের হয় পানি দিয়ে ধুয়ে নিবে। এরপরও যদি পেশাবের কোন অংশ ভিতরে জমা থাকে, আর তা না বের হয় তাহলে এর দ্বারা উযু ভাঙ্গবে না। এবং নামায ও ইমামতির কোন ক্ষতি হবে না। কোনক্রমেই উক্ত বিশেষ অঙ্গকে টানাটানি করা বাঞ্ছনীয় নয়। আর শরী‘আতে এর নির্দেশও

দেয়া হয়নি। তাছাড়া এরূপ করার পরিণতিতে উক্ত অঙ্গ মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং এর ফলে নানারকম যৌনরোগ দেখা দিতে পারে। তবে অন্ডকোষ ও পায়খানার রাস্তার মাঝামাঝি প্রস্রাবের নালীতে হালকা চাপ দিলে প্রস্রাব পরিষ্কার হয়ে বের হয়। এ জন্য কাশির প্রয়োজন হয় না। এবং ডাক্তারী মতেও কোন সমস্যা হয় না।

ولو نزل البول الى قصبة الذكر لم ينقض الوضوؤ ولو خرج الى القلفة نقض الوضوء۔ كذا في الذخيرة. (الفتاوى الهندية:9/1)

{পৃষ্ঠা-১৮৫}

নখপালিশ থাকা অবস্থায় উযু গোসলের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ নখপালিশ ব্যবহার করলে উযু হবে কি-না ?

জবাবঃ উযুর মধ্যে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া ফরজ, তার একচুল পরিমাণ জায়গা শুকনা থেকে গেলে বা সেখানে পানি না পৌছলে উযু হবে না। নখপালিশ লাগানোর কারণে নখে পানি পৌছে না। অথচ নখে পানি পৌছানো ফরজ। তাই নখপালিশ লাগালে উযু ও ফরজ গোসল কিছুই হবে না। বরং, সে নাপাক থেকে যাবে এবং তার নামায, কুরআন তিলাওয়াত কিছুই জায়িয হবে না, বরং হারাম হবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ২৭]

ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لان فيه لزوجة صلابة تمنع نفوذ الماء. (رد المختار:143/1)

গোসল

গোসল করার সুন্নত তরীকা ও গোসলের পর উযুর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ফরজ গোসল করার নিয়ম-কানুন কি ? কোন পদ্ধতিতে ফরজ গোসল করতে হয় এবং মেয়েলোক ও পুরুষের আলাদা কোন পদ্ধতি আছে কি-না ? আর গোসলের পর নামায পড়তে পুনঃ উযু করতে হবে কি-না ?

জবাবঃ গোসল করার সময় প্রথমে ইস্তিঞ্জা করে নিবে, অতঃপর পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে উভয় হাত ধুয়ে নিয়ে শরীর ও কাপড় থেকে নাপাকী দূর করবে। তারপর হাত ভাল করে পরিষ্কার করে নিবে। অতঃপর নামাজের উযুর মত উযু করে নিবে। উযুর সময় ভালভাবে গড় গড়া করবে এবং নাকের নরম জায়গা পর্যন্ত পানি পৌঁছাবে । উযুর শেষে মাথায় পানি ঢালবে। অতঃপর ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে পানি ঢালবে। এভাবে তিনবার সম্পূর্ণ শরীর ভালভাবে ঘষে গোসল শেষ করবে।

মেয়েলোক এবং পুরুষ লোকের গোসলের নিয়ম একই। তবে মেয়েলোকের খোপা বাঁধা থাকলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছলে তা খোলা জরুরী নয়। কিন্তু পুরুষের চুল সম্পূর্ণ খোলা রাখতে হবে। উপরন্তু মেয়েদের নাক ও কানের অলংকার পড়ার ছিদ্রে যাতে পানি পৌঁছে তা লক্ষ্য রাখতে হবে।

গোসলের পরে নতুন করে উযুর প্রয়োজন নেই।

[প্রমাণঃ ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম, ১ : ১৪৬ # শামী ১ : ১১৯]

لو تكرر الوضوء في مجلس واحد مرارا لم يستحب الوضوء بل يكره لما فيه من الاسراف. (رد المحتار:119/1)

{পৃষ্ঠা-১৮৬}

সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা

জিজ্ঞাসাঃ গোসলখানায় সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে গোসল করা জায়িয আছে কি ?

জবাবঃ যে গোসলখানায় বেপর্দা হওয়ার আশংকা নেই, তথায় একাকী উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করা যদিও জায়িয, কিন্তু উলঙ্গ অবস্থায় গোসল না করাই উত্তম। কেননা এটা তাকওয়ার খেলাপ। হাদীস শরীফে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন, "আল্লাহ তা'আলা লজ্জাশীল ও গোপনীয়তা রক্ষাকারী এবং লজ্জা ও গোপনীয়তাকে ভালবাসেন। সুতরাং তোমরা পর্দার সাথে গোসল কর।" [প্রমাণঃ শরহে মুনিয়্যা, ৫১ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই, ১: ১৬৫ # ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম, ১: ১৪৮ # শরহে কবীর (হালবী কাবীর)]

পুরুষাঙ্গ দিয়ে তরল পদার্থ বের হলে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ উত্তেজনার সহিত পুরুষাঙ্গ হতে যদি লালা জাতীয় কিছু বের হয়ে যায়, তাহলে গোসল করা ফরজ হবে কি-না ? তা কাপরে লাগলে তা নাপাক হবে কি-না।

জবাবঃ উত্তেজনার সময় প্রাথমিক পর্যায়ে পুরুষাঙ্গ হতে লালা জাতীয় যা বের হয়, শরী'আতের পরিভাষায় উহাকে মযী বলে। আর মযী বের হওয়ার দরুন গোসল ফরজ হয় না, বরং উযু করতে হয় এবং শরীরের ও কাপরের যে অংশে লাগবে ঐ অংশ পাক করা জরুরী। [প্রমাণঃ মেশকাত শরীফ, ১: ৪০]

তায়াম্মুম

নামাযের সময় সংকীর্ণতায় ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা যাবে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি কোন এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছে। তারপর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে যে, গোসল ফরয হয়েছে। যদি গোসল করতে যায়, তাহলে ফজরের নামায কাজা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। এমতাবস্থায় পরিধানের কাপড় পরিবর্তন করে তায়াম্মুম করে নামায পড়লে নামায হবে কি-না ?

জবাবঃ যদি কারো গোসল ফরয হয় এবং গোসল করতে তার শরয়ী কোন উজর না থাকে, যেমন মারাত্মক অসুস্থতা বা এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া যায় না, তাহলে এমতাবস্থায় সে যে কোন স্থানেই থাকুক না কেন, তার জন্য গোসল করে নামায পড়া জরুরী। যদিও গোসল করলে নামায কাযা হয়ে যায়, তথাপি এ অবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়ার অনুমতি নেই। কারণ এভাবে সে পাক হতে পারবে না। তাহলে নামায কিভাবে পড়বে ? মেহমানের জন্য গোসল করতে লজ্জা বা সংকোচ শরী'আতে উজর নয়। [প্রমাণঃ হিদায়া, ১:৩১]

{পৃষ্ঠা-১৮৭}

বাসে বা ট্রেনে তায়াম্মুম

জিজ্ঞাসাঃ সফর অবস্থায় বাস বা ট্রেনে তায়াম্মুম করতে হলে কি পরিমাণ ধূলা থাকতে হবে ?

জবাবঃ সফর অবস্থায় বা যে কোন সময় বাস বা ট্রেনে বা এমন যেকোন স্থানে যা মাটি জাতীয় পদার্থে তৈরী নয় তাতে তায়াম্মুম সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, তার মধ্যে এতটুকু পরিমাণ ধূলা থাকা- যাতে ধূলাবালি ভালভাবে হাতে লাগে। উল্লেখ্য, রোগী বা মাজুর ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ যাত্রীদের জন্য তায়াম্মুম করা জায়িয হবে না, যেহেতু ট্রেনে পানি থাকে বা নিজের সাথেও পানি রাখা যায় বা কোন ষ্টেশনে থামলে পানির ব্যবস্থা করা যায়, তেমনিভাবে বাসেও পানি রাখা যায় বা ড্রাইভারকে বলে পানির স্থানে থামিয়ে উযু করে নামায পড়া যায়।

সুতরাং এসকল ক্ষেত্রে সহীহ উজর ব্যতীত তায়াম্মুম করা জায়িয নয়। এদিকে খেয়াল রাখা জরুরী।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ :৫৫]

প্লেনে তায়াম্মুম করে নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ প্লেনে উযুর জায়গায় খুব ভীড় হয়। উযু করতে গেলে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা আছে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে নামায পড়া যাবে কি-না ?

জবাবঃ ভীড় হওয়ার আগেই উযু করতে চেষ্টা করতে হবে। অগত্যা ব্যর্থ হলে এমন পরিস্থিতির জন্য উত্তম হল তায়াম্মুম করে তখন ওয়াক্ত মত নামায পড়ে নিবে এবং পরে সুযোগ মত উযু করে পুনঃ ঐ নামায অবশ্যই কাযা পড়ে নিবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ :৫৪]

পাথর, কয়লা বা চুনা দ্বারা লেপা দেয়ালে তায়াম্মুম করা

জিজ্ঞাসাঃ কয়লা বা পাথর কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম সহীহ হবে কিনা ? চুনা দ্বারা প্রলেপিত দেয়ালে ধূলাবালি না থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম হবে কি-না ?

জবাবঃ কাঠের কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম করলে তায়াম্মুম সহীহ হবে না। তবে পাথরী কয়লা দ্বারা তায়াম্মুম সহীহ হবে। পাথরী চুনা মাটিরই এক প্রকার। আর মাটির যাবতীয় প্রকার দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয। অতএব চুনা দ্বারা প্রলেপিত দেয়ালে তায়াম্মুম করা জায়িয হবে, ঐ দেয়ালে ধুলাবালি থাক বা না থাক।

[আদ্ দুররুল মুখতার,১ : ২৩৯, ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ২৬, আল বাহরুর-রায়িক ১ : ১৪৭-১৪৯, হিদায়া ১ : ১১২, ফাতওয়ায়ে দারুল উলূম ১ : ২২৪, আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৫৭, ফাতাওয়া খলীলীয়া ৭৫]

{পৃষ্ঠা-১৮৮}

وتيمم بطاهر من جنس الارض..........فيجوز التيمم بالتراب و الرمل والسبحة المنعقدة من الارض.......الخ- [الفتاوي الهندية 26/1]

মোজার উপর মাসাহ

কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের কাপরের তৈরী মোজার উপর মাসাহ করে নামায পড়া যাবে কি-না ? মোজার উপর মাসাহ করার নিয়ম কি ?

জবাবঃ আমাদের দেশের কাপরের তৈরী মোজার উপর মাসাহ করা জায়িয হবে না। চামড়া বা এমন মোটা কাপড়ের (যা পড়ে জুতা ছাড়া অনায়াসে হাঁটা যায়) মোজার উপর মাসাহ করা জায়িয আছে। এর নিয়ম এই যে উযু বা গোসলের পর পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করবে। মুকিম একদিন এক রাত এবং মুসাফির তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত উক্ত মোজার উপর মাসাহ করতে পারবে। উল্লেখিত সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মোজা খুলে ফেললে আর মাসাহ করতে পারবে না। নতুনভাবে আবার শুরু করতে হবে। মাসাহ করার পদ্ধতি হল ভিজা হাতের আঙ্গুলসমূহ মোজার সামনের দিকে টেনে নিয়ে একবার মাসাহ করে নিবে। ডান পায়ে ডান হাত দ্বারা এবং বাম পায়ে বাম হাত দ্বারা মাসাহ করবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলুম, ১ : ২৪৬, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১ : ২৬৩]

চামড়ার মোজার নীচে সুতি মোজা থাকলে তার উপর মাসাহ-এর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ চামড়ার মোজার নীচে যদি সুতি বা পশমের মোজা পড়া হয় তাহলে সে চামড়ার মোজার উপর মাসাহ জায়িয হবে কি ?

জবাবঃ চামড়ার মোজার নীচে যদি সুতি বা পশমের মোজা পড়া হয়, তাহলে সে চামড়ার মোজার উপরও মাসাহ করা জায়িয হবে। এতে কোন অসুবিধা হবে না।

و نقل من فتاوي الشامي ان ما يلبس من الكرباس المجرد تحت الخف يمنع المسح علي الخف لكونه فاصلا و قطعة كرباس تلف علي الرجل لايمنع لانه غير مقصود باللبس لكن يفهم مما ذكر في الكافي انه يجوز المسح عليه لان الخف الغير الصالح للمسح اذا لم يكن فاصلا فلان لايكون الكرباس فاصلا اولي- (البحر الرائق- 1/16-115)

[প্রমাণঃ আল বাহরুর-রায়িক, ১ : ৩১৫-১৬ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৬৫ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ৪৪]

{পৃষ্ঠা-১৮৯}

মাযূর

মাযূরের সংজ্ঞা ও হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ (ক) আমি একজন পাইলসের রোগী। মাঝে মাঝে আমার এরূপ হয় যে উযু করার পর পায়খানার রাস্তা দিয়ে সামান্য হাওয়া বের হয়ে যায় । এমতাবস্থায় আমি মাযূর হিসেবে গণ্য হব কি-না ? এবং উক্ত উযু দ্বারা নামায আদায় করা জায়িয হবে কি-না ?

(খ) আর যদি আমি মাযূর হিসেবে গণ্য হই, তাহলে ফজরের উযু দ্বারা ইশরাকের নামায ও কুরআন তিলাওয়াত জায়িয হবে কি-না ? শরী'আতের দৃষ্টিতে মাযূরের সংজ্ঞা কি ?

জবাবঃ (ক) উযু করার পর মাঝে মাঝে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সামান্য হাওয়া বের হলে সে মাযূর হিসেবে গণ্য হবে না এবং একবার উযু করার পর হাওয়া বের হলে উযু দ্বারা তার পক্ষে পুরো ওয়াক্তের নামায পড়া সহীহ হবে না। বরং বায়ু নির্গত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করতে হবে।

(খ) মাযূর ব্যক্তি ফজরের উযু দ্বারা ইশরাকের নামায ও কুরআন তিলাওয়াত করতে পারবে না। তবে সে একবার উযু করে ওয়াক্তের মধ্যে সবরকমের নামায পড়তে ও তিলাওয়াত করতে পারবে।
মাযূর হওয়ার জন্য শর্ত হল, যে কোন ফরজ নামাজের পূর্ণ সময়ের মধ্যে এতটুকু সময় পবিত্র হওয়ার সুযোগ না পাওয়া, যাতে উযু করে ফরয নামায আদায় করা যায়, তাহলে এমন ব্যক্তিকে মাযূর হিসেবে গণ্য করা হবে এবং এমন ব্যক্তি এক উযু দ্বারা ওয়াক্তের মধ্যে ফরজ ও নফল নামায ও তিলাওয়াত যত ইচ্ছা আদায় করতে পারবে। তবে যখন ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে অথবা ওয়াক্তের মধ্যে নির্দিষ্ট ওজর ছাড়া উযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ পাওয়া যাবে, তখন তার উযু নষ্ট হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, একবার মাযূর হওয়ার পর উক্ত ওযর পরবর্তী ওয়াক্তে কেবলমাত্র একবার দেখা দেওয়াই যথেষ্ট। পূর্ণ সময় দেখা দেয়া জরুরী নয়। তবে উক্ত ওজর যদি পূর্ণ ওয়াক্তের মধ্যে একবারও দেখা না দেয় তাহলে তখন থেকেই সে আর মাযূর থাকবে না।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার,১ : ৩০৫, হিদায়া ১ : ৬৭, আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৭৫,]

و صاحب عذر من به سلس البول إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بان لايجد في جميع وقتها زمانا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث- (الدر المختار 305/1)

والمستحاضة ومن به سلس البول و الرعاف الدائم و الجرح الذي لا يرقأ يتوضؤن لوقت كل صلاة فيصلون بذالك الوضوء في الوقت ماشاؤا من الفرائض و النوافل- (الهداية 67/1)

{পৃষ্ঠা-১৯০}

পেট হতে অতিমাত্রায় গ্যাস বের হলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ আমি ইস্তিঞ্জা করার পর উযু করে নামায পড়তে দাড়াই কিন্তু বারবার গ্যাস বের হওয়ায় আমি বারবার উযু করতে বাধ্য হই। কিন্তু সবসময় উযু করা সম্ভব হয় না। একবার উযু করার পর বারবার গ্যাস বের হয়। এতে আমার করণীয় ?

জবাবঃ যদি নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর পূর্ণ এক ওয়াক্তই আপনার এই অবস্থা থাকে এবং এতটুকু সময় না পাওয়া যায়, যে সময়ে আপনি উক্ত ওয়াক্তের ফরজ ও ওয়াজিব নামায আদায় করতে পারেন, তখন আপনাকে শরী'আতের ভাষায় মাযূর বলা হবে। আর মাযূরের হুকুম হল, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পর নতুনভাবে উযু করে নামায আদায় করতে হবে এবং যতক্ষণ ঐ ওয়াক্ত থাকে, গ্যাস বের হওয়ার কারণে উযু নষ্ট হবে না। সুতরাং ওয়াক্তের মধ্যে ঐ উযু দিয়ে সব ধরনের নামায পড়তে পারবেন এবং এক ওয়াক্ত চলে গেলে ঐ ওয়াক্তের উযু দ্বারা অন্য ওয়াক্তের কোন নামায আদায় করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত মাসআলা তখন প্রযোজ্য হবে, যখন সঠিকভাবে জানা যায় বা দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, সত্যিই তার গ্যাস বের হয়ে থাকে। আর তা জানার পদ্ধতি হল আওয়াজ শুনতে পাওয়া বা দূর্গন্ধ পাওয়া বা অন্য কোনভাবে তার দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া যে, ঠিকই তার গ্যাস বের হয়। অন্যথায় যদি শুধু বাতাস বের হওয়ার মত মনে হয় এবং সন্দেহ হয় তাহলে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে এদিকে ভ্রুক্ষেপ না করা উচিত। বরং এই অবস্থায় সময় মত শান্তভাবে নামায পড়ে নিবেন। কেননা এ ধরনের অবস্থা কোন কোন সময় শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে যা নিছক ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, শয়তান মানুষকে আল্লাহ তা'আলা থেকে দূরে সরানোর জন্য এ ধরনের অনেক কিছু করে থাকে। এখন আপনি আপনার অবস্থা অনুযায়ী মাযূর কিনা তা ঠিক করে নিন। বাস্তবে যে অবস্থা হয়, সে অনুযায়ী আমল করতে পারেন। [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ১ : ৪০ # আদ্দুররুল মুখতার,১ : ৩০৬, হিদায়া, ১ : ৬৭-৬৯]

{পৃষ্ঠা-১৯১}

ইস্তিঞ্জা, নাজাসাত

ইস্তিঞ্জাতে ঢিলা-কুলুখ বা টয়লেট পেপার না পাওয়া গেলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ পেশাব-পায়খানা করার পর ঢিলা-কুলুখ না পাওয়া গেলে শুধু পানি খরচ করলে শরীর পাক হবে কি-না ?

জবাবঃ ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা সুন্নত। কারণ, ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার না করলে নাপাকী ভালভাবে পরিষ্কার হয় না । তবে যদি ঢিলা বা টয়লেট পেপার না পাওয়া যায়, তাহলে শুধু পানি দ্বারা অঙ্গ ভালভাবে ধৌত করবে এবং হাত মাটিতে ঘষে অথবা সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে নিবে। তবে পেশাবের পর সাথে সাথে পানি ব্যবহার করবে না কিছুক্ষণ বসে থাকবে, একটু কাশি দিবে বা অন্ডকোষের নীচ থেকে মূত্রনালীর মাথা পর্যন্ত হালকাভাবে একটু মর্দন করে নিবে তারপর পানি ব্যবহার করবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১০৪, বাদায়েউস সানায়ে, ১ : ১৮]

কাপড় বা শরীরে প্রস্রাব লাগলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ আমার ছোট বাচ্চা যখন-তখন প্রস্রাব করে দেয় । ফলে আমার কাপড়সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ভিজে নাপাক হয়ে যায়। যার দরুন প্রতিবার গোসল করে শরীর পাক করা সম্ভব হয় না। তাই সব সময় নামায আদায় করতে পারি না। আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রস্রাব লাগা কাপড় পরিবর্তন করে ও ভিজা কাপড় দ্বারা শরীর মুছে দিলে বা পানি দ্বারা ধৌত করে নামায পড়লে নামায আাদায় হবে কি-না ?

জবাবঃ বাচ্চাদের প্রস্রাব লাগা কাপড় পরিবর্তন করে এবং শরীরের যে অংশে প্রস্রাব লেগেছে, সে অংশ পানি দ্বারা ধৌত করে অথবা ভিজা অঙ্গটি পবিত্র ভিজা কাপড় দ্বারা তিনবার মুছে নামায পড়লে নামায আাদায় হবে।

উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা ফরয, এসব সাধারণ অযুহাতে নামায কাযা করা জায়িয হবে না।

[প্রমাণঃ সূরা নিসাঃ ১০৩ # নাসবুর রায়াহ ১ : ১২৮ # আদ্দুরুলমুখতার,১ : ৩০৯ # হিদায়া, ১ : ৭৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১ : ২৮৩-২৯১,ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৪৩-৪৪]

কেঁচোর মাটি দ্বারা কুলুখ নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ কেঁচোর মাটি পাক কি-না ? এর দ্বারা ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করা জায়িয হবে কি-না ?

জবাবঃ যেহেতু কেঁচো জমিনের কীট-পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী। রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী নয়। অতএব, এর মুখের লালা ও এবং পায়খানা নাপাক নয়। সুতরাং

{পৃষ্ঠা-১৯২}

কেঁচোর মাটিও নাপাক নয়। একই কারণ মধুতেও বিদ্যমান। কারণ, তাতে মধু পোকার পায়খানার মিশ্রণ থাকে। কেঁচোর মাটি নাপাক ধরলে, মধুকেও নাপাক ধরতে হবে। অথচ সর্বসম্মতভাবে মধু নাপাক নয়। সুতরাং কেঁচোর মাটিও নাপাক নয়। তা দ্বারা ঢিলা-কুলুখ জায়িয হবে।

নাপাক শরীর ও নাপাক কাপড় ধোয়া পানির ছিটা ও গোসলান্তে গায়ে লেগে থাকা পানির হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ (ক) নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় সাবান ও পানি মিশ্রিত ছিটা শরীরে লাগলে শরীর নাপাক হবে কি ?

(খ) ফরয গোসলের পর শরীরে যে পানি লেগে থাকে তা না মুছে কাপড় পরিধান করলে সে কাপড় নাপাক হবে কি ? ফরয গোসল করার সময় শরীর থেকে পানির ছিটা কাপড়ে পড়লে তা নাপাক হবে কি ?

জবাবঃ (ক) যে সমস্ত কাপড় সম্পর্কে দৃঢ় ভাবে জানা যায় যে, কাপড়টি নাপাক, ঐ কাপড় ধৌত করার সময় সাবান পানি মিশ্রিত ছিটাগুলোও নাপাক হবে। তাই যে সমস্ত অঙ্গে উক্ত পানির ছিটা পড়বে, ঐ অঙ্গগুলো অবশ্যই ধৌত করে নিতে হবে। কারণ, অল্প পানির মধ্যে নাপাক পতিত বা মিশ্রিত হওয়ার দ্বারা পানি নাপাক হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত পানির ছিটার কারণে সমস্ত শরীর নাপাক হবে না।

(খ) নাপাকী থেকে গোসল করার পর শরীরে যে পানি লেগে থাকে তা না মুছে কাপড় পরিধান করলে তা নাপাক হবে না। আর ফরয গোসল করার সময় শরীর থেকে পানির ছিটা পড়লে উক্ত কাপড়ও নাপাক হবে না। কারণ এ ধরনের পানির ছিটা নাপাক নয়। তবে শর্ত হল গোসলের পূর্বেই শরীরের বাহ্যিক নাপাকী দূর করে নিতে হবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৪১ #ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ২৩, ১ : ১৫]

নাপাক কাপড় বালতিতে পাক করার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ নাপাক কাপড় বালতিতে রেখে ভালভাবে পানি দ্বারা ধৌত করে উক্ত কাপড় ভালভাবে নিংড়ানোর পর সেই পানি ফেলে দেয়া হল। এভাবে পর পর তিনবার ধৌত করা হয়, এতে কাপড়টি পাক হবে কি ? উল্লেখ্য, আল্লামা আশরাফ আলী থানভী (রঃ) কর্তৃক প্রণীত 'বেহেশতী জেওর' নামক কিতাবে লেখা রয়েছে- 'যেই পানি দ্বারা কোন নাপাক জিনিস ধৌত করা হয়, সেই পানি নাপাক হয়ে যায়।' সুতরাং নাপাক কাপড় ধৌতকৃত বালতিতে রক্ষিত পানি নাপাক হয়ে যায়। সুতরাং নাপাক কাপড় ধৌতকৃত বালতিতে রক্ষিত পানি যেহেতু নাপাক হিসেবে পরিগণিত, তাই দ্বিতীয় বার ও তৃতীয়বার বালতিতে পানি দিয়ে কাপড় ধৌত করার পূর্বে বালতি পাক করে নিতে হবে কি ?

{পৃষ্ঠা-১৯৩}

জবাবঃ পেশাব ইত্যাদি দৃশ্যমান নয় এমন নাপাকী দ্বারা যদি কাপড় অপবিত্র হয়, তাহলে প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে পর পর তিনবার ধৌত করার দ্বারা কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে । আর যদি নাপাকী রক্ত ইত্যাদির মত দৃশ্যমান হয় তাহলে নাপাকী দূর করার দ্বারাই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে একবার বা তিনবার ধৌত করার প্রশ্ন নেই।

আর নাপাক কাপড় ধৌত করার সময় প্রত্যেকবার ভিন্নভাবে বালতি ধুয়ে পাক করার প্রয়োজন নেই। তৃতীয়বার কাপড়টি ধৌত করার পর তা পাক হয়ে যাবে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় বার বালতি থেকে পানি সবটুকু ফেলে দিয়ে পরবর্তী বারের জন্য পানি নেয়া প্রয়োজন।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার, ১: ৩০৮, ১: ৩২৮, ১: ৩৩১ #ফাতাওয়া আলমগীরী, ১: ৪২]

কিবলামুখী বাথরুমের হুকুম এবং তা ব্যবহারের নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ সৌদী আরবে বাসা কিংবা অফিসে টয়লেট নির্মানের ব্যাপারে বাংলাদেশের মত সতর্কতা অবলম্বন করা হয় না বলে প্রায়ই কাবার দিকে মুখ করে বা কিংবা পিঠ করে মলমূত্র ত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়। তারা বলে "চার দেয়াল ঘেরা বাথরুমে যেদিকে খুশি, সেদিকে ফিরে পেশাব পায়খানা করতে পারে।" তাদের এ কথা ঠিক কি-না ? এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি ?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব মতে, পেশাব-পায়খানার সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা পিঠ করা, খোলা ময়দানে হোক বা দেয়াল ঘেরা স্থানে হোক সব স্থানেই মাকরুহে তাহরীমী। হাদীস শরীফে আছে, 'যখন পেশাব-পায়খানার জন্য বসবে তখন কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ করবে না।' এ হাদীসে খোলা স্থান বা দেয়াল ঘেরা স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সাহাবা (রাঃ) যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর অর্থ বেশী বুঝতেন, তাদের আমল লক্ষ্য করলেও প্রমাণিত হয় যে, দেয়ালঘেরা স্থানেও কিবলামুখী হয়ে বা কিবলার দিকে পিঠ করে বসা নিষেধ। যেমনঃ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাযিঃ) সাহাবীগণের (রাযিঃ) এক জামা'আতসহ সিরিয়া সফরে গেলে নাসারাদের দেশ হিসেবে সমস্ত বাথরুমগুলো ইসলামী তরীকার খেলাফ ছিল। তথাপিও তাঁরা সতর্কতার সাথে কিবলার দিকে মুখ বা পিঠ না করে অত্যন্ত কষ্ট করে এদিকে ওদিকে ফিরে জরুরত পূর্ণ করেছিলেন। হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন কেউ যদি ভুলে কিবলার দিকে মুখ করে ইস্তেঞ্জায় বসে ; অতঃপর হঠাৎ স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে কিবলার দিক থেকে অন্যদিকে সরে যায়, তবে তার ঐ বসা থেকে উঠে অন্যদিকে ফিরতে যতটুকু সময় লাগে, এর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। তাই কোন অবস্থায়ই কিবলার দিকে মুখ করা

{পৃষ্ঠা-১৯৪}

বা পিঠ করা যাবে না। নিরুপায় হয়ে গেলে তখন বাথরুমে বসে এদিক-ওদিক মোড় নিয়ে জরুরত পূরণ করে নিবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৩ : ১১-১২ # ইমদাদুল মুফতীন, ৩০০ # বুখারী শরীফ, ১ : ২৬ # তিরমিযী শরীফ, ১ : ৮ # আবু দাউদ শরীফ, ১ : ৩ # মিশকাত শরীফ, ১ : ৪২ # তানজীমুল আশতাত, ১ : ১৩৮-৩৯ # নূরুল ইযাহ, ৩০ # মাজাহেরে হক, ১ : ১২০ # আলমগীরী, ১ : ৫০ # ফাতাওয়া শামী, ১ : ৩৪১ # আল মুগনী, ১ : ১৬২]

শরীরে প্রস্রাবের ছিটা লাগার ওয়াসওয়াসা হলে কি হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ইস্তিঞ্জা করার পর আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রস্রাবের ছিটা আমার শরীরে লেগেছে, তাহলে কি আমি ভাবতে পারি যে, আমি নাপাক হয়ে গেছি ? এ সম্পর্কে শরী'আতে কি বিধান আছে ?

জবাবঃ না, আপনার এরূপ ভাবার কোন অবকাশ নেই। নিশ্চিতভাবে ছিটা লাগা অনুভব হওয়া বা দেখা ব্যতীত সন্দেহের কারণে এরূপ ভাবা শরী'আতে নিষেধ। আর সুঁইয়ের অগ্রভাগের পরিমাণ যেসব প্রস্রাবের ছিটা গায়ে লাগে তাতেও শরীর নাপাক হয় না। সুতরাং এর দ্বারা আপনি নাপাক হবেন না। তবে শুধু ছিটার জায়গা ধুয়ে নেয়া ভাল। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১০৫]

প্রস্রাব হতে জায়গা পাক করার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ (ক) নীচতলার পাকা মেঝেতে ছোট বাচ্চা প্রায়ই প্রস্রাব করে দেয়। ফলে মেঝে নাপাক হয়ে যায়। এখন উহা পাক করার পদ্ধতি কি ?

(খ) উক্ত জায়গাটি তাৎক্ষণিকভাবে পাক করার সহজ তরীকা কি হতে পারে ? আর যদি পানি সেখান থেকে গড়িয়ে বের করার কোন পথ না থাকে তাহলে জায়গাটি পাক করার উপায় কি হবে ?

(গ) উযু করার পর ভেজা পায়ে ঐ মেঝেতে হাঁটলে পায়ের তলা কি নাপাক হবে ?

জবাবঃ (ক) পাকা ঘরের মেঝের নাপাক স্থানটুকু শুকনা বা ভেজা কাপড় দ্বারা মুছে দেয়ার পর যদি বাতাসে বা রোদে শুকিয়ে নাপাকীর চিহ্ন দূর হয়ে যায়, তাহলে ঐ স্থানটুকু পাক হয়ে যাবে। তবে নাপাকীর সামান্য চিহ্ন থাকলেও তা পাক হবে না। এজন্যে প্রথমে প্রস্রাবটুকু মুছে নিয়ে একটি পাক কাপড় ভিজিয়ে উক্ত জায়গাটা প্রাথমিকভাবে ২/৩ বার মুছে নিবে, যাতে শুকিয়ে যাওয়ার পর প্রস্রাবের দুর্গন্ধ বা চিহ্ন না থাকে। [প্রমাণঃ আবু দাউদ শরীফ, ১ : ৫৫ # ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১ : ৪৪, আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৯২]

(খ) পাকা মেঝে বা ফ্লোর নাপাক হয়ে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পাক করার সহজ পদ্ধতি হল, নাপাক জায়গায় পানি ঢেলে ভালভাবে ঝাড়ু দিয়ে ধুয়ে দিবে এভাবে তিনবার ধুয়ে নিলে জায়গাটা পাক হয়ে যাবে। আর যদি পানি

{পৃষ্ঠা-১৯৫}

গড়িয়ে বের করার ব্যবস্থা না থাকে , তাহলে প্রথমে একটি শুকনো বা ভেজা কাপড় দিয়ে প্রস্রাবটুকু মুছে দিবে। অতঃপর কাপড়টি ভাল করে ধুয়ে নাপাক জায়গাটা আবার মুছে দিবে। এক্ষেত্রে প্রতি বারই নতুন পানি ব্যবহার করবে। এভাবে তিনবার পাক কাপড় দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিলে জায়গাটা পাক হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, নিচতলা এবং উপরতলার হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার, ১ ৩১৩ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৪৩ # হিন্দিয়া, ১ : ৪৩-৪৪]

(গ) উল্লেখিত নিয়মাবলীর কোন এক নিয়মে নাপাক জায়গা পাক হয়ে যাওয়ার পর সেখানে ভিজা পায়ে হাঁটলে পা নাপাক হবে না। আর যদি উক্ত জায়গাটি উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে পাক না করা হয়ে থাকে,

তাহলে সেখানে খালি পায়ে হাঁটলে নাপাক হয়ে যাবে । সেক্ষেত্রে নামায পড়তে হলে, পা দ্বিতীয়বার ধুয়ে নিতে হবে।

قال في الشامي: ولو اريد تطهيرها عاجلا يصب عليها الماء ثلاث مرات وتجفف في كل مرة بخرقة طاهر- [الشامي 311/1]

[প্রমাণঃ হালবী কাবীর, ১৫৬ # আদ-দুররুল মুখতার, ১ : ৩১১ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২ : ১৫০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১ : ৩৩২]

পাক কাপড়ের অভাবে নামাজ আদায়ের সহজ সূরত

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন বাচ্চার মা, বাচ্চা একটু পর পর পেশাব-পায়খানা করে। কাপড় পাল্টিয়ে সারতে পারি না। অতিরিক্ত তেমন কোন কাপড়ও নেই, বিধায় এ মুহূর্তে নামাযের জন্য আমার করণীয় কি ?

জবাবঃ বাচ্চাদের পেশাবও নাপাক। নামায পড়ার সময় পাক কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে হবে। আর এর জন্য অনেক কাপড় থাকার দরকার নেই। নামায পড়ার জন্য মাত্র একটা পাক কাপড় আলাদাভাবে হিফাজত করে রাখবেন। আর যে কাপড়ে বাচ্চা পেশাব করেছে, নামযের সময় সে কাপড়টা পরিবর্তন করে নিবেন এবং নামায আদায় করার পর পাক কাপড়টা রেখে দিয়ে যে কাপড়ে পেশাব করেছে ঐ কাপড়টার শুধু পেশাব লাগার স্থানটুকু ধুয়ে পরিধান করবেন। না ধুয়ে পরিধান করলেও কোন ক্ষতি নেই। নাপাক কাপড়ের দ্বারা শরীর নাপাক হলে বা শরীরে পেশাব লেগে থাকলে নামাযের সময় শরীরও ধুয়ে পাক করে নিবেন।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১ : ২৯১ # নাসবুর রায়াহ ১ : ২৭৩]

কেরোসিন তৈল শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কেরোসিন তৈল পবিত্র না অপবিত্র ? উযু করার পরে তা শরীরে লাগলে নামায হবে কি-না ? কাপড়ে লাগলে ধোয়া ব্যতীত নামায পড়া যাবে কি-না ?

{পৃষ্ঠা-১৯৬}

জবাবঃ কেরোসিন তৈল যেহেতু খনিজ দ্রব্য, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কোন নাপাক বস্তুর সাথে সংমিশ্রণ না ঘটে, ততক্ষণ তার নাপাক হওয়ার কোন যুক্তি নেই। তবে কেরোসিন তৈল কাপড়ে লাগলে ধৌত করা ব্যতীত নামায পড়লে দুর্গন্ধের কারণে নামায মাকরূহ হবে।

এ দুর্গন্ধের কারণেই হারিকেন বা কেরোসিনের অন্য কোন আলো মসজিদে নেয়া মাকরূহ। এগুলো মসজিদের বাইরে রাখতে হয়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৩০৫ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ২ : ১৭১]

নাপাক ভিজা কাপড়ে শুকনো পাক কাপড় বা হাত লেগে গেলে তার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ শুকনা পাক কাপড় বা হাত পেশাবে বা নাপাক ভিজা কাপড় বা অন্য কিছুতে কি পরিমাণ বা কেমনভাবে লাগলে নাপাক হবে ? শুধু স্পর্শতেই কি নাপাক হয়ে যাবে ?

জবাবঃ শুকনা পাক কাপড় বা হাত পেশাবে বা নাপাক ভিজা কাপড় বা অন্য কিছুতে যদি এ পরিমাণ লাগে যে, শুকনো বস্তু নিংড়ালে তা হতে পানি ঝরে বা হাত ভিজে যায় । তাহলে পাক বস্তু নাপাক হয়ে যাবে । শুধু স্পর্শ করার দ্বারা পাক বস্তু নাপাক হবে না ।
[প্রমাণঃ গুনয়াতুল মুতামাল্লী ১৭১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ১ : ১৩৫]

নাপাক খাট, গদি বা তোষকের উপর নামায পড়ার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ নিয়মানুযায়ী নামাযের স্থান পাক-পবিত্র হওয়া শর্ত । কিন্তু কোন খাটের কাঠ, গদি ও তোষক ইত্যাদির উপর যদি ছোট বাচ্চা প্রস্রাব করার পর শুকিয়ে যায়, এমতাবস্থায়

উক্তখাটের কাঠ, গদি ও তোষকের উপর অন্য কোন পবিত্র কাপড়, চাদর বা মোটা বিছানা বিছিয়ে নামায আদায় করা যাবে কিনা ?

জবাবঃ খাট, গদি বা তোষক ইত্যাদিতে প্রস্রাব লেগে শুকিয়ে গিয়ে থাকলে, যদিও শুকানোর কারণে তা পাক হয় না, তবুও তার উপর কোন পাক কাপড়, চাদর বা বিছানা বিছিয়ে নামায পড়া যাবে। উক্ত পবিত্র কাপড় বা বিছানা বিছানোর দ্বারাই নামাযের জায়গা পাক হওয়ার শর্ত আদায় হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ হালবী কাবীর, ১৯৯]

ভাতের মাঝে ডিম সিদ্ধ করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ অধিকাংশ লোকই ভাত রান্না করার সময় হাড়ির ভিতর ডিম সিদ্ধ করে। কিন্তু অনেক আলেমের কাছে শুনি ভাতে ডিম দিলে, ঐ ভাত নাপাক হয়ে যায়। এটা নিয়ে অনেক দিন থেকে সন্দেহের দোলায় দুলছি। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিস্তারিত হুকুম কি ?

জবাবঃ ডিম ভাতের ভিতর সিদ্ধ করতে দেয়ার পূর্বে যদি ভালভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়া হয়, তাতে ভাত নাপাক হবে না। কারণ, ডিম ভালভাবে

{পৃষ্ঠা-১৯৭}

ধোয়ার পরে ডিম পবিত্র হয়ে যায়। তবে না ধুয়ে সিদ্ধ হতে দিলে, ডিমের উপরিভাগে নাপাক হওয়ার দরুন সম্পূর্ণ ভাত নাপাক হবে। কিন্তু ধুয়ে দেয়ার পর সেই সন্দেহ আর থাকে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৩২৮]

স্বপ্নদোষে মসজিদ নাপাক হলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ কারো যদি মসজিদে স্বপ্নদোষ হয় তাহলে সে কি করবে ? সমস্ত মসজিদ পানি দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে না, না যেখানে ঘুমিয়েছিল সে স্থানটা শুধু পরিষ্কার করলেই চলবে ?

জবাবঃ ইতিকাফকারী ও মুসাফির ব্যতীত অন্য কারো জন্য মসজিদে ঘুমানো মাকরূহ। মসজিদে ঘুমানোর পূর্বে উচিত হল, মোটা কোন বস্তু বিছিয়ে তার উপর ঘুমানো। মসজিদে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে, যদি মসজিদে নাপাকী লেগে যায়, তবে যতটুকু জায়গায় নাপাকী লেগেছে, ততটুকু জায়গা ধুয়ে নিলে চলবে, সম্পূর্ণ মসজিদ ধোয়ার প্রয়োজন নেই। আর যদি মসজিদে নাপাকী না লাগে, বরং নাপাকী শুধু ঘুমন্ত ব্যক্তির নিজস্ব বিছানা বা কাপড়েই সীমিত থাকে, তাহলে মসজিদ ধোয়ার প্রয়োজন নেই। মসজিদের বিছানায় নাপাক লাগলে বিছানার সেই অংশটুকু ভালভাবে ধুয়ে পাক করে নিতে হবে।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ২ : ৭১১ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৬ : ১২১-২২]

নাপাক বীর্যে সৃষ্ট মানুষের পবিত্রতা

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক লোক বলেন- মানুষ বীর্যের সৃষ্টি, আর বীর্য নাপাক, সুতরাং মানুষ হাকীকতে নাপাক। এই মানুষ সাবান ইত্যাদি লাগিয়ে পাক হবে কিভাবে। তার এই কথাটি কি ঠিক ?

জবাবঃ মানব জাতি মূল পদার্থ বা যে মূল ধাতু (বীর্য) থেকে সৃষ্টি, তা মূলতঃ নাপাক, কিন্তু এই মূল পদার্থ মানবাকার ধারণ করার পূর্বে পর্যায়ক্রমে যখন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর হয়, তখন তাতে পূর্বাবস্থার কোন প্রকার হাকীকত বা অস্তিত্ব বাকী থাকে না। তাই সেই বীর্য যখন রক্তপিন্ড, অতঃপর সেই রক্তপিন্ড থেকে গোশতের টুকরা হল তখনই তা পবিত্র হয়ে গেল। তারপর গোশতের টুকরায় হাড় দেয়া হল এবং তাতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে আত্মার সমন্বয়ে একজন সুন্দর ও সুঠাম পবিত্র মানুষে রূপান্তর করা হয়। সুতরাং এ বীর্য যখন প্রকারান্তে ধারাবাহিকভাবে পাঁচটি ধাপ অতিক্রম করে সর্বশেষ মানবাকারে ধারণ করে, তখন তাতে বীর্যের

কোন হাকীকত বা অস্তিত্ব বাকী থাকে না । যেমন-ধরুন মুরগী কোন নাপাক বস্তু খেল, আর সেই নাপাক দ্রব্য তার পেটে গিয়ে তা থেকে তার গোশত তৈরি হল । বলুন তো এ গোশত পাক হবে না নাপাক হবে ? নিঃসন্দেহে পবিত্র ও হালাল হবে । কারণ, সেই নাপাক দ্রব্য
{পৃষ্ঠা-১৯৮}
গোশতে রূপান্তর হওয়ার পর তার নাপাকীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেয়েছে । তদ্রুপই উল্লেখিত ব্যপারটি । কাজেই মানুষ হাকীকতে নাপাক এবং ‘এই মানুষ সাবান লাগিয়ে গোসল করলেও পাক হয় না’ এমন মন্তব্য করা আদৌ ঠিক নয়, বস্তুতঃ এ ধরনের মন্তব্য করা তারই জন্য সম্ভব, যার কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ।
[প্রমাণঃ তাফসীরে কাবীর, ৩০ : ২৩৬ # তাফসীরে মা‘আরিফুল কুরআন, ৬ : ৩০৩]

কাপড় পাক করার তরীকা ও নতুন কাপড় না ধুয়ে পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ (ক) কাপড় পাক করার সহীহ তরীকা কি ? (খ) নতুন কাপড় ধৌত করা ব্যতীত পরিধান করে নামায আদায় হবে কি ?

জবাবঃ কাপড় বিভিন্ন ভাবে নাপাক হতে পারে । সুতরাং তা পাক পবিত্র করার তরীকাও ভিন্ন ভিন্ন । যদি কাপড়ে এমন নাপাকী লাগে যা দেখা যায়- যেমন রক্ত, মল বা এজাতীয় অন্য কিছু, তাহলে ধৌত করার মাধ্যমে উক্ত নাপাকী দূর হয়ে গেলেই কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে । এক্ষেত্রে তিনবার ধৌত করার প্রয়োজন নেই । তবে সুন্নাত হল, প্রত্যেক বার নিংড়িয়ে তিনবার ধুয়ে নেয়া । আর যদি তিনবার ধৌত করার পরেও নাপাকী দূর না হয়, তবে তিনবারের অতিরিক্ত ধৌত করাও জরুরী ।
উল্লেখ্য যে, আসল নাপাকী দূর হওয়ার পরও যদি নাপাকীর কোন আলামত বা চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে এবং কষ্ট ব্যতীত তা দূর করা সম্ভব না হয়, তাহলে নাপাকীর উক্ত আলামত বা চিহ্ন দূর করার জন্য অতিরিক্ত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই ।
আর যদি নাপাকী দেখা না যায়, যেমন প্রস্রাব বা তরল জাতীয় অন্য কোন নাপাকী, তাহলে তিনবার ধৌত করে ভালকরে নিংড়ানোর দ্বারাই এ জাতীয় নাপাকী হতে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে । কাপড় পাক-পবিত্র করার উল্লেখিত পন্থা দুটি কেবল মাত্র সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য, যখন নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, নাপাকী অমুক জায়গায় লেগেছে, কিন্তু নাপাকী কোথায় লেগেছে তা যদি জানা না যায়, তাহলে সম্পূর্ণ কাপড় ধৌত করা জরুরী ।

(খ) যদি কোন ভাবে জানা যায় যে, নতুন কাপড়ে নাপাকী লেগে আছে, তাহলে উক্ত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে না । আর যদি নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে, নতুন কাপড়ে নাপাকী নেই, তাহলে এরূপ নতুন কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে ।
তেমনি ভাবে নতুন কাপড়ে নাপাকী লেগে আছে, কি নেই, যদি কোনটাই জানা না থাকে, তাহলে উক্ত কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করা জায়িয হবে । তবে ধৌত করে নেয়া উত্তম ।
[প্রমাণঃ ত্বাহাবী শরীফ, ৪১ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৪১ # ফাতহুল কাদীর, ১ : ১৬৮ # হিদায়া, ১ : ৭৭-৭৮]
{পৃষ্ঠা-১৯৯}

প্রস্রাবের ছিটা সম্পর্কে

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় দেখা যায় যে, পেশাব করার সময় পেশাবের ছিটা লুঙ্গি অথবা পাজামায় লেগে যায় তখন নামাযের জন্য কাপড় পাল্টাতে হলে বাড়ীতে যেতে হয় । এতে

জামা'আত ছুটে যায় । আর জামা'আত ধরতে গেলে পেশাবের ছিটা সহ নামায পড়তে হয় । এমতাবস্থায় করণীয় কি ?
অনেক মুরুব্বিদের মুখে শুনি এমতাবস্থায় কাপড়ের মাথা থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ তিনবার ধুয়ে নিলে পাক হয়ে যায় । এটা শরী'আত সম্মত কিনা জানাবেন ।

জবাবঃ পেশাব করার জন্য তৈরীকৃত নির্ধারিত স্থান তথা বা ঢালু স্থান ব্যতীত অন্যত্র যথা অসমতল ভুমিতে পেশাব করার প্রয়োজন দেখা দিলে তার জন্য সুন্নাত তরিকা হচ্ছে, এমন স্থানে পেশাব করা যাতে পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা শরীরে না লাগে । সুতরাং শক্ত জায়গা, পাথর বা বাতাসের বিপরীতে পেশাব করা সুন্নাতের খেলাফ । যদি পেশাবের ছিটা কাপড়ে লাগে আর তা যদি সূঁচের মাথার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় তাহলে তা মাফ এবং কোন সমস্যা ছাড়াই নামায সহীহ হয়ে যাবে । আর যদি বেশী হয়ে আয়তনে অনুর্ধ্ব এক দিরহাম (হাতের তালুর মাঝের নিচু অংশ) পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে ধুয়ে নেয়া ওয়াজিব । না ধুয়ে নামায পড়লে মাকরূহে তাহরীমীর সহিত নামায হয়ে যাবে, অবশ্য উক্ত নামায দ্বিতীয় বার দোহরায়ে পড়তে হবে । আর যদি এক দিরহামের চেয়ে বেশী হয় বা বিভিন্ন জায়গায় ছিটা লাগে কিন্তু সবগুলো মিলে আয়তনে এক দিরহামের চেয়ে বেশী হয়ে যায়, তাহলে না ধুলে নামায হবে না । বরং উক্ত কাপড়ে নামায পড়তে হলে নাপাকী দূর করার জন্য তা ধুয়ে নেয়া ফরজ । তবে যদি কেউ কাপড়ের পেশাব লাগার স্থানটি ভুলে যায়, সুনির্ধারিত ভাবে বুঝতে না পারে যে, কাপড়ের কোন অংশে পেশাব লেগেছে, তাহলে চিন্তা-ফিকির করে একটি জায়গা নির্ধারণ করে ঐ জায়গাটি ধুয়ে নিবে । এভাবেও উক্ত কাপড় পাক হয়ে যাবে । কিন্তু যদি তার নিকট পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পেশাব অন্য জায়গায় লেগেছে, তাহলে ঐ কাপড় পরিধান করে যে কয় ওয়াক্ত নামায পড়েছে তা আবার দোহরায়ে নিতে হবে ।

[ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৫০, ৪৩, আদ্দুররুল মুখতার ১ : ৩১২, ৩১৬, ফাতাওয়া দারুল উলুম ১ : ২৮৩]

وعفي......البول انتضح كرؤوس إبر وكذا جانبها الاخر وان كثر باصابة الماء للضرورة. (الدر المختار:312/1)
وعفا الشارع عن قدر درهم وان كره تحريما فيجب غسله وما دونه تنزيها فيسن وفوقه مبطل فيفرض. (الدر المختار:316/1)

{পৃষ্ঠা-২০০}

হায়েয নেফাস

হায়েযের অবস্থায় যিকির-আযকার

জিজ্ঞাসাঃ মহিলারা হায়েযের অবস্থায় তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-আযকার করতে পারবে কি-না ?

জবাবঃ হায়েযের অবস্থায় নামায ও তিলাওয়াত ব্যতীত জিকির-আযকার, দরূদ শরীফ, ওযীফা পড়তে পারবে, কোন নিষেধ নেই । বরং মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব যে, প্রত্যেক নামাযের সময় উযু করে জায়নামাযে বসে নামায পড়ার সময় পরিমাণ ওযীফা, দু'আ, দরূদ ও ইস্তিগফার পড়া । এতে তার আমলনামায় হাজার রাকা'আত নামাযের সওয়াব লিখা হয়, সত্তর হাজার গুনাহ মাফ হয়, মর্যাদা বেড়ে যায় এবং ইস্তিগফারের প্রত্যেক শব্দের বিনিময়ে একটি করে নূর লাভ হয়, আর শরীরের প্রত্যেক ফোঁটা রক্তের বদলে হজ্ব ও ওমরার সওয়াব লিখা হয় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ১৯৬ বরাতে মাজালিসুল আবরার ৫৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৭৭]

ঔষধ খেয়ে হায়েয বন্ধ করতঃ রোযা রাখা ও সহবাস করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে অনেক মেয়েলোক ট্যাবলেট খেয়ে মাসিক বন্ধ করে দেয় । এভাবে হায়েয বন্ধ করে রোযা পালন করা বা স্বামীর সহিত মেলামেশা করা শরী'আত মুতাবিক জায়িয আছে কি ? ট্যাবলেট খেয়ে মাসিক বন্ধ করা বৈধ কি-না ?

জবাবঃ ট্যাবলেট খেয়ে হায়েয বন্ধ করে রোযা রাখলে রোযা হয়ে যাবে । ট্যাবলেট দ্বারা হায়েয বন্ধ হলে স্বামীর সাথে মেলামেশাও করতে পারে । তবে মেয়েদের স্বাভাবিক অবস্থার বিরুদ্ধে এ নিয়মকে শরী'আত পছন্দ করে না । কারণ, এর দ্বারা শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে । তাই ট্যবলেট না খাওয়াই উত্তম । বরং হায়েয চালু থাকতে দিবে এবং পরবর্তীতে রোযা কাযা করে নিবে । মনে রাখবেন, এতে রমযানের রোযার সওয়াব কমবে না ।
[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১ : ৩৮, ১ : ১৯১ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬ : ৪০৪]

হায়েয অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ পূর্ণবয়স্কা মহিলার বিবাহ হচ্ছে না এমতাবস্থায় এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসল । শর্ত হল তাকে কুরআন পাঠ করে শুনাতে হবে । উল্লেখ্য যে, মহিলা ঐ সময় হায়েয অবস্থায় ছিল । অপারগ হয়ে হায়েয অবস্থায়
{পৃষ্ঠা-২০১}
মহিলা কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছে । এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন হয়েছে এবং এখন এর জন্য কি করণীয় ?

জবাবঃ হায়েয অবস্থায় কুরআন শরীফ তিলাওয়াত নাজায়িয । সুতরাং উক্ত মেয়ের জন্য কুরআন পড়ে শুনানো জায়িয হয়নি । বরং তার জন্য উচিত ছিল যে, হয়তো এ অসুস্থতা বা উজরের কথা উল্লেখ করে সময় নেয়া, অথবা আয়াতুল কুরসী বা এরূপ অন্য কোন দু'আ কিংবা এরূপ আয়াত বা হাদীসে ওজীফা হিসেবে পড়ার নির্দেশ এসেছে । তা দু'আর নিয়্যতে পড়ে শুনিয়ে দেয়া, তিলাওয়াতের নিয়্যতে নয় । এখন উক্ত মেয়েটি আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করে খালিস দিলে তওবা করে নিবে । [প্রমাণঃ শামী, ১ : ২৯৩, # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৬৭]

মাসিক চলাকালীন দু'আ বা সূরা লিখে মুখস্ত করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ মাসিক চলাকালীন কোন দু'আ অথবা সূরা বাংলায় অথবা ইংরেজীতে লিখে মুখস্ত করা যায় কি-না ?

জবাবঃ মাসিক চলাকালীন যে কোন দু'আ আরবী ভাষায় লিখে বা পড়ে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে মুখস্ত করা যায়, ভিন্ন ভাষার প্রয়োজন নেই । তবে কোন সূরাকে মুখে উচ্চারণ করে তিলাওয়াত বা মুখস্ত করা যায় না । এমনিভাবে যে সকল সূরা বা আয়াতে দু'আর বা ওযীফার দিক আছে সেগুলোকে দু'আ বা ওযীফার নিয়্যতে পাঠ করা যায় । উল্লেখ্য কুরআন তিলাওয়াত শুধু আরবী ভাষাতেই হবে । অন্য ভাষায় সহীহ উচ্চারণ, তিলাওয়াত সম্ভব নয় ।
وفي الدر المختار: ولا بأس لحائض وجنب بقرائة قرآن بقصده. فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء او شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القرائة لا باس به. (الفتاوى الشامية:293/1)

পূর্ব মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই মাসিক বন্ধ হলে নামায পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ একজন মহিলার প্রতি মাসে প্রায় ৬ দিন করে মাসিক হয় । এক মাসে ৫ দিনের মাথায় আছরের নামাযের পূর্বে বন্ধ হয়ে যায় । তবুও নামায না পড়ে ৬ দিনের অপেক্ষায় থেকে ফজরের সময় আর মাসিক হল না দেখে গোসল করে নামায পড়েছে । কিন্তু যোহরের পূর্বে আবার রক্ত দেখা যায় । তখন ঐ মহিলা নামায পড়ার দরুন গোনাহগার হবে কি ?

জবাবঃ পূর্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই যদি রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তার জন্য সতর্কতামূলক গোসল করে পাক পবিত্র হয়ে নামায পড়ে নেয়া উচিত।

{পৃষ্ঠা-২০২}

কিন্তু এমতাবস্থায় সহবাস থেকে বিরত থাকতে হবে, যেহেতু এখনো রক্ত আসার সম্ভাবনা আছে । সুতরাং মহিলাটি তার পূর্বের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে যে নামায পড়েছে, এজন্য গোনাহগার হবে না । বরং এটাই নিয়ম ।

উল্লেখ্য, যদি পূর্বের মেয়াদ শেষ হয়ে মাসিক বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে গোসল করে নামায আদায় করবে । তখন গোসল করার পর অথবা মাসিক বন্ধ অবস্থায় এক ওয়াক্ত নামায অতিবাহিত হওয়ার পর সহবাস করতে পারবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ : ৩৯, # বেহেশতী জেওর, ২ : ৬০]

هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ. لَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا دُونَ عَادَتِهَا يُكْرَهُ قُرْبَانُهَا وَإِنْ اغْتَسَلَتْ حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا وَعَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ وَتَصُومَ لِلِاحْتِيَاطِ (الفتاوى الهندية:39/1).

ঋতুস্রাবের মেয়াদ পূর্ব মেয়াদ থেকে বেড়ে যাওয়া অবস্থায় নামায পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ জনৈকা বিবাহিতা মহিলার মাসিক ৬ দিন স্থায়ী হয়ে থাকে । কোন কোন বারে দেখা গেছে- প্রথম থেকেই সামান্য সামান্য স্রাব হয় এবং ১০ দিনের বেশী থাকে । বর্তমানে এটা একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে, এ রকম স্বল্প স্রাব শুরু হলেই ঐ মাসে ১০ দিনের বেশী স্থায়ী হয়ে থাকে । এমতাবস্থায় উক্ত মহিলার জন্য ৬ দিন পর থেকেই মাসিক অবস্থাকালীন শর‘ই নিষেধাজ্ঞা গুলো উঠে যাবে, না কি সম্পূর্ণ ১০ দিন অপেক্ষা করতে হবে ?

জবাবঃ উপরোক্ত অবস্থায় উক্ত মহিলাকে দশ দিন দশ রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে । যদি স্রাব দশ দিন দশ রাত্রির চেয়ে অতিরিক্ত জারী থাকে, তাহলে পূর্বের অভ্যাস অনুযায়ী ছয়দিন হায়েয গণ্য হবে । আর সেই সুরতে ছয়দিন বাদ দিয়ে বাকী দিন গুলোর নামায, রোযা কাযা করতে হবে । আর যদি স্রাব দশ দিনেই বন্ধ হয়ে যায়, দশ দিনের বাইরে না যায়, তাহলে পুরো দশ দিনই হায়েয হিসেবে গণ্য হবে ।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন, ১ : ২৭৬ # ফাতাওয়া দারুল উলুম, ১ : ২৫৬ # হিদায়া, ১ : ৬৭ # ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ : ৩৭]

فَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْعَشَرَةَ فَالطُّهْرُ وَالدَّمُ كِلَاهُمَا حَيْضٌ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً وَإِنْ جَاوَزَ الْعَشَرَةَ فَفِي الْمُبْتَدَأَةِ حَيْضُهَا عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَفِي الْمُعْتَادَةِ مَعْرُوفَتُهَا فِي الْحَيْضِ حَيْضٌ وَالطُّهْرُ طُهْرٌ. هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ . (الفتاوى الهندية:37/1)

{পৃষ্ঠা-২০৩}

হায়েয-নেফাস অবস্থায় নামায ও রোযার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ হায়েয-নেফাসের সময় নামায-রোযা কি একেবারে মাফ হয়ে যায় ? নাকি কাযা করতে হয় ?

জবাবঃ হায়েয-নেফাসের সময় নামায মাফ হয়ে যায় । নামায কাযা করতে হয় না । কিন্তু রোযা মাফ হয় না । পরে রোযার কাযা আদায় করতে হয় । [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ, ১ : ১৫৩ # ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ : ৩৮]

হায়েয-নেফাসের সময় বিভিন্ন দু'আ কালাম পড়া

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েদের হায়েয-নেফাসের সময় এই আমলগুলো করা যায় কিনা । যেমন- তিন কুল পড়ে শয়নের সময় শরীরে ফুক দেয়া । আয়াতুল কুরসী পাঠ করা, সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, সূরা আল ইমরানের ১৭-১৮ ও ২৬-২৭ আয়াত ও তওবার শেষের ২ আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি ।

জবাবঃ যদি কোন মহিলার হায়েয-নেফাসের সময় শয়ন কালে আয়াতুল কুরসী, তিন কুল ইত্যাদি এবং অন্যান্য দু'আ বা এরূপ অন্য কোন আয়াত বালা মুসীবত থেকে মুক্তি ও হিফাজতের উদ্দেশ্যে পড়তে চায় তাহলে পড়তে পারবে । কিন্তু তিলাওয়াতের নিয়্যতে উপরোক্ত অবস্থায় ছোট একখানা আয়াত পড়াও নাজায়িয ।
[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১ : ২৯৩ # ফাতাওয়া শামী, ১ : ২৯৩ # হিদায়া, ১ : ৬৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ৬৮-৭১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ১ : ২৫৮]

জিজ্ঞাসাঃ কালেমা শরীফ বিনা উযুতে হাঁটতে বসতে পড়া যাবে কি-না ?

জবাবঃ কালেমা শরীফ, দরূদ শরীফ, যিকির ইত্যাদি বিনা উযুতে হাঁটা, বসা, দাঁড়ানো, শয়ন সর্বাবস্থায়ই পড়া জায়িয । তবে উযু অবস্থায় পড়া মুস্তাহাব । [প্রমাণঃ সূরা আল ইমরান, ১৯১ # ফাতাওয়া শামী, ১ : ১৭৪]

হায়েয-নেফাস অবস্থায় নেইল পালিশ, লিপিষ্টিক ইত্যাদি ব্যবহার করা

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েলোকের জন্য হায়েয-নেফাসের সময় নখ পালিশ, আলতা, ঠোঁট পালিশ, লিপিষ্টিক ইত্যাদি লাগানো জায়িয কি-না ?

জবাবঃ হায়েয অবস্থায় যেহেতু উযু ও নামাযের প্রয়োজন পড়ে না, তাই ঐ সময় নখ পালিশ লাগানো জায়িয হবে । কিন্তু পাক হওয়ার পর উযু বা গোসল করার সময় তা তুলে ফেলতে হবে । কারণ সাধারণত আমাদের দেশে প্রচলিত নখ পালিশ ব্যবহারে নখের ভিতর পানি প্রবেশ করে না বিধায় উযু-নামায কোনটাই সহীহ হয় না ।

স্মরণ রাখা দরকার যে, নখ পালিশ, ঠোঁট পালিশ, লিপিষ্টিক ইত্যাদির ব্যবহারে যদিও সাময়িক সৌন্দর্য অর্জিত হয়, এগুলো স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা ত্বকের জন্যও ক্ষতিকর । তাই এগুলো ব্যবহারে অভ্যস্ত না হওয়া ভাল ।

[প্রমাণঃ আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, ২ : ৭০-৭৫ # আলমগীরী, ১ : ৪-৩৮]
{পৃষ্ঠা-২০৪}

নামায

নামাযের সময়

মাগরিবের নামাযের সময়

জিজ্ঞাসাঃ মুসল্লীদের সুবিধার্থে যদি মাগরিবের নামায আযানের ৪/৫ মিনিট পরে শুরু হয় তাহলে কোন অসুবিধা আছে কি ? জানালে খুশি হবো ।

জবাবঃ ফুকাহায়ে কেরামের তাহকীক অনুযায়ী মাগরিবের আযান ও নামাযের মাঝে বিনা উযরে যদি ২ রাকা'আত নামাযের সময়ের চেয়ে অধিক পরিমাণ সময় ব্যবধান হয়ে যায় তাহলে সেটা

মাকরূহে তানযিহী হয় । সুতরাং মাগরিবের আযান ও নামাযের মাঝে ৪/৫ মিনিট দেরী করে জামা'আত শুরু করা মাকরূহে তানযিহী হবে ।
[শামী, ১ : ৩৬৯ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ১৫৯-১৬০]
وتعجيل المغرب مطلقا وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها. (الدر المختار:369/1)

ফজরের পর নিষিদ্ধ সময়ের পরিমাণ

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের পরে বেলা উঠা আরম্ভ হওয়ার পরে কতক্ষণ বা কত মিনিট নামায পড়া নিষেধ ? প্রচলিত ক্যালেন্ডারে যে ২৩ মিনিট বিলম্ব করার কথা লেখা থাকে তার ভিত্তি কি ?
জবাবঃ ফজরের পরে সূর্য উঠা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে এক তীর পরিমাণ (যার পরিমাণ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ৯ মিনিট) নামায পড়া নিষেধ । তবে প্রচলিত ক্যালেন্ডারে সতর্কতার জন্য কিছু বেশী বিলম্বের কথা লিখা হয়েছে । হযরত মাওলানা আবরারুল হক সাহেব হারদুয়ী (দাঃ বাঃ) ১৫ মিনিট বিলম্বের কথা বলে থাকেন । আমলের জন্য এটাই উত্তম । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১৪১ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ২ : ২৩৮ # শামী, ১ : ৩৬৬-৭১]

সূর্যোদয়ের ২/৩ মিঃ পর নামায শেষ হলে

জিজ্ঞাসাঃ সূর্যোদয়ের ১০/১২ মিনিট পূর্বেই ফজরের নামাযের জামা'আত শুরু করা হলেও নামায শেষ হওয়ার পর দেখা গেল ২/৩ মিনিট পূর্বেই সূর্যোদয় হয়ে গেছে । এখন এ নামায সহীহ হবে কি ?
জবাবঃ নামায শেষ করার পর যদি জানা যায় যে, নামাযের মধ্যেই সূর্যোদয় হয়ে গেছে, তাহলে নামায ফাসিদ (নষ্ট) পরিগণিত হবে । তবে সে অবস্থায় নামাযীর জন্য সূর্য ভালভাবে উঠার (অর্থাৎ সূর্য উঠার ১০/১৫ মিনিট) পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাযা নামায পড়ে নেয়া ফরয । সুতরাং উল্লেখিত অবস্থায় হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সকলের নামায ফাসিদ হয়ে গেছে । কারো নামায সহীহ হয় নি ।
{পৃষ্ঠা-২০৫}
ইমাম সাহেবের কর্তব্য মসজিদে এলান করে দেয়া যে, অদ্যকার বা অমুক তারিখের ফজরের নামায সহীহ হয়নি । সুতরাং যারা উক্ত তারিখের ফজরের জামা'আতে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই কাযা করে নিবেন । অথবা নির্দিষ্ট এক সময় সকলে মিলে জামা'আতের সাথে কাযা আদায় করা ভাল ।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৩৭৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৪৭]
(قوله : بخلاف الفجر إلخ) أي فإنه لا يؤدي فجر يومه وقت الطلوع ؛ لأن وقت الفجر كله كامل فوجبت كاملة ، فتبطل بطرو الطلوع الذي هو وقت فساد . (رد المحتار:373/1)

ইশার নামাযের ওয়াক্ত

জিজ্ঞাসাঃ আমি যদি ইশার নামায মাগরিবের ৩০ অথবা ২০ মিনিট পর পড়ে নেই, তাহলে আমার নামায হবে কি-না ?
জবাবঃ মাগরিব নামাযের ৩০ অথবা ২০ মিনিট পর ইশার নামায আদায় করলে ইশার নামায সহীহ হবে না । সূর্য অস্ত যাওয়ার ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট পর ইশার নামায আাদায় করবে । কেননা তার পূর্বে অনেক মৌসুমে ইশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় না ।
[প্রমাণঃ দারুল উলূম, ২ : ৫২ # আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১৩০]

(و) أخر (المغرب إلى اشتباك النجوم) ....هو الأصح . وفي رواية لا يكره ما لم يغب الشفق بحر أي الشفق الأحمر ؛ لأنه وقت مختلف فيه فيقع الشك . (رد المحتار:368/1)

(و) وقت (المغرب منه إلى) غروب (الشفق وهو الحمرة) عندهما ، وبه قالت الثلاثة وإليه رجع الإمام.....فكان هو المذهب . (رد المحتار:361/1)

যেখানে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত সেখানে নামায আদায়ের পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ উত্তর মেরুতে ও দক্ষিণ মেরুতে ৬ মাস দিন এবং ৬ মাস রাত থাকে । সেখানকার মুসলমানগণ পাঁচ ওয়াক্ত নামায কিভাবে আদায় করবে ?

জবাবঃ এরূপ অঞ্চলে অনুমান করে নামায পড়তে হবে । অর্থাৎ প্রতি ২৪ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে । পার্শ্ববর্তী দেশে কোন ওয়াক্ত নামায থেকে কোন ওয়াক্ত নামাযের ব্যবধান কতটুকু, তা জেনে নিয়ে উপরোক্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আঞ্চলিক সময় ভাগ করে সেভাবে নামায আদায় করে নিতে হবে । এতদসম্বন্ধীয় একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব কালে প্রথম দিন হবে এক বৎসরের সমান । তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে সাহাবায়ে কিরামগণ নামায পড়ার ব্যপারে জানতে চাইলেন । অর্থাৎ এ সময়ে আমরা নামায আদায় করবো কিভাবে ? হুযূর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, আন্দায (অনুমান) করে উক্ত এক বৎসরের সমান একদিনের মধ্যে পূর্ণ এক বৎসরের নামায আদায় করে নিতে হবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ২ : ১১৫]

{পৃষ্ঠা-২০৬}

(وفاقد وقتهما) كبلغار ، فإن فيها يطلع الفجر قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء (مكلف بهما فيقدر لهما) ولا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء به أفتى البرهان الكبير واختاره الكمال. (الدر المختار:362/1)

ফজরের সুন্নাতের সময় ও কাযার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের সুন্নাত নামায কি অবশ্যই ফরজ নামাযের আগে পড়তে হয় ? কোন অবস্থাতেই কি ফজরের পরে পড়া যায় না ।

জবাবঃ ফজরের সুন্নাত ওয়াজিবের নিকটবর্তী এবং জামা‘আতের সাথে নামায পড়াও ওয়াজিব । সুতরাং উভয়টাকে ঠিক রাখা সম্ভব হলে সেটাই করতে হবে । আর যদি উভয়টা ঠিক রাখা না যায়, তাহলে জামা‘আতকে প্রাধান্য দিতে হবে । যদি সুন্নাত পড়ে ফজরের ফরযের দ্বিতীয় রাকা‘আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদের বারান্দায় বা জামা‘আতের কাতার ছেড়ে পিছনে কোন কাতারে গিয়ে দু’রাকা‘আত সুন্নাত আদায় করে নিবে । তার পরে জামা‘আতে শরীক হবে । আর যদি সুন্নাত পড়তে গেলে ফরযের উভয় রাকা‘আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে সুন্নাত ছেড়ে জামা‘আতের সাথে ফরজ পড়ে নিবে । সুন্নাত পড়ার প্রয়োজন নেই । তবে যদি কেউ ছুটে যাওয়া সুন্নাত পড়তে চায়, তাহলে সূর্য উদয়ের পরে পড়তে পারবে এবং তা এক্ষেত্রে নফল হবে । কিন্তু ফরজের পরে সূর্য উদয়ের পূর্বে কোন ধরনের সুন্নাত বা নফল নামায পড়তে পারবে না । [প্রমাণঃ হিন্দিয়া, ১ : ১২০ # রহীমিয়া ৩ : ৪৭ # দারুল উলুম, ৪ : ২০৪]

55 / 4) - الفتاوى الهندية)

وَمَنْ انْتَهَى إلَى الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ إنْ خَشِيَ أَنْ يَفُوتَهُ رَكْعَةٌ وَيُدْرِكُ الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ وَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهُمَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ. (الفتاوى الهندية :120/1)

যোহরের শেষ ও আসরের শুরু ওয়াক্ত

জিজ্ঞাসাঃ যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত ও আসরের নামাযের শুরু ওয়াক্ত আমরা কিভাবে নির্ধারণ করতে পারি ?

জবাবঃ দাঁড়িয়ে থাকা প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়ায়ে আসলী (অর্থাৎ ঠিক দুপুরের সময় প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব ছায়া) ব্যতীত ২ মিছল (দ্বিগুন পরিমাণ) হওয়া পর্যন্ত যোহর নামাযের সময় বাকী থাকে। এরপর থেকেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এছাড়া নামাযের সময়সূচী বিষয়ক স্থায়ী ক্যালেন্ডার দেখেও উক্ত দুই নামাযের সময় জানতে পারেন। তা আমাদের দেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়।
[প্রমাণঃ হিদায়াহ, ১ : ৮১ # শরহে বিকায়াহ, ১ : ১২৮]
{পৃষ্ঠা-২০৭}
সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামায ব্যতীত অন্য নামায পড়ার হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ (১) ফজরের আযানের পর থেকে সূর্য উদয় পর্যন্ত ফজরের চার রাকা'আত নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায যেমন উমরী কাযা, দুখুলুল মাসজিদ ও নফল নামায পড়া যাবে কি-না ?
জবাবঃ (১) হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সুবহে সাদিকের পর সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে উক্ত দিনের ফজরের ফরয ও সুন্নাত নামায ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায পড়া জায়িয নয়। তাবে কাযা নামায পড়া জায়িয। তাও মসজিদে না পড়ে বাড়ীতে পড়ে নেওয়াই উত্তম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪ : ২৮৪ পৃঃ # কিফায়াতুল মুফতী, ৩ : ২৬ পৃঃ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ২ : ৬৯, ৭০, ৭১]

ইশার নামাযের শেষ সময়
জিজ্ঞাসাঃ ইশার নামাযের সর্বশেষ সময়সীমা রাত কয়টা পর্যন্ত ? রাত ১.৩০ মিনিটে ইশার নামাযের জামা'আত করলে তা শুদ্ধ হবে কি-না ?
জবাবঃ সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে সাদা আভা দূর হবার পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত থাকে। তবে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে ইশা পড়ে নেওয়া মুস্তাহাব। এবং এটিই ইশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত। অর্ধেক রাত পর্যন্ত শর'ই ওযর ব্যতীত ইশার নামায বিলম্বিত করে পড়লে তা মাকরূহ হবে। ১.৩০ মিনিট যেহেতু রাত্র দ্বিপ্রহরের পরের সময়। অতএব বিনা উযরে সে সময় ইশার নামায একাকী পড়া বা জামা'আতের সাথে পড়া মাকরূহ।
সূর্যোদয়ের মুহূর্তে নামায
জিজ্ঞাসাঃ (ক) আমরা জানি যে, পূর্বাকাশে সূর্য উকি দেয়া মাত্রই নামায পড়া নিষিদ্ধ। সুতরাং ক্যালেন্ডারে উল্লেখিত সময় অনুযায়ী নামায শেষ করলে নামায শুদ্ধ হবে কি না এর পূর্বেই নমায শেষ করতে হবে ?
(খ) এমনিভাবে সাহারীর শেষ ও ফজরের শুরুর সময় নামায পড়লে উক্ত নামায আদায় হবে কি ? সুবহে সাদিকের পরে কোন নফল নামায পড়া জায়িয হবে কি ?
জবাবঃ সূর্যোদয় আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ফজরের নামায শেষ করলে নামায সহীহ হবে। আর ক্যালেন্ডারের সময় সে হিসেবেই নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং ক্যালেন্ডারের সময় মত নামায শেষ করলে উক্ত নামায সহীহ হবে। তবে উত্তম হলো এ সময়ের কিছু পূর্বেই নামায শেষ করে ফেলা।
(খ) যেসব ক্যালেন্ডারে ফজর শুরু ও সাহরীর শেষ হওয়ার সময় একত্রে লেখা আছে সে হিসেবে ফজরের নামায পড়লে নামায সহীহ হবে না। কমপক্ষে

{পৃষ্ঠা-২০৮}
এর ৬/৭ মিনিট পরে ফজরের আযান দিতে হবে এবং ফজরের নামায পড়তে হবে । কেননা উক্ত ক্যালেন্ডার গুলোতে সাধারণতঃ সাহরীর ব্যপারে সতর্কতার জন্য সুবহে সাদিক শুরু হওয়ার ৩/৫ মিনিট পূর্বেই সাহরীর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে । অথচ প্রকৃতপক্ষে তখনোও ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয় না । ফজরের ওয়াক্ত এর থেকে ৩/৫ মিনিট পরে শুরু হয় । উল্লেখ্য যে, সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ও ফরয আর কাযা নামায ছাড়া অন্য নামায জায়িয নয় । তবে যদি কেউ শেষ রাতে নফল নামায শুরু করে থাকে এবং ইতিমধ্যেই সুবহে সাদিক উদিত হয়ে যায়, তাহলে তার এ নামায শেষ করা উচিত এবং এ নামায নফল নামায বলেই গণ্য হবে । [প্রমাণঃ রদদুল মুহতার ১ : ৩৮১-৩৮৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ১৩০, ২ : ১৩১, ২ : ১৪১]

নামাযের শর্তাবলী

নামায অবস্থায় সতর খুলে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ নামাযরত অবস্থায় মেয়েলোকের ছতরের অংশ কতটুকু এবং কতক্ষণের জন্য খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে ।

জবাবঃ নামাযের মধ্যে মহিলাদের মুখমন্ডল, দুহাত কব্জি পর্যন্ত ও দু'পায়ের পাতা এ অঙ্গগুলো খোলা থাকলে কোন অসুবিধা হবে না । এসব ব্যতীত সমস্ত শরীর ছতরের মধ্যে গণ্য । সুতরাং তা ঢেকে রাখা ফরয । আর ফরয তরক হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে । তবে ফরয তরকের ব্যপারে বিস্তারিত ইলম থাকা দরকার । সতরের অন্তর্ভুক্ত কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশের কম যদি ইচ্ছা পূর্বক বা ভুলে খুলে যায় এবং তিন তাসবীহ বা তার চেয়ে বেশীক্ষণ খুলে থাকে, তাতেও নামায নষ্ট হবে না । কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্বক এক চতুর্থাশং ছতর সামান্য সময়ের জন্য খুলে রাখে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে । আর অনিচ্ছাকৃত ভুলে সতরের যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশের বা তার চেয়ে বেশী খুলে গেলে, তৎক্ষণাত ঢেকে না নিলে যদি সতর খোলা অবস্থায় নামাযের রোকন সমূহ হতে কোন একটি রোকন আদায় করে অথবা সতর খোলা অবস্থায় এতটুকু সময় নামাযে রত থাকে– যে সময়ে নামাযের কোন একটি সংক্ষিপ্ত রুকন আদায় করা যায়, তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং সে নামায পুনরায় পড়া জরুরী ।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ৪০২]

জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ ঘরের মেঝেতে জুট ম্যাটস্ বিছানো আছে । শত সাবধানতার পরেও দেড় বছরে শিশু কণ্যার প্রস্রাব থেকে রেহাই পায়না জুট ম্যাটস্ । এমতাবস্থায় শুকনা স্থানে জায়নামায বিছিয়ে কি নামায পড়া যাবে ?

{পৃষ্ঠা-২০৯}
জবাবঃ হ্যা, শুকনা স্থানে জায়নামায বিছিয়ে নামায পড়া যাবে । কেননা নামায সহীহ হওয়ার জন্য শুধুমাত্র পা রাখার জায়গা ও সিজদার জায়গা পাক হওয়া জরুরী ।
[প্রমাণঃ হিদায়া ১ : ৭১]

উযু ব্যতীত নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কেউ ভুলবশতঃ উযু ব্যতীত নামায আদায় করার পর ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেলে স্মরণ হল । এমতাবস্থায় তার করণীয় কি ?

জবাবঃ এমতাবস্থায় করণীয় হল- উযু করে পুনরায় উক্ত নামায আদায় করে নিতে হবে । কারণ, নামাযের জন্য পাক পবিত্র হওয়া শর্ত । তাই তিনি পূর্বে যে নামাযটি আদায় করেছেন তা আদায় হয় নি । অতএব, সে নামাযটি উযু করে অর্থাৎ পাক পবিত্রতা অর্জন করে পুনরায় আদায় করা জরুরী । অসতর্কতার দরুন আল্লাহর দরবারে ইস্তিগফার করবে ।[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ৪০, আবু দাউদ শরীফ ১ : ৮৭ # শামী ১ : ৮৭ # তিরমিযী ১ : ৩]

উত্তর আমেরিকায় কিবলার দিক প্রসঙ্গে

জিজ্ঞাসাঃ উত্তর আমেরিকার কিবলার দিক নিয়ে স্থানীয় মুসলমানগণ চরম বিভ্রান্তির শিকার । দীর্ঘদিন হতে এখানকার মুসলমানগণ দক্ষিণ পূর্ব দিকে কিবলা জেনে আমল করে আসছে । ইদানিং কিছু লোক এর বিপরীত উত্তর-পূর্ব দিককে কিবলা বলতে শুরু করায় এ দ্বিধা দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে ।

আমি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একজন সাবেক কর্মকর্তা । দিক নির্ণয়ই আমার বিশেষ দায়িত্ব ছিল । বর্তমানে আমি উত্তর আমেরিকায় অবস্থান করছি । পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে আমি উত্তর আমেরিকার কিবলা উত্তর পূর্বদিকে হওয়াটা গলদ মনে করি । অথচ স্থানীয় মুসলমানগণ এ ব্যাপারে চরম পেরেশানীতে ভুগছে । বিজ্ঞ মুফতীয়ায়ে কিরামের খেদমতে আরয, এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে রাহনুমায়ী করবেন ।

জবাবঃ

قال الله تعالى : {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}- (سورة البقرة:144)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة-

عن ابى حنيفة رحم الله تعالى : المشرق قبلة اهل المغرب والمغرب قبلة اهل المشرق والجنوب قبلة اهل الشمال والشمال قبلة اهل الجنوب: كذا فى تبيين الحقائق صـ: 1/1ج1

{পৃষ্ঠা-২১০}

উপরোল্লেখিত আয়াত হাদীস এবং ইমামে আ'যম ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উসূল থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, যে সকল লোকেরা সরাসরি বায়তুল্লাহকে সম্মুখে রেখে নামায পড়ছে তাদের জন্য বায়তুল্লাহ শরীফই কিবলা । আর যারা বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে দূরে অবস্থান করছে তাদের জন্য সরাসরি বায়তুল্লাহ শরীফ কিবলা নয় । বরং বায়তুল্লাহ শরীফের দিক কিবলা । তাদের নামাযে কা'বা শরীফের দিকে মুখ ফিরানো ফরয । সুতরাং যারা কাবা শরীফের উত্তরাঞ্চলে অবস্থান করছে তাদের কিবলা দক্ষিণ দিকে আর যারা কাবা শরীফের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান করছে তাদের কিবলা উত্তর দিকে । তদ্রুপ পূর্বাঞ্চলে যাদের আবাস পশ্চিম দিকে তাদের কিবলা আর পশ্চিমাঞ্চলে যাদের আবাস পূর্ব দিকে তাদের কিবলা ।

উল্লেখিত দিকগুলো কিভাবে জানা যাবে এ প্রসঙ্গে কুরআনের বাণী- {وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} তিনি পথ নির্ণয়ক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের সন্ধান পায় । ।[সূরা নাহল-১৬]

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا} তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রসমূহ সৃজন করেছেন । যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথপ্রাপ্ত হও । [সূরা আন'আম-৯৭]

قال رسول الله صلي الله عليه وسلم ان خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر و النجوم الاظلة لذكر الله (رواه الطبراني)

আলোচিত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রকে দিক নির্ধারণের মাধ্যম বানিয়েছেন । এ কারণে হযরত সাহাবায়ে কিরাম ও আকাবিরে উম্মাত বাইতুল্লাহ

থেকে দূরবর্তী শহরে কিবলার দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিদর্শন ও মাধ্যমের সাহায্য নিতেন। সর্বস্তরের ও সর্বস্থানের মুসলমান অধিবাসীদের জন্য অতি সহজে কিবলার দিক নির্ণয় উপরোক্ত বাহ্যিক নিদর্শনসমূহের উপর ভিত্তি করেই সম্ভব। انا امة امية لا نكتب و لانحسب (মিশকাত শরীফ, ১৭৪)

উক্ত হাদীস থেকেও বুঝা গেল যে, কিবলার দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উপরোক্ত প্রকাশ্য আলামত সমূহের উপরই নির্ভর করা চাই। সেগুলোকে বাদ দিয়ে জ্যামিতিক সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ এবং যন্ত্রের পিছে পড়া শরী'আতের ভাবমূর্তির পরিপন্থী। এ ব্যাপারে উলামাদের আমল থেকেও জানা যায় যে, যখন কখনো জ্যামিতিক হিসাব বা যন্ত্র দ্বারা নির্ধারণকৃত কিবলার দিক শরী'আতের গ্রহণযোগ্য সাদাসিধে উসূলের ভিত্তিতে নির্ধারণকৃত কিবলা পরিপন্থী বা ভিন্নতর মনে হয়েছে,

{পৃষ্ঠা-২১১}

তখন প্রথমোক্ত কিবলা প্রত্যাখ্যাত বিবেচিত হয়েছে এবং শেষোক্ত কিবলা চূড়ান্ত ও গৃহীত হয়েছে। যেমনটি দামেশকের মসজিদে উমাইয়া, মিশরের মসজিদে আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে হিসাবের উপর ভিত্তি করে যে কিবলা বের করা হয়েছিল তা পুরাতন কিবলা থেকে কিছুটা ভিন্ন প্রকাশ পেয়েছে। তথাপি অদ্যবধি সে পুরাতন কিবলারই অনুসরণ করা হচ্ছে। মিশরের রাষ্ট্রপতি আহমদ বিন তুলূন জ্যামিতিক হিসাব করে যে কিবলা নির্ধারণ করেছেন সেটা মসজিদে আমর ইবনুল আসের থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছিল। উক্ত কিবলার উপর আমল করাকে উলামায়ে কিরাম খিলাফ আউলা তথা অনুত্তম বলে ঘোষণা করেছেন। [জাওয়াহিরুল ফিকহ্, ১ : ২৬০]

সারকথা, কুরআন-হাদীস এবং উলামায়ে কিরামের আমলের দ্বারা এটা প্রমাণ হয় যে, কা'বা হতে দূরবর্তী শহরের কিবলার দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি মোটা মোটা নির্দেশনের উপর ভিত্তি করাই হল শরী'আতের ভাব সম্মত।

জ্যামিতিক হিসাব-নিকাশ ও যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করা শরী'আতের পছন্দনীয় নয়। সুতরাং যেখানে পুরাতন মসজিদ বিদ্যমান, যেহেতু এর কিবলার দিক মোটা মোটা নির্দেশনের উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত। তাই নতুন করে এর কিবলা নির্ণয়ের পরিবর্তে পুরাতন কিবলা অনুসরণ করাই জরুরী।

মুফতীয়ে 'আযম মুহাম্মদ শফী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে বিষদ আলোচনার পর লিখেছেন- সারকথা হল কিবলার দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যন্ত্রাদি এবং হিসাবের সাহায্য নেয়া পূর্বসূরীদের নীতি ছিলনা। শরী'আতও এর নির্দেশ দেয় নি। কোন অবস্থায় এর প্রয়োজনও নেই। বরং পূর্বসূরীদের নিয়মনীতি হল, যে এলাকায় পুরাতন মসজিদ আছে সে স্থানে সেগুলোরই অনুসরণ করতে হবে। আর যে স্থানে পুরাতন মসজিদ নেই সেখানে নক্ষত্রাদি এবং অন্যান্য মোটা মোটা নিদর্শনের মাধ্যমে কিবলার দিক নির্ণয় করবে। [জাওয়াহিরুল ফিকহ্, ১ : ২৬৭]

অবশ্য যে স্থানে পুরাতন মসজিদ নেই, সে স্থানে যন্ত্রাদি এবং জ্যামিতিক হিসেবের সাহায্য নেয়া এ ব্যাপারে পারদর্শী ব্যক্তির জন্য জায়িয হবে। তবে শর্ত হল চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকাশ্য নিদর্শনের সাহায্যে নির্ণয়কৃত কিবলার যেন খিলাফ না হয়। খিলাফ হলে সেক্ষেত্রে প্রথমোক্ত কিবলা অগ্রাহ্য হবে এবং দ্বিতীয়টাই বলবত থাকবে। এসকল কথা ফাতাওয়া শামী ১ : ৪৩০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে।

উপরোল্লেখিত বিষদ আলোচনার আলোকে যদি উত্তর আমেরিকা এবং কানাডার অধিবাসীদের কিবলার দিক সম্পর্কে চিন্তা করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের কিবলা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হবে । এর একাধিক কারণ রয়েছে ।

{পৃষ্ঠা-২১২}

(১) 'রিসালায়ে তাম্বীতে আহলে হক' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীর প্রায় শেষের দিক হতেই উত্তর আমেরিকার মুসলামানদের যাতায়াত ও বসতি শুরু হওয়ায় এবং খৃষ্টাব্দ ১৯৭০ এর দশকের পূর্ব পর্যন্ত সেখানকার মসজিদ ও ঈদগাহ সমূহের মিহরাব পূর্ব-দক্ষিণ দিকেই ছিল ।

(২) যেহেতু মক্কা শরীফ কর্কটক্রান্তি থেকে কয়েক ডিগ্রী দক্ষিণ দিকে অবস্থিত, এদিকে উত্তর আমেরিকা কর্কটক্রান্তি থেকে অনেক ডিগ্রী উত্তর দিকে অবস্থিত সুতরাং সূর্য চলার কক্ষপথের দ্বারা প্রমাণ হয় যে, উত্তর আমেরিকাবাসীদের কিবলার দিক অবশ্যই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হবে ।

(৩) ফুকাহাদের নিকট দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সব থেকে মযবুত দলীল ধ্রুব তারকা । যেহেতু ধ্রুব তারকা উত্তর আমেরিকায় যথেষ্ট উঁচুতে অর্থাৎ মাথা বরাবর দৃষ্টিগোচর হয় । আর মক্কা শরীফে সে তারকা উত্তর দিকে যথেষ্ট নিচে থাকে । অতএব এর দ্বারাও বুঝা গেল উত্তর আমেরিকা মক্কা শরীফ থেকে তুলনা মূলক উত্তর দিকে অবস্থিত । আর পশ্চিম দিকে হওয়াতো সুস্পষ্ট । সুতরাং উত্তর আমেরিকা বাসীদের জন্য কিবলার দিক দক্ষিণ-পূর্ব দিক হওয়া আবশ্যক । [তাম্বীতে আহলে হক ১২]

অনেকে উত্তর আমেরিকার কিবলা উত্তর পূর্বদিক বলেন । আমাদের দৃষ্টিতে এটা সঠিক নয় । কেননা, তারা এর প্রমাণ স্বরূপ দূরত্বের কম-বেশ এবং জ্যামিতিক হিসাবকে মূলভিত্তি বানান । যা আকাবিরের নিয়মের খিলাফ এবং শরী'আতের ভাবমূর্তির পরিপন্থী ।

তাছাড়া উত্তর আমেরিকার কিবলা উত্তর-পূর্ব দিকে বলার মধ্যে একটি বড় খারাবী হল, সে সূরতে উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা উভয় স্থানের কিবলা এক হয়ে যায় । অথচ এটা অসম্ভব । কেননা দক্ষিণ আমেরিকা যেমন আর্জেন্টিনা প্রভৃতি এলাকার কিবলার দিক উত্তর পূর্ব হওয়া স্বতঃসিদ্ধ এবং মধ্য আমেরিকার কিবলা সম্পূর্ণ পূর্ব দিকে । এখন যদি উত্তর আমেরিকার কিবলাও উত্তর-পূর্ব দিকে হয় তখন উত্তর-দক্ষিণ দু'টো দিকের কিবলাই এক দিকে হয়ে যায় যা নিশ্চিত ভুল । এ ভুল থেকে মুক্তির জন্য উত্তর আমেরিকার কিবলা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হওয়া আবশ্যক । যাতে উত্তর-দক্ষিণ উভয় দিকের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পায় । তবে যদি তাদের কিবলার দিক সঠিক কিবলার থেকে ৪৫ ডিগ্রির ভিতরে হয় যদিও সেটা উত্তর আমেরিকার সহীহ কিবলা নয়, তবুও সেদিক ফিরে নামায পড়লে নামায সহীহ হয়ে যাবে । ৪৫ ডিগ্রি থেকে বেশী হলে নামায সহীহ হবে না । এটাই আমাদের তাহকীক । বিশ্বের অন্যান্য উলামায়ে কিরাম এ ব্যাপারে বিচার-বিশ্লেষণ করলে ভাল হয় ।

{পৃষ্ঠা-২১৩}

উল্লেখ্য, আমাদের এ যাবৎ আলোচনা আলাসকা শহর ছাড়া অন্যান্য শহরের জন্য প্রযোজ্য । কেননা, জিরো পয়েন্টের রেখা যদি লন্ডনের উপর ধরার পরিবর্তে সরাসরি কাবা শরীফের উপর মানা হয় এবং মুসলমানদের জন্য সেটাই জরুরী । তখন আলাসকা শহর পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের মধ্যে পড়বে । তাই এ শহরের কিবলা দক্ষিণ-পশ্চিমে হওয়া বাঞ্ছনীয় । শর'ই নিয়ম নীতির দাবী এটাই যে, বাইতুল্লাহ শরীফই পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু । সুতরাং দিক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বায়তুল্লাহকেই জিরো পয়েন্ট মানতে হবে । আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ}

নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মু'মিনের জন্য বানানো হয়েছে- সেটা হচ্ছে এ কা'বা ঘর । যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত স্বরূপ । [সূরা আল-ইমরান, ৯৬]
এমনিভাবে বুখারী শরীফে আছে, ইয়ামানকে ইয়ামান এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু সেটা কা'বা শরীফের ডানে অবস্থিত । আর শামকে শাম এজন্য নামকরণ করা হয়েছে যেহেতু সেটা কা'বা শরীফের বামে অবস্থিত । [বুখারী শরীফ ১ : ৪৯৬]

وفي الدر المختار: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة حقيقة او حكما كعاجز فللمكي اصابة عينها و لغيره اصابة جهتها بان يبقي شيئ من سطح الوجه مسامتا للكعبة او لهوائها بان يفرض من تلقاء وجه مستقبلها حقيقة في بعض البلاد خط علي زاويتين قائمة الي الافق مارا علي الكعبة و خط اخر يقطعه علي زاويتين قائمتين بمنة وبسرة. منح-
وفي الشامي: ان المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة الي جهه اليمين او اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل علي ان الانحراف لا يضر-
وفي الدر المختار: وفي عبارة الدرر فتبصر وتعرف بالدليل و هو في القري الامصار محاريب الصحابة التابعين – وفي المفاوز و البحار النجوم كالقطب وإلا فمن الاهل العالم بها ممن لو صاح به سمعت- [الشامي /427'428' 429' 410' 431]

{পৃষ্ঠা-২১৪}

নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

নামাযের মধ্যে একটি সিজদা ভুলে গেলে

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের মধ্যে যদি কেউ একটি সিজদা ভুলে যায় এবং নামায শেষ করার পরে মনে আসে, তখন কি করণীয় ? আর যদি সন্দেহ হয় যে, ১টি সিজদা দিলাম, না কি দু'টি দিলাম তখন কি করণীয় ?
জবাবঃ নামাযের মধ্যে যদি কেউ একটি সিজদা ভুলে যায়, অতঃপর নামায শেষ করার পরে মনে আসে, তখন উভয় দিকে সালাম ফিরানো সত্ত্বেও যদি সিনা কিবলা থেকে না ফিরে থাকে এবং সেরূপ কোন কথাবার্তা না বলে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাত উক্ত সিজদাটি আদায় করে সাহু সিজদাহ করবে । আর যদি সেই সিজদা আদায়ের অবকাশ না থাকে অর্থাৎ সালামের পর কথাবার্তা বলে ফেলেছে বা কিবলার দিক থেকে সিনা ঘুরে গিয়েছে বা উযু চলে গিয়েছে, তাহলে নামায পুনরায় পড়তে হবে । কারণ প্রতি রাকাআতে দু'টি সিজদাহ করা ফরয ছিল । ১টি সিজদাহ না করার কারণে তার জিম্মায় ফরয রয়ে গিয়েছে । আর ফরয ছুটে গেলে নামায পুনরায় পড়তে হয় । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ :৪৪]
নামায শেষ করার পরে একটি সিজাদাহ করেছে না দু'টি করেছে এ নিয়ে সন্দেহ হলে তা ধর্তব্য নয় । অর্থাৎ এর জন্য তাকে কিছুই করতে হবে না । হ্যাঁ, যদি পূর্ণ বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় যে, কোন এক রাকা'আতে সিজদা একটি করেছে, তাহলে পূর্ব বর্ণিত তাফসীল অনুযায়ী আমল করবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ৪৮]

মুক্তাদীর জন্য তাশাহহুদ পড়া জরুরী কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ আমি জানি ইমামের কিরাআত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট । সে মতে আমার জিজ্ঞাসা হল- ইমামের কিরাআত যদি মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট হয় তাহলে ইমামের তাশাহহুদ মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট হবে না কেন ?
জবাবঃ হাদীসে এতটুকুই পাওয়া গিয়েছে যে, ইমামের কিরাআত মুক্তাদির জন্য যথেষ্ট । যেমন হাদীস শরীফে আছে- যে ব্যক্তির ইমাম থাকে, তার ইমামের কিরাআতই তার জন্য কিরাআত (মুসলিম শরীফ) এমনিভাবে এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস আছে । কিন্তু তাশাহহুদে ব্যাপারে এরকম কোন

হাদীসে নেই বিধায় তাশাহহুদ মুক্তাদীকে ভিন্নভাবেই পড়তে হবে । এমনিভাবে কিরাআত ব্যতীত অন্যান্য সকল দু'আ-তাসবীহ মুক্তাদীদের পড়তে হবে । [শামী, ১ : ৪৭০ পৃঃ]

{পৃষ্ঠা-২১৫}

নামাযে দুই সিজদাহ করা ফরয কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব চার রাকা'আত ফরয নামাযের ৪র্থ রাকা'আতের দুই সিজদার মাঝে এক সিজদাহ আদায় করেছেন এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহু দিয়েছেন । তখন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে ইমাম সাহেব বললেন, দ্বিতীয় সিজদাহ ফরয নয় ওয়াজিব । তাই আমার জানার বিষয় হল সিজদা উভয়টি ফরজ কি-না ?

জবাবঃ নামাযের প্রতি রাকা'আতে দু'টি সিজদাই ফরয । অর্থাৎ, ১ম সিজদা যেমন ফরয, তেমনিভাবে দ্বিতীয় সিজদাও ফরয । তাই উল্লেখিত ইমাম সাহেবের কথাটি সত্য নয় এবং প্রশ্নে বর্ণিত চার রাকা'আত ফরয নামায ইমাম ও মুক্তাদীগণের মধ্য হতে কারো আদায় হয়নি । প্রত্যেকেরই এ নামায পুনরায় পড়তে হবে । অন্যথায় এক ওয়াক্ত নামায না পড়ার গোনাহ হবে । উল্লেখ্য যে, যদি নামাযের কোন রাকা'আতে ভুলবশতঃ একটি সিজদাহ ছুটে যায়, তাহলে নিয়ম হল, নামাযের ভিতরে স্মরণ হওয়া মাত্রই সিজদাটি আদায় করে নেয়া এবং শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ে সিজাদায়ে সাহু আদায় করা । এর দ্বারা নামায আদায় হয়ে যাবে । ইমাম সাহেব যেহেতু ছুটে যাওয়া সিজদা না করে শুধুমাত্র সিজদায়ে সাহু আদায় করেছেন , তাই নামায আদায় হয়নি । [প্রমাণ আলমগীরী, ১ : ৭০ ও ১২৮ # ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ : ৪৪২ # আল-বাহরুর রায়িক, ১ : ২৯৩ # তাহতাবী, ১৮৫ # বাদায়ি উস সানায়ি, ১ : ১৬৭]

দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ দুই সিজাদার মাঝে দু'আ পড়ার হুকুম কি ?

জবাবঃ দুই সিজদার মাঝে বসে দু'আ করা মুস্তাহাব । আবূ দাউদ এবং তিরমিযী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়তেন । তবে জামা'আতে নামায পড়ানোর সময় ইমামের জন্য দুর্বল মুসল্লীদের প্রতি লক্ষ রেখে সম্পূর্ণ দু'আ না পড়া উচিত । বরং ইমাম সংক্ষিপ্ত পড়বে, আর মুসল্লীগণ যতটুকু পড়তে পারে পড়বে । একাকী নামায পড়ার সময় পূর্ণ দু'আ পড়া মুস্তাহাব । হানাফী মাযহাবের ফিকহের কিতাবে বলা হয়েছে দু'আ পড়া সুন্নাত নয় এ কথার দ্বারা মুস্তাহাব হওয়া বাতিল হয় না । কারণ, একটি জিনিস সুন্নাত না হলেও মুস্তাহাব হতে পারে । এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই । [প্রামাণ ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ : ৫০৫ # ফাতাওয়া দারুল উলুম, ২ : ১৭১ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ২৮ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৪ : ৩০০]

{পৃষ্ঠা-২১৬}

দুই সিজদার মাঝে দু'আ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ ফরয নামাযে দুই সিজাদার মাঝখানে যে দু'আটি পড়া হয়,

اللهم اغفرلى وارحمنى واهدنى وارزقنى وعافنى -

তা পড়া কিরুপ ? না পড়লে কোন ক্ষতি আছে কি-না ?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটি হাদীসের কিতাবে বর্ণিত আছে । রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত দু'আটি দুই সিজদার মাঝে পড়তেন । দুই সিজদার মাঝে উক্ত দু'আটি পড়া মুস্তাহাব । পড়লে সওয়াব হবে । না পড়লে কোন ক্ষতি নেই । উল্লেখ্য, উক্ত দু'আটি শুধু ফরয নামাযেই নয়,

প্রত্যেক নামাযের দুই সিজদার মাঝে পড়া মুস্তাহাব । [প্রমাণ তিরমিযী শরীফ, ১/৬৩ , ইবনে মাজা শরীফ, ১ : ৬৪ ই'লাউল সুনান, ৩৩]

নাভীর নিচে হাত বাঁধা

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে অনেকে নাভীর উপরে হাত বাঁধে, আবার অনেকে নাভীর নিচে বাঁধে । এখন আমার প্রশ্ন নাভীর নিচে হাত বাঁধার পক্ষে আপনাদের নিকট কোন কিতাবের দলীল আছে কি-না ? এবং সহীহ কোন হাদীসে তা আছে কি-না ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে হাত নাভীর নিচে বাঁধার ব্যাপারে সহীহ হাদীস আছে ।

হযরত আবূ জুহাইফা হতে বর্ণিত । হযরত আলী (রাঃ) বলেন-নামাযে হাত নাভীর নীচে রাখা সুন্নাত তরীকা ।" (আবূ দাঊদ শরীফ, ৭৬ পৃঃ এবং দারা কুতনী, ২৮৬ পৃঃ) উক্ত রিওয়ায়াতটি আবূ দাঊদ শরীফের প্রসিদ্ধ তিনটি নুসখার মধ্য হতে ইবনে আরাবিয়ার নুসখার মধ্যে বিদ্যমান আছে ।

এছাড়াও ই'লাউস সুনান কিতাবের ২য় খন্ডের ১৬৫ ও ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় নাভীর নিচে হাত বাঁধা সম্পর্কে হাদীস বিদ্যমান আছে । তাছাড়া আবূ দাঊদ শরীফের বর্তমান প্রচলিত নুসখার ১১০ নম্বর পৃষ্ঠার হাশিয়ার মধ্যেও উক্ত হাদীস বিধৃত হয়েছে ।

وفى الفتاوى الهندية – فى سنن الصلاة وادابها.... رفع اليدين للتحريمة.....وضع يمينه على يساره تحت سرته الخ- [الفتاوى الهندية 72/1]

عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه رضـ قال رأيت النبى صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله فى الصلاة تحت السرة – [كذا فى مصنف ابن شيب – 39/12 وزجاجة المصابيح-237/1]

{পৃষ্ঠা-২১৭}

সিজদার মাঝে উভয় পা খাড়া রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি সিজদার সময় উভয় পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখতে হবে । কিন্তু বেহেশতী যেওরে (অনুবাদ ১ম খন্ড, ১১০ পৃঃ) উল্লেখ আছে যে, সিজদায় উভয় পা মিলানো থাকবে এর মীমাংসা কি ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে সিজদার সময় উভয় পায়ের মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা যে সুন্নাত তরীকা হিসেবে বলা হয়েছে এটাই সহীহ মাসআলা । বেহেশতী যেওর ১ম খন্ড ১৩৯ পৃষ্ঠায় সিজদার মধ্যে গোড়ালী মিলানোর যে কথা আছে, তার উদ্দেশ্যও সেটা । অর্থাৎ উভয় গোড়ালীর মধ্যে বেশী দূরত্ব রাখবে না । বরং মিলানোর কাছাকাছি করে রাখবে । যার দূরত্ব মোটামুটি চার আঙ্গুল পরিমাণ । উভয় গোড়ালী সম্পূর্ণ মিলানো এজন্য উদ্দেশ্য হতে পারে না যে, তাতে একটি হাদীসের আমল হলেও এসম্পর্কিত অপর তিনটি হাদীসের উপর আমল তরক হয়ে যায় । আর আমরা যেভাবে বলেছি, তাতে এ ব্যাপারে বর্ণিত চারটি হাদীসের তিনটার উপরই সরাসরি আমল হয়ে যায় । একটি হাদীসের মধ্যে সামান্য ব্যাখ্যা দিতে হয় । হাদীসগুলো নিম্নরূপঃ

(১) হযরত আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক রাতে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিছানায় না পেয়ে তালাশ করতে শুরু করি । তখন আমার হাত হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর উভয় পায়ের উপর পড়ে । যা তখন খাড়া অবস্থায় ছিল । হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তখন নামাযের স্থানে সিজদাহরত ছিলেন । [প্রামাণ মিশকাত শরীফ, ৮৪ পৃঃ]

(২) হযরত আবূ হুমাইদ আস-সায়ীদী এক লম্বা হাদীসে নবীজী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর নামাযের বর্ণনা দেন । যার শেষাংশে বলেন- অতঃপর তিনি সিজদার জন্য মাটিতে ঝুঁকতেন ।

সিজদায় হস্তদ্বয়কে উভয় পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন । আর উভয় পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলার দিকে মুড়ে রাখতেন । [প্রামাণ মিশকাত শরীফ, ৭৬ পৃঃ]
(৩) হযরত বারা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন রুকুতে যেতেন, তখন পায়ের আঙ্গুলগলোকে এমনভাবে কিবলামূখী করাইতেন যে, উভয় পায়ের মাঝখানে ফাঁকা থাকত । (বাইহাকী) উল্লেখিত তিনটি রিয়াওয়াত দ্বারা সিজদার মধ্যে উভয় পায়ের গোড়ালীর ফাঁক রাখা সাব্যস্ত হয় ।
কারণ, তৃতীয় হাদীসটি একদম স্পষ্ট যে, উভয় পায়ের মাঝে ফাঁক থাকবে । আর ১ম হাদীস দ্বারা এভাবে ছাবিত হয় যে, শুধু গোড়ালী মিশালে উভয় পা খাড়া থাকে না । বরং বাঁকা হয়ে যায় । আর দুই পায়ের মাঝে চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখলে উভয় পা খাড়া থাকে । তেমনিভাবে ২য়, ৩য় হাদীসে বলা হয়েছে যে,
{পৃষ্ঠা-২১৮}
পায়ের আঙ্গুল সমূহ কিবলামুখী করে রাখতে হবে । এটাও তখনই সম্ভব যখন পা দ্বয়ের মাঝে চার আঙ্গুল ফাঁকা থাকবে । কারণ, উভয় পায়ের গোড়ালী মিলালে দুই পায়ের শুধুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন আঙ্গুল কিবলামুখী করা সম্ভব হয় না ।
(৪) হযরত আয়িশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, একরাতে আমি হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে হারিয়ে ফেলি । অথচ তিনি আমার সাথে একই বিছানায় শুয়েছিলেন । অতঃপর খুঁজতে খুঁজতে তাঁকে সিজদারত পাই । এমতাবস্থায় যে, তার পায়ের গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল । আর পায়ের আঙ্গুলীগুলো মিলানো ছিল । আর পায়ের আঙ্গুলীগুলো কিবলামুখী ছিল । [ই'লাউল সুনান, ইবনে হিব্বান , নাসায়ী] যারা সিজদায় গোড়ালী মিলাতে বলেন এ হাদীসটি তাদের দলীল । কিন্তু একটা হাদীসের উপর আমল করলে, অবশিষ্ট তিনটি হাদীস বাদ দিতে হয় । এবং এ হাদীসের শেষের অংশের উপরও আমল করা যায় না । এজন্য ফুকাহাগণ বলেছেন যে, ৪র্থ হাদীসে যে গোড়ালীদ্বয় মিলানোর উল্লেখ আছে, এর অর্থ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর গোড়ালীদ্বয় নিকটবর্তী ও কাছাকাছি ছিল এবং তার মর্ম এই যে, উভয় গোড়ালীর মধ্যে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক যেহেতু বেশী নয়, সুতরাং তাকেও মিলানো বলা যায় ।
ফুকাহাগণ এ ব্যাখ্যা এজন্য করেছেন যে, এ ব্যাখ্যা না করলে খোদ এ হাদীসের শেষাংশে যে পায়ের আঙ্গুল সমূহকে কিবলামুখী করতে বলা হয়েছে তার উপরেও আমল করা যায় না এবং উপরের তিনটা হাদীসও বাদ দিতে হয় । তার উপরও আমল করা যায় না । যারা গোড়ালী মিলাতে বলেন, তারা ফাতাওয়া শামীর কথাও বলে থাকেন । কিন্তু ফাতাওয়া শামীতে যে পুরুষদের জন্য রুকু ও সিজদায় উভয় পায়ের গোড়ালী মিলানোর কথা আছে, এটাকে এবং এর পক্ষে তিনি যে দলীল পেশ করেছেন তা অন্যান্য ফুকাহাগণ গ্রহণ করেন নি । কারণ স্পষ্ট ।
[আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪১ # তাহাবী শরীফ, ১ : ১৬৬ # ই'লাউস সুনান, ৩ : ৩০]
{পৃষ্ঠা-২১৯}
قال الامام الطحاوى فرأينا السنة جائت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالتجافى فى الركوع والسجود واجمع المسلمون على ذالك فكان ذالك من تفريق الاعضاء - [شرح معانى الاثار.166/1]
قال عبد الحى اللكنوى رحمة الله عليه قلت لقد دارت هذه المسئة فى سنة اربع وثمانين بعد اللف والمأتين بين علماء عصرنا فاجاب اكثرهم بأن الصاق الكعبين فى الركوع والسجود ليس بمسنون ولا اثر له فى الكتب المعتبرة –
والقول الفصيل ان يقال ان كان المراد بالصاق الكعبين ان يلزق المصلى احد كعبين بالأخر ولا يفرج بينهما كما هوظاهر عبارة الدرالمختاروالنهر وغيرهما وسبق اليه فهم المفتى ابى السعود ايضا فليس هومن السنن على الاصح كيف ؟ وقد

ذكر المحققون من الفقهاء ان الاولى للمصلى ان يجعل بين قدميه نحواربعة اصابع ولم يذكروا انه يلزقهما فى حالة الركوع والسجود –
وقال العينى فى البناية نقلا عن الواقعات ينبغى ان يكون بين قدمى المصلى قدراربع اصابع اليد لانه اقرب الخشوع والمراد من قوله عليه السلام الصقوا الكعاب بالكعاب اجتماعهما انتهى – [هكذامذكور فى السعاية 181/2]

দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তির মুখে শুনতে পেলাম যে, নফল অথবা ফরয নামায যদি দুই রাকা'আতের চেয়ে অধিক হয় তাহলে দ্বিতীয় রাকা'আতের শেষে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ, দু'আয়ে মাসূরা পড়ে তৃতীয় রাকা'আতের জন্য দাঁড়াতে হবে । এটা ঠিক কি-না ?

জবাবঃ ফরয ও ওয়াজিব নামায যদি দুই রাকা'আতের অধিক হয়, তাহলে ২য় রাকা'আতের বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়বে, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়বে না । যদি কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে পড়ে তাহলে মাকরূহ হবে এবং নামায দোহরিয়ে পড়তে হবে । আর ভুলবশতঃ করলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে । তেমনিভাবে যোহর ও জুমু'আর পূর্বের চার রাকা'আত ও জুমু'আর পরের চার রাকা'আত সুন্নাতের প্রথম বৈঠকেও দরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়া যাবে না বরং ফরযের মত শুধু তাশাহহুদ পড়তে হবে । এছাড়া সকল চার রাকা'আত বিশিষ্ট নফল বা সুন্নাতে গাইরে মুআক্কাদার প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ-দরূদ শরীফ ও দু'আ মাসূরা পড়া এবং পরবর্তী দুই রাকা'আতের শুরুতে ছানা ও আঊযুবিল্লাহ পড়া উত্তম । [আপকে মাসাইল ২ : ৩৪৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৯০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ২৩১]

নামাযের মধ্যে তিন তাসবীহ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামাযের মধ্যে মুক্তাদিরা রুকু, সিজদার তাসবীহ তিন বারের বেশী বলতে পারবে কিনা ?

জবাবঃ ইমাম সাহেবে রুকূ সিজদার মধ্যে ধীরস্থির ভাবে পাঁচবার তাসবীহ পড়বেন । এর মধ্যে মুক্তাদীগণ তিনবার অবশ্যই পড়তে পারবেন । আর সুযোগ পেলে পাঁচবারও পড়তে পারেন । সুতরাং তিনবারের বেশী পড়া নিষেধ করা যাবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৭৫/আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৯৬]

{পৃষ্ঠা-২২০}

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু" পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ জায়নামাযে দাঁড়িয়ে "ইন্নী ওয়াজ্জাহতু" এই দু'আ পড়া কি ? অনেকে বলে এই দু'আ হাদীসে নেই । এমতাবস্থায় এ দু'আ পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ ফরয নামাযের প্রথমে উক্ত দু'আ পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না সত্য, তবে না পড়াই ভাল । সুন্নাত ও নফল ইত্যাদি নামাযের মধ্যে তাহরীমার পর সানার পূর্বে পড়তে পারে । কেউ যদি এই দু'আ না পড়ে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না । বরং তাহরীমার পূর্বে জায়নামাযের জন্য বিশেষ কোন দু'আ নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায় না । তাই না পড়াটাই বাঞ্ছনীয় । অনেকে ধরাবাঁধা নিয়মে নামাযের অঙ্গ হিসেবে তাহরীমার পূর্বে এরূপ জায়নামাযের দু'আ পাঠকে বিদ'আত আখ্যা দিয়েছেন । [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন, ৩১৬ # আল-বাহরুল রায়িক, ১ : ৩১০]

তাশাহহুদে মহিলাদের বসার তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে মহিলাদের তাশাহহুদের জন্য বসার সুন্নাত তরীকা কি ? এ বিষয়ে বাংলা বেহেশতী যেওরে 'পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য' অধ্যায়ে যে বাম উরুর উপর ডান উরু এবং বাম নলার উপর ডান নলা রাখতে হবে বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা কি ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে মহিলাদের তাশাহহুদের জন্য বসার সুন্নাত তরীকা হল, বাম নিতম্ব মাটিতে লাগিয়ে বসবে এবং উভয় পায়ের পাতা ডান দিকে বের করে দিবে । যতদূর সম্ভব ডান রান বাম রানের উপর রাখবে অর্থাৎ উভয় রান একটা আরেকটার উপর না হলেও অন্ততঃ মিশে থাকবে । ডান নলা বাম নলার উপর রাখবে । বেহেশতী যেওরে যা লিখা আছে উপরোক্ত আলোচনা তারই ব্যাখ্যা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ৭৫ # মাজমু 'আতুল ফাতাওয়া, ১ : ২৪২ # খোলাসাতুল ফাতাওয়া, ১ : ৫৪ # বেহেশতী যেওর উর্দু, ১১ : ৮৮৫]

সিজদায় যাওয়ার সঠিক পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ সিজদায় যাওয়ার সঠিক পদ্ধতি কি ? অনেকে বলেন, হাঁটুতে ভর করে সিজাদাতে যাওয়ায় দু'টো রুকু হয়ে যায় । এ কথাটি কি ঠিক ?

জবাবঃ সিজদায় যাওয়ার সঠিক পদ্ধতি হল নিজের সিনা সম্পূর্ণ সোজা রেখে প্রথমে দু'হাঁটু জমিনের উপর রাখবে । দু'হাঁটু জমিনে রাখার পর সীনা ঝুকিয়ে দুই হাতের তালু জমিনে রাখবে । অতঃপর নাক, এরপরে কপাল রাখবে । হাঁটুতে ভর করতে গিয়ে যদি বিনা ওযরে সীনা সামনের দিকে ঝুঁকে যায়, তাহলে তার দ্বারা দ্বিতীয় আরেকটি রুকু হয়ে যায়, যদ্বারা নামায মাকরূহে তাহরীমী হয়ে

{পৃষ্ঠা-২২১}

যায় । অতএব আপনি যা শুনেছেন, তা ঠিক । এজন্য অনেকে বলেছেন যে, হাঁটুতে হাত না রেখে যাওয়া ভাল । কারণ, তাতে এক রাকা'আতে দুই রুকূ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না । তবে কেউ যদি হাঁটুতে হাত দিয়ে সীনা না ঝুঁকিয়ে সিজদায় যায়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই । মোদ্দাকথা, সিজদায় যাওয়ার সময় হাত কোথায় থাকবে, তার স্পষ্ট কোন বর্ণনা হাদীসে নেই । সুতরাং হাঁটুতে হাত দিয়ে বা না দিয়ে উভয় ভাবে সিজদায় যেতে পারবে । কিন্তু সীনা সোজা রেখে যাবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১ : ৪৯৭ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ৩৩]

তাশাহহুদের পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বৈঠকে তাশাহহুদের পূর্বে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া যাবে কি-না ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে প্রথম রাকা'আতের শুরুতে আউযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ এবং অন্যান্য রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে এবং সূরা ফাতিহার পরে অন্য সূরা শুরু থেকে পড়লে, তার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ার হুকুম । এছাড়া নামাযের মধ্যে অন্য কোথাও আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার নিয়ম নেই । সুতরাং তাশাহহুদের পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ার দরকার নেই । অবশ্য কেউ পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ২ : ১৯৯ # শামী, ১ : ৪৭৫-৬]

নামাযে সূরার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়বে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে প্রত্যেক রাকা'আতে প্রত্যেক সূরার তিলাওয়াত করার প্রারম্ভে কি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়তে হবে ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত ও ফাতিহার পরে অন্য সূরার শুরু থেকে পড়লে প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া মুস্তাহাব । কোন বড় সূরা মাঝ থেকে পড়লে বিসমিল্লাহ পড়বে না । [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক, ১ : ৩১২ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ২২৮/১৭৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ২ : ২৬৮ # শামী ১ : ৪৯০]

নামাযে হাত বাঁধা

জিজ্ঞাসাঃ (ক) তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ আল্লাহু আকবার বলে আমরা সাধারণত নাভীর নিচে হাত বাঁধি । কিন্তু দেখা যায়, কিছু লোক নাভীর উপরে হাত বাঁধে, যারা নাভীর উপর হাত বাঁধে তাদের নামাযের কোন ক্ষতি হবে কিনা ?
(খ) শাফিঈ মাযাহাব মতালম্বীরা বুকের বরাবর হাত বাঁধে । আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি কখনো বুকের বরাবর হাত বাঁধতেন ? বুক বরাবর এবং নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন সহীহ দলীল থাকলে তা জানালে খুশী হবো ।
{পৃষ্ঠা-২২২}
জবাবঃ (ক ও খ) নামাযে হাত বাঁধার সুন্নাত তরীকা নিয়ে ইমামের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে । ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মতে নামাযে নাভীর নিচে হাত বাঁধা সুন্নাত । ইমাম শাফেঈ (রহঃ)-এর মতে নাভীর উপর সিনার নিচে হাত বাঁধা সুন্নত । আর উভয় আমল হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । কাজেই যারা নাভীর উপর সিনার নিচে হাত বাঁধে তাদের নামাযের কোন ক্ষতি হবে না । তাই এ নিয়ে পরস্পরে ঝগড়া করা বা একে অপরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকতে হবে । তবে ইমাম আবূ হানাফীর মাযহাবের ‘আমল’ একাধিক সহীহ দ্বারা প্রমাণিত । যার সনদের নির্ভরযোগ্যতা সীনার নীচে হাত বাঁধার হাদীস থেকে শক্তিশালী । নিম্নে প্রত্যেক মাযহাবের দলীল প্রদত্ত হল ।
হানাফী মাযহাবের দলীলঃ
(১) হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত । নামাযে নাভীর নিচে একহাত অন্য হাতের উপর রাখতে হয় ।(আবূ দাউদ ইবনে আরাবীর নুসখা, ১ : ২০১)
(২) আবূ হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাঃ) ইরশাদ করেছেন নামাযে সুন্নাত হচ্ছে, নাভীর নীচে হাতের উপর হাত রাখা । (আবূ দাউদ ১ : ২০১)
(৩) ওয়ায়েল ইবনে হজর তার পিতা হজর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি তিনি নামাযে নাভীর নিচে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন । (ইবনে আবী শাইবা ১ : ৪২৭)
(৪) প্রখ্যাত তাবেয়ী ইব্রাহিম নাখায়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযে নাভীর নীচে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে । (ইবনে আবী শাইবা ১ : ৪২৭)
শাফেয়ী মাযহাবের দলীলঃ
(১) সালমান ইবনে মুসা তাউস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন । অতঃপর নামাযে সীনার উপর উভয় হাত বাঁধতেন । (আবূ দাউদ)
(২) ওয়ায়েল ইবনে হজর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে নামায পড়েছি । তিনি সিনার উপর তার ডান হাত বাম হাতের উপর রেখেছেন । (সহীহ ইবনে খুযাইমা ১ : ২৪৩)
নামাযে ছানা, আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ
জিজ্ঞাসাঃ নামাযের প্রথম রাকা‘আতে সানা, আঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করা কি সুন্নাত ? যদি সুন্নাত হয়, তাহলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা‘আতে এগুলোর স্থানে কি পড়তে হবে ?
{পৃষ্ঠা-২২৩}
জবাবঃ ইমাম মুক্তাদি ও মুনফারিদ সকলের জন্য শুধু প্রথম রাকা‘আতে ছানা পাঠ করা সুন্নাত । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা‘আতে পড়তে হবে না । আর যেহেতু সানা পড়া ওয়াজিব নয়, তাই

যদি প্রথম রাকা'আতে ভুলবশতঃ অথবা এমনিতেই কোন কোন সময় ছুটে যায়, তবুও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে ।
আর আঊযুবিল্লাহ ইমাম ও মুনফারিদ এর জন্য শুধু প্রথম রাকা'আতে পাঠ করা সুন্নাত । সুতরাং তা ছুটে গেলেও নামায আদায় হয়ে যাবে । দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে পড়তে হবে না । তেমনিভাবে 'বিসমিল্লাহ' ইমাম ও মুনফারিদের জন্য প্রত্যেক রাকা'আতের শুরুতে পড়া সুন্নাত । তবে মুক্তাদির যেহেতু কিরা'আত পড়তে হয় না, তাই তার জন্য আঊযুবিল্লাহ বা বিসমিল্লাহ পড়ার প্রশ্ন আসে না । [প্রমাণ মুখতাসারুল কুদূরী ২৪ # হিদায়াহ, ১ : ১০৩ # হিদায়াহ ১ : ১০২]

আযান, ইকামত ও মুয়াযযিন
মিনারা তৈরি
জিজ্ঞাসাঃ আযানের জন্য সর্বপ্রথম মিনারা কে তৈরি করেন ? শরী'আতে মিনারের মূল্যায়ন কি ? মিনারা নির্মাণে মসজিদ ফান্ড ব্যবহার করা যাবে কি ?
জবাবঃ আযানের ধ্বনি যাতে মহল্লার প্রতিটি লোকের কর্ণকুহরে পৌছে যায়, সে জন্য উঁচু স্থানে আযান দেয়া হয় । এতদ উদ্দেশ্যে ইসলামের সর্বপ্রথম মিনারা তৈরি হয় সালামা কর্তৃক হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নির্দেশক্রমে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫ : ৩২২]
ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যদিও মিনারা ছিল না কিন্তু তখনও এমন উঁচু স্হানে আযান দেয়া হতো, যাতে আযানের ধ্বনি সবাই শুনতে পারে। (আবূ দাঊদ শরীফ) সুতরাং যদি মহল্লায় মিনারা ব্যতীত আওয়াজ পৌঁছানোর বিকল্প ব্যবস্হা না থাকে, তবে মসজিদের আয় দ্বারাই মিনারা তৈরী করা যাবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উঁচু না হতে হবে এবং রিয়া ও তাকাব্বুরের জন্য না হতে হবে। আর যদি আওয়াজ পৌঁছানোর অন্য ব্যবস্হা থাকে, তাহলে মিনারা তৈরী করার জন্য আলাদা চাঁদা কালেকশন করতে হবে। মসজিদের মূল টাকা এতে খরচ করা যাবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫ : ৩২২ # ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৬ : ১১৯]

আযানে ডানে ও বামে মুখ ফিরানো
জিজ্ঞাসাঃ কিছু লোকের মন্তব্য যে, মাইকে আযান দিলে ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দরকার নেই ।এ হুকুম তো মিনারা বা অন্য কোথাও আযান দিলে তখন প্রযোজ্য হবে । এ কথাটি কি ঠিক ? {পৃষ্ঠা-২২৪}
জবাবঃ আযান ও ইকামতে ডান দিকে চেহারা ফিরিয়ে حي علي الصلاة: বলতে হয় এবং বাম দিকে চেহারা ফিরিয়ে حي علي الفلاحবলতে হয় । এটা সর্বাবস্থায় সুন্নাত । জামা'আতের জন্য আযান হোক বা একাকি নামাযের জন্য আযান হোক । এমনকি সন্তান ভূমিষ্ঠের পর আযান দিতেও এ পদ্ধতি অবলম্বন করা সুন্নাত । বলা বাহুল্য, আযানে ডানে বামে চেহারা ঘুরানো আযানের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে মাইকে আযান দিলেও ডানে-বামে চেহারা ঘুরানোর সুন্নাত ঠিকই থাকবে ।
স্মর্তব্য যে, আযানে সম্পূর্ণ ডানে চেহারা ঘুরিয়ে حي علي الصلاة বলতে হবে । তারপর চেহারা কিবলার দিকে এনে পুনরায় ডানে ঘুরানোর পর দ্বিতীয় বার حي علي الصلاةবলতে হবে । এমনিভাবে বামদিকে চেহারা ঘুরায়ে حي علي الفلاحবলবে । প্রত্যেক দিকে দু'বার চেহারা ঘুরাবে । এমন যেন না হয় যে, কিবলার দিক থেকে বলতে শুরু করলো আর বলতে বলতে চেহারা ঘুরালো । চেহারার সাথে সাথে যেন সিনা ও পা কিবলার দিক হতে না ঘুরে যায় । ইকামতে ১বার ডানে চেহারা

ঘুরায়ে দু'বার حي علي الصلاة বলতে হবে এবং আরেকবার বামে চেহারা ঘুরিয়ে দু'বার حي علي الفلاح বলবে। [প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ১ : ৩৮৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯৩]
ইকামতের সময় হাত বেধে রাখা
জিজ্ঞাসাঃ জামা'আত শুরু হওয়ার আগে ইমামতের সময় উভয় হাত একত্রে বুকের উপর বা নাভীর নিচে বাঁধা অবস্থায় রাখা জায়িয কি-না ?
জবাবঃ ইকামতের সময় উভয় হাত ছেড়ে সোজা হয়ে দাড়াতে হবে। সে সময় অর্থাৎ, নামায শুরু হওয়ার পূর্বে হাতদ্বয় বাঁধা অবস্থায় রাখা সুন্নাতের খেলাপ এবং মাকরূহ। [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ : ৫৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯৭]
একই মসজিদে একই সাথে একই সময়ে ২/৩ জনের আযান দেওয়া
জিজ্ঞাসাঃ একই মসজিদে একই সময়ে একই সাথে ২/৩ জনের আযান দেয়া জায়িয হবে কি ?
জবাবঃ হ্যা জায়িয হবে। কারণ, আযানের উদ্দেশ্য হল মুসল্লিগণকে নামাযের দিকে আহবান করা। আর কয়েকজন একত্রে আযান দিলে আওয়ায বেশী হয় এবং বেশী দূরে যায়। যদ্দরুন দূরের মুসল্লীগণও যথা সময়ে হাযির হয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে পারবে। [প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর ২ : ৩৮]

আযানের পূর্বে বা পরে সাইরেন বাজানো
জিজ্ঞাসাঃ ফজরের আযানের পূর্বে বা পরে সাইরেন বাজিয়ে মানুষকে নামাযের জন্য আহবান করা জায়িয কি-না ?
{পৃষ্ঠা-২২৫}
জবাবঃ ফযরের আযান ও ইকামতের মাঝে সাইরেন বাজিয়ে বা অন্য কোন শব্দের মাধ্যমে যেমন- জামা'আত প্রস্তুত, কিংবা এ জাতীয় অন্য কোন শব্দ বলে মানুষকে নামাযে আসার জন্য আহবান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয। তবে মাইকে বা সাইরেন বাজিয়ে এমন বিকট আওয়াজ করা উচিত নয় যার ফলে মানুষের অসুবিধা হয়। [প্রমাণঃ আল-মাবসূত ১ : ১৩০ # আলমগীরী ১ : ৫৬]
খুতবার পূর্ববর্তী আযান
জিজ্ঞাসাঃ মুসলামন নামধারী কতিপয় ব্যক্তি বলে থাকে যে, জুমু'আর নামাযের খুতবায় দাঁড়ানোর পূর্বে আযান দেয়া জায়িয নয়। তাই এতদসম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক
জবাবঃ জুমু'আর দুই আযানের প্রথমটি হল জুমু'আর প্রস্তুতির জন্য। অর্থাৎ, এ কথা জানানোর জন্য যে, জুমু'আর নামাযের সময় একেবারে নিকটবর্তী। সুতরাং তোমরা ক্রয়-বিক্রয় সহ যাবতীয় কাজ-কর্ম স্থগিত রেখে জুমু'আর নামাযের প্রস্তুতি গ্রহণ কর। আর দ্বিতীয় আযান দেয়া হয় খুতবা শ্রবণের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। অর্থাৎ একথা জানানোর জন্য যে, এখন থেকে খুতবা শুরু হচ্ছে সুতরাং নফল নামায ও তাসবীহ পাঠ ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে একাগ্রচিত্তে খুত শ্রবণের প্রস্তুতি গ্রহণ কর।
প্রথম আযানটি মসজিদের বাইরে দেওয়াই উত্তম। আর দ্বিতীয় আযান দিতে হবে মসজিদের ভিতরে ইমাম সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে। এটাই শরী'আতের হুকুম। সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে ১৪০০ বছর পর্যন্ত এর উপর আমল হয়ে আসছে। তাই লোকেরা যা বলছে তা সঠিক নয়। [প্রমাণঃ

সূরা জুমু‘আঃ ৯, আবূ দাউদ শরীফ ১ : ১৫৫ # আল-বাহরুর রায়িক, ২ : ১৫৭ # ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া ২ : ৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ১২৬]
واذا أذن المؤذنون الأذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا إلى الجمعة لقوله تعالي: {فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع}
واذا صعد الامام المنبرجلس واذن المؤذنون بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث-اى من زمن عثمان.......الخ [الهداية
[171/1

প্রত্যেক আযানের পূর্বে নিয়মিত দরূদ পাঠ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের পূর্বে মুয়াযযিন সাহেব সালাম পাঠ করেনঃ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া শাফি’আল মুযনিবীন । আসসালাতু আসসালামু

{পৃষ্ঠা-২২৬}

আলাইকা ইয়া রাহমাতাল্লিল ‘আলামিন । প্রত্যেক আযানের পূর্বে নিয়মিত এ ধরনের সালাম পাঠ করা শরী‘আত সম্মত কি-না ?

জবাবঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ । দরুদ পাঠের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মহব্বত প্রকাশ পায় যা প্রতিটি মুমিনের জন্য জরুরী । তবে মুসলমানদের সকল আমলই শরী‘আত নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী হতে হবে । ইচ্ছামত কেউ কোন আমলকে নির্ধারিত করে নিতে পারে না ।যেমন নামায পড়া খুবই ফযীলত পূর্ণ । কিন্তু ফজর ও আসরের পর নফল নামায পড়া শরী‘আতে নিষেধ । তখন কেউ নামায পড়লে সওয়াব তো দূরের কথা বরং গুনাহ হবে । আযানের পর দু‘আর পূর্বে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা শরী‘আতে সুন্নাত হিসেবে সাব্যস্ত হয়েছে । কিন্তু আযানের পূর্বে নিয়ম বানিয়ে দরূদ পাঠ করার কোন বিধান শরী‘আতে নেই । তাই দরূদ পাঠ করা ফযীলতের বিষয় হলেও আযানের পূর্বে দরূদ পাঠের নিয়ম করে নেয়া গর্হিত ও বিদ‘আত কাজ । এটা শরী‘আতের নিয়মকে পরিবর্তন করার শামিল । এ নিয়মের দ্বারা মানুষ এমন বিভ্রান্তিতে পড়বে যে, মানুষ মনে করবে হয়ত আযানের আগে এভাবে দরূদ পড়া শরী‘আতের নিয়ম । অথচ এটা শরী‘আতের কোন বিশেষ নিয়ম নয় । তাই তার এ কাজের দ্বারা শরী‘আতের আযান বিধানকে বিকৃত করে দেয়া হচ্ছে । বলা বাহুল্য-আযানের শেষে দরূদ পড়ার নিয়ত ছিল । তা না পড়ে আযানের পূর্বে দরূদ পড়া নামাযের শেষে (আত্তাহিয়্যাতুর পর) দরূদ শরীফ না পড়ে সূরা ফাতিহার শুরুতে পড়ার মতই অপরাধ । যা গর্হিত হওয়া স্পষ্ট । দরূদ শরীফ পাঠ অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কর্তৃক বর্ণিত তরীকায় হতে হবে । মনগড়া তরীকায় না হওয়া জরুরী । আযানের পূর্বে দরূদ পড়া মনগড়া তরীকা । সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতি আমাদের চেয়ে বেশী মহব্বত রাখতেন । উল্লেখিত পদ্ধতি কোন উত্তম কাজ হলে এ কাজে তাঁরাই অগ্রগামী হতেন । অথচ কোন সাহাবী (রাযিঃ) থেকে এ ধরনের কাজ বর্ণিত নেই ।

হযরত নাফে (রঃ) বলেন- এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) সামনে হাঁচি দিয়ে الحمدلله এর সাথে والسلام على رسول الله বলল । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন- এটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল হলেও নবীজী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে হাচির পর এই

দরূদ পড়তে শিক্ষা দেননি । বরং الحمدلله على كل حال পড়তে শিখিয়েছেন । [তিরমিযী শরীফ ২ : ১০৩ পৃঃ]

{পৃষ্ঠা-২২৭}

এতদভিন্ন ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া হাবীবাল্লাহ! ইয়া শাফি‘আল মুযনিবীন! ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন! এভাবে ইয়া হরফ দ্বারা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আলিমুল গায়িব এবং সর্বত্রই বিরাজমান, এই ভ্রান্ত আকীদা প্রকাশ পায়- যা নিঃসন্দেহে নাজায়িয ও শিরকের পর্যায়ভূক্ত । যে ব্যক্তি শিরক থেকে বাঁচতে চায়, তার কর্তব্য শিরকের আশংকাজনক শব্দ হতেও বিরত থাকা । হ্যা, নবীজী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর রওযা মুবারক সামনে নিয়ে এভাবে বলতে নিষেধ নেই । কারণ তখন নবী(সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সরাসরি সম্বোধন করাই নিয়ম এবং তিনি সরাসরি সেই ডাকের জবাব দেন বলে হাদীস রয়েছে । [প্রমাণঃ মিশকাত ১ : ২৭ পৃঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৬৯ পৃঃ # আলমগীরী ১ : ৫৭ পৃঃ]

আযান ও নামাযে মাইক বা লাউড স্পীকারের ব্যবহার

জিজ্ঞাসাঃ আযান ও নামাযে মাইক ব্যবহার করা কুরআন ও হাদীসের আলোকে কতটুকু সহীহ ?

জবাবঃ নামায যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত তাই উক্ত ইবাদতকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী সাধাসিধেভাবে আদায় করাই বাঞ্ছনীয় । এ কারণে বর্তমানে মুফতীগণ বিনা প্রয়োজনে ছোট জামা‘আতে নামাযে মাইক ব্যবহার করাকে খেলাফে আওলা বলে আখ্যায়িত করেছেন । তবে বড় জামা‘আত হলে নামাযে মাইক ব্যবহার করা যায় । এতে কোন অসুবিধা নেই । তেনমিভাবে আযানের এক উদ্দেশ্য হল আওয়ায দূরে পৌছানো । তাই মাইকে আযান দেওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই । [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী, ১ : ৫৮৯ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ৮৪৫ # ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ১ : ৯০-৯৪]

ইকামতের সুন্নাত তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ ইকামত জোড় সংখ্যায় বলতে হবে ? না বেজোড় সংখ্যায় বলতে হবে ?

জবাবঃ ইকামত দেয়ার সহীহ তরীকা হচ্ছে (ক) প্রথম চার তাকবীর একত্রে এক নিঃশ্বাসে বলতে হবে । এরপরে ওয়াকফ করবে । অবশ্য প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করবে ।

(খ) অতঃপর দুই দুই বাক্য একশ্বাসে একত্রে বলে ওয়াকফ করবে । এরপর নিশ্বাস ত্যাগ করবে । অতঃপর ডানে চেহারা ঘুরিয়ে حى على الصلاة একশ্বাসে দু’বার বলবে । অতঃপর বামে চেহারা ঘুরানোর পর حى على الفلاح একশ্বাসে দু’বার বলবে । সর্বশেষ তিন বাক্য অর্থাৎ দুই তাকবীর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এক শ্বাসে বলে ইকামত শেষ করবে । [প্রমাণঃ মা‘আরিফুস সুনান ২ : ১৯৫ # তিরমিযী শরীফ ১ : ৪৮]

{পৃষ্ঠা-২২৮}

জুমু‘আর ছানী আযান বাইরে হবে না ভিতরে

জিজ্ঞাসাঃ জুমু‘আর ছানী আযান প্রসঙ্গে অনেকে বলেন এই আযান বাইরে হবে। এ নিয়ে দেশের অনেক জায়গায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে । কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানাবেন ।

জবাবঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যুগ থেকে দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর যুগ পর্যন্ত জুমু‘আর নামাযের জন্য অন্যান্য নামাযের ন্যায় একটি আযানের প্রচলন ছিল

। অতঃপর হযরত উসমান (রাঃ)-এর খেলাফত কালে দ্বিতীয় আরেকটি আযান (যা বর্তমানে প্রথম আযান) মদীনার যাওরা নামক স্থানে দেওয়া হয় । উক্ত স্থানে এ আযান দেয়ার পর প্রথম যুগের আযানটি (যা বর্তমানে দ্বিতীয় আযান) মিম্বরের নিকট খতিবের সম্মুখে দেয়া শুরু করেন । হযরত উসমান (রাঃ) সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে এর প্রচলন করেছিলেন । সুতরাং এতে প্রমাণিত হয় জুমু‘আর নামাযের সানী আযান মিম্বরের নিকট খতিবের সম্মুখে দেয়া সাহাবায়ে কেরামের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত ।

আর যারা বলে জুমু‘আর ছানী আযান মসজিদের বাইরে দিতে হবে তাদের এ দাবী বিভ্রান্তিকর, দলীল বিহীন, মনগড়া ও পরিত্যাজ্য । [হিদায়া ১ : ১৭১ পৃঃ # আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী ৪ : ২৪৭ # ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১ : ১৪৯ # দুররুল মুখতার ৩ : ৩৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯৪]

واذا صعد الامام المنبر أذن المؤذنون بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث (من زمن عثمان رضى الله تعالى عنه). [الهداية 171/1 –

নাবালিগ ছেলের আযান-ইকামত দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ নাবালিগ ছেলের আযান ইকামত দ্বারা নামায আদায় করলে সহীহ হবে কি-না ? জানতে ইচ্ছুক ।

জবাবঃ নাবালিগ ছেলে দু’ধরনের হতে পারেঃ (ক) নাবালিগ বুঝবান (খ) নাবালিগ বুঝহীন । যদি নাবালিগ বুঝহীন হয়, তাহলে তার আযান সহীহ হবে না । আর যদি নাবালিগ বুঝমান হয়, তাহলে তার আযান দেয়া মাকরূহ হবে । অবশ্য ছেলে যদি বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয় তাহলে তার আযান দেয়া মাকরূহ হবে না । [প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার ১ : ৩৯৩-৯৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৮৯ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ২ : ৮]

ইকামতের কালিমা কয়টি

জিজ্ঞাসাঃ অনেককে দেখা যায় যে, তারা ইকামতের বাক্যগুলো একবার করে বলে । অনেকে ইকামতের বাক্য আযানের মত ডবল করে ১৭ টি বাক্য উচ্চারণ করে । এ ব্যাপারে সঠিক বিষয়টি জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন ।

{পৃষ্ঠা-২২৯}

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত উভয় বিষয়ের ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত রয়েছে । তবে ১৭ কালিমা বিশিষ্ট হাদীসের উপর অধিকাংশ সাহাবীদের আমল ছিল । আযানের স্বপ্নদ্রষ্টা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়িদ (রাযিঃ) নিজেই হুজুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে হযরত বিলাল (রাযিঃ) কে আযানের ১৫ টি কালিমা শিক্ষা দেন ।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন- ইকামত আযানের ন্যায় । তবে কাদকামাতিস সালাহ দুইবার বলবে । সুতরাং মোট ইকামতের শব্দ হয়ে গেল ১৭ টি । যেমনঃ হযরত আবূ মাহযূরা (রাযিঃ) হতে বর্ণিতঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত আবূ মাহযূরা (রাযিঃ) কে ইকামতের ১৭টি কালিমা শিক্ষা দিয়েছেন শিক্ষা দিয়েছেন । [প্রমাণঃ তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ ও মিশকাত শরীফ ১ : ৬৩]

গোসল ফরজ অবস্থায় মসজিদে ঢুকা ও আযান দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের জামা'আত শুরুর ১৫/২০ মিনিট পূর্বে মুয়াজ্জিন ঘুম থেকে উঠেছে । তার গোসলের প্রয়োজন । মসজিদে ঢুকে মাইকে আযান দিতে হবে । সে কি প্রথমে আযান দিয়ে তারপর গোসল করলে সঠিক হবে ?
জবাবঃ গোসল ফরয হলে ঘুম থেকে উঠার পর গোসল করেই মসজিদে প্রবেশ করতে হবে । গোসল ফরয এমন ব্যক্তির জন্য মসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয় । যে কোন দরকারই হোক না কেন । মুয়াজ্জিনের জন্য এ ধরনের অসাবধানতার অবকাশ নেই । ফিকির থাকলে এমনটি হয় না । তারপরেও হলে তারাতাড়ি গোসল সেরে তারপরে আযান দিবে । অথবা ইমাম বা খাদেমকে আযান দিতে বলবে । বিনা গোসলে আযান দেয়া মাকরূহ । যদি বিনা গোসলে আযান দিয়ে দেয় তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে ।[প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ১ : ১৪৩ # টিকা ১ : ১৪৩ # আলমগীরী ১ : ৫৪]
হাইয়্যা আলাস সালাহ বলার সময় দাড়ানো
জিজ্ঞাসাঃ আমার জানা মতে জামা'আতের নামাযে ইকামতে 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময় দাঁড়ানো মুস্তাহাব । তবে দেখা যায়, অনেক ইমামই ইকামতের পূর্বে দাঁড়ান এবং মুসল্লিদেরকেও দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করতে বলেন । অথচ মুস্তাহাবের উপর কোনই আমল করেন না । এখন আমাদের করণীয় কি ?
জবাবঃ মুক্তাদিরা পূর্ব থেকে কাতার সোজা করে বসে থাকলে মুয়াযযিন সাহেবের 'হাইয়্যা আলাস সালাহ' বলার সময় উঠে দাড়ানোর অনুমতি আছে । তবে এটা কোন জরুরী বা সুন্নাত আমল নয় । আর পূর্ব থেকে কাতার সোজা না করে বসা থাকলে কাতার সোজা করা যেহেতু জরুরী তাই কাতার
{পৃষ্ঠা-২৩০}
সোজা করার লক্ষ্যে ইকামত শুরু করার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করে নিতে হবে । এটাই সহীহ নিয়ম । কারণ, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাতার সোজা করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন । অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাতার সোজা করার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন । এমনকি অনেক সাহাবায়ে কিরাম কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত ইকামত শুরু করতে বলতেন না । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৩০২ # তিরমিযী শরীফ ১ : ৫২ # আদদুররুল মুখতার ১ : ৪৭৯ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ২ : ১১২]
একই ব্যক্তির আযান ও ইমামতী
জিজ্ঞাসাঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে একই ব্যক্তি আযান দিতে এবং ইমামতী করতে পারবে কি-না ?
জবাবঃ একই ব্যক্তি আযান দিয়ে জামা'আতের ইমামতী করতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই । এমনকি ইমাম সাহেব ইকামত দিলেও কোন অসুবিধা নেই । হযরত উমর ফারুক (রাঃ) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । তিনি বলতেন, খিলাফতের দায়িত্ব আমার কাধে না থাকলে আমি নিজেই আযান দিয়ে নামাযের ইমামতী করতাম । তাছাড়া ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) নিজে আযান দিয়ে ইমামতী করতেন । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৪০১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ৯৫]
الافضل كون الامام هوالمؤذن وفى الصياء انه عليه السلام أذن فى سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر وقد حققناه فى الخزائن-
[الفتاوای الشامی 401/1
وفي الضياء " {أنه عليه الصلاة والسلام أذن في سفر بنفسه وأقام وصلى الظهر} " وقد .الأفضل كون الإمام هو المؤذن
[[الفتاوای الشامی 401/1. حققناه في الخزائن

একাধিক আযানের জবাব দিতে হবে কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামাযের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মসজিদে আযান দেয়া হয় । এমনকি একই সময়ে বিভিন্ন মসজিদের আযান কানে পৌঁছে । প্রশ্ন হচ্ছে- আমরা কি সবগুলো আযানেরই জবাব দিব, নাকি কোন একটার ?

জবাবঃ একাধিক আযান যদি আগে পরে হয়, তাহলে প্রথম আযানের উত্তর দিতে হবে । আর একই মুহূর্তে এক সাথে আযানের ধ্বনি কানে আসলে স্বীয় মহল্লার মসজিদ যেখানে সে নামায পড়ে, সেটির আযানের উত্তর দিবে । [প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ১ : ৩৯৭, আদদুররুল মুখতার ১ : ৪০০, আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯২]

আর আযানের কার্যত জওয়াব দেয়া ওয়াজিব । অর্থাৎ আযান শুনে সক্ষম পুরুষদের জন্য জামা'আতে হাযির হওয়া ওয়াযিব । বিনা উযরে ঘরে নামায পড়লে ওয়াজিব তরক হবে । [প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ১ : ৪০০]

{পৃষ্ঠা-২৩১}

আযান-ইকামত ও নামাযের তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একজন আলিম এসেছিলেন । তিনি আযান-ইকামত, উযু-নামায, বিবাহ-শাদী ও কাফন-দাফন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শরী'আতের বিধান এবং নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর সুন্নাত তরীকার বর্ণনা প্রদান করেন । তাঁর কথাগুলো আমাদের কাছে খুবই নতুন মনে হল । কেননা এসব বিষয় এত বিস্তারিত ইতিপূর্বে আমরা আর শুনিনি বা সাধারণতঃ কাউকে বলতেও শুনা যায় না । তাঁর কথা দ্বারা বুঝলাম যে, আমরা যেভাবে শরী'আতের বিধানগুলো পালন করছি, তা আল্লাহর বিধান এবং (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তরীকার সাথে খুব কমই মিল রয়েছে । বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা শরী'আতের বিধানের খেলাফ কাজ করে যাচ্ছি এবং সেটাকেই দীন মনে করছি । যাহোক তার কথাগুলো যেহেতু নতুন মনে হল, তাই আপনাদের নিকট আযান-ইকামতের বিষয় জানতে চাচ্ছি । তিনি আযান ও ইকামতে.......... (আল্লাহ) শব্দের লামের মধ্যে এবং সকল মাদ্দে তাবায়ীর মধ্যে এক আলিফ থেকে বেশী লম্বা করতে নিষেধ করেছেন । আযান ১২ শ্বাসে দিতে বলেছেন । অবশ্য ফজরের আযান ১৪ শ্বাসে দিতে বলেছেন । আর ইকামত ৭ শ্বাসে দিতে বলেছেন । আযান ও ইকামতের প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করে পড়তে বলেছেন । এবং ইকামতেও আযানের ন্যায় চেহারা ঘুরাতে বলেছেন । তার এই কথা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু গ্রহণযোগ্য ? প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক ।

জবাবঃ সম্ভবতঃ উক্ত আলিম ব্যক্তি হযরত থানবী (রহঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হক-এর কোন যিম্মাদার বা সদস্য হবেন । কারণ, বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মজলিসে দাওয়াতুল হক সংশ্লিষ্ট আলেম-উলামা সমাজের সকল স্তরে মুর্দা সুন্নাতসমূহ পুনর্জীবিত করছেন এবং সর্বস্তরে সহীহ সুন্নাতকে কায়িম করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ।

আপনি উক্ত আলিম সাহেবের রেফারেন্স দিয়ে যে কথাগুলো বলেছেন তা সবই সহীহ, সঠিক এবং সুন্নাত মুতাবিক।

(ক) আযান-ইকামত ও নামাযের তাকবীর সমূহে এবং সকল মাদ্দে তাবায়ীতে এক আলিফ মাদ্দ করতে হবে এটাই সহীহ কথা । এর থেকে কম করা হারাম এবং বেশী করা মাকরূহে তাহরীমী ।

(খ) আযান ১২ শ্বাসে এবং ইকামত ৭ শ্বাসে দেয়া সুন্নাত ।

(গ) আযান ও ইকামতের প্রত্যেক বাক্যের শেষে সাকিন করে বলা সুন্নাত । আকবার শব্দটির "রা" অক্ষরে পেশ পড়া ভুল এবং সুন্নাতের খেলাপ ।

{পৃষ্ঠা-২৩২}

(ঘ) ইকামতে حى على الصلاة এবং حى على الفلاح বলার সময় ডানে ও বামে চেহারা ঘুরানো সুন্নাত ।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামীঃ ১ /৩৮৭ -৩৯৯, আলবাহরুররায়িকঃ ১/ ২৫৭, ফাতহুল কাদীরঃ ১/২১৩, তাতারখানিয়াঃ ১/৫১৮, নববী ২/৭৭, ২/১৯০, ফাতাওয়া শামীঃ১/৩৮২]

উযু ব্যতীত আযান দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ উযু ব্যতীত মসজিদে ঢুকে আযান দেয়া যাবে কি ?

জবাবঃ উযু ব্যতীত মসজিদে ঢুকে আযান দেয়া জায়িয আছে । তবে উত্তম হলো উযু করে আযান দেয়া । এজন্য অনেক ফিকহবিদগণ উযু ব্যতীত আযান দেয়াকে মাকরূহ বলেছেন । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ২ : ৯২, ২ : ১০২ পৃঃ, আলমগীরী ১ : ৫৪, হেদায়া ১ : ৯০ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭ : ৩৪ পৃঃ # ফাতাওয়া শামী ১ : ৩৯২ পৃঃ]

জুমু'আর ছানী আযানের জবাব

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ছানী আযানের জবাব দিতে হবে কি-না ?

জবাবঃ জুমু'আর ছানী আযানের জবাব মুখে উচ্চারণ করে দেয়া নিষেধ । তবে মনে মনে দেয়া যেতে পারে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ১২৫, দারুল উলুম ৫ : ৫৯, তাবয়ীনুল হাকায়েক ১ : ২২৩, বাদায়েসুস সানায়ে ১ :২৬৪]

এক মসজিদে আযান দিয়ে অন্য মসজিদে নামায আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের মুআযযিন সাহেব যদি আযান দিয়ে অন্যত্র চলে যান, তাললে তিনি কি সেখানেই নামায পড়ে নিবেন ? না যে মসজিদে আযান দিয়েছে, সেই মসজিদেই তার নামায আদায় করতে হবে ?

জবাবঃ মুআযযিন যে মসজিদে আযান দিবেন, সেই মসজিদেই তার নামায আদায় করা উচিত । প্রয়োজন ব্যতীত এক মসজিদে আযান দিয়ে অন্য মসজিদে নামায আদায় করা উচিত নয় । তবে একান্ত প্রয়োজনে এক মসজিদে আযান দিয়ে অন্য মসজিদে নামায আদায় করায় কোন অসুবিধা নেই । [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ১ : ৫০ # নাসাঈ শরীফ ১ : ৭৯ # আবূ দাউদ শরীফ ১ : ৬৯ # আরফুশ শাযী ১ : ৫০ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৫৪]

একাকী নামাযীর ইকামত

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় সাধারণতঃ সব জায়গায় মসজিদের আযান শোনা যায় । এমতাবস্থায় যদি কারো বিশেষ কোন কারণে ঘরে নামায আদায় করতে হয়, তাহলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ইকামত সহ নামায আদায় করতে হবে কি-না ?

জবাবঃ যেহেতু ঘর থেকে মহল্লার মসজিদের আযান শোনা যায়, তাই বিশেষ ওযরবশতঃ নিজ গৃহে একা একা নামায আদায় করার ক্ষেত্রে আযান

{পৃষ্ঠা-২৩৩}

ইকামত না দিলেও নামায মাকরূহ হবে না । তবে ইকামতসহ নামায আদায় করাই মুস্তাহাব । কারণ, এক্ষেত্রে ইকামত বলার দ্বারা কিরামান কাতিবীনও নামাযে অংশগ্রহণ করে এবং এতে জামা'আতের সাদৃশ্য হয়ে যায় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৩৯৫ # বাদায়িউস সানায়ি ১ :

১৫২ # তাতার খানিয়া ১ : ৫২৪-৫২৫, হিদয়াহ ১ : ৯২ # কানযুদ দাকায়িক ২০ # বেহেশতী যেওর ১১ : ২৫ # নাফউল মুফতী ১৭২]
فلا يكره تركهما إذ أذان الحى يكفيه وفى الشامى تحت قوله لان أذان المحلة واقامتها كأذانه واقامته لأن المؤذن نائب اهل المصركلهم- [الفتاوى الشامى 395/1]

ঝড় তুফানের সময় আযান দেওয়া

জিজ্ঞাসাঃ অনেক এলাকায় ঝড়-তুফানের সময় প্রায় ঘরেই আযান ও তাকবীর দেয়া হয় । কিন্তু সম্পূর্ণ আযান কেউ দিতে চায় না । যেমন হাইয়া আলাচ্ছালাহ/ হাইয়া আলাল ফালাহ বলে না । এটা কি জায়িয ?

জবাবঃ প্রচন্ড ঝড়-তুফানের সময় বা অবিরাম ঝড় বৃষ্টি চলতে থাকলে সুন্নাত ও মুস্তাহাব মনে না করে এমনিই আযান দেয়াটা মুবাহ (জায়িয) । যদি কোন স্থানে প্রচন্ড ঝড়-তুফানের সময় আযান দিতে হয়, তাহলে পুরা আযান দিতে হবে । [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৩ : ৬ পৃঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ১৬৫]
لايسن الأذان لغيرها كعيد وفى الشامى تحت قوله اى من الصلوات والا فيندب للمولود- [الفتاوى الشامى385/1]

মসজিদের ভিতরে আযান দেওয়া উত্তম না বাইরে

জিজ্ঞাসাঃ বেহেশতী গাওহার কিতাবে উল্লেখ আছে যে, জুমু'আর ছানী আযান ব্যতীত বাকী সকল আযান মসজিদের বাহিরে দিবে । মসজিদে দেয়া মাকরূহে তানযীহী । কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মসজিদে মাইক দিয়ে মসজিদের ভিতর থেকে আযান দেয়া হয় । শরী'আতের দৃষ্টিতে এটা কিরূপ ?

জবাবঃ বেহেশতী গাওহারের মধ্যে এ মাসাআলাটি এরূপভাবে লিখা রয়েছে যে, মসজিদের মধ্যে আযান দেয়া সুন্নাতের খিলাপ । কেননা আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হল- লোকদেরকে একথা জানানো যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই জামা'আত কায়িম হবে । আর এ কথাও স্পষ্ট যে, মসজিদের মধ্যে আযান দিলে আওয়ায দূরে যায় না । তাই মসজিদের বাইরে কোন উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হয় । বর্তমানে মাইকের দ্বারা মসজিদের ভিতর থেকে বা কোন নীচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিলে যদিও আওয়ায দূরে যায় তথাপিও মাইকের দ্বারা মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া উত্তম নয় । দীনের আসল আকৃতি বিদ্যমান রাখা

{পৃষ্ঠা-২৩৪}

কর্তব্য । তাই উত্তম হল-মসজিদের বাইরে কোন রুমে হিফাযতের সাথে মাইক রাখার ব্যবস্থা করবে এবং সেই রুম থেকে আযান দিবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ২৯৪-২৯৫ # রদ্দুল মুহতার ১ : ৩৮৪ পৃঃ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৫৫ # ই'লাউস সুনান ৮ : ৪৯]
وينبغى ان يؤذن على المأذنة او خارج المسجد ولايؤذن فى المسجد كذا فى فتاوى قاضيخان والسنة ان يؤذن فى موضع عال يكون اسمع لجيرانه يرفع صوته ولايجهد نفسه كذا فى البحرالرائق – [الفتاوى الشامى- 384/1]

আযানের সময় আঙ্গুল চুম্বন করা

জিজ্ঞাসাঃ আযানের সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম মুবারক শুনার পর আঙ্গুল চুম্বন করা এবং আঙ্গুল দিয়ে চোখ মলা কি জরুরী ?

আমাদের এলাকায় কোন কোন মানুষ এরূপ করে থাকেন এবং কেউ না করলে তাকে ওহাবী ইত্যাদি বলে গালী দেন। এ সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি?

জবাবঃ আযানের সময় হুজুর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাম শুনে আঙ্গুল চুম্বন করা এবং চোখে লাগানো কোন মারফু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় । এ কাজকে সুন্নাত মনে করা

ভুল । অবশ্য অতীতের কোন কোন আলেম চোখের ব্যাথা দূর করার জন্য এবং পাওয়ার বৃদ্ধির জন্য চিকিৎসা স্বরূপ এরূপ করেছেন । এখনো যদি কেউ সুন্নাত বা মুস্তাহাবের গুরুত্ব না দিয়ে চোখের উপকারের জন্য চিকিৎসা স্বরূপ এরূপ করে তাহলে করতে পারে । কিন্তু শর্ত হল যে, কেউ যদি না করে তাহলে তাকে খারাপ মনে করতে পারবে না এবং ওহাবী ইত্যাদি বলতে পারবে না । যদি খারাপ মনে করে বা ওহাবী ইত্যাদি বলে, তাহলে তা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়িয হয়ে যাবে । কেননা মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নাজায়িয । আর এ আমল তো মুস্তাহাবও নয় । বরং এক ধরনের চিকিৎসা মাত্র । সুতরাং এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা চরম মূর্খতা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ৫৮, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১ : ১৮৬]

ان المندوب ينقلب مكروها اذا خيف ان يرفع عن مرتبته......الخ- [مجمع البحار.244/2- فتح البارى . 281/2- مجالس الابرار(العربى)299]

আযানের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামের লোকেরা আযানের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাতের সুরতে দু'আ পড়ে থাকেন । যারা তদ্রুপ করেন না তাদের প্রতি কটুক্তি করেন । শরী'আতের দৃষ্টিতে এর ফায়সালা কি ? {পৃষ্ঠা-২৩৫}

জবাবঃ আযানের পরে দু'আ পড়ার ব্যাপারে আসল তরীকা হল-শুধু মুখে দু'আ পড়বে । মুনাজাতের মত হাত তুলবে না । এটাই উত্তম । তবে যদি কেউ সঠিক মাসআলা না জানার কারণে আযানের দু'আ পড়ার সময় হাত তুলে তাহলে তার সাথে কঠোরতা করা ঠিক নয় । সহজে নরম কথায় বুঝাতে পারলে বুঝাবে । নচেৎ তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে ।

যারা আযানের দু'আর মধ্যে হাত না উঠালে তিরষ্কার করে, তারা উত্তমের খেলাপ একটি বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে । তাদের উচিত এ ধরনের বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা । [প্রমাণঃ মাজমু'আতুল ফাতাওয়া ২ : ২৪৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪ : ১৬১ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩ : ১৬]

আযানের পর নামাযের জন্য পুনরায় ডাকাডাকি করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে ফজরের আযান দেয়ার পর দলবদ্ধভাবে অথবা একাকী নামাযের জন্য মানুষকে ডাকাডাকি করার শর'ই বিধান কি ? বর্তমান যুগে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ব্যাপারে মানুষের শিথিলতা প্রদর্শনের প্রেক্ষিতে এ ডাকাডাকির গুরুত্ব কতটুকু ?

জবাবঃ তাসবীব অর্থাৎ আযানের পর জামা'আতের কিছুক্ষণ পূর্বে যিকির তাসবীহ, আসসালাতু জামি'আ" অথবা নামায প্রস্তুত" ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে নামাযের জন্য যেভাবে ডাকাডাকি করা হয়, এতে মানুষের অনেক উপকার হয় । মসজিদে মুসল্লিদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায় । কেননা গভীর রাতে ঘুমানোর কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকের পক্ষেই আযানের পর জাগ্রত হওয়া সম্ভব হয় না । এমনকি অনেকের নামাযও কাযা হয়ে যায় । কিন্তু জামা'আতের পূর্বে এ ডাকাডাকি করার ফলে অনেকের পক্ষে জামা'আতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয় । আর কেউ যদি জামা'আতে শরীক হতে নাও পারে, তারপরও অন্ততঃ একা নামায আদায় করে নিতে পারে । এদিকে লক্ষ্য করেই উলামায়ে কিরাম ফজরের সময় আযানের পর পুনরায় নামাযের জন্য ডাকাডাকি করা উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন ।

অন্যান্য নামাযের জন্যও এরূপ তাসবীবের অনুমতি আছে । কারণ বর্তমানে এ ফিতনার যুগে প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের ক্ষেত্রেই মানুষের মাঝে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২ : ৩৬২ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ২ : ১০১/৯৮]

আযানের জবাব

জিজ্ঞাসাঃ কোন আযানের জবাব দেওয়া উচিৎ ? সুন্নাত তরীকার খিলাপ হলেও কি আমাকে জবাব দিতে হবে ?

জবাবঃ সুন্নাত তরীকানুযায়ী আযান না হলে তার মৌখিক জবাব দেয়া আবশ্যক নয় । [প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ১ : ৩৭৯]

{পৃষ্ঠা-২৩৬}

আযান-ইকামতের উত্তর দেওয়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আযানের জবাব দেয়া ও ইকামতের জবাব দেয়া সম্পর্কে শরী'আতের হুকুম কি ?

জবাবঃ আযানের জবাব মৌখিকভাবে দেয়া মুস্তাহাব এবং কার্যকরীভাবে জওয়াব দেয়া অর্থাৎ নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব । সুতরাং মৌখিক জবাব দিয়ে জামা'আতে উপস্থিত না হওয়া অন্যায় । এতে ওয়াজিব তরক করার গুনাহ হবে । এমনিভাবে ইকামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব ।

তবে আযান-ইকামত সুন্নাত তরীকায় না হলে, সেই আযান-ইকামতের মৌখিক জবাব না দেয়া দোষণীয় নয় । আমাদের দেশের অধিকাংশ মুয়াযযিনদের আযান ও ইকামত সুন্নাত তরীকার খিলাপ । এ ব্যাপারে খিয়াল রাখা খুবই জরুরী । কারণ, আযান শি'আরে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত । وفى الدرالمختار: ان سمع المسنون وهوماكان عربيا لا لحن فيه-
وفى الشامى: الظاهر أن المراد ماكان مسنونا جميعه فلوكان بعض كلماته غيرعربى اوملحونا لاتجب عليه الإجابة فى الباقى لأنه حينئذ ليس اذانا مسنونا- [الفتاوى الشامى 397/1]

আযানের সময় তিলাওয়াত

জিজ্ঞাসাঃ কুরআনে পাক তিলাওয়াতরত কোন মুসল্লী আযান শ্রবণ করলে কি তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জাওয়াব দিবে ? নাকি তিলাওয়াত চালু রাখবে ?

জবাবঃ প্রথম যে আযান শুনা যাবে, সেই আযানের মৌখিক জাওয়াব দেয়া মুস্তাহাব । কুরআনে পাক তিলাওয়াতরত অবস্থায় তিলাওয়াত বন্ধ করে আযানের জাওয়াব দিবে এটাই উত্তম । কিন্তু কেউ কুরআনে কারীম বা দীনী বিষয় শিক্ষাদান বা শিক্ষা করার মধ্যে লিপ্ত থাকে, যেমন মক্তব বা হেফজখানার ছাত্ররা কুরআন পড়তে থাকে বা কোন জরুরী বয়ান চলতে থাকে । সেক্ষেত্রে তিলাওয়াত বা বয়ান বন্ধ করে আযানের জাওয়াব দেয়া মুস্তাহাব নয় । অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে আযানের জাওয়াব না দিলে কোন অসুবিধা নাই ।

ইমাম ও ইমামত

ইমামের যিম্মাদারী ও গুণাবলী

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের স্থায়ী ইমামের ইমামতীর জন্য কি কি গুণ থাকা জরুরী ? স্থায়ী ইমামের প্রতি মুসল্লিদের বা মহল্লাবাসীদের কি হক থাকে । পক্ষান্তরে মুসল্লিদের বা মহল্লাবাসীদের প্রতি ইমাম সাহেবের কি হক আছে ? বিস্তারিত জানালে চিরকৃতজ্ঞ থাকব ।

{পৃষ্ঠা-২৩৭}

জবাবঃ ইমামতীর জন্য কয়েকটি সিফাত বা গুণ থাকতে হয় যথা-(১) মুসলমান হওয়া, (২) বালিগ হওয়া, (৩)জ্ঞানী হওয়া, (৪) পুরুষ হওয়া, (৫) কারী ও আলেম হওয়া। অর্থাৎ শুদ্ধভাবে কিরাআত পাঠে সক্ষম এবং নামাযের জরুরী মাসাইল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। (৬) মুত্তাকী

হওয়া অর্থাৎ সকল প্রকার হারাম ও মাকরূহ তাহরীমী ও বিদ‘আতী কাজ থেকে বেচে থাকা (৭) শর‘ই উযর থেকে মুক্ত হওয়া, যেমন-বোবা, তোতলামী ইত্যাদি না হওয়া । মোদ্দাকথা শরী‘আতের পূর্ণ অনুসরণ করা এবং তার উপর সর্বদাই অটল থাকা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৫০, ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৭ : ৬২]

উল্লেখিত শর্তসমূহ না পাওয়া গেলে তাকে ইমাম পদে নিয়োগ দান করা জায়িয হবে না । বিশেষ করে কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করা বা বহাল রাখা জায়িয নয় । তেমনি ফাসিকের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । এ ধরনের ব্যক্তির জন্য ইমামতী করাও নাজায়িয ।

ফাসিক বলা হয় যারা গুনাহে কবীরায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে । যেমন দাঁড়ি কেটে ছেটে এক মুষ্টির কম করে রাখা । মিথ্যা কথা বলা বা খেয়ানত করা । পর্দা না মানা, সিনেমা-টেলিভিশন প্রভৃতি দেখা । গান-বাদ্য শুনা, ঘরে জীবজন্তুর ছবি বা মূর্তি স্থাপন করা । বেপর্দা মহিলাদের ঝাড় ফুঁক করা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ : ৭৭, # মারাকিল ফালাহ, ১৬৩, # ফাতাওয়ায়ে শামী ১ : ৫৫৯, # ইমদাদুল মুফতীন ৩১৯]

ইমাম যেহেতু নায়েবে নবী সুতরাং নবী-রাসূলগণের যে তিনটি কাজ ছিল তাবলীগ, তালিম ও তাযকিয়া (সূরা বাকারা ১২৯, ১৫১, জুম‘আ ২) এগুলো প্রথমে তার মধ্যে হাসিল করতে হবে । এর প্রত্যেকটা গুণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের নিকট থেকে শিখতে হবে । নিজের যিন্দেগীকে উক্ত তিন যিম্মাদারী আদায় করার জন্য ওয়াকফ করতে হবে । সুতরাং ইমাম হিসেবে তিনটি যিম্মাদারী পালন করতে হবে ।

প্রথম যিম্মাদারীঃ মসজিদের মুসল্লীদের সঠিকভাবে ইমামতী করা ও নামায পড়ানো । এর জন্য দু’টি কাজ করতে হবে ।

(ক) সূরা-কিরাআত পুরাপুরি সহীহ করতে হবে । কারণ, কিরাআতের অনেক ভুল দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যায় ।

(খ) সহীহ মাসআলা-মাসাইল, আমলী মশক ও বাস্তব অনুশীলন-এর মাধ্যমে শিখে নিতে হবে । কারণ, ইমামের অনেক ভুলের কারণে সকলের নামায নষ্ট হয়ে যায় । যেমন মনে মনে কিরাআত পড়া । জিহবা, ঠোঁট বা মুখ না হেলিয়ে দিলে দিলে কিরাআত পড়া । [হিদায়া ১ : ১১৭]

{পৃষ্ঠা-২৩৮}

দ্বিতীয় যিম্মাদারীঃ মসজিদের মুসল্লীদের এবং মসজিদের মকতবের বাচ্চাদেরকে কুরআনে কারীম তথা সূরা-কিরাআত সহ দীনের বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা । দীনের করণীয় পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান দান করা । অর্থাৎ তাদের ঈমান-আকায়িদ, ইবাদাত-বন্দেগী, মু‘আমালাত বা হালাল রিযিক, মু‘আশারাত বা বান্দার হক ও ইসলামী সামাজিকতা, আত্মশুদ্ধি বা অন্তরের রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা । এর মাধ্যমে সমস্ত গুনাহের অভ্যাস পরিত্যাগ করান এবং প্রত্যেকটি বিষয় বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতে কলমে শিক্ষাদান করা । এমন যেন না হয় যে, একজন ইমাম ১০/১৫ বৎসর একস্থানে ইমামতী করছেন অথচ তাঁর পেছনের মুসল্লিদের সূরা-কিরাআত, নামাযের রুকু ও সিজদাহ কিছুই সহীহ হয়নি । অথচ তিনি ইমামতী করেই যাচ্ছেন ।

তৃতীয় যিম্মাদারীঃ মহল্লার সকল শ্রেণীর লোকদেরকে দীনী ও দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছানোর লক্ষ্যে সময় সুযোগমত তাদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌঁছাতে চেষ্টা করা । একজন ইমাম ইচ্ছা করলে এক বৎসরে সারে তিনশত বাড়ীতে পৌঁছতে পারেন । এর জন্য ইমাম সাহেবের নিকট সম্পূর্ণ মহল্লার লোকদের একটা তালিকা থাকা উচিৎ । উক্ত তালিকা অনুযায়ী যারা

মসজিদে আসেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজের সহকর্মী বানিয়ে তাদের সাথে পরামর্শক্রমে যার সাথে যার পরিচয় আছে তাকে রাহবার বানিয়ে তার সহযোগিতায় সেসব লোকের বাড়ীতে পৌঁছা। অতঃপর তাদের কাছে দীনের গুরুত্ব তুলে ধরা। তাদের পরিবারের মহিলাদেরকেও দীনী দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাদেরকেও সহীহ ইমান ও আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করা। সাথে সাথে মহল্লার গরীব লোকদের খোঁজ-খবর নেয়া। বিপদে-আপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো। বর্তমানে আমাদের অবহেলার দরুন মসজিদের মকতব বন্ধ হয়ে দুশমনদের ফাঁদ কিন্ডার গার্ডেন আবাদ হচ্ছে। সুযোগ থাকতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

মুসল্লিদের উপর ইমামের হক হল যেহেতু তিনি সরদার বা নায়েবে নবী তাই তাকে সম্মান প্রদর্শন করা। তাঁকে বিপদ-আপদে হাদিয়া-তোহফা দিয়ে সাহায্য করা এবং তার সুখে-দুঃখে খোঁজ-খবর নেয়া এবং তার দীনী কথা সমূহকে যথাযথভাবে মেনে চলা। তার সাথে বেয়াদবী বা অসম্মানজনক আচরণ থেকে বিরত থাকা। কোন ভুলভ্রান্তি দেখলে আদবের সাথে গোপনে তাকে জানানো। [প্রমাণঃ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১ : ৭৮]

{পৃষ্ঠা-২৩৯}

وشروط الإمام للرجال الاصحاء ستة اشياء: الاسلام والبلوغ والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار كالرعاف والفأفأة والتمتمة واللثغ وفقد شرط كطهارة ستر عورة. (رد الحتار:550/1)

ধূমপায়ীর ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের নিকটবর্তী এক মসজিদের ইমাম সাহেব এক মুষ্টির ভিতরে দাড়ী কাটেন, লাহনে জলী কিরাআত পড়েন এবং ধূমপান করেন। উক্ত ইমামের পিছে নামায পড়া জায়িয হবে কি ?
জবাবঃ এক মুষ্টির ভিতরে দাড়ী কাটা হারাম। যে ব্যক্তি এ হারাম কাজে লিপ্ত হবে শরী‘আতের অন্যান্য আহকাম পুরাপুরি পালন করা সত্বেও সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে। আর ফাসিকের পিছে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । তদুপরি বিড়ি-সিগারেট পান করা মাকরূহ। বিড়ি-সিগারেট পান করার পর মুখ পরিষ্কার করা ব্যতীত মসজিদে যাওয়া নিষেধ। এর দ্বারা মানুষদের এবং ফেরেশতাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। তাছাড়া এটা স্বাস্থের জন্যও খুব ক্ষতিকর। আর নামাযের কিরাআতে লাহানে জলী পড়লে ক্ষেত্র বিশেষে নামায ফাসিদ হয়ে যায়। সুতরাং উল্লেখিত তিন প্রকার দোষে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ইমাম পদে নিয়োগ করা বা বহাল রাখা জায়িয নয়। তার পিছে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। এজন্য দ্রুত ঐ ব্যক্তিকে ইমামের পদ থেকে অপসারণ করে দীনদার, পরহেযগার, মুত্তাকী ও সহীহ আকীদা সম্পন্ন আলেমকে ইমাম পদে নিয়োগ করা কমিটির অপরিহার্য দায়িত্ব। নতুবা মুসল্লিদের নামাযের ক্ষতির জন্য মুতাওয়াল্লী বা কমিটি দায়ী হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫ : ১০৫-১১২ # ফাতাওয়ায়ে রাহীমিয়া ৪ : ৩৫০ # ফাতাওয়ায়ে শামী ১ : ৫৫০]

واما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لايهتم لأمر دينه, وبأن في تقديمه للامامة تعظيمه, وقد وجب عليهم اهانته شرعا...... في شرح المنية على ان كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا. [رد المحتار:560/1]

দাঁড়িবিহীন সাবালকের ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ আমি এক মসজিদের মুয়াযযিন। আমার বয়স ১৮ বৎসর। ইমাম সাহেব মাঝে মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে আমাকে নামায পড়াতে হয়। কিন্তু কিছু সংখ্যক মুসল্লী আমার পিছনে নামায পড়তে রাযী নন। তাদের অভিযোগ হল আমি ছোট, আমার দাড়ী উঠে নাই। আর ইমামের জন্য ১২ হাজার হাদীস জানা থাকা জরুরী, আমার তা নেই। এখন প্রশ্ন হল, এমতাবস্থায় আমার পিছনে নামায হবে কি-না এবং তাদের বক্তব্য সঠিক কি-না ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পুরুষ ছেলে ১২ বৎসরের পর যখনই তার স্বপ্নদোষ হবে সে বালেগ গণ্য হয়ে যাবে । শরী'আতের সমস্ত হুকুম তার উপর অর্পিত হবে । তখন সূরা-কিরাআত ও মাসআলা-মাসাইল জানা থাকলে সে ইমামতী করতে পারবে । এতে শরী'আতের কোন বাধা নেই ।
{পৃষ্ঠা-২৪০}
অবশ্য ১২ বৎসরের পর স্বপ্নদোষ না হলে সে বালেগ গণ্য হবে না । কিন্তু তার বয়স ১৫ বৎসর হয়ে গেলে তখন আর কোন আলামতের প্রয়োজন নেই স্বপ্নদোষ হোক আর নাই হোক, সে বালেগ বলে গণ্য হবে এবং সে ইমামতী করতে পারবে ।
আপনার বয়স যেহেতু ১৮ বৎসর, তাই আপনার জন্য ইমামতী করতে বয়সের দিক দিয়ে কোন বাধা নেই । নামায ও ইমামতীর জরুরী মাসআলা-মাসাইল জানা থাকলে ইমামতী করতে পারবেন । ইমামতীর জন্য দাঁড়ি থাকা জরুরী কোন বিষয় নয় । তদ্রুপ নামাযের ইমাম হতে হলে ১২ হাজার হাদীস জানা থাকতে হবে, শরী'আতে এরূপ কথার কোন ভিত্তি নেই । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ : ৯০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ১১৫ # রদ্দুল মুহতার ১/৫৫০]
ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشر سنة وادنى المدة في حقه اثنتا عشرة سنة وفي حقها تسع سنين يعني لو ادعيا البلوغ في هذه المدة تقبل. (البحر الرائق:85/8)
ইমামের আচরণ
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব অধিকাংশ সময় ছোট ছেলে-মেয়েদের সাথে অট্টহাসি ও রসিকতা করে থাকেন । তিনি নামাযের পূর্বে সমবয়সী লোকদের সাথে নিয়ে দুনিয়াবী গল্প করেন ও উচ্চৈঃস্বরে হাসেন ।
জবাবঃ ছোটদের সাথে মাঝে-মধ্যে রসিকতা করা জায়িয । এটা একটা প্রশংসিত কাজ । রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অনেক সময় এরূপ করতেন । তবে সীমাতিরিক্ত হাসি-ঠাট্টা বা রসিকতা করা মোটেই ভাল নয় । আর মসজিদে নিছক দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা, গল্প-গুজব করা অনেকের মতে হারাম । আর কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন । তবে ইমাম কি ধরনের দুনিয়াবী কথা বলেছেন তা প্রশ্নে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় এ সম্পর্কে ফাতাওয়া দেয়া সম্ভব নয় ।
পর্দা অমান্যকারী ইমাম
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব অনেক মহিলার সাথে কথাবার্তা বলেন । মক্তবে বয়স্কা ছাত্রীদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন । তিনি ঝাড়-ফুকের ব্যবসা করেন । বেপর্দা অনেক যুবতী মেয়েও ইমাম সাহেবের সাথে বেপর্দা খোলা-মেলা সাক্ষাৎ করে ও তদবীর গ্রহণ করে । এমতাবস্থায় তার পিছনে নামায আদায় করা ঠিক হবে কি ?
{পৃষ্ঠা-২৪১}
জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য বেগানা মহিলা হতে পর্দা করা ফরয । সুতরাং তাদের সাথে কথাবার্তা বলা ও দেখা সাক্ষাৎ করা হারাম । বর্ণনা মুতাবিক উক্ত ইমাম সাহেব ফাসিক । তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী এবং তাওবা করে সংশোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তার জন্য ইমামতী করাও মাকরূহে তাহরীমী । তেমনিভাবে মসজিদ কমিটির পক্ষে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখাও মাকরূহে তাহরীমী ।(রদ্দুল মুহতার ১ : ৫৬০) [প্রমাণঃ সূরা নূরঃ ৩০, মিশকাত ২ : ২৬৯ # মিশকাত শরীফ ১ : ২০ # ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৫৬০ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৩২০ # কাযীখান ১ : ৯১]
ফাসেক ও বিদ'আতী ইমামের পিছনে ইক্তিদা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা প্রতিমাসে আল্লাহর রাস্তায় তিনদিন সময় দেই । এক মসজিদে গিয়ে দেখি সেখানকার ইমাম সাহেব হাঁটুর উপর কাপড় তুলে পেশাব করেন । আযানের পর হাত তুলে মুনাজাত করেন । মীলাদে দাঁড়িয়ে কিয়াম করেন । তাবলীগ পছন্দ করেন না । বড়পীর (রহঃ)-এর খুব ভক্ত । আমরা সেখানকার কয়েকজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ করে জানতে পারলাম যে, ঐ মসজিদের ইমাম সাহেবের প্রভাব এত বেশী যে কমিটির সদস্যরা পর্যন্ত তার শিষ্যের মতো । যেহেতু তাবলীগ সারা জীবনই করব (ইনশাআল্লাহ) সেহেতু প্রশ্ন জাগে, যেসব মসজিদে এমন ইমামের সাক্ষাৎ মিলবে, তাদের পিছনে নামায আদায় করব কি-না ? এমন ইমামদেরকে শোধরাবার উপায় কি ? মেহেরবানী করে উত্তর দিলে উপকৃত হব ।

জবাবঃ মানুষের সামনে হাঁটুর উপর কাপড় তোলা নাজায়িয । আযানের পর হাত না তুলে দু'আ করার নিয়ম । তবে কেউ হাত তুলে মুনাজাত করলে তার সাথে ঝগড়া করবে না । শরী'আতে প্রচলিত মিলাদের কোন অস্তিত্ব নেই । সুতরাং দাঁড়িয়ে কিয়াম করার তো প্রশ্নই উঠে না । এগুলোকে শরী'আতের বিধান মনে করা বিদ'আত ও নাজায়িয । বড়পীর (রহঃ) ও অন্যান্য বুযুর্গদের ভক্ত হওয়া ভাল । কিন্তু বড়পীরের নামে বা খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতীর নামে শিরক-বিদ'আতের কোন অবকাশ নেই । কারণ, তাঁরা কখনোও এগুলোর তা'লীম দেন নাই । যে সব মসজিদে ফাসেক ও বিদ'আতী ইমামের সাক্ষাৎ মিলবে এবং অন্যত্র গিয়ে অন্য ইমামের পিছনে নামায আদায় করাও অসুবিধা হয়, এমতাবস্থায় এই ইমামের পিছনেই নামায পড়লে নামায আদায় হবে । জামা'আতে নামায পড়ার সাওয়াবও পাওয়া যাবে । সুতরাং জামা'আত ছেড়ে একা একা নামায পড়া যাবে না । ইমামের ত্রুটির কারণে অসুবিধা হলে তার জন্য ইমাম সাহেব ও কমিটি দায়ী থাকবে । এমন ইমামকে বিভিন্ন হেকমতের মাধ্যমে সহীহ কিতাব-পত্র হাদিয়া দিয়ে এবং হক্কানী উলামাদের কারগুযারী শুনিয়ে তাকওয়া-পরহেযগারীর দিকে

{পৃষ্ঠা-২৪২}

দাওয়াত দিতে হবে । এতে যদি শোধরানো যায় তাহলে ভাল । আর যদি না শোধরায় তাহলে আল্লাহ তা'আলার হাওলা করতে হবে । কারণ, আল্লাহ যাকে না শোধরায় মানুষের পক্ষে তাকে শোধরানো সম্ভব নয় । তবে কমিটির উচিত হল, এমন ইমামকে অপসারণ করে দীনদার মুত্তাকী ইমাম নিয়োগ করা । [প্রমাণঃ সূরা নাহল ১২৫ # শামী : ১ : ৫৬২ # কাযীখান ১ : ৯২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৯০]

صلى خلف فاسق او مبتدع نال فضل الجماعة (قوله: نال فضل الجماعة) افاد ان الصلوة خلفهما اولى من الانفراد. (الدر المختار:562/1)

অবিবাহিত ব্যক্তির ইমামত, দাঁড়ি মুন্ডনকারীকে কমিটির সদস্য বানানো

জিজ্ঞাসাঃ (ক) অবিবাহিত ব্যক্তির পিছনে জুমু'আর নামায পড়া যাবে কি ? কিছু কিছু আলিম-উলামার ভাষ্য যে, অবিবাহিত লোকের পিছনে জুমু'আর নামায পড়া মাকরূহ একথা কতটুকু সত্য ?

(খ) যে সমস্ত লোক দাঁড়ি রাখে না তারা কি মসজিদ কমিটির সদস্য হতে পারে ?

জবাবঃ অবিবাহিত লোকের পেছনে জুমু'আর নামায পড়া যাবে । শুধু অবিবাহিত হওয়ার কারণে তার পিছনে নামায মাকরূহ হবে এ কথা সঠিক নয় ।

ইমাম সাহেব যদি কামভাব প্রবল না হয় এবং স্বাভাবিক থাকে, তাহলে তার জন্য বিবাহ করা জরুরী নয় বরং সুন্নাত । আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে এবং শারীরিক দিক দিয়ে সক্ষম থাকলে এ সুন্নাত আদায় করাতে দেরী করা ঠিক নয় । তবে সেই মুহূর্তে বিবাহ না করার কারণে তার জন্য

ইমামতী করায় কোন অসুবিধা হবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭ : ৪০-৪১ # রহীমিয়া ৬ : ৩৫১]

(খ) যে ব্যক্তি দাঁড়ি রাখে না সে ফাসিক । ফাসিক ব্যক্তিকে কোন মসজিদ বা দীনী প্রতিষ্ঠানের কমিটির পরিচালক বা সদস্য না বানানো উচিত ।

শরী'আতের দৃষ্টিতে মসজিদ কমিটির সদস্য বা পরিচালক দীনদার, আমানতদার, শরী'আতের পাবন্দ, পরহেযগার হওয়ার সাথে সাথে এতটুকু দীনী জ্ঞান ও যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়া জরুরী, যার দ্বারা সে পরিচালনার কাজ শরী'আত সম্মতভাবে আঞ্জাম দিতে সক্ষম হয় ।

এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মজলিসে শুরা বা বড়দের সাথে পরামর্শ করার গুণও তার মধ্যে যেন থাকে । উপরোক্ত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ থাকা সত্ত্বেও কোন ফাসিককে দীনী প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী বা পরিচালক বা কমিটির সদস্য বানানো জায়িয নয় । কারণ তারা শরী'আতের বিধান জানে না । উলামায়ে

{পৃষ্ঠা-২৪৩}

কিরামের আযমত ও কদর বুঝে না । অফিস-আদালতের কর্মকর্তাগণ কর্মচারীদের সাথে যে আচরণ করেন তারা উলামাদের সাথে সে আচরণ করেন যা সম্পূর্ণ ভুল । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪ : ৩৮০, # আলমগীরী ২ : ৪০৮, বুখারী শরীফ ২ : ১০৬১, # রহীমিয়া ২ : ১৬৫, # মাহমূদিয়া ১ : ৪৫২, # ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১ : ১৫০]

তোতলা ইমামের ইমামত

জিজ্ঞাসাঃ কোন হাফেজ বা মাওলানার যবান যদি তোতলা থাকে, তিনি কুরআন শরীফ সহীহ-শুদ্ধ পড়তে পারেন না । তাহলে কি তার পিছনে মুসল্লিদের নামায সহীহ হবে ?

জবাবঃ যাদের পড়া সহীহ নয়, কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধ করে পড়তে পারে না, অথবা এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষর উচ্চারণ করে, এমন ব্যক্তিকে ইমাম নির্বাচন করা জায়িয হবে না । ভুল পড়নেওয়ালা ইমামের পিছে সহীহ পড়নেওয়ালাদের ইকতিদা করা সহীহ নয় । চাই ভুল পড়নেওয়ালা তোতলা হোক বা না হোক । হ্যাঁ, সব মুসল্লীদের পড়াও যদি গলদ হয় তাহলে তাদের নামায হয়ে যাবে ।

গান বাজনাকারী ইমামের পিছনে ইক্তিদা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় একটি মসজিদে ইমাম সাহেব যৌবন বয়সে দোতারা বাজিয়ে গান-বাজনা করতেন । এরপর কোন এক পীরের মুরীদ হয়ে ভাল হয়ে গিয়েছিলেন । এখন দেখা যাচ্ছে যে, মাঝে-মাঝে গোপনে কয়েক জনকে গান-বাজনা শিখাচ্ছেন । এখন ঐ ইমামের পিছনে নামায হবে কি-না ? দলীলসহ জানালে উপকৃত হবো ।

জবাবঃ শরী'আতে গান-বাজনা সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুনাহ । গান-বাদ্য শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া উভয়টাই কবীরা গুনাহ । আর যে ব্যক্তি কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে সে ফাসিক । আর ফাসিকের পিছনে নামায পড়া এবং তার জন্য ইমামতী করা দুইটিই মাকরূহে তাহরীমী ।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইমাম সাহেব পূর্বে যৌবন বয়সের গান-বাজনা করা থেকে তাওবা করে অতঃপর তাওবার আলামত প্রকাশ হওয়ার পর অর্থাৎ আমল আখলাক দুরস্ত হয়ে যাওয়ার পর তার পিছনে ইকতেদা এবং ইমামের জন্য নামায পড়ানো জায়িয হয়েছিল ।

কিন্তু বর্ণনা অনুযায়ী বর্তমানে সত্যিই যদি গোপনে বা প্রকাশ্যে গান-বাজনা শিখায় তাহলে তিনি আবারও কবীরা গুণাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে তার পিছনে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে । তবে

যদি কেউ না জানার কারণে বা কাছে-ধারে অন্য মসজিদ না থাকার কারণে বা অন্য কোন শর‘ই উযরের দরুন তার পিছনে ইকতেদা করে তার নামায মাকরূহ হবে না ।

{পৃষ্ঠা-২৪৪}

সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ বালেগ ছেলে-মেয়ে সহ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকারী মৌলভী শিক্ষকের পিছনে ঈদগাহের ইমামতী ও মসজিদের ইমামতী জায়িয কি-না ? ঐ ইমাম কানেও কিছু কম শুনে । তার পিছনে নামাযের হুকুম কি হবে ?

জবাবঃ মসজিদের ইমামের জন্য মুত্তাকি পরহেযগার আলিম হওয়া জরুরী । কিন্তু কোন ইমাম যদি যুবতী মেয়েদের সাথে উঠাবসা করেন, তাদের সাথে পর্দা রক্ষা না করে খোলাখুলি দেখা সাক্ষাৎ করেন, বেপর্দা ভাবে কথাবার্তা বলেন, তাহলে তিনি ফাসিক বলে গণ্য হবেন । আর ফাসিকের জন্য খালিস দিলে তাওবা না করা পর্যন্ত ইমামতী করা এবং মুসল্লীদের তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান বা ইমাম হিসেবে বহাল রাখা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য নাজায়িয ।

এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির জন্য জরুরী যে, উক্ত ব্যক্তি তাওবা করতঃ তাওবার আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উল্লেখিত পাপ কাজ সম্পূর্ণভাবে পরিহার পূর্বক তার চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে খোদাভীতি পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ইমামতী থেকে দূরে রাখা । খালিস তাওবা করলে তাকে ইমাম পদে রাখতে চাইলে রাখা জায়িয হবে ।

সহশিক্ষা চালু আছে এমন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে গেলে উপরে উল্লেখিত নাজায়িয কাজের মধ্যে শামিল হতে হয় । অতএব উক্ত ইমামের বেলায় উপরে উল্লেখিত হুকুম বর্তাবে । উক্ত শিক্ষক ইমামতী না করলেও বয়স্ক বালেগা মহিলাদের পড়ানোর চাকুরী করা তার জন্য জায়িয নয় ।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ২ : ২৮৪, # ফাতাওয়া খানিয়া, ফাতাওয়া কাযীখাঁন ১ : ৯০]

বেপর্দা ইমামের ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব কাপড়ের ব্যবসা করেন । তার দোকানে মহিলাদের পোষাকাদি পাওয়া যায় । যার কারণে মহিলাদেরকে দোকানে আসা-যাওয়া করতে দেখা যায় । সে ব্যবসার স্বার্থে মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা ও টাকা-পয়সার আদান-প্রদান করে থাকেন । এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম সাহেবের ব্যাপারে শর‘ই ফায়সালা কি ?

জবাবঃ মসজিদের ইমাম মুত্তাকী ও পরহেযগার আলিম হওয়া জরুরী । অবশ্য তিনি যদি নিজের দৃষ্টি হিফাযত করে মহিলাদের সাথে প্রয়োজনীয় জরুরী কথা বলেন তাহলে তিনি ফাসিক হবেন না । কিন্তু কোন ইমাম যদি বেগানা যুবতী মেয়েদের সাথে পর্দা রক্ষা না করে খোলা-খুলি দেখা সাক্ষাৎ করেন, বেপর্দাভাবে কথাবার্তা বলেন তাহলে তিনি ফাসিক বলে গণ্য হবেন । আর ফাসিকের জন্য খালিস দিলে তাওবা না করা পর্যন্ত ইমামতী করা এবং

{পৃষ্ঠা-২৪৫}

মুসল্লীদের জন্য তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে । ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ দান করা বা ইমাম হিসেবে বহাল রাখা মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য জায়িয হবে না ।

এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির জন্য জরুরী যে, উক্ত ব্যক্তি তাওবা করতঃ তাওবার আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ উল্লেখিত পাপ কাজ সম্পূর্ণভাবে পরিহার পূর্বক তার চাল-চলনে ও আচার-ব্যবহারে খোদাভীতি পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে ইমামতী থেকে দূরে রাখা । খালিস তাওবা করলে তাকে ইমাম পদে রাখতে চাইলে রাখা জায়িয হবে । (প্রকাশ থাকে যে, মসজিদ কমিটির

জন্য জরুরী তারা তাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে এই পরিমাণ বেতন দিবে, যার দ্বারা ইমাম সাহেব সুন্দরভাবে তার পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতে পারেন । আর যদি কোন ইমাম সাহেবের দোকান থাকে, তাহলে তার জন্য জরুরী যে, তিনি দোকানে না বসে অন্য কোন লোক দিয়ে তা পরিচালনা করবেন । যাতে করে তার প্রতি কারো বদগোমানীর সুযোগ না হয় ।)
[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২ : ২৭০, # আদ-দুররুল মুখতার, ১ : ৫৬০, # হালাবী কাবীর, ৫১৩, # আল-মাবসূত, ১ : ৪০, # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ : ৯৯, # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৪ : ৩৭১, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ২৪৪, # ইমদাদুল মুফতীন, ৩২১]

পরপুরুষের সাথে পালিয়ে যাওয়া স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণকারীর ইমামত

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক আলেম কোন এক মসজিদে ইমামতী করেন । তাঁর স্ত্রী এক পর পুরুষের সাথে পালিয়ে গিয়ে কোর্টে বিবাহবদ্ধ হয়ে এক সপ্তাহ উভয়ে দিন যাপন করে । পরে মেয়ের অভিভাবকগণ যে কোন কৌশলে তাকে নিয়ে আসে । ইমাম সাহেব দ্বিতীয় স্বামীর তালাক ছাড়াই তাকে নিয়ে ঘর-সংসার করছেন । ফলে মুসল্লীগণ অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ইমামতী থেকে বরখাস্ত করে দেন । এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম সাহেবের পিছনে নামায হবে কি-না ? যদি না হয়, তবে তার ইমামতী শুদ্ধ হওয়ার কোন পন্থা আছে কি ? এ ঘটনার পর জেনে শুনে ইমাম সাহেব সেই মেয়েকে নিয়ে ঘর-সংসার করাতে তার উপর এবং ঐ মেয়ের উপর শরী'আতের কি বিধান প্রয়োগ হতে পারে ?

জবাবঃ বর্ণনানুযায়ী আলেম সাহেবের স্ত্রী তাঁরই আছে । স্ত্রী অন্যের সাথে বিবাহ বসার কারণে প্রথম বিবাহের কোন ক্ষতি হয়নি । যেহেতু মাওলানা সাহেবের থেকে তালাক জনিত কিছু প্রকাশ পায়নি, সেহেতু স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ সহীহ হয়নি । শরী'আতের পরিভাষায় উক্ত বিবাহকে নেকাহে বাতিল বলা হয় । আর নেকাহে বাতিলের হুকুম হল- যার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে, তার থেকে কোন প্রকার তালাক ও ইদ্দত ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী ঘর-সংসার করতে পারে । এতে শর'ই কোন অসুবিধা নেই ।

{পৃষ্ঠা-২৪৬}

অতএব স্ত্রীর উক্ত কার্যকলাপের জন্যে ইমাম সাহেব অপরাধী নয় । সুতরাং ইমাম সাহেবের ইমামতীতে শর'ই দৃষ্টিকোণে কোন অসুবিধা নেই । তবে স্ত্রীকে খালিস তাওবা করিয়ে নেয়া ইমাম সাহেবের কর্তব্য ।

আর যেহেতু স্ত্রীর ২য় বিবাহ নেকাহে বাতিল হয়েছে, সেহেতু উক্ত ব্যক্তির সাথে জীবন-যাপন সম্পূর্ণ হারাম হয়েছে । [প্রমাণঃ সূরা নিসা ২৩, আদদুররুল মুখতার, ৩ : ৩১০, ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৭ : ৪৬৬-৬৭, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ১২ : ২৪৯]

দাঁড়িবিহীন ব্যক্তির ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন কলেজের প্রভাষক । আমি মধুর সুরে এবং তাজবীদের সঙ্গে কুরআন শরীফ পড়তে পারি । কুরআন-হাদীস সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান আছে । কিন্তু আমি দাঁড়ি রাখি না । গ্রামের বাড়ীতে গেলে সবাই আমাকে পাঞ্জেগানা নামায পড়াতে বলে । মুক্তদীদের অনুরোধক্রমে আমি নামায পড়াই । এমতাবস্থায় আমার ইমামতী শুদ্ধ হবে কি-না ?

জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব । এক মুষ্ঠির কমে দাঁড়ি মুন্ডানো, কাট-ছাট করা হারাম । এটা একটা দীর্ঘস্থায়ী কবীরা গুনাহ । যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়ি কেটে-ছেটে কিংবা মুন্ডিয়ে এক মুষ্ঠির কম রাখে, তাহলে সে ফাসিক বলে গণ্য হবে । আর ফাসিকের ইমামতী করা মাকরূহে তাহরীমী এবং তার পিছনে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী ।

সুতরাং সহীহ শুদ্ধ কিরাআত পড়তে পারে এমন দাঁড়িওয়ালা লোকের বর্তমানে আপনি ইমামতী করতে পারবেন না । বরং ঐ ব্যক্তিকেই ইমামতী করতে দিবেন । তবে যদি সেখানে শুদ্ধ কিরাআত পড়নেওয়ালা কেউ না থাকে, তাহলে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সেখানে আপনি ইমামতী করতে পারেন । তবে দাঁড়ি না রাখার গুনাহ হতেই থাকবে ।
[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ১ : ৫৬০, # ইমদাদুল মুফতীন ৩২১, # আযীযুল ফাতাওয়া ১৪৫, # খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১ : ১৪৫]

ফাসিকের ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেবের মাঝে এমন কিছু ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয়, যার কারণে, তার পিছনে নামায পড়তে নামাযের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয় । যেমনঃ তিনি তার বাবা-মায়ের মনে কষ্ট দেন । বড় ভাই-বোনদের সাথে মিথ্যা মামলা করে তাদের অপমান করেন । ৫/৬ টা বিয়ে করেছেন, বিবি-বাচ্চাদের খবর রাখেন না । বেপর্দা মেয়েলোকদের সাথে মেলামেশা করেন । এ ধরনের শরী‘আত পরিপন্থী অনেক কাজ করেন । এমতাবস্থায় উক্ত লোককে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা বৈধ হবে কি ? বা তার সম্পর্কে শরী‘আতের ফায়সালা কি ?

{পৃষ্ঠা-২৪৭}

জবাবঃ শরী‘আতের দৃষ্টিতে ছেলা রেহেমী তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা জরুরী । মিথ্যা মামলা করে কাউকে জেলে পাঠানো কবীরা গুনাহ । একসাথে চারটার বেশী বিবাহ করাও হারাম । মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ ও মহাপাপ । বেগানা মহিলাদের থেকে পর্দা করা ফরয । তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করা ও অনর্থক কথাবার্তা বলা কবীরা গুণাহ । মোটকথা, এসব ঘটনা সহীহ হলে, উক্ত ইমাম ফাসিক । আর তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । কর্তৃপক্ষের উচিত, উক্ত ইমামকে সরিয়ে অন্য একজন নেককার, পরহেযগার ও হক্কানী আলিমকে ইমাম নিয়োগ করা । আর যদি উক্ত ইমামকে বরখাস্ত করলে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ঐ ইমামের পিছনে নামায পড়ে নিবে । তবে গুনাহের দায়-দায়িত্ব ঐ ইমাম ও তার সহযোগীদের উপর বর্তাবে । আর যদি আশে-পাশে ভাল ইমাম থাকে তাহলে সেখানে গিয়ে নামায পড়া ভাল । [প্রমাণঃ সূরা আলে ইমরানঃ ৬১ # সূরা হজ্জঃ ৩০ # বুখারী শরীফ, ১ : ১০ # মিশকাত শরীফ ২ : ২৭০ # ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৫৯ # ফাতাওয়া দারুল উলুম ৩ : ৩০৪]

অঙ্গহীন ব্যক্তির ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ যে ব্যক্তির হাত নেই বা কবজি কনুই পর্যন্ত কাটা তার ইমামতী জায়িয কি-না ?
জবাবঃ যে ব্যক্তির হাত নেই বা কবজি কনুই পর্যন্ত কাটা তার ইমামতী জায়িয আছে । তবে যে ব্যক্তির উভয় হাত ভাল তাকে ইমাম বানানো উত্তম । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ১৬৫]

দাঁড়িকর্তনকারীর ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক লোক আমাকে বলে যে, দাঁড়ি কেটে বা ছেটে যদি এতটুকু রাখা হয়, যা ৪০(চল্লিশ) হাত দূরে থেকে দেখা যায়, তাহলে এমন ইমামের পিছনে নামায পড়া যাবে । এই সম্বন্ধে শরী‘আতের হুকুম কি ?
জবাবঃ তার কথা ঠিক নয় । এর কোন ভিত্তি নাই । বরং এক মুষ্টি হওয়ার পূর্বে দাঁড়ি কাট-ছাট করা হারাম । কেউ যদি এক মুষ্টির আগেই কাটে বা ছাটে তাহলে তার পিছনে নামায পড়া যাবে না । শরী‘আতের দৃষ্টিতে সে ফাসিক । সে ইমামতের অযোগ্য । তার ইমামতী করা বা আযান-ইকামত দেয়া নাজায়িয । তাকে ইমাম বা মুআযযিন পদে নিয়োগ বা বহাল রাখা কর্তৃপক্ষের জন্য

নাজায়িয । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৪১৪ পৃঃ, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ২৪০ পৃঃ # আযীযুল ফাতাওয়া ২০১]

{পৃষ্ঠা-২৪৮}

আহলে হাদীস, লা-মাযহাবী ইমামের পিছনে ইক্তিদা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের ইমাম যদি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের হয়, তবে তার পিছনে নামায পড়লে নামায সহীহ হবে কি-না ?

জবাবঃ আহলে হাদীস বা অন্য কোন সহীহ মাযহাবের ইমামের পিছনে নামায পড়া সম্পর্কে হুকুম হল যে, যদি সেই ইমাম সম্পর্কে জানা থাকে যে, তিনি হানাফী মাযহাব মতে নামাযের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও সকল শর্তসমূহের প্রতি পুরোপুরি যত্নবান থাকেন, তাহলে তার পিছনে ইক্তিদা করতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই । আর যদি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযে যে সকল শর্ত বা ফরয-ওয়াজিব রয়েছে, ইমাম সাহেব সেগুলো যথাযথ পালন করেন না বলে জানা থাকে, তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করা জায়িয নয় । আর যদি এমন ইমাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানা না থাকে, তখন তার পিছনে ইকতিদা করা মাকরূহ । কিন্তু বর্তমানে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু মাযহাবের খেয়াল করেন না বরং মাযহাবের খিলাপ করা সাওয়াব মনে করে, ইমামদের মান্য করা শিরিক বলে, ইমামগণ সম্পর্কে অনেক জঘন্য মন্তব্য করে থাকে, মাযহাব অনুসারীদের তিরষ্কার করে, সে কারণে তারা ফাসিক ও হঠকারী সাব্যস্ত হয়েছে । সুতরাং যথা সম্ভব তাদের পিছনে ইকতিদা না করাই বাঞ্ছনীয় । [প্রমাণঃ দারুল উলূম ৩ : ৩৩৫, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৮২]

ولو كانت الفتنة في الاقتداء فلا يقتدي صونا للمسلمين عن التخليط في الدين. (فتوى دار العلوم:335/3)

জনৈক ইমাম সাহেবের ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদ সংলগ্ন মার্কেটে ঔষধের ফার্মেসী খুলে সেখানে হোমিও চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন । উল্লেখ্য যে, তিনি সনদপ্রাপ্ত ও সরকার স্বীকৃত ডাক্তার নন । উক্ত ফার্মেসীতে বেপর্দা মহিলারা এসে তার নিকট থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করেন । প্রায়ই দেখা যায়, ইমাম সাহেব জামা'আত আরম্ভ হওয়ার তিন চার মিনিট পূর্বে এসে তাড়াহুরা করে ইস্তিঞ্জা-উযু সমাপ্ত করে ইমামতী শুরু করেন । এমতাবস্থায় সচেতন মুসল্লীবৃন্দের পক্ষ হতে গোপনে এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করা হলে তিনি দারুন রাগান্বিত হন । বলেন- চিকিৎসার জন্য মেয়েলোক দেখা সম্পূর্ণ জায়িয । এমনকি তাদের গুপ্তাঙ্গও দেখা জায়িয ।" তিনি আরো বলেন, অনেক মহিলারা মাথায় কাপড় পর্যন্ত রাখত না । অথচ আমার এখানে চিকিৎসা গ্রহণের জন্য আসার পর তারা মাথায় কাপড় দেয় । এটাই বা কম কি ? শুধু তাই নয়; বরং সংশ্লিষ্ট মুসল্লীগণকে তিনি ফিতনাকারী হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন-আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাতলি ।

{পৃষ্ঠা-২৪৯}

দুই তিন মিনিটে ইস্তিঞ্জা ও উযু সমাপ্তির ব্যাপারে তিনি বলেন-প্রমেহ রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য এক্ষেত্রে বেশী সময়ের প্রয়োজন । আর আমার প্রমেহ রোগ নেই । এছাড়া তিনি মুসল্লীগণের যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বলেন- ইমাম সাহেবের চেয়ে আপনারা বেশী জানেন না । সুতরাং ইমাম সাহেবের ত্রুটি ধরতে চেষ্টা করবেন না । এ বিষয়ে আমার জিজ্ঞাসাঃ

(ক) পর্যাপ্ত মহিলা ডাক্তার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় উক্ত ইমাম সাহেবের এভাবে বেপর্দা মহিলাদেরকে চিকিৎসা প্রদান করা জায়িয আছে কি ?

(খ) চিকিৎসা গ্রহণের নিমিত্তে আগত বেপর্দা মহিলাদেরকে হিদায়েতের জন্য কিছু উপদেশ দিলে মহিলাদের সাথে উক্ত ইমাম সাহেবের পর্দা করার বিধান শিথিল হবে কি-না ?
(গ) ডাক্তারী পাশ না করে ডাক্তারী করা জায়িয কি-না?
(ঘ) ২/৩ মিনিটে ইস্তিঞ্জা ও উযু শেষ করা সম্পর্কিত ইমাম সাহেবের পক্ষ হতে প্রদত্ত উত্তর গ্রহণযোগ্য কি-না ? প্রকৃতপক্ষে একজন সুস্থ মানুষের ইস্তিঞ্জা-উযুর জন্য কত মিনিট সময়ের প্রয়োজন ?
(ঙ) উক্ত ইমাম সাহেব যে পর্যায়ের ডাক্তার, এমন ডাক্তার কর্তৃক প্রয়োজনে মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ দেখা জায়িয কি-না ?
(চ) বর্ণিত সুরতে সচেতন মুসল্লীগণ ফিতনাকারী কি-না ?
(ছ) উক্ত ইমাম সম্পর্কে মুসল্লীদের করণীয় কি ?
জবাবঃ (ক) বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইমাম সাহেব ফাসিক । তার পেছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরীমী । তার জন্য ইমামতী করাও মাকরূহে তাহরীমী । সুতরাং উক্ত ব্যক্তির তাওবা করে সংশোধন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা জায়িয হবে না । সেক্ষেত্রে উক্ত ইমাম নিজেকে সংশোধন করতে রাজী না হলে তাকে বহিষ্কার করে নতুন একজন দীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার ও হকপন্থী আলিমকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করা অপরিহার্য । কেননা, শরী'আতের দৃষ্টিতে বেগানা মহিলাদের সাথে বিনা প্রয়োজনে কথা-বার্তা ও দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম । তবে বিজ্ঞ ডাক্তারদের জন্য কেবলমাত্র রোগাক্রান্ত জায়গাটুকু দেখা জায়িয । এছাড়া অন্য কোনভাবে শরী'আতের সীমালংঘন করা হারাম ।
(খ) আর উক্ত ইমাম সাহেব যেহেতু কোন বিজ্ঞ ডাক্তার নন এবং এলাকাতেও প্রয়োজনীয় মহিলা ডাক্তার বিদ্যমান রয়েছে সুতরাং উক্ত ইমামের জন্য পর্দার বিধান শিথিল করার প্রশ্নই আসে না ।
(গ) ডাক্তারী পাশ না করে ডাক্তারী করা মোটেও উচিত নয় । কেননা তার ভুল সিদ্ধান্তের কারণে রোগীর জীবন ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
{পৃষ্ঠা-২৫০}
(ঘ) ২/৩ মিনিটে ইস্তিঞ্জা ও উযু শেষ করা সম্ভব । কিন্তু এমন তাড়হুড়া করা উচিত নয় । কেননা, এর দ্বারা প্রস্রাবের ফোটা ভিতরে থেকে যাওয়ার ফলে উযু ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে ।
(ঙ) না, এমন পর্যায়ের ডাক্তারের জন্য মহিলাদের গুপ্তাঙ্গ দেখা জায়িয নয় ।
(চ) বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু উক্ত ইমাম প্রকৃতপক্ষেই দোষী । সুতরাং মুসল্লীগণ ফিতনাকারী সাব্যস্ত হবে না । কেননা, ফিতনার সীমা হল শর'ই কোন কারণ ব্যতীত অহেতুক ইমামের উপর মিথ্যা তুহমত আরোপ করা বা ইমামের উপর রাগ করা । তেমনিভাবে ইমাম নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তাকে হটানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়া । আর এখানে এগুলোর কোনটিই পাওয়া যাচ্ছে না ।
(ছ) যদি ঝগড়া-বিবাদ ব্যতীত উক্ত ইমামকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনেই নামায পড়ে নিবে । গুনাহের দায়-দায়িত্ব ইমাম সাহেব ও তার সহযোগীদের উপর বর্তাবে । তবে তাকে সংশোধন করার বা সহীহ দীনদার ইমামের ফিকির চালিয়ে যাবে ।
এক মাযহাবের লোকের জন্য অন্য মাযহাবের লোকদের ইমামতীর হওয়ার হুকুম কি ?
জিজ্ঞাসাঃ হানাফী মাযহাবের কোন লোক যদি অন্য মাযহাবের লোকদের ইমামতী করে এবং উক্ত মাযহাবের অনুসরণ করে যেমন, رفع يدين (হাত উঠানো) আওয়ায করে আমীন বলা ইত্যাদি, এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য ইমামতী করা সহীহ হবে কি-না ? অথবা হাত না উঠিয়ে হাত

উঠানোর ভান করা যেমন, রুমালকে দুই হাত দিয়ে ঝাকি মারা, যাতে করে অন্য মাযহাবের মুক্তাদিরা বুঝতে পারে যে, رفع يدين করেছে । তাহলে এভাবে ইমামতী করা জায়িয হবে কি-না ? এবং উক্ত কাজটি ধোকার মধ্যে গণ্য হবে কি-না ?

জবাবঃ এক মাযহাবের অনুসারীগণ অন্য মাযহাবের অনুসারী লোকদের ইমামতী করতে পারে । উদাহরণতঃ হানাফী মাযহাবের কোন লোক শাফিয়ীদের ইমাম হতে পারে । অনুরূপ শাফিয়ী মাযহাবের লোক হানাফীদের ইমাম হতে পারে । ইমাম সাহেব তার মাযহাব অনুযায়ী নামায পড়াবেন । ইমামের জন্য মুক্তাদীর মাযহাবের দিকে লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজন নেই । তাছাড়া এরূপ করার অনুমতিও নেই । তবে দু'চারটা পয়সার জন্য মুক্তাদীদের সন্তুষ্টিকল্পে এরূপ করা অর্থাৎ নামাযে রুমাল ঝাকি দেয়া নিঃসন্দেহে ধোকাবাজী ও গোনাহের কাজ । এর দ্বারা নামাযেরও ক্ষতি হয় ।

ইমাম ও মুক্তাদী নিজ নিজ মাযহাব অনুযায়ী নামায আদায় করবেন । এতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোনরূপ অসুবিধা নেই । এ শর্ত মেনে যারা ইমাম রাখেন তাদের ইমামতী করবে । নতুবা নিজের সহীহ মাযহাব বদল করে বা ধোকাবাজী করে ইমামতী করবে না ।

{পৃষ্ঠা-২৫১}

উল্লেখ্য যে, কোন মাযহাব অনুযায়ী কোন বিষয় যদি উযু ভঙ্গের কারণের মধ্যে পড়ে, কিন্তু অন্য মাযহাব অনুযায়ী পড়ে না, সেক্ষেত্রে ইমাম সাহেব থেকে এ ধরনের কোন কিছু পাওয়া গেলে অন্য মাযহাবের অনুসারী মুক্তাদীদের নামায দোহরানো কর্তব্য । [প্রমাণঃ শামী ১ : ৫৬৩ পৃঃ # আহসানুল ফাতাওয়া পৃঃ ৩ : ৩১৫ পৃঃ # দারুল উলূম ৩ : ১৯৪ পৃঃ ও ৩ : ২০৫ পৃঃ]

ভক্তি হয় না এমন ব্যক্তির পিছনে ইক্তিদা

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেবের চাল-চলন ও আমল আখলাকের কারণে আমি তাকে ভক্তি করতে পারি না । এমতাবস্থায় যদি আমি ঐ ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়ি তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ ফিকহের কিতাবসমূহে আছে যে, ইমাম সাহেবের মধ্যে যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন ত্রুটি না থাকে এবং মুক্তাদিরা যদি ঐ ইমামের উপর দুনিয়াবী কারণে খামাখা অসন্তুষ্ট (নারায) থাকে, তাহলে তার পিছে নামাযের মধ্যে কোন ক্ষতি হবে না । ইমামের নামায পড়ানোও মাকরূহ হবে না । আর এ অবস্থায় যেহেতু মুক্তাদীগণ অহেতুক ইমামের উপর নারায, তাই মুক্তাদীগণ গুণাহগার হবে । আর যদি ইমামের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে শর'ই কোন ত্রুটি থাকায় তার প্রতি মুক্তাদিরা নারায থাকে, তাহলে ঐ ব্যক্তির ইমাম হওয়া মাকরূহ হবে । তার ইমামতী ছেড়ে দেয়া উচিত । আপনার আপত্তির বিস্তারিত কারণ কোন ভাল আলেম থেকে জানার চেষ্টা করুন । এতে সত্যই যদি ইমাম দোষী হন, তাহলে তার সংশোধনের ফিকির করা যাবে । আর যদি আপনি খামাখা কু-ধারণা করে থাকেন, তাহলে ইমাম সাহেব থেকে মাফ চেয়ে নিবেন ।

এক মুষ্টির কম দাঁড়ি রাখে এমন ব্যক্তির ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ আমি কোন এক মসজিদে নামায পড়তে যাই । ইতিমধ্যে দুই রাকা'আত নামায চলেও গেছে । আমি তখন ইমাম সাহেবকে দেখি তার দাঁড়ি এক মুষ্টির কিছু কম, পরনে ছিল লুঙ্গি ও শার্ট । আমি তার পেছনে নামায পড়ে নেই । এখন আমার প্রশ্ন হল- (১) এই ইমামের পিছনে নামায পড়া ঠিক হয়েছে কি-না ? (২) আবার অনেক সময় দেখা যায় নামাযের সময় চলে যাচ্ছে এ জন্য তাড়াতাড়ি করে মসজিদে গেলাম জামা'আত ধরার জন্য । গিয়ে দেখি অযোগ্য লোক

ইমামতী করছে । তখন কি করব ? এই ইমামের পিছনে কি নামায পড়ব ? জামা'আতে নামায পড়া জরুরী বেশী ? নাকি জামা'আত ত্যাগ করে একা একা পড়ে নিব ?
{পৃষ্ঠা-২৫২}
জবাবঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব । যাদের দাঁড়ি লম্বা হয় তাদের দাঁড়ির তিন দিকেই এক মুষ্টি পরিমাণ দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব ।
যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়ি ছেঁটে-কেটে এক মুষ্টির কম করে রাখে, তাহলে সে ব্যক্তি ফাসিক গণ্য হবে । আর ফাসিক ব্যক্তির ইমামতী মাকরূহে তাহরীমী । তার পিছে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী । যদি কোন ব্যক্তি এ ধরনের ইমামের পিছনে ঘটনাক্রমে নামায পড়ে ফেলে, তাহলে নামায হয়ে যাবে । ঐ নামায দোহরাতে হবে না । এরূপ ক্ষেত্রে একা নামায না পড়ে এ ধরনের ইমামের পিছনে জামা'আতে শরীক হবে এটাই কর্তব্য ।
ধোকাবাজ ও ধুষদাতার ইমামতী
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব টিভি দেখেন । নিজের চাকুরীর জন্য স্বীয় হাতে ঘুষ প্রদান করেন । ১৯৯৩ ইংরেজী হতে ইবতেদায়ী মাদ্রাসা পরিচালনা করছেন । কিন্তু সরকারকে কাগজ-পত্রের মাধ্যমে ১৯৯০ সনে প্রতিষ্ঠা দেখিয়েছেন । অথচ তখন ইবতেদায়ী মাদ্রাসার ঘর বা জায়গা বলতে কিছুই ছিল না । উক্ত মাদ্রাসার মঞ্জুরী সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর হয়েছে ।
এমতাবস্থায় উল্লেখিত তিনটি অন্যায় কাজে লিপ্ত ইমামের পিছনে নামায পড়া ও তার ইমামতী করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ ?
জবাবঃ টিভি দেখা, ঘুষ দেয়া ও মিথ্যা কথা বলে ফায়দা উঠানো ইত্যাদি কাজ প্রত্যেকটাই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । আর কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত ব্যক্তিকে শরী'আতের দৃষ্টিতে ফাসিক বলা হয় । কোন ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ করা বা ইমাম পদে বহাল রাখা জায়িয নয় । অনুরূপভাবে ফাসিকের পিছনে নামায পড়াও মাকরূহে তাহরীমী এবং এ ধরনের ব্যক্তির জন্য ইমামতী করাও নাজায়িয ।
সুতরাং বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত ইমাম সাহেব এসব কবীরা গুনাহে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে তার পিছনে নামায পড়া এবং তার জন্য ইমামতী করা মাকরূহে তাহরীমী হবে । তবে তিনি খালিসভাবে তাওবা করলে এবং অন্যায়গুলো শুধরিয়ে নিলে তখন মসজিদ কমিটি তাকে বহাল রাখতে পারেন ।
[প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৩১৯, # আল-বাহরুর রায়িক ১ : ৩৪৯, # মাহমূদিয়া ২ : ৭৭]
গর্হিত আকিদা পোষণকারীর পিছণে ইক্তিদা
জিজ্ঞাসাঃ একজন ইমাম সাহেবের যদি নিম্নবর্ণিত দোষগুলো তাকে, তাহলে তার পিছনে নামায পড়া শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন ? দোষগুলো হলঃ (১) হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা সর্বদা হাযির-নাযির আছেন এ বিশ্বাস রাখে ও প্রচার করে । (২) হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের সৃষ্টি একথা বিশ্বাস রাখে ও বলে । (৩) তাবলীগ জামা'আতের বিরোধিতা করে । (৪) নারীদেরকে ভোট দেয়া জায়িয বলে ।
{পৃষ্ঠা-২৫৩}
জবাবঃ আপনাদের বর্ণনা মতে, উল্লেখিত আকীদা পোষণকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে গোমরাহ, ফাসিক ও বিদ'আতী । আর ফাসিক ও বিদ'আতী ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । ফাসিককে ইমাম পদে নিয়োগ করা বা বহাল রাখা জায়িয নয় । তবে যদি কোন ইমাম কুফরী আকীদা রাখে, যেমন যিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতপক্ষে তিনিই আল্লাহ তাহলে উক্ত ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া জায়িয হবে না । এমন ধরনের ব্যক্তির পিছনে কখনোও নামায পড়ে

থাকলে তা পুনরায় দুহরিয়ে পড়তে হবে । [প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ১ : ৪২৩ পৃঃ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ : ৭৩ # দারুল উলূম ৩ : ১৭০, ২৪৫-২৮০]
নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সরাসরি আলিমুল গাইব ও হাযির-নাযির মনে করা এবং তাঁকে আল্লাহ তা'আলার জাতি নূরের অংশ মনে করা কুফরী আকীদার শামিল । সুতরাং এ ধরনের আকীদা পোষণকারী ব্যক্তির পিছনে নামায না পড়ে অন্য কোন মসজিদে গিয়ে নামায পড়তে হবে । যেখানে জুমু'আ ফরয, সেখানে অন্য মসজিদ অনেক দূরে হলেও সেখানে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় করতে হবে । যদি কোন দিন বিশেষ কোন কারণে দূরের মসজিদে গিয়ে জুমু'আর নামায আদায় সম্ভব না হয়, তাহলে একা একা যুহরের নামায আদায় করে নিবে । তবুও কুফরী আকীদা ওয়ালা ইমামের পিছনে ইকতিদা করবে না ।
তাবলীগী জামা'আত নিঃসন্দেহে হাক্কানী জামা'আত । তাদের বিরোধিতা করা অন্যায় । আর মহিলা নেতৃত্ব ইসলাম স্বীকার করে না । তবে ক্ষেত্র বিশেষে তাদেরকে ভোট দেয়া যেতে পারে । [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ১ : ১৬৪ # ফাতাওয়া আব্দুল হাই ১ : ৪৫]
টিভি দর্শনকারী ইমামের পিছনে নামাযের হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ যে ইমাম টিভিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে থাকেন সে ইমামের পিছনে নামায হবে কি-না ? এমতাবস্থায় মুসল্লীগণের করণীয় কি ?
জবাবঃ মসজিদের ইমাম একজন মুত্তাকী ও পরহেযগার আলেম হওয়া জরুরী । কিন্তু কোন ইমাম সাহেব যদি টিভি ইত্যাদির অনুষ্ঠান দেখেন ও শোনেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি ফাসিক ও পাপী । আর ফাসিকের জন্য খালিস দিলে তাওবা না করা পর্যন্ত ইমামতী করা এবং মুসল্লীদের তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । এমতাবস্থায় মসজিদ কমিটির উপর জরুরী যে, সে ব্যক্তি তাওবা করে তাওবার আলামত প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ উল্লেখিত পাপ কাজ পরিহারপূর্বক তার চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে খোদাভীতি পরিলক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত) তাকে ইমামতী থেকে বরখাস্ত করা । খালিস তাওবা করলে, তাকে ইমাম পদে রাখা জায়িয হবে । [প্রমাণঃ সূরা লুকমান, ফাতাওয়া কাযী খান, ১ : ৯১, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ১ : ২০৩]
{পৃষ্ঠা-২৫৪}
অনুপস্থিতির কারণে বেতন কেটে রাখা
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবের মাসিক বেতন ১৫০০/= টাকা । তাঁকে প্রতি দুইমাস অন্তর পনের দিনের ছুটি দেয়া হয় । ইমাম সাহেব ছুটিতে বাড়িতে গেলে আসার সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ২/১ দিন দেরী হয়ে যায় । ফলে মসজিদের সেক্রেটারী বেতন থেকে টাকা কর্তন করে রাখেন । অর্থাৎ যে কয়দিন কামাই যায় সেই কয়দিনের বেতনের টাকা কেটে রাখেন । এটা কি শরী'আত অনুযায়ী বৈধ হবে ?
জবাবঃ শরী'আত মতে, যেমন শর্ত ও চুক্তি হবে সেভাবেই পরবর্তীতে লেন-দেন হবে । সেই হিসেবে যদি চাকুরীজীবীর জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে এমন শর্ত করা থাকে যে, বিনা ছুটিতে অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য বেতন কর্তন করা হবে এবং সে উক্ত শর্ত জেনে শুনে চাকুরী গ্রহণ করে থাকে, তাহলে নিয়ম অমান্য করার কারণে তার বেতন কেটে নেয়া জায়িয হবে । তবে পূর্ব চুক্তি না থাকলে বেতন কাটতে পারবে না । মোটকথা পূর্বশর্ত অনুযায়ী মু'আমালা কার্যকর হবে । কারণ মুতাওয়াল্লী বা কমিটির জন্য শর্ত সাপেক্ষে ইমাম নিয়োগ করা জায়িয আছে । ইমামও সে শর্ত মেনে নিয়ে চাকুরী গ্রহণ করতে পারে । অতএব, নিয়মের ব্যতিক্রম করলে তার বেতন কর্তন করা যাবে ।

অবশ্য মসজিদ কর্তৃপক্ষের মানবিক কর্তব্য এই যে, যদি মাঝে মধ্যে এ ধরণের অসুবিধা দেখা দেয় এবং সেটা বিশেষ কোন অসুবিধার কারণে হয়, তাহলে উক্ত ২/১ দিনের বেতন না কেটে ছুটি মঞ্জুর করে নেওয়া । কারণ, ইমাম তাদের জন্য দীনের দৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশী খায়েরখাহ বন্ধু । তার সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রাখা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য । তারা এ দায়িত্ব পালন করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করবেন । আর ইমামের দায়িত্ব যে, বিনা উযরে খামাখা দায়িত্ব পালনে অনিহা দেখিয়ে নিজেকে দায়িত্বহীন প্রমাণিত না করা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৪ : ৪৪৮, # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬ : ৩১১]

একাকী নামায আদায়কারীর পিছনে ইকতিদা

জিজ্ঞাসাঃ কেউ একাকী নামায শুরু করেছে । অতঃপর একজন এসে তার পিছনে ইকতিদা করল । এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তির নামায শুদ্ধ হবে কি-না ?

এক ব্যক্তি একাকী নামায পড়তে দাঁড়িয়ে ভুলে ইমামতের নিয়ত করে ফেলে । পরে স্মরণ হওয়ায় নামাযের ভিতরই একাকীত্বের নিয়ত করে নিয়েছে । এ অবস্থায় এক লোক এসে তার পিছনে ইকতিদা করেছে । এখানে প্রথম ব্যক্তির নামায কি শুদ্ধ হবে ? যদি হয়, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির ইকতিদাও কি সহীহ হবে ?

{পৃষ্ঠা-২৫৫}

জবাবঃ মুক্তাদী পুরুষ হলে ইমামত সহীহ ও শুদ্ধ হওয়ার জন্য যেহেতু ইমামতের নিয়ত করা জরুরী নয়, অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত উভয় সূরতে দু'জনের নামাযই শুদ্ধ হয়ে যাবে । তবে ইমামতের নিয়ত না থাকা অবস্থায় ইমামতের যে আলাদা সাওয়াব রয়েছে, তা হতে ইমাম সাহেব বঞ্চিত হবেন । আবার যদি ইমাম সাহেব দ্বিতীয় ব্যক্তির ইকতিদার সময় তার ইমামতের নিয়ত করে নেন, তবে তিনি ইমামতের সাওয়াব পেয়ে যাবেন । কিন্তু এমতাবস্থায় যদি জেহরী নামায হয় (যে নামাযে কিরাআত জোরে পড়তে হয়), তাহলে নিয়তের পর হতে আওয়ায করে কিরাআত পড়া ইমামের উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ১৬৬, ৬৭]

ফরজের পূর্বের সুন্নাত কাযা কারীর ইমামত

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব ফজর বা যোহরের সুন্নাতে মুআক্কাদাহ না পড়ে ইমামতী করতে পারবেন কি-না ? যদি কেউ করে ফেলেন, তবে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ ইমাম সাহেব সুন্নাতে মুআক্কাদাহ না পড়ে ইমামতী করতে পারবেন । তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না । আর এতে মুক্তাদীদের নামাযের মধ্যেও কোন প্রকার ক্ষতি হবে না ।

ইমামের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পাবন্দী করা জরুরী । জামা'আত শুরু হওয়ার আগেই যেন সুন্নাত আদায় হয়ে যায়, তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । হ্যাঁ, যদি কোন উযরের কারণে কোন সময় ইমামের দেরী হয়ে যায়, তবে মুক্তাদীদের জন্য ইমামকে সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া উচিত । আর যদি সুন্নাত পড়ার সুযোগ না হয়, তাহলে সুন্নাত পড়া ব্যতীত ইমামতী করলে কোন অসুবিধা হবে না । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৮৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ৯]

মাঝে মাঝে পেশাবের ফোঁটা বের হয়ে যায় এমন ব্যক্তির ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির নামাযে রুকু-সিজদাহ করার সময় বা এমনিতেই কোন কোন সময় পেশাবের ফোঁটা বেরিয়ে আসে । তবে সব সময় ধারাবাহিক ভাবে বের হয় না । এমন ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া ঠিক হবে কি ? সে নির্দিষ্ট একটা কাপড় দ্বারা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামায পড়াতে পারবে কি ?

জবাবঃ উল্লেখিত ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে মা'যূর নয় । বরং তিনি রুগী । এমতাবস্থায় তার চিকিৎসা হওয়ার আগ পর্যন্ত তার জন্য ইমামতী করা বা তাকে ইমাম হিসেবে রাখাও যাবে না । কারণ, যে কোন মুহূর্তে তার উযু চলে যেতে পারে । সুতরাং ইচ্ছাপূর্বক সকলের নামায দোহরানোর ঝুঁকি নেয়ার অনুমতি নেই । হ্যাঁ সহীহ কিরাআত পড়নেওয়ালা এবং মাসাইল জাননেওয়ালা কোন লোকই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তার পিছনে ইকতিদা করবে । তবে যদি তার পেশাবের ফোটা এসে যায়, তাহলে সকলের নামায দোহরাতে হবে ।

{পৃষ্ঠা-২৫৬}

ঐ ব্যক্তি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট একটা কাপড় রাখতে বা ব্যবহার করতে পারে । কিন্তু কোন স্থানে পেশাবের ফোটা লাগলে সে স্থান ধুয়ে নেয়া জরুরী । [প্রমাণঃ আল-আশরাহ ওয়ান্নাযায়ির ১০০ পৃঃ, ফাতাওয়া দারুল উলূম ২ : ৩১২]

"নামায না হলে এর কৈফিয়ত আমি দিব" ইমাম যদি এ রকম বলে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব ইসলামের বিভিন্ন বর্জনীয় আকীদা ও আমল সমূহে অভ্যস্থ । তিনি যে সকল আকীদা ও আমল চালিয়ে যাচ্ছেন, ঐ সকল বিষয়ের লিখিত ফাতাওয়ায় দেশের তিনটি বৃহত্তর ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিষ্কারভাবে জানিয়েছে যে, উক্ত ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া জায়িয হবে না । ইমাম সাহেব বলেছেন, যদি আমার পিছনে নামায পড়া শুদ্ধ না হয়, তার দায়িত্ব ও কৈফিয়ত আল্লাহর দরবারে আমি নিজেই দিব ।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল, উক্ত ইমাম সাহেবের কথা মেনে নিয়ে তার পিছনে নামায পড়ব কি-না ? এবং পড়লে আদায় হবে কি ?

জবাবঃ যদি সেই ইমাম সাহেবের আকীদা ও প্রচারণা শরী'আতে গর্হিত হয়, তাহলে উক্ত ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া সহীহ হবে না । কেননা, ইবাদত বন্দেগীর ব্যাপারে একজনের বোঝা অন্য কেউ গ্রহণ করতে পারে না । সুতরাং ইমাম যে মুসল্লীদের ইবাদতের দায় দায়িত্ব নিচ্ছেন, এটা তার জন্য নাজায়িয এবং মুসল্লিদের জন্য এটা বিশ্বাস করা নাজায়িয । বরং উক্ত ইমামকে ধোকাবাজ এবং পয়সা লোভী মনে করা উচিত । আখিরাতের ব্যাপারে তার ঈমানও আপত্তিকর । তবে ইমাম সাহেব যদি তার গলদ আকীদা ও আমল সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে প্রকাশ্যভাবে তাওবার ঘোষণা দেন এবং তাওবার আলামত প্রকাশ পায়, অর্থাৎ তিনি আগে যেসব ভুল করতেন বা বলতেন, এখন সেগুলোর বিরুদ্ধে বলতে থাকেন, ওয়ায করেন, তাহলে তখন তার পিছনে নামায সহীহ হবে । [প্রমাণঃ আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত ১২, সূরা ফাতির ১৮]

বিনা কারণে ইমামের প্রতি মুসল্লিদের অসন্তুষ্টি গ্রহণযোগ্য নয়

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম অত্যন্ত গরীব, নিঃস্ব ও অসহায় । বাড়ী-ভিটা কিছুই তাঁর নেই । অভাবের তাড়নায় মাদ্রাসায় বেশীদূর লেখাপড়া করতে পারেননি । যেখানে তিনি থাকতেন সেখানকার গণ্যমান্য লোকেরা অন্য এক ইয়াতিম মেয়ের সঙ্গে তাকে বিবাহ দেন । উক্ত মেয়ের কিছু সম্পত্তি ছিল । সে নামায পড়ে না । মনে করা হয়েছিল পরবর্তীতে ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু হয়নি । সম্পত্তির অহংকারে সে স্বামীকে আদৌ কোন তোয়াক্কা করে না এবং পর্দাও মানে না । তাকে দীনের উপর আনার জন্য ইমাম সাহেব আপ্রাণ চেষ্টা করেন । তবে খুবই হেয় অবস্থায় তিনি জীবনাতিপাত করছেন । মাসিক বেতন আর জমির

{পৃষ্ঠা-২৫৭}

ফসল দ্বারা কোন রকমে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছেন। ইমাম সাহেব অত্যন্ত নম্র, ভদ্র, বিনয়ী ও দীনদার হলেও তার সন্তানাদি তাদের মায়ের স্বভাবেরই। প্রায় সকলেই তাকে সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। এমতাবস্থায়, উক্ত ইমামের পিছনে ইকতিদা জায়িয হবে কি ?
জবাবঃ ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। এতে মানুষের কোন অধিকার নেই। সুতরাং আপনাদের ইমাম সাহেব যদি প্রকৃতপক্ষে ইমামতীর যোগ্য হন অর্থাৎ তিনি মুত্তাকী, পরহেযগার ও দীনের জরুরী মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে জ্ঞাত হন, তার কিরাআত শুদ্ধ হয় তাহলে তার পিছনে ইক্তিদা করায় কোনরূপ অসুবিধা নেই।
আর আর্থিক সংকটের কারণে তার স্ত্রী ও সন্তানরা তাকে হেয়প্রতিপন্ন করে এজন্য তার ইমামতীতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, স্বয়ং রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরামের জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পরিলক্ষিত হয় যে, তারা দুনিয়াতে অনেক দুঃখ-কষ্টে জীবন-যাপন করেছেন।
আর উক্ত ইমাম সাহেবের স্ত্রীকে একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, তার জান্নাত নির্ভর করছে তার স্বামীর সন্তুষ্টির উপর। স্বামীর সন্তুষ্টি ব্যতীত তার ইবাদত বন্দেগী কবুল হবে না। স্বামীকে কষ্ট দিলে জান্নাতের হুরগণ তার জন্য বদ দু'আ করেন। অনুরূপভাবে সন্তানদেরকে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, তাদের জান্নাত নির্ভর করছে পিতার সন্তুষ্টির উপর। পিতাকে কষ্ট দিলে এর শাস্তি দুনিয়াতেই শুরু হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ হিদায়াহ ১ : ১২১ # মিশকাত শরীফ ২ : ২৮১ ও ২৮৩]
ইমামতীর জন্য শর্ত
জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের নির্ধারিত ইমাম নামাযে দাঁড়িয়েছেন। পেছন থেকে একজন বলল- বড় আলেম পিছনে রেখে নামায হয় না। কথিত "বড় আলেমের" জন্মেরও আগে থেকে ইমাম সাহেব বিনা পারিশ্রমিকে নিয়মিত নামায পড়ান। জামা'আত শেষ হওয়ার পর উক্ত বড় আলেম ঘোষণা দিলেন, কারো নামায হয়নি। দোহরিয়ে নামায পড়তে হবে এবং তিনি দোহরিয়ে নামায পড়ালেন। প্রশ্ন হলো ইমামতীর শর্ত কি ?
জবাবঃ ইমামতীর জন্য শর্তগুলো নিম্নরূপঃ (১) নামাযের মাসাইল সম্বন্ধে অবগত হওয়া। অর্থাৎ নামাযের ফরয ও ওয়াজিব ও সুন্নাত-মুস্তাহাব সমূহ জানা। কি কি বিষয় দ্বারা নামায নষ্ট হয়ে যায়, কি কি দ্বারা সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হয় ইত্যাদি জানা। (২) এতটুকু কুরআন শরীফ সহীহভাবে হিফজ থাকা- যা দ্বারা নামাযের সুন্নাত কিরাআত পড়তে পারে। (৩) তাকওয়া ও পরহেযগারী থাকা অর্থাৎ, গুনাহে কবীরা ও হারাম কাজ এবং বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকা।
{পৃষ্ঠা-২৫৮}
মোটামুটি এতটুকু গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে ইমামতীর জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে। ইমাম নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরে তিনিই উক্ত মসজিদের ইমামতীর জন্য সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। কোন বড় আলেম আসলেও তিনি বেশী উপযুক্ত হবেন না। সে অবস্থায় নির্ধারিত ইমামের ইমামতীতে নামায সঠিক হবে, দোহরাতে হবে না। তবে হ্যাঁ সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্ধারিত ইমাম সাহেব কোন বড় আলেমকে ইমামতীর জন্য এগিয়ে দিতে পারেন। এটা তার ইখতিয়ার। এটা তার জন্য ভালো, জরুরী নয়। মসজিদের ইমাম যদি যোগ্য না হন, তবে মুতাওয়াল্লীর বা কমিটির দায়িত্ব উপযুক্ত ইমাম নিয়োগ করা। নতুবা তারা গুনাহগার হবেন এবং এরূপ অযোগ্য ইমামের মসজিদে যোগ্য আলেম আসলে, তাকেই ইমামতীর জন্য আগে দাঁড়াতে হবে। আর সেরূপ অবস্থায় নির্ধারিত অযোগ্য ইমাম নামায পড়লে তা দোহরাতে হবে। কারণ, সহীহ পড়নেওয়ালার উপস্থিতিতে গলদ

পড়নেওয়ালা নামায পড়ালে, সকলেরই নামায নষ্ট হয়ে যায় । [প্রমাণঃ ইমদাদুল আহকাম ১ :৪১৪-৪১৫, # ফাতাওয়া শামী ৩ : ৭৩৫]

ইমামতীর বেশী হকদার কে ?

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামের ঈদের নামাযের ইমাম নিয়োগ নিয়ে ইখতিলাফ হয়ে থাকে ।কিন্তু কতিপয় গ্রামবাসী একজন আলিয়া মাদ্রাসার কারী সাহেবকে ইমাম বানাতে চায় । আর কিছু গ্রামবাসী একজন কারী হাফেজ এবং দাওরা ফারিগ একজন আলেমকে ইমাম বানাতে চায় । এখন তাদের মধ্যে ইমামতের জন্য উত্তম কে হতে পারেন ?

জবাবঃ ইমামতীর যোগ্যতার জন্য কাওমী মাদ্রাসার আলেম বা আলিয়া মাদ্রাসার আলেম হওয়া কোন মাপকাঠি নয় । বরং নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলীতে দু'জনের মাঝের অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে নির্ণয় করা যায় । যথা-

(১) উভয়ের মধ্যে দীন সম্পর্কে যিনি বেশী ইলম ও জ্ঞান রাখেন । বিশেষ করে নামাযের মাসআলা -মাসাইল সম্পর্কে যিনি বেশী জানেন ।

(২) প্রয়োজনীয় কিরাআত বিশুদ্ধ থাকার পর উভয়ের মধ্যে যার কুরআন তিলাওয়াত বেশী সহীহ ও ভাল ।

(৩) উভয়ের মধ্যে যিনি বেশী মুত্তাকী এবং পরহেযগার ।

(৪) উভয়ের মধ্যে যার চরিত্র তুলনামূলকভাবে বেশী ভাল ।

(৫)উভয়ের মধ্যে যার বংশ উত্তম এবং কন্ঠস্বর ভাল ।

(৬) উভয়ের মধ্যে যিনি বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন ।

(৭) উভয়ের মধ্যে যার বয়স বেশী ।[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ১৬০, # বাদায়ে ১ : ১৫৭]

{পৃষ্ঠা-২৫৯}

ইমামের জন্য নামাযী-বেনামাযী সকলের ঘরে খাওয়া ও বেতন নেয়া

জিজ্ঞাসাঃ মহল্লায় নামাযী, বে-নামাযী, সুদ খাওয়ায় অভ্যস্ত ও মদ খাওয়ায় অভ্যস্ত এমন বহু শ্রেণীর লোক বসবাস করে থাকে । এখন কথা হল, এমন একটি মহল্লায় ইমাম সাহেব সকলের ঘরে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে কি-না । এমনিভাবে এদের থেকে উসূলকৃত টাকা দিয়ে ইমাম সাহেবের বেতন আদায় করা যাবে কি-না ?

জবাবঃ বে-নামাযী এবং মদ পানে অভ্যস্ত ব্যক্তির অধিকাংশ মাল যদি হালাল উপায়ে উপার্জিত হয়, তাহলে তাদের বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়া বা মসজিদ মাদ্রাসায় তাদের দান গ্রহণ করা যাবে । তবে এর থেকে দীনদার লোকদের পরহেয করা ভাল ।

আর সুদখোর বা যে সমস্ত লোকদের অর্ধেক বা অধিকাংশ উপার্জন হারাম বলে প্রবল ধারণা হয় এবং হালাল মাল হতে খাওয়ানো বা দানের ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায় তাহলে তাদের বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া বা তাদের দান গ্রহণ করা জায়িয নেই । [প্রমাণঃ মাহমূদিয়া ৮ : ২৭২, # আলমগীরী ৫ : ৩৪২ ও ৩৪৩]

ইমামের জন্য দাঁড়িতে খেজাব লাগানো

জিজ্ঞাসাঃ দাঁড়িতে বা চুলে কালো খেজাব (কলপ) লাগানো জায়িয আছে কি-না ? পাপ হলে তা কোন প্রকার ? যদি কোন ইমাম তাঁর দাঁড়িতে খেজাব লাগান, তাহলে তার ইমামতীর কি হুকুম ? এমতাবস্থায় মুসল্লীগণের কি করা উচিত ?

জবাবঃ দীন ইসলামের জন্য জিহাদরত মুজাহিদ ব্যতীত অন্য কারো জন্য দাঁড়ি বা চুলে সম্পূর্ণ কালো খেজাব লাগানো নাজায়েয । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- "শেষ যামানায় এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, যারা কাল খেজাব লাগাবে তারা জান্নাতের ঘ্রানও পাবে না ।" অন্য এক হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি কাল খেজাব লাগাবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার চেহারা কাল করে দিবেন । সুতরাং যেহেতু কাল খেজাব লাগানো নাজায়েয । যে ব্যক্তি নাজায়েয কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে তাকে শরী'আতের পরিভাষায় ফাসিক বলা হয় । আর ফাসিকের জন্য ইমামতী করা এবং তার পিছনে ইকতিদা করা উভয়টি মাকরূহে তাহরীমী । অতএব মসজিদ কমিটি ও মুসল্লীগণের জন্য জরুরী যে, ইমাম সাহেবকে উক্ত কাজ অর্থাৎ কাল খেজাব লাগান বন্ধ করে অতীতের অন্যায়ের জন্য খালিস অন্তরে তাওবা করতে বলবেন । আর যদি তাতে সম্মতি প্রকাশ না করে তাহলে তাকে ইমামতী থেকে বরখাস্ত করে তার স্থলে মুত্তাকী ও পরহেযগার আলেম ইমাম নিয়োগ করবেন । [প্রমাণঃ আবূ দাউদ শরীফ, ২ : ৫৭৮, # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ১১৮, # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬ : ২৯০]
{পৃষ্ঠা-২৬০}

কুফুরী কালিমা বলে ফেললে

জিজ্ঞাসাঃ (ক) জনৈক ইমাম সাহেব নিজ জমি-জমা নিয়ে কিছুদিন যাবৎ মামলায় হয়রানীর শিকার হয়ে আসছেন । একদিন কথায় কথায় তিনি বলে ফেললেন, "আল্লাহ আছে ? থাকলে কি আর এ রকম হয় ?" এখন প্রশ্ন হলো- এরকম বলা কি ঠিক ? আবার তিনি প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে পর্দা ব্যতীত অবাধে পর মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে থাকেন । আবার সুদযুক্ত বন্ধকী জমিও নিয়ে থাকেন । এ ইমাম সাহেবের পিছনে নামায আদায় হবে কি-না ?

জবাবঃ এ ধরনের কথাবর্তা কুফরী কালিমার অন্তর্ভুক্ত । অতএব এ ধরনের কথা বলে থাকলে কালিমা পড়ে তওবা ইস্তিগফার করা জরুরী । বিবাহিত হলে বিবাহ দোহরায়ে নেয়া উচিত । ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা বলা থেকে খুবই সতর্ক থাকা দরকার । কুফরী কালাম বললে ঈমান চলে যায় । আর ঈমান চলে গেলে পিছনের যিন্দেগীর সব আমলও নষ্ট হয়ে যায় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪ : ৭৮]

মসজিদের ইমামের জন্য মুত্তাকী পরহেযগার হওয়া জরুরী । কোন ইমাম যদি বেগানা যুবতী মেয়েদের সাথে উঠাবসা করেন, তাদের সাথে অনর্থক কথাবার্তা বলেন, তাহলে তিনি ফাসিক বলে গণ্য হবেন । আর ফাসিকের জন্য খালিস দিলে তাওবা না করা পর্যন্ত ইমামতী করা এবং মুসল্লীদের তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী । করযদাতার জন্য বন্ধকী জমির ফসল খাওয়া সুদ ও হারাম । সুতরাং এর থেকেও তাওবা করে ফসল জমিওয়ালাকে ফেরত দিতে হবে । [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৩২১, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২ : ৭৭]

সুন্নাত তরীকার খেলাফ নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের ইমাম সাহেবের নামাযের মধ্যে নিম্নের কাজগুলো পরিলক্ষিত হলে তার নামায ও তার পিছনে ইকতিদাকারী মুসল্লীদের নামায শুদ্ধ হবে কিনা ? কাজগুলো হচ্ছে-

১। নামাযরত অবস্থায় সিজদার সময় দুই পা উঁচু হওয়া ও মাটি থেকে পৃথক হওয়া ।

২। নামাযরত অবস্থায় দুইহাত দ্বারা জামা-কাপড় নাড়াচাড়া করা ।

৩। নামাযের নিয়ত বাধার পর একাধিক বার হাই তোলা ।

৪। রুকূর সময় দুই হাতের আঙ্গুলের মাথাগুলো পিছনের দিক করে রাখা ।

৫। নামাযের শুরুতে যেখানে দাঁড়ায়, নামাযের মধ্যে সেখান থেকে ৪/৫ আংগুল আগানো বা পিছানো।
৬। সিজদা হতে উঠার সময় মাটিতে ভর দিয়ে উঠা।

আরীফ তেজগাহ এর দেখা প্রুফ

৫। নামাযের শুরুতে যেখানে দাঁড়ায়, নামাযের মধ্যে সেখান থেকে ৪/৫ আঙ্গুল আগানো বা পিছানো।

৬। সিজদা হতে উঠার সময় মাটিতে ভর দিয়ে উঠা।

{পৃষ্ঠা-২৬১}

৭। সিজদার সময় দুই হাতের আঙ্গুল ফাঁক রেখে ডান হাতের আঙ্গুলগুলো বাম দিকে আর বাম হাতের আঙ্গুল ডান দিকে আড়াআড়ি ভাবে রাখা।

৮। নামাযরত অবস্থায় একাধিক বার কাশি দেয়া।

৯। নামাযের সময় হওয়ার পরও নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য অপেক্ষা করা এবং পিছন থেকে ঐ ব্যক্তিকে সামনের কাতারে আনা।

জবাবঃ ১। নামাযে সিজদারত অবস্থায় দুই পায়ের মধ্য হতে যে কোন একটির সামান্য অংশও যদি একবার তাসবীহ্ বলার পরিমাণ সময় জমিনের সাথে লেগে থাকে, তাহলে নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। অবশ্য সামান্য সময় পা জমিনে লাগিয়ে রেখে বাকী সময় ইচ্ছাপূর্বক পা উঁচু করে রাখা মাকরূহ্। তবে অনেক ফকীহের মতে সিজদাহ্ অবস্থায় তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় উভয় পা উঠিয়ে রাখলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্তব্য। আর যদি সিজদার পূর্ণ সময়ের মধ্যে উভয় পা সম্পূর্ণ উঠিয়ে রাখে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:২০৫, # আযীযুল ফাতাওয়া ২২৬, # রদ্দুল মুহতার ১:৩৬৯, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৮]

২। নামায অবস্থায় জামা-কাপড় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে খেলা করা কিংবা কাপড় সামলানো অহেতুক-মাকরূহ্ কাজ।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৫:১০৯]

৩। নিয়ত বাঁধার পর একাধিক বার স্বেচ্ছায় হাই তোলাও মাকরূহ্। কেননা, এটা নামাযে অমনোযোগিতারই বহিঃপ্রকাশ। কাজেই হাই আসলে যথা সম্ভব দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে।

৪। রুকূর সময় দু'হাতের আঙ্গুল পিছনে রাখা সুন্নাতের খিলাপ। কারণ, রুকূতে হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক রেখে হাঁটু মজবুত করে ধরা সুন্নাত। আর হাতের আঙ্গুলগুলো পিছনের দিকে রাখলে এ সুন্নাত লঙ্ঘিত হয়।

৫। নামাযরত অবস্থায় যদি চলা ফেরার কারণে এক কাতার বা তার চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। বর্ণিত অবস্থায় কোন জরুরতে বা অনিচ্ছাকৃত এরূপ করলে, নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:১৭৭]

৬। সিজদা হতে উঠার সময় মাটিতে ভর দিয়ে উঠা মাকরূহ্। তবে দূর্বলতা বা অন্য কোন উযর বশতঃ করলে মাকরূহ্ হবে না।

৭। সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে কিবলার দিকে করে রাখা সুন্নাত। আঙ্গুলগুলো ফাঁক রাখা বা উভয় হাত কিবলামুখী না রেখে আড়াআড়ীভাবে রাখা সুন্নাতের খিলাপ।

৮। বিনা উযরে কাশি দিলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ইমাম সাহেব কিরা‘আত শুরু করার পূর্বে কিরা‘আত পড়তে অসুবিধা হওয়ায় গলা সাফ করার জন্য এক দু’বার কাশি দিতে পারেন।

{পৃষ্ঠা-২৬২}

৯। নামাযের যে সময় নির্ধারণ করা হয়, মিনিটে-সেকেন্ডে সে ভাবে দাঁড়ানো জরুরী নয়। অনেক সময় ইমামের খাতিরে বা মুসল্লীদের কোন বিশেষ জরুরতের কারণে দেরী করতে হয়। তাতে কোন দোষ নেই। আর কারণ ছাড়া যদি অন্য কারো জন্য দেরী করা হয়, তাহলে দেখতে হবে- উক্ত ব্যক্তি যদি বুযুর্গ হন এবং এই অপেক্ষা করার দ্বারা মুসল্লীদের যদি কষ্ট না হয়, বরং সবাই আগ্রহ করে তার জন্য অপেক্ষা করে এবং অপেক্ষা করার কারণে নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত পেরিয়ে না যায়, তাহলে বিলম্ব করাতে কোন দোষ নেই। এ ধরনের সংগত কারণ না থাকলে অপেক্ষা করা উচিত নয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬৩৮-৬৫৪, ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৫-১০৯, আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৮, # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:১৭৭ ও ১৯৬, # আহকামে নামায ৪২:৪৩]

মুক্তাদীদের নামাযের হিসাব ও ইমামতের নিয়ত।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেবের জন্য কি মুক্তাদীদের নামাযের হিসাব দিতে হবে? একা নামায শুরু করার পর পিছনে মুক্তাদী এলে ইমাম সাহেব কিভাবে নিয়ত করবে? ইমাম সাহেবের কিরা‘আত অশুদ্ধ হলে মুসল্লীদের জন্য একা একা নামায পড়া জায়িয হবে কি?

জবাবঃ নামাযে ইমামতী করার কারণে মুক্তাদীগণের নামাযের হিসাব ইমামের দিতে হবে না। তবে যদি ইমামের কোন ত্রুটির কারণে মুক্তাদীর নামায নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম সাহেবকেই জবাব দিতে হবে।

মুক্তাদী পুরুষ হলে ইমামতী সহীহ্ শুদ্ধ হওয়ার জন্য ইমামতের নিয়ত করা জরুরী নয়। তবে ইমামতীর নিয়ত না করলে ইমামতীর যে আলাদা সওয়াব রয়েছে তা হতে ইমাম সাহেব বঞ্চিত হবেন।

উল্লেখ্য যে, একাকী নামায শুরু করার পর যদি অন্যদের ইকতিদার সময় তাদের ইমামতীর নিয়ত করে নেন, তাহলে ইমামতীর সওয়াব পেয়ে যাবেন। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি উচ্চ আওয়াজে কিরা‘আত বিশিষ্ট নামায হয় (যে নামাযে কিরা‘আত জোরে পড়তে হয়) তবে নিয়তের পর হতে আওয়াজ করে কিরা‘আত পড়া ইমামের জন্য ওয়াজিব।

ইমাম ও মুসল্লীদের মধ্যে হতে কেউ যদি বিশুদ্ধ কুরআন শরীফ না পড়তে পারে তাহলেও তুলনামূলক যার পড়া ভাল তাকে ইমাম বানিয়ে জামা’আতে নামায পড়তে হবে। সেক্ষেত্রেও একা একা নামায পড়া যাবে না। তবে বিশুদ্ধ কুরআন পড়তে পারে, এমন লোকের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করা ভাল।

[প্রমাণঃ শামী ১:৪২৪, # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:১৩৩ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১:১৬৬, # দারুল উলূম ৩:৭৮] {পৃষ্ঠা-২৬৩}

অবৈধ অর্থ দ্বারা ইমামের বেতন।

জিজ্ঞাসাঃ মুসল্লীরা যদি অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে ইমামকে বেতন প্রদান করে, তাহলে ইমামের জন্য সেই বেতন নেয়া জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা কোন মানুষের প্রতি বিনা দলীল-প্রমাণে খারাপ ধারণা করতে নিষেধ করেছেন। তাই নিশ্চিতভাবে না জেনে অযথা মুসল্লীদের মাল অবৈধ পন্থায় উপার্জিত হওয়ার ব্যাপারে খারাপ ধারনা করা নাজায়িয। বরং এরূপ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ব্যাপারে ভাল ধারনা পোষণ করার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে। সুতরাং মুসল্লীদের মালের অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশী হারাম হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিতভাবে জানার পূর্বে ইমাম সাহেবের জন্য মুসল্লীদের নিকট থেকে বেতন নেয়া জায়িয হবে।

তবে যদি কোন ইমাম নিশ্চিতভাবে জানতে পারেন যে, অমুক মুসল্লীর অর্ধেক বা অধিকাংশ মাল হারাম পন্থায় উপার্জিত তাহলে ইমাম সাহেব সেই মুসল্লী থেকে বেতন, ভাতা ও হাদিয়া ইত্যাদি গ্রহণ করবেন না। আর যদি ইমাম সাহেব বিশেষ কোন মুসল্লীর অর্ধেকের বেশী মাল হালাল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন বা এ ব্যাপারে তার অন্তরে প্রবল ধারনা সৃষ্টি হয়, তাহলে তার থেকে বেতন বা হাদিয়া গ্রহণ জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ সূরা মায়িদা ২, # সূরা হুজুরাত ১২, # মিশকাত ২৪৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১৪৭ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:১৯৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৭:২২]

রুকূ সিজদায় তিনবারের অধিক তাসবীহ্ পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেবের রুকু-সিজদার মধ্যে তিনবারের বেশী তাসবীহ্ পাঠ করা মাকরূহ্ হবে কি? আর যদি মুক্তাদীগণ তিনবারের বেশী যেমন-৫/৭ বার পড়ে, তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না?

জবাবঃ ইমামের জন্য তিনবারের বেশী তাসবীহ্ পড়া মাকরূহ্ হবে না। বরং ইমাম সাহেবের জন্য রুকূ-সিজদার তাসবীহ্ ধীরস্থির ভাবে পাঁচবার পড়া মুস্তাহাব। যাতে করে মুক্তাদীগণ কমপক্ষে তিনবার পড়তে পারেন। তবে পাঁচবারের অধিক পড়া মাকরূহ্ হবে। কিন্তু যদি মুক্তাদীগণ রুকূ-সিজদার তাসবীহ্ তিনবারের বেশী পড়েন, তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৪৬১-৪৬২, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:২৯৫]

ইমাম সাহেবের মেহরাব ব্যতীত অন্যস্থানে দাঁড়ানো।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব জামা'আতে নামায পড়ানোর সময় মেহরাব ছেড়ে অন্য কোন স্থানে (মসজিদের ভিতরেই) দাঁড়িয়ে জামা'আতের নামাযের ইমামতী করতে পারবেন কি-না?

{পৃষ্ঠা-২৬৪}

জবাবঃ ইমামের জন্য মেহরাবের একদম ভিতরে দাঁড়ানো সুন্নাত নয়। বরং অপারগতা ছাড়া এরূপ দাঁড়ানো মাকরূহ্। সুন্নাত হলো, ইমাম সাহেব কাতারের এ রকম মাঝে দাড়ানো যাতে করে উভয় পার্শ্বে মুসল্লীদের সংখ্যা সমান থাকে। যেহেতু মেহরাব কাতারের মাঝে বানানো হয়; সেহেতু মেহরাবে নামাযের স্থানে দাঁড়ালে কাতারের মাঝে দাঁড়ানোর এ সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। অন্যথায় মেহরাবে দাঁড়ানো পৃথক কোন সুন্নাত নয়। সুতরাং ইমাম সাহেব জামা'আতে নামায পড়ানোর সময় মেহরাব ব্যতীত অন্যস্থানে দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে পারবে। তবে শর্ত হলো, ইমাম সাহেবকে এমনভাবে দাঁড়াতে হবে যাতে করে তাঁর দু'পার্শ্বে মুসল্লী বরাবর হয় এবং কোনদিকে মুসল্লী কম বেশী না হয়ে যায়। বর্তমানে ডানদিকে কাতার বড় করা বা মুসল্লী সংখ্যা বৃদ্ধি করার যে প্রচলন আছে তা সহীহ্ নয়।

[প্রমাণঃ শামী ১:৫৬৮ # আলমগীরী ১:৮৯]

ফজরের নামায কাযা অবস্থায় যোহরের ইমামতী করা।

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তির ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলে, সে যোহরের নামাযে ইমামতী করতে পারবে কি-না?

জবাবঃ কোন শরয়ী উযরের কারণে ফজরের নামায কাযা হযে গেলে এবং তা আদায় করে নিলে পরবর্তী নামাযের ইমামতী করতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি কাযা আদায় না করে থাকে এবং উক্ত ব্যক্তি সাহেবে তারতীব (যার যিম্মায় কোন কাযা নামায নেই অথবা ছয় ওয়াক্তের কম কাযা নামায রয়েছে) হয় এবং উক্ত কাযা নামাযের কথা স্মরণও থাকে, তাহলে তার জন্য কাযা আদায় করার পূর্বে পরবর্তী নামাযের ইমামতী করা জায়িয নয়।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩০৪]

ইমামতীতে দাঁড়ানোর জায়গা।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব একজন মুসল্লী নিয়ে নামায পড়ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী মুসল্লী ইমামের ডানদিকে ছিল। নামায পড়া অবস্থায় আরো দুইজন মুসল্লী এসে গেল। তখন মুসল্লীদের কি দায়িত্ব ছিল?

জবাবঃ তখন নিয়ম হল মুক্তাদীই পিছনে চলে আসবে এবং নবাগতরা তাদের দেখে দাঁড়াবে আর যদি ইমাম সাহেব স্বয়ং আগে চলে যান, তাহলে তাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে প্রথম সুরত উত্তম। [ফাতাওয়া শামী ১:৫৬৭]

মুয়াযযিনের টিউশনীর টাকা ইমামের গ্রহণ করা।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব তার নিজ মসজিদের মুআযযিনকে দিয়ে টিউশনী করান এবং টিউশনী দ্বারা উপার্জিত অর্থ ইমাম সাহেব একাই গ্রহণ করেন। উক্ত ইমাম সাহেবের এ কাজ শরী'আত সম্মত হবে কি?

জবাবঃ ইমাম সাহেব ও মুআযযিন সাহেবের লেন-দেন তাদের পারস্পরিক কোন চুক্তির ভিত্তিতে কি-না? তা না জেনে এ ব্যাপারে আপত্তি করা সমীচীন হবে না; বরং অন্যায় হবে।
[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ২:৪১৩ # ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫:৩২১]

{পৃষ্ঠা-২৬৫}

খুৎবা ও ইমামতী।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় ঈদের নামাযে একজন ইমাম সাহেব নামায পড়েছেন ও অন্যজন খুৎবা পাঠ করেছেন এতে নামাযের কোন ক্ষতি হয়েছে কি?

জবাবঃ উল্লেখিত সুরতে নামায আদায় হয়ে গিয়েছে। তবে উত্তম এটাই যে, যিনি নামায পড়াবেন, তিনিই খুৎবা দিবেন।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৬২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১৮৪]

বৃদ্ধ ইমামের ইমামতী।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব বৃদ্ধ হওয়ায় মুসল্লীরা ইমামের কিরা'আত ঠিকমত শুনতে পায় না। তাই মুসল্লীদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে এবং অনেকে এমনও মন্তব্য করেছে যে, উক্ত ইমামের পিছনে নামায হবে না। কারণ, বৃদ্ধ হওয়ার কারণে তার সূরা কিরা'আত সহীহ্ হয় না এবং শুনা যায় না। এ ব্যাপারে শরয়ী সিদ্ধান্ত কি?

জবাবঃ উক্ত ইমাম সাহেব যদি বিশুদ্ধ ভাবে কিরা'আত পড়তে পারেন এবং নিকট থেকে শ্রবণকারীরা কিরা'আত সহীহ্ শুদ্ধ শুনতে পান, তবে উক্ত ইমাম সাহেব-ই ইমামতীর জন্য বেশী হকদার। তাকে বহাল রাখা উচিত।

হ্যাঁ, কিরা'আত শুনতে না পাওয়ার কারণে বা স্পষ্ট বুঝতে না পারার কারণে কর্তৃপক্ষ যদি তাকে অব্যহতি দিতে চান তাহলে দিতে পারেন। তবে বৃদ্ধ ইমামের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য পেনশন ভাতা বা এ জাতীয় সম্ভাব্য কিছু করা মুসল্লীদের
যিম্মাদারী।

জামা'আত

সামনে খালি রেখে পিছনে কাতার করা।

জিজ্ঞাসাঃ কাতারে একা একা দাঁড়ানোতে কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ সামনের কাতারে দাঁড়ানোর মত খালি জায়গা রেখে পিছনের কাতারে দাঁড়ানো মাকরুহ্। যারা সামনের কাতার পুরা না করে পিছনের কাতারে দাঁড়ায়, তাদের নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। যদি কোন আগন্তুক মুসল্লী এরূপ কাতার দেখে, তাহলে তার উচিত- পিছনের কাতার ভেদ করে সামনের খালি জায়গা পূর্ণ করা। আর যদি সামনের কাতারে খালি জায়গা না থাকে, তাহলে সে মাসআলা জানে এমন কোন ব্যক্তিকে সামনের কাতার থেকে টেনে আনবে। এমন লোক যদি না পাওয়া যায়, তাহলে একাই এক কাতারে দাঁড়াবে, যাতে কোন ধরনের ফিতনা না হয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ২:২৪২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:৩৩৫, ৩৪৫ # ফাতওয়া আলমগীরী, ১:৮৮]

{পৃষ্ঠা-২৬৬}

অশুদ্ধ পড়েন এমন ইমামের পিছনে শুদ্ধ পড়নেওয়ালার নামাযের হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন মসজিদের ইমাম সাহেবের পড়া অশুদ্ধ হয় এবং তাকে বলার পরও কুরআন পড়া ঠিক না করেন এবং সহীহ্ পড়তে পারেন এমন কোন ব্যক্তিকেও নামায পড়াতে দেন না। কিন্তু যিনি সহীহ্ পড়তে পারেন, তিনি জানেন জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব। এই মুহূর্তে সহীহ্ পড়নেওয়ালা ব্যক্তি কি করবেন? জামা'আতে, না একা একা পড়বেন?

জবাবঃ কুরআন শরীফ ভুল পড়লে গুনাহ্ হবে। তবে সব ভুলের কারণে নামায ফাসিদ হয় না। কোন ইমামের পড়া এমন অশুদ্ধ হয় যে, তাতে অর্থ বিগড়িয়ে নামায নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য ইমামতী জায়িয নেই। এবং তার পিছনে সহীহ্ পড়নেওয়ালা ব্যক্তির ইকতিদা করা জায়িয নেই। এ সূরতে ইকতিদা করলে সকলের নামায বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এমনি অশুদ্ধ হয় যে, তাতে গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা কম- যেমন: মদ্, গুন্নাহ্ ইত্যাদির ভুল, তাহলে সহীহ্ পড়নেওয়ালা তার পিছনে নামায না পড়ে অন্যত্র সহীহ্ পড়নেওয়ালা ইমামের পিছনে নামায পড়বে। তবে যদি অন্যত্র গেলে জামা'আত ছুটে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে তাহলে এই ইমামের পিছনেই নামায পড়ে নিবে। এ ক্ষেত্রে সহীহ্ পড়নেওয়ালার ইকতিদার দরুন সকলের নামায ফাসিদ হবে না।

[প্রমাণঃ হিদায়াহ ১:১২৬ # ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৭:৩৯]

কেবল মাত্র স্বামী-স্ত্রীর জামা'আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত জামা'আতের সাথে আদায় করেন। কিন্তু কোন কোন দিন বিশেষ উযরবশতঃ ঘরে স্বামী ইমাম হয়ে স্ত্রীকে মুক্তাদী বানিয়ে জামা'আতে নামায আদায় করে নেয়। এখন প্রশ্ন হল, এরূপ নামাযের দ্বারা জামা'আতে নামায আদায়ের সওয়াব হবে কি-না? এবং স্বামী-স্ত্রী দু'জনে জামা'আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করলে উক্ত নামায সহীহ্ হবে কি-না?

জবাবঃ উল্লেখিত বর্ণনা মুতাবিক উযরবশতঃ স্বামী ইমাম হয়ে স্ত্রীকে মুক্তাদী বানিয়ে জামা'আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করলে নামায হয়ে যাবে এবং জামা'আতের সওয়াবও পাওয়া যাবে। তবে মসজিদের জামা'আতের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে না। এখানে প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, বিনা উযরে মসজিদের জামা'আত তরক করা জায়েয নয়। কারণ, মসজিদের প্রতিবেশীর জন্যে মসজিদে জামা'আতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, স্বামী-স্ত্রী জামা'আতবদ্ধ নামায পড়লে স্ত্রীকে স্বামীর পিছনের কাতারে দাঁড়াতে হবে।
[প্রমাণঃ ইবনে মাজাহ ৬৯ # দুররুল মুখতার, ১:৫৬৬ # ফাতাওয়ায়ে শামী, ১:৫৬৬ # ইবনে মাজাহঃ৫৭] {পৃষ্ঠা-২৬৭}

জামা'আতের কাতার সোজা করার হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতের কাতার সোজা করা ওয়াজিব নাকি সুন্নাত?

জবাবঃ জামা'আতের কাতার সোজা করাকে কেউ কেউ ওয়াজিব বললেও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নামাযের কাতার সোজা করা সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কাতার সোজা করতেন এবং এ ব্যাপারে খুব তাকিদ দিতেন। এক হাদীসে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "তোমরা কাতার সোজা কর অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারার মধ্যে পরিবর্তন করে দিবেন।" অন্য রেওয়ায়েতে আছে 'তোমাদের অন্তরের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন।' নামাযের জামা'আতের কাতার সোজা না হলে ইমাম সাহেবের দ্বায়িত্ব হল, কাতার সোজা করে দেওয়া। প্রয়োজন হলে পিছনের কাতারসমূহ সোজা করার জন্য ইমাম সাহেব কাউকে যিম্মাদারও নিযুক্ত করে নিতে পারেন।
[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ৯৮ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৪:৩১৯- ৮:৯৯]

জামা'আতের কাতার সোজা করার নিয়ম।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের জামা'আতের কাতার সোজা করার নিয়ম কি? অনেকে বলেন যে, আঙ্গুলের অগ্রভাগ লম্বা রেখার সাথে মিলিয়ে রাখলে নামাযের কাতার সোজা হয়। আবার কেউ বলেন, পায়ের গোড়ালী মিলিয়ে কাতার সোজা রাখতে হবে। কোনটি সঠিক?

জবাবঃ ছফ বা নামাযের জামা'আতের কাতার সোজা করার নিয়ম হল একজনের টাখনু অপরজনের টাখনু বরাবর এবং একজনের কাঁধ অন্যজনের কাঁধের বরাবর রাখা। আর যদি কোন মসজিদে কাতারের দাগ দেওয়া থাকে, তাহলে দাগের উপর পায়ের গোড়ালী রেখেও কাতার সোজা করা যায়। দাগে আঙ্গুল রেখে কাতার সোজা করা সম্ভব নয়।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:১৫৮ # তাহতাভী, ২৪৮, # দারুল উলুম, ৩:৩৩৭]

নাবালক ছেলেরা নামাযের কাতারের মাঝে মাঝে দাঁড়াবে।

জিজ্ঞাসাঃ ফরজ নামাযের জামা'আতের কাতারের মাঝে মাঝে নাবালক ছেলেরা নিজ পিতার নিকট দাঁড়ায়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ করা ঠিক কি-না?

জবাবঃ যেসব নাবালক ছেলেরা নামায পড়ার নিয়ম-কানুন মোটামুটি জানে, তাদেরকে বড়দের কাতারে দাঁড় করানোই শ্রেয়। কারণ, একাধিক বাচ্চা একত্রে মিলে দাঁড়ালে, তারা নিজের নামাযের এবং অনেক ক্ষেত্রে বড়দের নামাযের ক্ষতি করে থাকে। তাই বড়দের সাথে দাঁড় করালে, এ অসুবিধাটা হবে না। কিন্তু যে সমস্ত ছেলেরা নামাযের নিয়ম-কানুন মোটেও বুঝে না, তাদেরকে মসজিদে নেয়াই শরীয়ত মতে উচিত নয়।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:২৮০]

{পৃষ্ঠা-২৬৮}

মহিলার ইমামতীতে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ মহিলারা জানাযার নামাযে ইমামতী করতে পারবে কি-না? এবং মহিলার ইমামতীতে জানাযার নামায আদায় করা হলে তা পুনরায় আদায় করতে হবে কি-না?

জবাবঃ মহিলারা পুরুষের ইমাম হতে পারে না। সুতরাং কোন মহিলা জানাযার নামাযে পুরুষের ইমামতী করতে পারবে না। তবে যদি সেখানে কোন পুরুষ না থাকে, তাহলে মহিলা ইমামতী করতে পারবে। কোথাও যদি কোন মহিলা জানাযার নামাযে পুরুষের ইমামতী করে তবে সেখানে দ্বিতীয়বার জানাযার নামায পড়তে হবে না। কেননা, যদিও উক্ত মহিলার ইমামতী সহীহ্ হয়নি এবং তার পিছনে পুরুষের নামাযও হয়নি তবুও যেহেতু উক্ত মহিলার নামায হয়ে গেছে তাই ফরজে কিফায়াহ্ আদায় হয়ে গেছে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২:২০৮ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৫:২৮৯]

মুক্তাদীর জন্যে আঊযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদীর জন্য 'আঊযুবিল্লাহ্' ও 'বিসমিল্লাহ্' আর বিতরের নামাজে দু'আয়ে কুনূত এবং বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার আগে 'বিসমিল্লাহ্' পড়তে হবে কি-না?

জবাবঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় মুক্তাদী তাকবীর বলে হাত বাধার পর শুধু ছানা পড়বে। আঊযুবিল্লাহ্ এবং বিসমিল্লাহ্ কোনটাই পড়বে না। বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনূত-এর শুরুতে এবং বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার আগে বিসমিল্লাহ্ পড়বে না। এটাই উত্তম। একাকী নামায পড়ার সময় ছানা পড়ার পর আঊযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পূর্ণ পড়বে। তারপর সূরায়ে ফাতিহা শুরু করবে। তবে আত্তাহিয়্যাতুর শুরুতে কেউ বিসমিল্লাহ্ পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার, ১:৪৯০ # মারাকিল ফালাহ্, ২২৮ # ইমদাদুল আহকাম, ২:৭৯]

সালাম ফিরানোর পর কাতার থেকে পিছনে সরে বসা।

জিজ্ঞাসাঃ অনেক সময় দেখা যায়- কিছু কিছু মুক্তাদী, ইমামের সালাম ফিরানোর পরেই কাতার থেকে পিছনের দিকে সরে
বসে। এতে কোন অসুবিধা আছে কিনা?

জবাবঃ সালাম ফিরানোর পরে কাতার থেকে সরে বসলে, এতে কোন গুনাহ্ হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ২:২৫৯]

জামে মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা।

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে ইমাম ও মুআযযিন এবং নামাযের সময় নির্ধারিত থাকার পরও স্থান সংকুলান না হওয়ার কারণে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-২৬৯}

জবাবঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী উক্ত মসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা যাবে না। সুতরাং মসজিদে মুসল্লীগণের স্থান সংকুলান না হলে, সংকুলান হওয়ার মত ব্যবস্থা করা উচিত। আর ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী কোন মসজিদে জামা'আতের সাথে মুসল্লীগণ নামায আদায় করবেন। [প্রমাণঃ রুদ্দুল মুহতার ১:৫৫৩ # আল মাবসূত ১:১৩৫ # হিনদিয়্যাহ, ২:৪৫৬]

নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ঘুমিয়ে যাওয়া।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আত চলাকালীন সময়ে এক মুসল্লী দাঁড়ানো অবস্থায় ঘুমিয়ে যায়। যার ফলে ইমাম সাহেবের সাথে রুকূতে শামিল হতে পারেনি। ইমাম সাহেব যখন সিজদায় চলে গেছেন, তখন সেই ব্যক্তির ঘুম ভাঙ্গে। এমতাবস্থায় সেই ব্যক্তি রুকূ করে সিজদায় শামিল হয়। প্রশ্ন হল তার নামায হয়েছে কি?

জবাবঃ বর্ণিত সুরতে উক্ত ব্যক্তির নামায আদায় হয়ে গেছে। কেননা, ইমামের অনুসরণের মধ্যে এক সুরত এটাও আছে যে, ইমামের পিছে পিছে ইমামের কোন রুকন আদায় করার পরে মুক্তাদীর কর্তৃক সেই রুকন আদায় করা।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫৯৪ পৃঃ]

মাসবূকের জন্য ইমামের শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরজ নামাযের কেবল মাত্র এক রাকা'আতে গিয়ে ইমামের সাথে শরীক হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ইমামের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করবে কি-না? আর যদি পাঠ করতে হয় তাহলে এটা পাঠ করা কি মুস্তাহাব, না সুন্নাত, না ওয়াজিব? এবং তা কোন পর্যন্ত পাঠ করতে হবে?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি মাসবূক। আর মাসবূক ইমামের যে কোন বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু, 'আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' পর্যন্ত পাঠ করবে এবং তা পড়া ওয়াজিব।

কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে দাঁড়ানো।

জিজ্ঞাসাঃ অনেক মসজিদে কাতারের মাঝে খুঁটি থাকে, যার কারণে কাতারের মাঝে ফাঁকা থাকে এতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

জবাবঃ মসজিদে মাঝে মাঝে পিলার বা খুঁটি থাকার কারণে মুসল্লীদের কাতারের মাঝে অল্প ফাঁকা থাকলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

[প্রমাণঃ আল-মাবসূত ২:৩৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:৩৪৪]

নামাযের মাঝখানে ইমামের উযু ভঙ্গ হলে।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামাযের সময় ইমাম সাহেবের উযু ভঙ্গ হলে ইমাম সাহেবের করণীয় কি?

{পৃষ্ঠা-২৭০}

জবাবঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেবের উযু ভেঙ্গে গেলে ইমাম সাহেবের করণীয় হল, প্রথমে তিনি মুক্তদীদের মধ্যে যিনি ইমামতী করার উপযুক্ত তাকে প্রতিনিধি বানিয়ে দিয়ে উযু করতে যাবেন। ইমামের প্রতিনিধি মুক্তাদীদেরকে নিয়ে বাকী নামায সমাপ্ত করবেন। এদিকে ইমাম সাহেব উযু করে এসে জামা'আত পেলে নামাযের যে অংশে বায়ু বের হয়ে উযু ভেঙ্গে গিয়েছিল, তা সহ যে সকল রাকা'আত জামা'আতের সাথে পাননি সে রাকা'আতগুলো কিরা'আত ব্যতীত পড়ে নিবেন। অতঃপর জামা'আতের সাথে শরীক হবেন। আর ইতোমধ্যে জামা'আত শেষ হয়ে গেলে একা একা কিরা'আত ব্যতীত বাকী নামায পড়ে নিবেন। ইচ্ছা করলে উযু করে এসে নতুন ভাবেও নামায পড়তে পারবেন।

যদি মুসল্লীদের মাঝে ইমাম হওয়ার উপযুক্ত কেউ না থাকে, তাহলে উত্তম হল, ইমাম সাহেব সালামের মাধ্যমে নামায ভেঙ্গে দিয়ে উযু করে নতুনভাবে জামা'আতের সাথে নামায পড়াবেন।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:৬০৬ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২:৩৯৭, # তাতার খানিয়া, ১:৬৮৮]

রুকূ সিজদাহ্ থেকে ইমামের আগে মুক্তাদীর সোজা হয়ে যাওয়া।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামাযের সময় ইমাম সাহেব রুকূ, সিজদাহ্ থেকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মুক্তাদীরা দাঁড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায় মুক্তাদীর নামাযে কোন অসুবিধা হবে কি?

জবাবঃ জামা'আতে নামায পড়ার সময় ইচ্ছাপূর্বক রুকূ, সিজদাতে ইমাম সাহেবের আগে উঠে গেলে নামায মাকরূহ্ হয়ে যায়। তবে যদি ইমাম সাহেব ভারী মানুষ হন এবং মুসল্লীগণ সাধারণভাবে রুকূ সিজদাহ্ করলেও তার থেকে কিছুটা আগে হয়ে যায়, তাহলে তাদের উচিত হবে- ইমাম সাহেবের একটু পরে উঠা এবং এরূপ ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত কেউ ইমামের একটু আগে উঠলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০৭, # বেহেশতী জেওর, ১১:৬৬]

বিনা উযরে মসজিদে না যেয়ে ঘরে নামায পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি বিনা উযরে মসজিদের জামা'আতে শরীক না হয় এবং একাকীই নিজ বাড়ীতে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায হবে কি-না এবং তাকে ফাসিক বলা যাবে কি-না?

জবাবঃ হানাফী মাযহাবে জামা'আতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব। সুতরাং বিনা উযরে জামা'আতে শরীক না হওয়া গুণাহ্। আর জামা'আত ছাড়াকে অভ্যাসে পরিণত করা ফাসেকী। সুতরাং যে বিনা উযরে জামা'আত ছেড়ে দেয়াকে অভ্যাসে পরিণত করেছে তাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসিক বলা যাবে। [প্রমাণঃ হিদায়া, ১:১২১, # আলমগীরী, ১:৮২ # ইমদাদুল আহকাম, ১:৪৩২]

{পৃষ্ঠা-২৭১}

পিছনের কাতারে একাকী দাঁড়ানো।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের জামা'আত হচ্ছে, এমন সময় একজন লোক এসে পিছনের কাতারে একা দাঁড়ালো। এখন সে একা কাতারে দাঁড়াবে, নাকি সামনের কাতার থেকে কোন একজনকে টেনে আনবে, যদি টেনে আনে, তবে নিয়ত বেঁধে, নাকি নিয়ত বাঁধার আগে টেনে আনবে?

জবাবঃ জামা'আতে নামায হচ্ছে, এমন সময় একজন লোক নামায পড়ার জন্য হাজির হলে সামনের কাতারে কোন খালি জায়গা না থাকলে, কাতারের মাঝখান থেকে একজনকে টেনে নিয়ে তার সাথে পিছনের কাতারে দাঁড়াবে। টেনে আনার ব্যাপারে নিয়ম হল- যিনি টেনে আনবেন, তিনি নিয়ত বেঁধেও টেনে আনতে পারেন। আবার নিয়ত বাঁধার পূর্বেও টেনে আনতে পারেন। উভয় সুরত জায়িয আছে। তবে এ ব্যাপারে লক্ষণীয় যে, এমন ব্যক্তিকে টেনে আনবেন-যিনি নামাযের এ মাসআলা সম্পর্কে জ্ঞাত। যাতে করে ঝগড়া করে নামায নষ্ট করে না ফেলেন।

[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:৮৮ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৩৯০]

একাকী নামায আদায়ের পর জামা'আতে শরীক হওয়া।

জিজ্ঞাসাঃ ফরয নামায আদায় করার পর বড় জামা'আত অনুষ্ঠিত হতে দেখলে, সে জামা'আতে শরীক হতে পারবে কি-না? যদি পারে, তাহলে নফলের নিয়্যত করতে হবে, না ফরজের?

জবাবঃ কেউ একাকী ফরজ নামায আদায় করার পর যদি ঐ নামাযের জামা'আত হতে দেখে, তাহলে শুধুমাত্র যোহর ও ইশার জামা'আতে নফলের নিয়্যতে শরীক হওয়া তার জন্য মুস্তাহাব হবে এবং এ সুরতে একাকী ফরজ পড়ার পর জামা'আতের সহিত আদায়কৃত তার নামায নফল হবে । ফজর, আসর এবং মাগরিব একবার আদায় করে থাকলে জামা'আতে শরীক হতে পারবে না। কারণ, ফজর ও আসরের ফরযের পরে কোন নফল নামায পড়া যায় না। আর মাগরিবের

পরে যদিও নফল পড়া যায়, কিন্তু মাগরিবের ফরজ যেহেতু তিন রাকা'আত, আর তিন রাকা'আত কোন নফল নামায নেই। তাই মাগরিবেও শরীক শরীক হতে পারবে না।
[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৩৯১]

নামাযের মধ্যখানে বিদ্যুত চলে গেলে মুকাব্বির হওয়া।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব মাইকে নামায শুরু করেছেন। নামায এক রাকা'আত পড়ার পর বিদ্যুত চলে গেল। পরে পিছনে মুআযযিন সাহেব মুকাব্বির হলেন এবং কয়েকবার তাকবীর জোরে বললেন। পরে আবার বিদ্যুত এসে গেল। তখন মুআযযিন সাহেব জোরে তাকবীর বলা বন্ধ করে দিলেন। এতে মুআযযিন সাহেবের নামাযের কি কোন ক্ষতি হবে?
{পৃষ্ঠা-২৭২}

জবাবঃ বিদ্যুত চলে যাওয়ায় মুআযযিন সাহেবের তাকবীর বলতে এবং পুনঃ বিদ্যুত আসায় তাকবীর বন্ধ করাতে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ, আকস্মিক জরুরতের কারণে তা করতে হয়েছে। আর তা নামায ভঙ্গ বা নামায মাকরূহ্ হওয়ার কোন কারণের আওতায় পড়ে না। তবে উত্তম হল মাইক ছাড়া সাদাসিদা ভাবে সুন্নাত তরীকায় নামায পড়া এবং বড় জামাআতে সম্পূর্ণ নামাযে মুকাব্বিরী করা।

শবে-কদরের নামায জামা'আতে পড়া। তারাবীহের পর বিতরের আগে জামা'আতের সাথে নফল পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ শবে-কদরের নামায জামা'আতের সাথে পড়া জায়িয হবে কি-না? তারাবীহের নামায জামা'আতে পড়ার পর বিতির নামায রেখে নফল নামায একা একা বা জামা'আতের সাথে পড়া জায়িয কি-না?

জবাবঃ হাদীস শরীফে যে তিন ধরনের নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়ার বর্ণনা এসেছে, অর্থাৎ কুসূফ, ইসতিসক্বা ও তারাবীহ্ এ তিন ধরনের নফল নামায ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায তিনের অধিক ব্যক্তি মিলে জামা'আতের সাথে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। চাই তারা এমনিতেই জামা'আতে শরীক হোক, বা তাদেরকে ডেকে শরীক করা হোক। যেহেতু শবে-কদরের নামায উল্লেখিত তিন ধরনের নফলের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই শবে-কদরের নফল নামাযও জামা'আতের সাথে পড়া মাকরূহে তাহরীমী হবে। তেমনিভাবে তারাবীহের নামায জামা'আতে পড়ার পর বিতরের আগে নফলের জামা'আত করাও জায়িয নয়। তবে যদি বিতরের জামা'আত কোন কারণে বিলম্বিত হয়, তাহলে একা নফল পড়তে পারে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রশীদিয়া, ৩৫৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:২২৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৩৭৭]
{পৃষ্ঠা-২৭৩}

নবাগত মুক্তাদী রুকূতে যাওয়ার সাথে সাথেই ইমাম রুকূ হতে উঠে গেলে।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি গিয়ে দেখল যে, ইমাম রুকুতে গেছেন। তিনিও তাড়াতাড়ি তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে রুকূতে গেলেন। কিন্তু একবারও তাসবীহ্ পড়েননি- এর পূর্বেই ইমাম রুকূ থেকে উঠে গেছেন এবং রুকূ থেকে উঠে সিজদায় গেছেন। এমতাবস্থায় তার নামায হয়েছে কি?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি যদি দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে রুকূতে গিয়ে থাকেন, তাহলে তার নামায সহীহ্ হয়েছে। কেননা, তিনি রুকূতে যাওয়ার তাকবীর তরক করেছেন যা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। তাছাড়া ইমামের সাথে রুকূতে পৌঁছে এক তাসবীহ্ পরিমাণ দেরী করা জরুরী নয়। বরং রুকূতে শুধু শরীক হলেই ঐ রাকা'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

এমনকি কেউ যদি এমন সময় রুকূর জন্য ঝুঁকে, যখন ইমাম সাহেব রুকূ থেকে মাথা উঠাতে থাকেন, কিন্তু এখনো এতটুকু সোজা হতে পারেননি যে, তার হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে না। ইতিমধ্যে মুক্তাদী এতটুকু পরিমান ঝুঁকে গেছে যে, তার হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌছে যায়। তাহলে সোজা এতে এক তাসবীহ্ পরিমাণ সময় নাও হয়, তবুও উক্ত মুক্তাদী এই রাকা'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে।

তবে তার জন্য ঐ রুকূতে একাকীভাবে এক তাসবীহ্ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব। অতঃপর অবশিষ্ট তাসবীহ্ না পড়ে দাড়িয়ে ইমামের অনুসরণ করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, তাকবীরে তাহরীমা সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় শেষ করতে হবে। সোজা তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতেই রুকূর জন্য ঝুঁকে পড়ে, তাহলে নামায সহীহ্ হবে না।

[প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:১২০ # আল-বাহরুর রায়িক, ১:২৯৩ # শামী, ১:৪৪২ # আহসানুল ফাতওয়া, ৩:২৮৮]

শরয়ী উযর ব্যতিত জামা'আত তরক করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। দোকান থেকে মসজিদের দূরত্ব ৪'শ থেকে ৫'শ গজের মত হবে। দোকান বন্ধ করা-খোলা, মসজিদে অবস্থান ও আসা যাওয়ায় প্রায় ৪০ মিনিট সময় ব্যয় হয়। তাছাড়া আমার দোকান আমাকে একাই চালাতে হয়, অন্য কোন লোক নেই। দোকান খোলা রেখে গেলে প্রায় সময়ই এটা সেটা চুরি হয়ে যায়। আর বন্ধ করে গেলে ৪ ওয়াক্তে ৪০ × ৪ = প্রায় ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট সময় ব্যয় হয়। ফলে ব্যবসার ক্ষতি হয়। এদিকে আমার এই দোকান ছাড়া হালাল রিযিকের আর কোন অবলম্বন নেই । এ সকল কারণে আমি সবসময় মসজিদে জামা'আতে শরীক হতে পারি না। অনেক সময় দোকানে জামা'আত করি, আবার কখনও একাই নামায পড়ি। এ অবস্থায় আমি মসজিদের জামা'আত তরক করতে পারব কি-না?

জবাবঃ শরীয়তে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার উপর খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যার ভিত্তিতে অন্যান্য মাযহাবে জামা'আতে হাজির হওয়া ফরজ বলা হয়েছে। হানাফী মাযহাবে জামা'আতে নামায পড়া ওয়াজিব এবং জামা'আত তরককারীদের ব্যাপারে শরী'আতে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোষণা করেছেন- আমার ইচ্ছা হয় কাউকে আযান দিয়ে নামায পড়াতে বলি এবং একদল যুবককে লাকড়ী সংগ্রহ করতে বলি, তারপর যারা আযান শোনার পরেও মসজিদে নামায পড়তে আসল না, তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের খাতিরে তা করি না।

সুতরাং আপনি আপনার মত দ্বীনদার লোকদের নিয়ে নিকটবর্তী স্থানে একটি পাঞ্জেগানা মসজিদ তৈরির চেষ্টা করুন এবং ওয়াক্তে একটু ক্ষতি হলেও জামা'আতে শরীক হতে চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার বেচাকেনা ও লাভ

{পৃষ্ঠা-২৭৪}

কম হবে না। আর যেসব ওয়াক্তে বেশী অসুবিধা হয়, সেসকল ওয়াক্তে দোকানে ২/১ জন লোক নিয়ে জামা'আত করে নামায পড়ে নিন।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৭:১৪৫, # দারুল উলূম ৩:৬৩, # শামী, ১:৫১৯]

একাকী বা ঘরে জামা'আতের সাথে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে আযান ও ইকামতের হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ আমি এমন এক শহরে চাকুরী করি, যেখানে আশে পাশে কোন মসজিদ নেই, অনেক দূরে একটা মসজিদ আছে, কিন্তু আযান শোনা যায় না, তাই যখন একা নামায পড়ি, তখন

আযান ইকামত ছাড়াই নামায পড়ি। আর যখন ২/৪ জন মিলে নামায পড়ি, তখন শুধু ইকামত দিয়েই পড়ি। এমতাবস্থায় আযান ব্যতীত নামায সহীহ হবে কি-না? একা নামাযের জন্য আযান, ইকামত জরুরী কি-না?

জবাবঃ আপনার স্থান থেকে যেহেতু মসজিদের আযান শোনা যায় না, তাই জামা'আতের সাথে নামায পড়ার জন্য আযান ও ইকামত উভয়টিই দিতে হবে। আর একা যখন নামায পড়বেন, তখন শুধু ইকামত দিলেই চলবে। তবে শুরুতে আযান দেয়াও উত্তম হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:৩৮৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:৮৫ # আযীযুল ফাতাওয়া, ১৮২]

তাকবীর দেয়ার সময় মুকাব্বিরের নিয়ত।

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে মুকাব্বির সাহেব তাকবীর বলার সময় কি নিয়ত করবেন? আমরা শুনেছি যে, মুকাব্বির সাহেব যদি তাকবীর বলার সময় অন্যকে শুনানোর নিয়ত করেন তাহলে তার নামায সহ সকলের নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। মাসআলাটির সঠিক সমাধান জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ মুকাব্বিরের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নিজের তাকবীরে তাহরীমার নিয়ত করা, নামায সহীহ্ হওযার জন্য জরুরী। নিজের তাকবীরের নিয়ত না করে শুধু অন্যদেরকে শোনানোর নিয়তে উচ্চ আওয়াজে তাকবীর বললে মুকাব্বির সহ যে সমস্ত মুক্তাদীগণ তার তাকবীর শুনে ইকতিদা করবেন সকলের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

আর যদি উভয়টার নিয়ত করেন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই, বরং এরূপ করাই উচিত। এমনিভাবে ইমাম সাহেবও যদি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নিজের নামাযের নিয়ত না করে শুধু মুক্তাদীদেরকে শোনানোর নিয়ত করে, তাহলে ইমাম সাহেব ও মুক্তাদী কারোর নামায সহীহ্ হবে না। আর তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্যান্য তাকবীরের ক্ষেত্রেও উভয়টারই নিয়ত করা উচিত। তবে সেসব তাকবীরের সময় শুধু মুসল্লীদেরকে শোনানোর নিয়ত করলেও নামায নষ্ট হবে না।
{পৃষ্ঠা-২৭৫}

উল্লেখ্য যে, ইমাম সাহেবের আওয়াজ জামা'আতের শেষ কাতার পর্যন্ত স্পষ্টভাবে পৌঁছলে মুকাব্বির নিযুক্ত করা মাকরূহ্ এবং বিদ'আত। তবে জামা'আতে নামায পড়ার সময় ইমাম সাহেবের তাকবীরের আওয়াজ যে স্থান থেকে স্পষ্ট শোনা যায় সেখানে মুকাব্বির দাড়াবে। আমাদের দেশে যেভাবে ইমাম সাহেবের পিছনেই মুকাব্বির দাড়ানোর নিয়ম চালু আছে এর কোন ভিত্তি নেই।
[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার, ১:৪৭৫]

মুসল্লীদের অনুপস্থিতিতে ইমামের একাকী জামা'আত করা।

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের দ্বায়িত্বে নিয়োজিত ইমাম সাহেব জামা'আতের গুরুত্ব বুঝে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু মহল্লার লোক অধিকাংশ নামাযী না হওয়ায় জামা'আতের গুরুত্ব না বুঝে অথবা অলসতার কারণে মসজিদে আসে না। যার কারণে মাঝে মাঝে ইমামের একাই নামায আদায় করতে হয়। এমতাবস্থায় ইমামের জামা'আত তরক হওয়ায় কি গুণাহ্ হবে? যদি গুণাহ্ হয়, তাহলে কি ইমাম সাহেব তার দ্বায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতের সাথে নামায আদায় করতে পারবেন সেখানে স্থান নেওয়ার চেষ্টা করবেন?

জবাবঃ এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম আযান ও ইকামত দিয়ে একা একা নামায আদায় করে নেবেন। এতে তার জামা'আতের সওয়াব হাসিল হয়ে যাবে। তবে মহল্লার লোকদের জামা'আতের গুরুত্ব বুঝিয়ে জামা'আতের পাবন্দ বানাতে চেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৩:৫৩ # মাহমূদিয়া, ১৪:২০৫]

ইমামের আমীন বলা।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব আওয়াজ করে সূরা ফাতেহা পড়ার পর, যখন মুক্তাদীগণ আমীন বলবেন, তখন ইমাম সাহেব আমীন বলবেন কি-না?

জবাবঃ সূরা ফাতিহা পড়ার পর মুক্তাদীগণের ন্যায় ইমাম সাহেবও আমীন বলবেন। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলের জন্য আমীন আস্তে বলা সুন্নাত।
[প্রমাণঃ ফাতওয়া আলমগীরী, ১:৭৪]

মসজিদ ছেড়ে খানকায় নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকাতে একটি মসজিদ আছে। কিছু সংখ্যক লোক চন্দ্রপাড়া পীর সাহেবের মুরীদ; তারা পীর সাহেবের কথামত উক্ত মসজিদের সন্নিকটেই একটি খানকা করে সেখানে পীর সাহেবের ওজীফা পালন করে, এরপর নামাযের সময় হলে তারা মসজিদে না এসে সেখানেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, এমনকি জুমু'আর নামাযও উক্ত খানকায় আদায় করে থাকে। এভাবে মসজিদ ছেড়ে খানকায় নামায আদায় করা কেমন?

{পৃষ্ঠা-২৭৬}

জবাবঃ হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, দুনিয়ার মধ্যে সর্বোত্তম স্থান হল মসজিদ।
[মুসলিম শরীফ, মিশকাত -৬৮]

আর মসজিদ বানানোর আসল উদ্দেশ্য হল, এলাকার সমস্ত মানুষ মসজিদে এসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায এবং জুমু'আ জামা'আতের সাথে আদায় করা। মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত সম্পর্কে হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, ঘরে একা একা নামায পড়ার চেয়ে মহল্লার মসজিদে নামায পড়লে ২৫ গুণ বেশী সওয়াব হয়। এবং জামে মসজিদে নামায পড়লে ৫০০ গুণ বেশী সওয়াব হয়।
[মিশকাত-৭২]

মসজিদে এসে নামায পড়ার গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার এক ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি জান! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর যুগে স্পষ্ট মুনাফিক ও অসুস্থ ব্যাক্তি ছাড়া অন্য কেউ মসজিদে এসে জামা'আতসহ নামায পড়া থেকে বিরত থাকত না। অসুস্থ ব্যক্তি যদি দুইজন মানুষের কাঁধে ভর করে চলতে পারত তাহলে তারা নামায পড়তে আসত। এবং তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সুনানে হুদা শিক্ষা দিয়েছেন। আর সুনানে হুদার একটি বিষয় হল, যে মসজিদে আযান দেয়া হয় সে মসজিদে এসে নামায পড়া। [মুসলিম শরীফ ১:২৩২]

মসজিদে এসে নামায না পড়ার ভয়াবহতা এবং কঠোরতা সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল কিন্তু তার আহবানে সাড়া দিলনা (অর্থাৎ, মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামা'আতসহ নামায পড়ল না) তার নামায হবে না। কিন্তু অপারগতা বশতঃ (যেমন, অসুস্থতা, প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদির কারণে) মসজিদে না আসতে পারলে কোন অসুবিধা নেই। (দারাকুতনী-মিশকাত-৯৭) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাতে এ হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, নামায হবে না এর অর্থ পরিপূর্ণভাবে নামায হবে না বা নামায কবুল হবে না।
[মিরকাতঃ ৩:৬৪]

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে শরী‘আতের বিধান হল, শরয়ী উযর ব্যতীত কেউ নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও মসজিদে না এসে কোন খানকায় বা বাড়িতে জামা’আতসহ নামায পড়লে জামা’আতের সওয়াব ও পুরষ্কার পাবে না । বরং এ অবস্থায় মসজিদে না এসে অন্য কোথাও (চাই তা ওয়াক্বফকৃত হোক না কেন) নিয়মিত জামা’আতসহ নামায পড়তে থাকলে ফাসিক বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের মতে চন্দ্রপাড়ার সিলসিলা পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ্। নিকটে মসজিদ থাকতে অন্যত্র জামা’আত করাও সে গোমরাহীর একটি আলামত। সুতরাং চন্দ্রপাড়ার মুরীদদের জন্য জরুরী, অতিসত্বর এ

{পৃষ্ঠা-২৭৭}

সিলসিলা ছেড়ে তাওবা করে নেয়া, এবং হক্কানী উলামায়ে কেরাম থেকে কোন সহীহ্ পীরের সন্ধান জেনে তাঁর সাথে সম্পর্ক করা।

ইমাম থেকে মুক্তাদীর দূরত্ব।

জিজ্ঞাসাঃ কোন একটি মার্কেটের মসজিদে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায়) যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। মসজিদে মুসল্লীদের স্থান সংকুলন হওয়ার পরও যদি ইমাম সাহেব মুসল্লীগণকে তার থেকে (ইমামের গোড়ালী বরাবর থেকে) সামান্য একটু পেছন হতে কাতার করার নির্দেশ দেন, তাহলে এ ব্যাপারে শরী‘আতের বিধান কি? উল্লেখ্য, উক্ত মসজিদে জুমু’আর নামায আদায় হয় না।

জবাবঃ কোন শরয়ী উযর না থাকলে মুক্তাদীগণ ইমাম সাহেব হতে এতটুকু দূরে দাঁড়াবেন, যেন তারা ইমামের পিছে অনায়াসে সুন্নাত তরীকায় সিজদাহ্ করতে পারেন।

প্রশ্নে উল্লেখিত মসজিদটিতে যেহেতু জায়গার কোন সমস্যা নেই, বিধায় মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে সুন্নাত তরীকায় সিজদা করা যায়, এ পরিমাণ জায়গা রেখে কাতার করবে । ইমামের পায়ের গোড়ালী বরাবর দাড়াবে না। কারণ, এটা সুন্নাত পরিপন্থী।

[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার, ১:৫৬৭-৫৬৮ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৩:৩৪৬ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ২:৮৬]

স্ত্রীকে নিয়ে জামা’আতের ক্ষেত্রে ইকামত।

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রীকে নিয়ে জামা’আত করলে ইকামত দিতে হবে কি-না? যদি ইকামত দিতে হয় তবে স্বামী ইমাম কর্তৃক ইকামত দিলে হবে কি-না? ইকামত ছাড়া জামা’আত করলে জামা’আত সহীহ্ হবে কি-না?

জবাবঃ স্ত্রীকে নিয়ে জামা’আত করলে ইকামত দিতে হবে। এমনকি একা ফরয নামায পড়লেও পুরুষগণ ইকামত দিয়ে নামায পড়বে। যিনি ইমাম হবেন তিনি আযান ও ইকামত দিতে পারেন।

[প্রমাণঃ আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ, ১:৩২৩ # ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া, ৪:২৯৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২:২৮৩]

নামাযে মাইক ব্যবহার করা।

জিজ্ঞাসাঃ মুক্তাদীর জন্যে ইমামের পুরাপুরি ইকতিদা করা জরুরী। আর এই ইত্তেবার সুবিধার্থে মাইক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু বিভিন্ন দ্বীনী ইজতিমায় মাইক ব্যবহার করা হয় না। যার কারণে মুসল্লীদের বেশ ভোগান্তি হয়। এ ব্যাপারে শরী‘আতের বিধান কি?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে মাইক ব্যবহার করা মূলতঃ জায়িয আছে। তবে নামায যেহেতু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, সুতরাং উক্ত ইবাদতকে সুন্নাত তরীকা মুতাবিক সাদাসিদাভাবে আদায় করা কর্তব্য। এ কারণে বর্তমান যামানার
{পৃষ্ঠা-২৭৮}
মুফতীগণ নামাযে মাইক ব্যবহার করাকে অনুত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। নামাযে মাইক ব্যবহার করার দ্বারা বহু ক্ষতির আশংকা রয়েছে, যেমন-নামাযের মধ্যে মাইক বন্ধ হয়ে গেলে মারাত্মক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। আবার অনেক সময় মাইকের বিকট আওয়াজে নামাযের খুশু-খুজু বরবাদ হয়ে যায়। সুতরাং তার থেকে বেঁচে থাকা এবং সুন্নতের সরল সহজ পন্থা অবলম্বন করাই বাঞ্ছনীয়। আওয়াজ দূরে পৌঁছানোর জন্য অতিরিক্ত মুকাব্বির নির্ধারণ করাই শরী'আতের প্রকৃত পন্থা।

নামাযে মাইক ব্যবহার না করলে মুক্তাদীদের জন্য ইমামের ইকতিদার ক্ষেত্রে ভোগান্তি হয়-একথা যথার্থ নয়। কারণ- মুকাব্বিরের মাধ্যমে ইকতিদায় কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এরপরও যতটুকু অসুবিধা থেকে যায়, মাইক ব্যবহারে তার চেয়েও বড় অসুবিধার আশংকা বিদ্যমান। আর মুকাব্বিরের মাধ্যমেই বড় জামা'আতে আওয়াজ পৌঁছানো সাহাবা, তাবিঈন ও সলফে সালেহীনের তরীকা। সেই সময় প্রচুর লোকের সমাগম হত। বিদায় হজ্বে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। তখন মাইক ছিল না। যদি মাইক ব্যতীত সেই যামানায় প্রচুর লোকের ইকতিদা করা সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে তা সম্ভব হবে না কেন? কাজেই বিভিন্ন দ্বীনী ইজতিমার পদ্ধতির উপর আপত্তি না করে উত্তম সুরত বাদ দিয়ে জায়িয হিসেবে যদি কেউ আযান ও নামাযে মাইক ব্যবহার করে, তবে তা করতে পারে। যেমন বিভিন্ন স্থানে তার প্রচলন রয়েছে। তবে সেটা অনুত্তম হবে।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৮৪৬]

মক্কা-মদীনার সফরে মহিলাদের মসজিদে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ মহিলারা মক্কা মদীনার সফরে মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীতে নামায পড়বে, না নিজ আবাসস্থলে? কোনটিতে সওয়াব বেশী হবে?

জবাবঃ হাদীস শরীফের স্পষ্ট বক্তব্য দ্বারা মহিলাদের মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীর চেয়ে স্বীয় আবাসস্থলে বা তাঁবুতে নামায পড়া অধিক সওয়াবের কথা প্রমাণিত। তাই মহিলারা মসজিদে হারাম, মসজিদে নববীতে নামায আদায়ের জন্য না গিয়ে তাঁবুতে বা নিজ আবাসস্থলে নামায আদায় করবে, তাহলে তারা উক্ত অবস্থায় ঐ মসজিদদ্বয়ের সওয়াব থেকে বেশী সওয়াব পাবে । আর সওয়াব হাসিল করাই মুসলমানের কাম্য হওয়া উচিত। মসজিদে নববীতে নির্দিষ্ট সময়ে যিয়ারতের জন্য যাবে আর বাইতুল্লাহতে শুধু তাওয়াফের জন্য যাবে। তাওয়াফে পুরুষদের সাথে ধাক্কাধাক্কি বৈধ নয়। পুরুষদের থেকে এড়িয়ে মাতাফের কিনারা দিয়ে তাওয়াফ করবে। এবং মদীনা অবস্থানকালে শুধু রওযায়ে আত্বহার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববীতে যাবে। এটাই শরী'আতের বিধান। এর দ্বারা নসীহত হাসিল করা উচিত যে, দেশে থাকা অবস্থায় মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমু'আ ও ঈদের জামা'আতে যাওয়া নিষেধ এবং গুনাহের {পৃষ্ঠা-২৭৯}
কাজ। ঘরের মধ্যে তাদের জন্য মসজিদের জামা'আত থেকে বেশী সওয়াব, তারপরেও মসজিদে যাওয়ার কি যুক্তি থাকতে পারে? এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, একদিকে এনজিওরা মুসলিম মা বোনদেরকে নারী স্বাধীনতার নামে ঘর থেকে টেনে বাইরে আনছে ঠিক সেই মুহূর্তে ইসলামের নামে কতিপয় ভ্রান্ত দল দ্বীনের নামে মা বোনদের ঘরছাড়া করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধিতে লিপ্ত আছে। এ ফিতনা থেকে দূরে থাকা দ্বীন ও ঈমানের হেফাজতের জন্য জরুরী।

[প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ১:১২০ # দুররে মুখতার ১:৮৩ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ৮৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৬৭]

মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত।

জিজ্ঞাসাঃ জামে মসজিদের ভিতরে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ মসজিদ যদি নির্দিষ্ট কোন মহল্লায় অবস্থিত না হয় বরং রাস্তা-ঘাটের পার্শ্বে কিংবা হাট-বাজারের মসজিদ হয় যার ইমাম মুআযযিন কিংবা মুসল্লি নির্ধারিত না থাকে, অথবা মসজিদটি কোন এক মহল্লায় অবস্থিত বটে কিন্তু সেখানে প্রথম জামা'আত অন্য মহল্লার লোকেরা করেছে, অথবা মহল্লাবাসিই প্রথম জামা'আতে করেছে; কিন্তু আযান ছাড়াই তারা করেছে। উপরোল্লিখিত তিন সুরতে দ্বিতীয় জামাআত করা (যদিও তা আযান ইকামতসহ হোক) সর্বসম্মতিক্রমে জায়িয।

এছাড়া অন্য যে কোন সুরতে শরয়ী মসজিদে দ্বিতীয় জামাআত করা মাকরূহে তাহরীমী।
[আল্-মাবসুত লিস সারাখসি ১:১৩৫-১৩৬, আসারুসসুন্নাহ ৩২৪, ফাতাওয়া শামী ১:৫৫২, আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩২২]

يكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ، إلا إذا صلى بهما فيه أولا غير أهله، لو أهله لكن بمخافتة الأذان ، ولو كرر أهله بدونهما أو كان مسجد طريق جاز إجماعا ؛ كما في مسجد ليس له إمام ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا ، (رد المحتار:4 / 218)

নাবালেগ শিশুদের নিয়ে নামাযের জামা'আত করা।

জিজ্ঞাসাঃ নাবালিগ ছেলেমেয়েদের নিয়ে জামা'আত পড়লে জামা'আত সহীহ্ হবে কি?

জবাবঃ জুম'আর নামায ব্যতীত অন্য নামাযে শুধু নাবালেগকে নিয়ে জামা'আত করলে সহীহ্ হবে এবং জামা'আতের ফযীলতও পাওয়া যাবে।
[আল আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ির ১:৩০৭, শামী ১:৫৫৩ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩:৪২]

واقلها اثنان واحد مع الامام ولو مميزا اي لو كان الواحد المقتدي صبيا مميزا.....الخ- [رد المحتار 553/1]

{পৃষ্ঠা-২৮০}

কিরা'আত ও তাজবীদ

লাহনে জলীর সংজ্ঞা ও হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ লাহনে জলী কাকে বলে? নামাযে কিরা'আত লাহনে জলী পড়লে নামায শুদ্ধ হবে কি? জনৈক ইমাম সাহেব বললেন- তিন আয়াত কিরা'আত সহীহভাবে পড়লে, এর পরে ভুল হলেও নামায শুদ্ধ হবে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে- তিন আয়াতের পর কোন আয়াতের অর্থ সম্পূর্ণ বিপরীত হলেও কি নামায সহীহ্ হবে?

জবাবঃ লাহনে জলী অর্থ বড়-ভুল যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যায়।

আয়াতের অর্থ বাতিল হয়, সেরূপ ভুলের দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে নামায বাতিল হয়ে যাবে, যদিও সেরূপ ভুল তিন আয়াতের পরে হোক না কেন। সুতরাং জনৈক ইমাম সাহেব যে কথা বলেছেন, তা সহীহ্ নয়। তবে লাহনে খফী (সাধারণ ভুল) যার দ্বারা অর্থ পরিবর্তন হয় না, তার দ্বারা নামায বাতিল হবে না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪:৩০৮ # জামালুল কুরআন পৃঃ ৪]

নামাযের কিরা'আতে ভুল।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব নামাযের কিরা'আতে পেশ এর স্থলে যের পড়লেন। যেমন- كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ এর স্থলে পড়লেন كيف فعل ربك । এমতাবস্থায় পিছন থেকে শুদ্ধ করে বলে দেয়া হলে ইমাম সাহেবও শুদ্ধ করে পুরো আয়াতটি পড়ে নিলেন।

অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতেও এক সূরা থেকে অন্য সূরায়ে চলে গেলেন এবং মাঝখানে কোনরূপ বিরতি না দিয়ে ধারাবাহিক ভাবে তিলাওয়াত করতে থাকলেন। নামাযে ভুলবশতঃ এরূপ অবস্থা হওয়ায় নামাযের বিশুদ্ধতা নিয়ে মুসল্লীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক পক্ষের ধারণা উল্লেখিত ভুলের দরুন নামাযের কোন ক্ষতি হয়নি; বরং নামায শুদ্ধ ও সহীহ্ হয়েছে। আর অপর পক্ষের ধারণা হচ্ছে উল্লেখিত ভুলের কারণে নামায সহীহ্ হয়নি বিধায় তারা পুনরায় নামায আদায় করেছে। কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে উপরোক্ত সমস্যার সঠিক সমাধান কি?

জবাবঃ বর্ণনা অনুসারে জানা যায়, মুক্তাদীর নিকট থেকে ইমাম সাহেব লুকমা (ভুল বিশুদ্ধকরণ) গ্রহণ করে সহীহ্ কিরা'আত পড়েছেন। সুতরাং উক্ত ভুলের দরুন কোন ক্ষতি হয়নি, তেমনিভাবে স্মরণ না আসায় অন্য সূরায় চলে গেলেও কোন দোষ নেই।

সুতরাং নামায পুনরায় পড়তে হবে না। আর যে দল বলেছে নামায হয়নি, তাদের কথা সঠিক নয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৬২২ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:২৭৭]

{পৃষ্ঠা-২৮১}

এক আলিফকে কমবেশী টানা।

জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় ও নামাযের তাকবীর বলার সময় এক আলিফ মদকে এক আলিফের চেয়ে কম বা বেশী করা যাবে কি-না? তা দলীলসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ কুরআনে কারীমের মধ্যে যেখানে যেখানে এক আলিফ আছে তেমনিভাবে নামাযের তাকবীর ও আযান, ইকামতের মধ্যে যেই যেই স্থানে এক আলিফে আছে, সেখানে এক আলিফই টানতে হবে। কম বা বেশী করবে না। অনেক লোক আযানের মধ্যে বা তাকবীরে তাহরীমাতে বা সিজদায় যেতে এবং সিজদাহ্ থেকে দাঁড়াতে এক আলিফ মদকে ইচ্ছামত টানতে থাকে, এটা সহীহ্ নয়।

নামাযের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার মদ্ এবং রুকূ থেকে সিজদাহ্ ও দাঁড়ান থেকে সিজদায় যাওয়া বা সিজদাহ্ থেকে দাঁড়ানোর সময় তাকবীরের মদ্ এক আলিফ থাকবে, দুই/তিন আলিফ লম্বা করবে না। তবে তারতীল ও হদরের বেশ-কম হবে অর্থাৎ, তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে এক আলিফ মদ্ হবে হদর বা তাড়াতাড়ি, আর রুকূ থেকে সিজদাহ্ বা বসা থেকে সিজদায় এক আলিফ হবে দাওর এর সাথে অর্থাৎ, মধ্যম তরীকায়। এবং দাঁড়ান থেকে সিজদায় বা সিজদাহ্ থেকে দাঁড়ানোর সময় এক আলিফ হবে তারতীলের সাথে অর্থাৎ ধীরে ধীরে হবে। মূল মদ্ সকল তাকবীরে এক আলিফই থাকবে।

[প্রমাণঃ শরহে মুকাদ্দামাতুল জাযরিয়াহ ৩২৮, # ফাতাওয়া শামী ১:৩৮৭, # আন-নাফহাতুল আম্বারিয়াহ ৩২৭, # আল-মিনাহুল ফিকরিয়াহ ৭২, নিহায়া ১২২]

আল্লাহু আকবারের "আল্লাহ" শব্দে মদ্দের পরিমান এবং তিলাওয়াতে সাধারণতঃ ঘটে যাওয়া ভুল-ত্রুটি।

জিজ্ঞাসাঃ (১) নামাযের মধ্যে "আল্লাহু আকবার"- এর "আল্লাহু" শব্দে কয় আলিফ পরিমাণ মদ্ হবে? বিশেষ করে সিজদাহ্ থেকে দাঁড়ানোর সময় অনেককে দীর্ঘ লম্বা করে টানতে দেখা যায়। এরূপ করা ঠিক কি-না?

জবাবঃ আল্লাহু শব্দের লামের উপর মদ্দে ত্ববায়ী- যার পরিমাণ এক আলিফ। আর হরকতের উচ্চারণকে দ্বিগুণ করলেই এক আলিফ টানা হয়ে যাবে। এ দ্বারা আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে, এক আলিফ টান অতি সামান্য। আমাদের দেশে এক আলিফকে সাধারণতঃ বেশী টানার দরুন এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, কোন মুহাক্কিক ক্বারী সাহেবের নিকট মশক্ না করলে, বিশ্বাস করানোই কঠিন হয়ে যায় যে, এক আলিফ মদ্দের পরিমাণ অতি অল্প। সুতরাং আযান, ইকামতের শুরু-শেষের তাকবীর সমূহের মধ্যে এবং নামাযের তাকবীরে তাহরীমা, সিজদায় যাওয়া ও সিজদাহ্ থেকে উঠার সময় তাকবীর সমূহে এক আলিফ থেকে লম্বা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। এ তাকবীর গুলোতে এক

{পৃষ্ঠা-২৮২}

আলিফ থেকে বেশী টানার কোন অবকাশ নেই। কারণ, উল্লেখিত স্থানসমূহে আল্লাহ শব্দ বাক্যের মধ্যে আসায় মদ্দে আরিযী হচ্ছে না, বরং ত্ববায়ী থাকছে। সেহেতু এক আলিফই টানতে হবে। বহু মুহাক্কিক আলিম এক আলিফকে পরিমাণ থেকে কম টানা বা বেশী টানাকে নাজায়িয বলেছেন। কারণ- এর দ্বারা আল্লাহর নাম বিগড়ানো হয়। এটা মারাত্মক অন্যায়। এটা কোন মামূলী বিষয় নয়। অবশ্য আযান-ইকামতে পাঁচটি বাক্যের শেষে আল্লাহ শব্দ এর মধ্যে যেহেতু ওয়াকফ করা হয়, সেহেতু তখন মদ্দে ত্ববায়ী থাকে না। বরং মদ্দে আরিযী হয়ে যায়। তাই তখন তিন আলিফ হতে পাঁচ আলিফ পর্যন্ত টানা যায়। আল্লাহ শব্দে বেশী মদ্ করা নিষেধ এ সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতসমূহ প্রনিধানযোগ্য।

(১) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) স্বীয় আল-মিনাহুল ফিকরিয়্যাহ্ গ্রন্থে লিখেনঃ

কিরা'আত বিষয়ে ইমামগণের নীতি ছেড়ে মদ্দে তবায়ীকে এক আলিফের অতিরিক্ত দুই আলিফ বা তার চেয়ে বেশী টানা নিকৃষ্ট ও হারাম। যেমন, মক্কা-মদীনা শরীফের হানাফী-শাফিয়ী মাযহাবের অধিকাংশ লোকেরা আযান-নামাযের মধ্যে এরূপ করে থাকে। বিশেষ করে কতিপয় অজ্ঞ মূর্খ এ ব্যাপারে তাদের অনুকরণ করে। সে কারণে এ অতিরিক্ত টানা আরো জঘন্য হয়ে গেছে।

(২) মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) মিরকাত শরহে মিশকাত গ্রন্থে লিখেছেনঃ

আল্লাহু শব্দের আলিফে অতিরিক্ত কোন টান নেই। তবে এতে তিন আলিফ টানতে হবে ওয়াকফ অবস্থায়।

(৩) ইলমুল কিরা'আতের প্রাণকেন্দ্র মিশরের জামিয়া আল আজহারের শাইখুল কুররা- "শাইখ মহাম্মদ" মক্কী নসর স্বীয় গ্রন্থে লিখেনঃ

মদ্দে ত্ববায়ীকে এক আলিফের চেয়ে বেশী টানা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। অতএব, এক আলিফকে বেশী টানার কারণে সে শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে। আর এক আলিফ টানলে সওয়াবের উপযুক্ত হবে। সুতরাং কতক মসজিদের ইমাম ও অধিকাংশ মুয়াযযিনরা যে মদ্দে ত্ববায়ীকে কিরা'আত বিষয়ের ইমামগণের নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে এক আলিফের চেয়ে বেশী টেনে থাকেন, এটা জঘন্যতম বিদ'আত ও নিকৃষ্টতম মাকরূহ্ কাজ।

(৪) হযরত হুসাইন, শাইখ উসমান স্বীয় কিতাব হাক্কুত-তিলাওয়াত এ লিখেছেনঃ

"মদ্দে ত্ববায়ীর পরিমাণ দুইটি হরকতের সমান, কিন্তু লোকেরা সাধারণতঃ আল্লাহ শব্দের নামকে দুই হরকতের চেয়ে বেশী টেনে থাকে, যা ভুল।"

এই ইবারত দ্বারা বিশেষভাবে যে কথাটি স্পষ্ট হল তা হচ্ছে, এক আলিফের পরিমাণ দুইটি হরকতের সমান।

{পৃষ্ঠা-২৮৩}

(৫) হযরত মওলানা আশেকে ইলাহী (রহঃ) লিখেছেন– “মদ্দে ত্ববায়ীকে এক আলিফের চেয়ে বেশী টানা ভুল ও জঘন্য। যেমন– হারামাইন শরীফাইনের অধিকাংশ ইমাম ও মুআযযিনগণও এরূপ করে থাকেন।

(৬) আল্লামা ইবনে হাজার হাইছামী (রহঃ) আযানে আল্লাহু শব্দের লামকে সর্বাবস্থায় এক আলিফের চেয়ে বেশী টানাকে লাহনে খফী বলতেন।

ভুল সংশোধন।

অনেকে আল্লাহু শব্দে মদ্দে তা’যীম ও তাহমীনের বা মদ্দে জলীল ইত্যাদি নামের দোহাই দিয়ে লম্বা করে টানতে থাকে। কিন্তু কুররায়ে সাব’আর বড় বড় ইমামগণ মদ্দে তাযীমের অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। ইলমে কিরা‘আতে এ নামে কোন মদ্ নেই।

দু’টি প্রশ্নের উত্তর।

১নং প্রশ্নঃ সিজদাহ্ থেকে দাঁড়ানোর সময় ইমাম যদি আল্লাহ শব্দকে লম্বা করে না টানেন, তাহলে বসা ও দাঁড়ানোর মধ্যে মুক্তাদীগণ দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে যান।

উত্তরঃ (ক) নামাযে এমনভাবে উদাসীন হওয়া আদৌ ঠিক নয় যে, কত রাকা’আত পড়া হয়েছে তা ভুলে যাবে।

(খ) সকল মুক্তাদীই যদি তাকবীরে ইমামের লম্বা টানের উপর ভরসা করে বসে থাকে, তাহলে ইমাম কখনো ভুলে দাঁড়িয়ে বা বসে গেলে, লুকমা দিবে কে দিবে?

(গ) একদিকে গাফেল মুক্তাদীদের মন খুশি করার জন্য আল্লাহর পবিত্র নামকে বিকৃত করা, অপরদিকে আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার নাম বিশুদ্ধ উচ্চারণ করা, আপনিই বলুন, কোন পথ অবলম্বন করা উচিত?

২নং প্রশ্নঃ যারা দূর্বলতা বা মোটা হওয়ার কারণে রুকূ-সিজদা হতে তাড়াতাড়ি উঠা বসা করতে পারে না, তারা কিভাবে তাকবীর বলবে? কেননা তারা আল্লাহ শব্দ এক আলিফ টানলে নির্দিষ্ট রুকনে যাওয়ার আগেই তাকবীর বলা শেষ হয়ে যাবে?

উত্তরঃ উযরের কারণে যারা অতি ধীরে সিজদায় যায় বা সিজদা থেকে উঠে, তারাও আল্লাহু শব্দের মধ্যে এক আলিফ মদ্ করবে। তারপর মাঝে তাকবীর শেষ হয়ে গেলে, কিছু না পড়া অবস্থায় সিজদায় যাবে, বা সিজদাহ্ থেকে উঠবে।

কুরআন তিলাওয়াতের সময় সাধারণতঃ কোন ভুলগুলো বেশী সংগঠিত হয়?

জবাবঃ আমাদের দেশের তিলাওয়াতের মধ্যে সাধারণতঃ যেসব ভুল-ভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়, তা নিম্নে প্রদত্ত হল। তবে এ তালিকা দ্বারা কারো কিরা‘আত সহীহ্ হয়ে যাবে না। বরং সহীহ্ হওয়ার জন্য কোন অভিজ্ঞ ক্বারী সাহেবের নিকট মশক্ করা জরুরী।

{পৃষ্ঠা-২৮৪}

কিরা’আতুল কুরআনের প্রচলিত ভুল।

(১) হরফের মধ্যে– (ক) ز “য” এর মত নরম হবে, “ঝ” এর মত শক্ত নয়। (খ) ض অনেকটা “জ” এর মত হবে, “দ” এর মত নয়। (গ) و উচ্চারণের সময় ঠোঁট গোল হবে। এই হরফে মদ্দের সময় ও শুরু থেকে ঠোট গোল হবে।

(২) সিফাতের মধ্যে- (ক) ض–এর استطالت -এর প্রতি এর খেয়াল করা হয় না। (খ) ز س ص- এর সিফাত আদায় হয় না। (গ) حروف مستعليه -এর মধ্যে আকার উচ্চারণ করে যা ভুল। অবশ্য যের অবস্থায় إستعلاء কম হওয়া জরুরী।

(৩) হরকতের মধ্যে- (ক) َ যবর –এ আকার উচ্চারণ হবে । যফলা (্য)-এর মত, টেড়া উচ্চারণ ভুল । (খ)ِ যেরকে দাবিয়ে উচ্চারণ করতে হয়, ে -এর উচ্চারণ ভুল (গ) ُপেশ উভয় ঠোট মিলার কাছাকাছি হবে, ো উচ্চারণ ভুল ।

(৪) (ক) হরফে লীন- মারুফ পড়তে হয় كيف(কাইফা) কে কায়ফা, لو (লাউ) কে লাও পড়া ভুল । (খ) নরম করে পড়তে হয়, ধাক্কা দেয়া ভুল । (গ) তাড়াতাড়ি পড়তে হয়, মদ করা ভুল ।

(৫) মদ্দের ব্যাপারে- (ক) এক আলিফকে দুই হরকত পরিমাণ টান হবে, বেশী টানা ভুল । (খ) তিন বা চার আলিফ মদ্দের আওয়াজে তরঙ্গ সৃষ্টি করবে না আওয়াজ নাকে নিবে না ।

(৬) গুন্নাহ ও ইখফা- উভয়টার পরিমাণ এক আলিফ । ইখফা অনেকটা বাংলা অনুস্বর (ং) -এর মত এবং গুন্নাহ "ন্ন” এর মত । অনেকে ব্যতিক্রম করে থাকে, যা ভুল ।

(৭) ক্বলকলাহ- সামান্য ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয়, বেশী ধাক্কা দেয়া ভুল । অবশ্য এসব অক্ষরে তাশদীদ থাকলে ওয়াকফের সময় জোরে ধাক্কা দেয়া হয়, যাতে করে অক্ষরটি দুবার উচ্চারিত হয় । যেমন-{ابي لهب و وتب}

(৮) ওয়াকফ এর অবস্থায়- (ক)ر পরিষ্কার শুনা যাবে, অধিকাংশেরই ر শুনা যায় না । (খ) তেমনিভাবে অনেকেরই ه সাফ হয় না বরং নরম হামাযার মত হয় । আবার কেউ কেউ বেশী ধাক্কা দেয়, তাও ভুল । (গ) ذ এর উপর ওয়াকফ করার সময় অনেকে ه এর মত আওয়াজ বের করে, যা ভুল । (ঘ) ع দাবায়ে উচ্চারণ করতে হয় কিন্তু বেশী দাবানো ভুল । (ঙ) তাশদীদ যুক্ত ر কে ওয়াকফের সময় অনেকে একটি উচ্চারণ করে, যা ভুল, বরং ر কে মাখরাজের মধ্যে দেরী

{পৃষ্ঠা-২৮৫}

করে উচ্চারণ করবে, যাতে উভয় ر উচ্চারিত হতে পারে । উল্লেখ্য ر পুর ও বারীকের মধ্যে জরুরী অনেক কায়িদা আছে । (হারদুই এর কায়িদা দ্রষ্টব্য) (চ) ى মুশাদ্দাদ উচ্চারণে অনেকে ”জ” এর মত আওয়াজ করে যা ভুল ।

(৯) লাহনে জলী- অনেকে ء কে ى এবং ى কে ء উচ্চারন করে যা লাহনে জলী যেমন- من ثلثي الليل- شانئك هو الابتر

(১০) হরুফে মুকত্বাআত- এর মধ্যে অনেকে তাজবীদের ফা, গুন্নাহ, ক্বলকলাহ, ইত্যাদি কায়িদা জারী করে না, যেমন- كهيعص তেমনিভাবে অনেকে আস্তে কিরাআত পড়ার সময় তাজবীদের কায়িদা জারী করে না যা মারাত্মক ভুল ।

ছোট সূরার শুরু থেকে দুই এক আয়াত বাদ দিয়ে পড়া তেমনিভাবে দুই সূরার মাঝখানে একটি সূরা বাদ দিয়ে পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এক ইমাম সাহেব মাগরিবের ফরজ নামায পড়াতে গিয়ে প্রথম রাকা’আতে সূরা “ক্বারিয়াহ্” এর প্রথম ২ আয়াত বাদ দিয়ে বাকী অংশ দিয়ে এক রাক’আত শেষ করলেন। ২য় রাক’আতে মধ্যের এক সূরা অর্থাৎ সূরা তাকাসুর বাদ দিয়ে পরবর্তী সূরা “সূরা

আছর” পড়ে নামায পড়লেন, এরপর ৩য় রাক’আত আদায় করে নামায শেষ করলেন; কিন্তু সাহু সিজদা দেননি। এমতাবস্থায় নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় হয়েছে কি?

জবাবঃ ফরজ ও ওয়াজিব নামাযে সূরা ফাতিহার পর কিরা‘আতের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় রাক’আতে সূরার মাঝখানে ছোট একটি সূরা বাদ দিয়ে পড়া, এমনিভাবে ছোট কোন সূরা থেকে কিছু অংশ বাদ দিয়ে পড়া মাকরুহে তানযীহী। আর ছোট সূরা বলতে ক্বিসারে মুফাসসালের সূরা সমূহ অর্থাৎ সূরায়ে যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা সমূহকে বুঝানো হয়। প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় নামায সহীহ্ হয়ে যাবে, সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে সূরা ক্বারিয়াহ দুই আয়াত বাদ দিয়ে পড়া এবং মাঝে সূরা তাকাসুর বাদ দিয়ে সূরা আসর পড়ার ফলে নামায মাকরুহে তানযীহী হয়েছে। এমনটি করা অনুচিত।

[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ১:৫৪৬, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৮৫, # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১:২৪৭, # আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল ২:২০৯]

ويكره الفصل بسورة قصيرة و ان يقرأ منكوسا- [الدر المختار 546/1]

وكذا لو قرأ في الاولي من وسط سورة او من سورة اولها ثم قرأ في الثانية من وسط سورة اخري او من اولها او سورة قصيرة الاصح انه لا يكره لكن اولي ان لا يفعل من غير ضرورة – (رد المحتار: 546/1)

{পৃষ্ঠা-২৮৬}

ছোট তিন আয়াতের পরিমান

জিজ্ঞাসাঃ সূরা ফাতিহার পর কমপক্ষে বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ছোট তিন আয়াতের পরিমাণ কতটুকু ? এবং তারাবীহ নামাযের কোন রাকা’আতে সূরা ফাতিহার পর {مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} এতটুকু পড়ার দ্বারা নামায সহীহ হবে কিনা ?

জবাবঃ ছোট তিন আয়াতের হদ বা পরিমাণ হল–

{ثم نظر ثم عبس وبسرثم أدبروا ستكبر}-

অথবা এর সমমানের ত্রিশ হরফ বিশিষ্ট এক বা একাধিক আয়াত। সুতরাং কেউ যদি তারাবীহ নামাযে সূরা ফাতিহার পর প্রশ্নে বর্ণিত আয়াতদ্বয় পাঠ করে রুকূতে যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, উক্ত আয়াতদ্বয়ে ত্রিশটি অক্ষর রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, কোন ফরয নামাযে সূরা ফাতিহার পর কেবলমাত্র

{مُدْهَامَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ}

পরিমাণ পাঠ করে রুকূতে গেলে যদিও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাসনূন কিরাআত পরিত্যাগ করার কারণে নামায মাকরুহে তানযীহী হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ২ : ২২০, # দুররে মুখতার ১ ধ ৪৫৬-৪৫৯]

ولها واجبات......وهى قراءة فاتحة الكتاب وضم أقصر سورة كالكوثر او ما قام مقامها وهوثلاث ايات قصار نحو {ثم نظرثم عبس وبسرثم أدبروا ستكبر}- وكذا لو كانت الأية اوالأيتان تعدل ثلاثا قصارا- ذكره الحلبى فى الاوليين من فرض – [الدر المختار- 456/1-459]

সূরা পড়তে গিয়ে ভুলে গেলে।

জিজ্ঞাসাঃ সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে গিয়ে মাঝখানে যদি ভুলে যায়, তাহলে কি করতে হবে? পুনারায় বিসমিল্লাহ্ পড়ে অন্য সূরা পড়ে নামায শেষ করা যাবে কি?

জবাবঃ সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা আরম্ভ করে যদি ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পড়ার পর ভুলে যায়, তাহলে অন্য সূরা আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই। বরং রুকু করে যথারীতি নামায শেষ করবে। এতে নামায সহীহ্ হবে। আর যদি এ পরিমাণ পড়তে না পারে, বরং দু'এক শব্দ পড়ার পরই ভুলে যায়, তাহলে বিসমিল্লাহ্ সহ অন্য কোন সূরা পড়ে নামায শেষ করবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ২:২৩৩, ২:২২০, # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:১৫৮, ২:১২৪]

{পৃষ্ঠা-২৮৭}

মুখ বন্ধ করে নামায পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ফরজ নামাযের নীরব অংশসহ সকল নামায সবসময় মুখ বন্ধ করে পড়েন। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন- মুখ বন্ধ করে পড়লে নামায হবে না- এমন কথা তিনি কোন কিতাবে পাননি। এতে তাঁর এবং মুক্তাদীদের নামায শুদ্ধ হবে কি?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে কিরা'আত পড়া ফরজ। আর সিররী অর্থাৎ, নীরব নামাযের কিরা'আত পড়ার নিয়ম সহীহভাবে মাখরাজ থেকে সিফাতের সাথে হরফের উচ্চারণ করা। এতটুকু অবস্থা কিরা'আতের ফরজ আদায়ের জন্য জরুরী এবং এর জন্য জিহ্বা ও ঠোঁট নড়া জরুরী। অনেকের নিকটে এর সাথে তাজবীদ সহকারে এই পরিমাণ জোরে পড়া চাই, যেন সে নিজে হালকাভাবে শুনতে পায়। অন্যথায় শুধু দিলে দিলে কির'আতের খেয়াল করলে কির'আতের পড়ার ফরজ আদায় হবে না এবং নামাযও সহীহ্ হবে না। তেমনিভাবে নামাযের অন্যান্য তাসবীহ্ বা দু'আ সমূহও উল্লেখিত নিয়মে পড়তে হবে। নতুবা সেগুলো সহীহভাবে আদায় হবে না। দিলে দিলে খেয়াল করা এক জিনিস, আর মুখে পড়া ভিন্ন জিনিস। মাখরাজের সাথে পড়তে হলে ঠোট-জিহ্বা নড়া আবশ্যক।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:১১৭, # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৭৫, # ফাতাওয়া রাশীদিয়া ৩১৯]

ثم المخافتة ان يسمع نفسه والجهر ان يسمع غيره وهذا عند الفقه ابي جعفر الهندواني - لان مجرد حركة اللسان لا يسمي قراة بدون الصوت- [الهداية 117/1]

ইমামের ভুল কিরা'আত পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক মসজিদের ইমাম সাহেবের কুরআন শরীফ পড়া কিছুটা গলদ। তিনি س -এর জায়গায় ث পড়েন এবং ث -এর জায়গায় س পড়েন। এরূপে ء -এর জায়গায় ع পড়েন এবং ع-এর জায়গায় ء পড়ে থাকেন। উচ্চারণে লম্বা খাটোও ঠিকমত পড়তে পারেন না। এমতাবস্থায় তার পিছনে নামায পড়া যাবে কি না?

জবাবঃ আপনার বর্ণনা অনুযায়ী বুঝা যায়, ইমাম সাহেবের কিরা'আতে লাহনে জলী হয়। আর কোন ইমামের পড়া যদি লাহনে জলী পর্যায়ের অশুদ্ধ হয়, তাহলে তার জন্য ইমামতী করা জায়িয নয় এবং তাকে ইমাম হিসেবে নিয়োগ

{পৃষ্ঠা-২৮৮}

দেয়া বা ইমাম বহাল রাখাও জায়িয নয়। সহীহ্ পড়নেওয়ালাদের জন্য তার পিছনে ইকতিদা করা যাবে না। বরং তারা সহীহ্ পড়নেওয়ালা ইমামের পিছনে নামায পড়বে। শুদ্ধ পড়নেওয়ালা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে নামাযের শুরুতে ভুল পড়নেওয়ালা ইমামের ইকতিদা করে, তাহলে তার নিজের

নামাযের সাথে অন্যের নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ হিদায়া ১:১২৭, # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪:৩৫১]

وإذا صلى أمي بقوم يقرؤون وبقوم أميين فصلاتهم فاسدة عند أبي حنيفة. (الهداية:127/1)

কিরা'আতের কিছু অংশ ছেড়ে দিলে।

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক ইমাম সাহেব ফরজ নামাযে কিরা'আত পড়ার সময় সূরা তাওবার ১০৭, ১০৮ ও ১০৯ আয়াত ঠিক পড়েছেন কিন্তু ১১০ আয়াতের {إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} শব্দটি ভুল ক্রমে ছুটে গিয়েছে । এমতাবস্থায় নামায শুদ্ধ হয়েছে কি ? নাকি নামায দুহরিয়ে পড়তে হবে ।

জবাবঃ সূরা তাওবার ১১০ আয়াতটি পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পৃক্ত {إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ} বাদ পড়াতে নামায ফাসিদ হওয়ার মত কোন পরিবর্তন আসেনি। কেননা, ভুলের দরুন অর্থের মধ্যে যদি এমন পরিবর্তন না হয়, যা বিশ্বাস করা কুফরী, তাহলে নামায ফাসিদ হবে না।

সুতরাং, উল্লেখিত সুরতে উক্ত আয়াতের অংশ বাদ পড়াতে নামায ফাসিদ হয়নি। তাই নামায দোহরিয়ে পড়ার দরকার নেই। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৩৫০]

মুকীমের সুন্নাত কিরা'আত।

জিজ্ঞাসাঃ মুকীম অবস্থায় সুন্নাত কিরা'আতের পরিমাণ কি?

জবাবঃ শরয়ী সফর বা কোন প্রতিবন্ধকতা বা উযর না থাকলে, মাসনূন কিরা'আতের পরিমাণ নিরুরূপঃ

ফজর ও যোহরে ত্বিওয়ালে মুফাসসাল তথা সূরা 'হুজুরাত' হতে সূরা 'বুরূজ' পর্যন্ত। আসর ও ইশাতে আওসাতে মুফাসসাল তথা সূরা 'ত্বারিক' হতে সূরা 'লাম-ইয়াকুন' পর্যন্ত। মাগরিবে ক্বিসারে মুফাসসাল তথা সূরা 'যিলযাল' হতে সূরা নাস পর্যন্ত যে কোন সূরা পড়া সুন্নাত।

উল্লেখ্য, উক্ত সূরাগুলো এমনভাবে নির্দিষ্ট না করে নেয়া চাই যে, অন্যগুলো একেবারেই পড়ায় আসে না। বরং মাঝে মধ্যে উল্লেখিত পরিমাণ মাফিক কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থান হতেও পড়া চাই। তবে নির্দিষ্ট ইমাম ব্যতীত অন্য কেউ নামায পড়ালে, সে উক্ত সূরাগুলোর যে কোনটি পড়বে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৭৭] {পৃষ্ঠা-২৮৯}

নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরা'আত।

জিজ্ঞাসাঃ সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর নামাযে কোন কোন সূরা পড়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়?

জবাবঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের ফরজ নামাযে যে সমস্ত সূরা পড়েছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ (ক) সূরা ক্বাফ, সূরা আত-তাকভীর, সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস। শুক্রবার ফজরের নামাযের ১ম রাক'আতে সূরা 'সিজদাহ্', ২য় রাকা'আতে সূরা 'আদ-দাহর' পড়েছেন। কখনো সূরা জুমু'আ ও সূরা মুনাফিকূন পড়তেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক যোহরের ফরয নামাযে পঠিত সূরা সমূহ নিরুরূপঃ যথা- সূরা আ'লা, সূরা আল-লাইল।

মাগরীবের ফরজ নামাযে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল সূরা পড়েছেন বলে পাওয়া যায়, তাহলো- সূরা আত-তূর, সূরা আল মুরসালাত, সূরা 'আরাফকে দু'ভাগে ভাগ করে

দু'রাকা'আতে। শুক্রবার মাগরিবের নামাযে ১ম রাকা'আতে সূরা কাফিরূন, ২য় রাকা'আতে সূরা ইখলাসও পড়েছেন। উক্ত সূরাদ্বয় কখনো মাগরিবের সুন্নাতেও পড়তেন।

ইশার ফরজে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো সূরা ত্বীন পড়েছেন বলে এক হাদীসে উদ্ধৃতি রয়েছে। অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মু'আয (রাযিঃ)-কে ইশাতে সূরা ওয়াশ্ শামস্, সূরা ওয়ায্ যুহা, সূরা ওয়াল্ লাইল ও সূরা 'আলা পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বিতরের ১ম রাকা'আতে সূরা 'আলা, দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়ার কথাও অন্য এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।

জুমু'আ ও দুই ঈদে সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা আল-ক্বামার ও সূরা ক্বাফ পড়েছেন বলে জানা যায়। অন্য এক রিওয়ায়াত মুতাবিক বুঝা যায় যে, তিনি সাধারণতঃ দুই ঈদ ও জুমু'আতে সূরা 'আলা ও গাশিয়াহ্ পড়তেন। কখনো ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হলে উভয় নামাযে উক্ত দুই সূরাই পড়তেন।

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে শরী'আতের বিধান বর্ণনাকারী। সে হিসেবে তাঁর জন্য মাসনূন কিরা'আতের পরিমাণের কম বা বেশী করার অবকাশ রয়েছে এবং তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাই তিনি পরিমাণ কম বা বেশী করেছেন উম্মতকে তালীম দেয়ার লক্ষ্যে যে, এমন করাও জায়িয আছে। তবে সাধারণতঃ মাসনূন কিরা'আতের তরতীবের অনুসরণ করবে। [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ ১:১৮৬-৮৭, নাসায়ী শরীফ, বুখারী শরীফ]

{পৃষ্ঠা-২৯০}

ফজরের সুন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কিরা'আত।

জিজ্ঞাসাঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কি সূরা দ্বারা ফজরের সুন্নাত নামায পড়েছিলেন। লোক মুখে শুনেছি, সূরা কাফিরুন ১ম রাকা'আতে, ২য় রাকাআতে সূরা ইখলাস ৩ বার পড়েছেন। কথাটা কতটুকু সত্য?

জবাবঃ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের সুন্নাতে ১ম রাকা'আতে সূরা কাফিরুন এবং দ্বিতীয় রাকা'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন। তবে সূরা ইখলাস তিনবার পড়ার কথা কোথাও পাওয়া যায় না। সুতরাং এটা ভিত্তিহীন।
[প্রমাণঃ তাহাবী শরীফ ১:১৭৬-৬৭, নাসায়ী শরীফ]

কিরা'আত আস্তে ও জোরে পড়ার কারণ।

জিজ্ঞাসাঃ যোহর ও আসর নামাযে কিরা'আত আস্তে এবং মাগরিব, ইশা ও ফজর নামাযে কিরা'আত জোরে পড়া হয় কেন?

জবাবঃ কারণ জানা আমাদের জন্য জরুরী নয় এবং এর মধ্যে কোন সওয়াবও নেই। সুতরাং আমাদের সময়, শক্তি এমন কাজে ব্যয় করা দরকার, যার মধ্যে দ্বীন বা দুনিয়ার বিশেষ উপকার নিহিত আছে। জানার জন্য জানা, এর চেয়ে উত্তম-আমালের জন্য জানা। সুতরাং এমন প্রশ্ন পাঠানোর দরকার, যা লোকদের আমলের জন্য কাজে আসে।

একাকী ব্যক্তি কিরা'আত জোরে না আস্তে পড়বে।

জিজ্ঞাসাঃ ঘরে নামায পড়তে হলে, সূরা-কিরা'আত জোরে পড়তে হয় কিনা? ঘরে নামায আদায় ও মসজিদে নামায আদায়ে তারতম্য কি?

জবাবঃ ঘরে নামায আদায়ের দ্বারা সম্ভবতঃ আপনার উদ্দেশ্য একাকী নামায পড়া। একাকী নামাযের কিরা'আতের নিয়ম হল, যে সকল নামাযের কিরা'আত আস্তে পড়ার নিয়ম, যেমন– যোহর, আসর, সে সকল নামাযে কিরা'আত আস্তেই পড়তে হয়, জোরে পড়ার অনুমতি নেই। আর যে সকল নামাযে কিরা'আত জোরে পড়ার নিয়ম, যেমন– মাগরিব, ইশা, ফজর, সে সকল নামাযে কিরা'আত আস্তে বা জোরে পড়া ইখতিয়ার বিধান। তবে একাকী অবস্থায় এগুলোতে জোরে পড়া উত্তম। কোন উযর ব্যতীত ইচ্ছাকৃত জামা'আত তরক করা নাজায়িয এবং গুনাহর কাজ। কেননা, মসজিদে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা অন্যান্য মাযহাবে ফরজ এবং হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ওয়াজিব এবং তাতে সওয়াব ২৭ গুণ বেশী।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫৩৪, # হিদায়া ১:১১৫]

ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الاوليين من المغرب والعشاء ان كان إماما ويخفى في الاخريين هذا هو المتوارث وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر واسمع نفسه لانه امام في حق نفسه وإن شاء خافت لانه ليس خلفه من يسمعه والافضل هو الجهر ليكون الاداء على هيأة الجماعة - (الهداية:115/1)
{পৃষ্ঠা–২৯১}

একই সূরা একই নামাযে বার বার পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশোত্তর কলামে জানতে পারলাম একাধিক সূরা মুখস্থ থাকা সত্ত্বেও একই সূরা একই রাকা'আতে বারবার পড়া মাকরূহ্। আর বেহেশতী জেওর কিতাবে দেখলাম কোন নামাযে সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া যে কখনও সেই সূরা ছাড়া অন্য সূরা পড়বে না এটা মাকরূহ্। এটা কতটুকু ঠিক?

জবাবঃ ফরজ নামাযে একই রাক'আতে একই সূরা বার বার পড়া মাকরূহ্। তবে নফল নামাযে এমন করা মাকরূহ্ নয়। তাছাড়া কোন নামাযের জন্য সূরা নির্ধারিত করে নেয়াও মাকরূহ্। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত উভয় মাসআলাই সঠিক।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া কাজীখান, ১:১১৯, # হালাবী কাবীর, ৩৫৫, # দারুল উলূম ২:২]

ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة من الفرائض ولا بأس بذلك في التطوع. (فتاوى قاضي خان:119/1)

চার রাকাত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের ২য় রাকাআতে সূরায়ে ফালাক পড়লে।

জিজ্ঞাসাঃ চার রাকা'আতওয়ালা সুন্নাত নামাযের দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ফালাক ভুলে পড়লে, ৩য় ও ৪র্থ রাক'আত কিভাবে আদায় করবে?

জবাবঃ তৃতীয় ৪র্থ উভয় রাক'আতেই সূরা নাস পড়বে– এটাই উত্তম। তবে তৃতীয় রাক'আতে সূরা নাস পড়ে চতুর্থ রাক'আতে সূরা বাক্বারার শুরু থেকে পড়তে চাইলে তাও পড়তে পারবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম , ২:২৫৭, # হালবী কাবীর ৪৯৪]

واذا قرأ في الاولى {قل اعوذ برب الناس} ينبغي ان يقرأها في الثانية ايضا, قال البزازي: لان التكرار اهون من القرأة منكوسا وفي الولوالجية: من يختم القرآن في الصلاة اذا فرغ من المعوذتين في الركعة الاولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية يقرأ بفاتحة الكتاب وشيئ من سورة البقرة. (الحلبي الكبير:494/1)
{পৃষ্ঠা–২৯২}

বাংলা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত সম্পর্কে।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে বাংলা কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা সম্পর্কে মতবিরোধ হয়েছে। কেউ বলেন, বাংলা কুরআন শরীফ পড়লে সওয়াব হবে। কেউ বলে, বাংলা উচ্চারণ সহীহ্ হয় না। কাজেই সওয়াব হবে না। উক্ত সমস্যার সঠিক সমাধান কি? তাছাড়া বাংলা কুরআন শরীফ মতে সূরা পড়লে নামায সহীহ্ হবে কি-না? এবং প্রতি হরফে ১০টি করে নেকী হবে কি-না?

জবাবঃ বাংলা উচ্চারণে কুরআন শরীফ লেখা এবং পড়া কোনটাই ঠিক নয়। যেহেতু এর দ্বারা সহীহভাবে আরবী হরফের উচ্চারণ সম্ভব নয়, কারণ- আরবী কয়েকটি হরফের বাংলা উচ্চারণ এক রকম। সেক্ষেত্রে বাংলায় আরবী হরফগুলো পার্থক্য করা এবং সহীহ্ মাখরাজ থেকে উচ্চারণ করা কঠিন। তাছাড়া এটা এক প্রকার কুরআন বিকৃতির মধ্যে শামিল এবং অনেক হরফ আছে যেগুলো বাংলাতে উচ্চারণ করাও মুশকিল। শুধু বাংলা কুরআন শরীফ দেখে পড়লে যেহেতু কুরআন শুদ্ধ হয় না, তাই এর দ্বারা নামাযও শুদ্ধ হবে না। এবং ভুল পড়ে প্রতি হরফে ১০ নেকীর আশা করা যায় না। সুতরাং এভাবে পড়ার অনুমতি নেই। কাজেই যারা সহীহভাবে কুরআন পড়তে জানে না তাদের উচিত কোন সহীহ পড়নেওয়ালা কারী সাহেব থেকে সরাসরি শিখে নেয়া। আজকাল নূরানী পদ্ধতিতে অল্প সময়ে সহজে কুরআন শরীফ শিক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং এসব ভুল পদ্ধতির আশ্রয় নেয়ার কোন অর্থ হয় না।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:৪৫-৪৭, # জাওয়াহিরুল ফিকহ্ ১:৭৭]

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় লা-মাযহাবী কিছু লোক প্রচার করছে যে, ইমামের পিছে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা না পড়লে তাদের নামাযই হবে না এবং হানাফীগণ যেহেতু ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা পড়ে না, সুতরাং তাদের নামায হয় না। একথা কতটুকু সহীহ্?

জবাবঃ লা-মাযহাবীদের একথা মেটেও সহীহ্ নয়। তারা যে হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে, তা ইমামের পিছে ইকতিদাকারীর ব্যাপারে মোটেও প্রযোজ্য নয়, বরং উক্ত হাদীস শুধুমাত্র ইমাম এবং একাকী নামায আদায় করার ব্যাপারে প্রযোজ্য। ইমামের পিছে মুসল্লীদের জন্য সূরা- পড়ার কোনরূপ অনুমতি কুরআন-সুন্নাহ্ এর মধ্যে নেই। বরং মুসল্লীদের জন্য ইমামের পিছে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোন সূরা পড়া নিষেধ। মুসল্লীদের কর্তব্য ইমামের জোরে হোক বা আস্তে সর্বাবস্থায় চুপ থাকা। দলীল নিরুরূপঃ

{পৃষ্ঠা-২৯৩}

ইমাম বাগাবী (রহঃ) হযরত মিকদাদ (রাযিঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছে সূরা-ক্বির‘আত পড়ত। এটাকে নিষেধ করার জন্য সূরা আ’রাফের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়-

[وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف : 204{

অর্থঃ যখন (নামাযে ইমাম কর্তৃক) কুরআন তিলাওয়াত করা হয়, তখন তোমরা (মুসল্লীরা) চুপ থাকবে। [সূরা আ’রাফঃ ২০৪]

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত -তিনি বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, "নিশ্চয় (নামাযে) ইমাম এ জন্য বানানো হয়, যেন তাঁর ইকতিদা করা হয়। কাজেই যখন ইমাম সাহেব তাকবীর বলেন, তখন তোমরাও তাকবীর বল এবং যখন তিনি পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক।" ইমাম আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং এটা বিশুদ্ধ হাদীস। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) ও এ জাতীয় হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) ও কাতাদাহ্ কর্তৃক বর্ণিত মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যখন ইমাম সাহেব পড়েন, তখন তোমরা চুপ থাক। উল্লেখ্য, সূরা ফাতিহা ও সূরা মিলানো উভয়টাই কিরা''আতের অন্তর্ভুক্ত।

عن علي رضي الله عنه قال : « سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم : أقرأ خلف الإمام أم أنصت ؟ قال : » لا بل أنصت فإنه يكفيك. (القراءة خلف الإمام للبيهقي:1 / 407 برقم:354)

হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেন- "(ইয়া রাসূলাল্লাহ !) ইমামের পিছনে আমি কি সূরা বা পড়ব, নাকি চুপ থাকব? জবাবে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন- না, বরং চুপ থাকবে, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।"

[বাইহাকী শরীফ]

قال وأخبرني موسى بن عقبة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا ينهون عن القراءة خلف الإمام. (مصنف عبدالرزاق:2 / 139)

অর্থঃ (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনায় আছে) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবু বকর, উমর ও উসমান (রাযিঃ) লোকদেরকে ইমামের পিছনে সূরা- পড়তে নিষেধ করতেন। {পৃষ্ঠা-২৯৪}

من قرأ خلف الامام فلا صلوة له.

অর্থঃ (হযরত আমর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে যায়িদ ইবনে সাবিত থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন,) যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে পড়বে, তার নামাযই হবে না।

মুহাম্মদ (রহঃ) ও আব্দুর রাজ্জাক (রহঃ) হযরত আলী (রাযিঃ) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فإن من كان له امام فقراءة الامام قراءة له.

অর্থঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ) "প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইমামের ইকতিদা করেছেন, তার ইমামের সূরা-কিরা'আ'তই তার জন্য সূরা- হিসেবে গণ্য হবে।" ইবনে মাজাহ (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে এবং দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে।

عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله عن القراءة خلف الامام فقال الامام يقرأ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইমামের পিছনে সূরা– পড়া সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হয়, জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– শুধু ইমামই পড়বে। [বাইহাকী শরীফ]

عن ابن عمر انه كان اذا سئل هل يقرأ احد مع الامام قال اذا صلى احدكم مع الامام فحسب قراءة الامام....الخ.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন তাঁকে এ প্রশ্ন করা হত– ইমাম সাহেবের সঙ্গে অন্য কেউ সূরা– পড়বে কি? জবাবে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেউ ইমামের সঙ্গে নামায পড়বে, তখন তার জন্য ইমামের কিরা'আতই যথেষ্ট। আর হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ) স্বয়ং ইমামের সঙ্গে সূরা– পড়তেন না। [মুআত্তা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)]

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل صلوة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلا صلوة إلا وراء الامام.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে নামাযে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় না, তা (পূর্ণ) নামাযই নয়। তবে যদি ইমামের পিছনে হয়, সেটা ভিন্ন কথা ।” হাদীসটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ) নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।
{পৃষ্ঠা-২৯৫}

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله نهى عن القراءة خلف الامام.

অর্থঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইমামের পিছনে সূরা– পড়তে নিষেধ করেছেন। ইমাম বাইহাকী (রহঃ) পক্ষান্তরে ইমামের পিছনে সূরা পড়ার ব্যাপারে যে বর্ণনা পেশ করা হয়। যেমনঃ

عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من صلى صلوة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج.

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামায পড়ল, অথচ সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করল না। সেটা অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ। সিহাহ সিত্তাহর ইমামগণ, ইমাম মালিক, আহমাদ, দারাকুতনী এবং বাইহাকী (রহঃ) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ।

عن عائشة رضي الله تعالى عنه قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كل صلوة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج.

অর্থঃ হযরত আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “যে নামাযে সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ নামায।”ইবনে মাজাহ ইবনে আবী শাইবা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

এ হাদীস সমূহের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীসগুলো একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ, ইমামের পিছে নামায আদায়কারীর ব্যাপারে নয়।

اما احمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم "لاصلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب":اذا كان وحده. احتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرأن فلم يصل الا ان يكون وراء الامام.

অর্থঃ আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেছেন- উল্লেখিত হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য। তিনি নিজের দাবীর ব্যাপারে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাযিঃ)- এর সেই হাদীসটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন, যে হাদীসে বলা হয়েছেঃ "যে ব্যক্তি নামায পড়ল, অথচ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে নামাযই পড়ল না। তবে যদি ইমামের পিছনে হয় তাহলে তার জন্য সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না।
{পৃষ্ঠা-২৯৬}

অতঃপর ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরো বলেছেন- লক্ষ্য করুন ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর একজন সাহাবী হযরত জাবির (রাযিঃ) এরূপ হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায পূর্ণ হয় না, এ হাদীসটি মুনফারিদ বা একাকী নামায আদায়কারীর জন্য প্রযোজ্য।

উল্লেখিত বর্ণনা সমূহের দ্বারা ইমামের পিছনে কোন সূরা- এবং সূরা ফাতিহাও না পড়ার কথা প্রমাণিত হয়। সে ভিত্তিতেই হানাফীগণ যে ইমামের পিছনে সূরা- পড়েন না, তা যথার্থ ও সহীহ্। এ সম্পর্কে লা-মাযহাবীদের দাবী ভিত্তিহীন ও অমূলক।

নামায ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহসমূহ

নামাযে লুঙ্গি বাঁধা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের মধ্যে লুঙ্গি খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, তাকে দুই হাত দ্বারা বাঁধা যাবে কি-না ?

জবাবঃ প্রথমে এক হাত দ্বারা একদিকে ঠিক করে নিবে। তারপর তিনবার "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" বলা পরিমাণ সময় দেরী করবে। অতঃপর দ্বিতীয় হাত দ্বারা অপর দিক ঠিক করে নিবে। এমন ভাবে করলে, নামাযের কোন অসুবিধা হবে না। দুই হাত দ্বারা একসাথে বাঁধলে আমলে কাসীর হবে বিধায় তাতে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ৪৩৭ পৃঃ]

আমলে কাসীরের সংজ্ঞা।

জিজ্ঞাসাঃ নামায ফাসিদ হওয়ার কারণ হিসেবে যে আমলে কাসীরের কথা বলা হয় সেই আমলে কাসীরের সংজ্ঞা ও পরিমাণ কি ?

জবাবঃ নামাযরত ব্যক্তির এমন কোন কর্ম- যা নামায পরিপন্থী তা দু'ভাগে বিভক্ত (ক) পরিমাণে সামান্য- যাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'আমলে কালীল' বলা হয়। (খ) পরিমাণে বেশী যাকে 'আমলে কাসীর' বলা হয়। নামাযের অভ্যন্তরের কোন কর্ম আমলে কাসীর বলে সাব্যস্ত হলে নামাযীর নামায সর্বসম্মতিক্রমে ভঙ্গ হয়ে যায়।

আমলে কাসীরের পরিমাণ নির্ণয়ের বেলায় ফিকাহবিদগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুযায়ী আমলে কাসীর বলা হয় এরূপ কর্মকে, যে কর্মের কর্মরতকে নামাযের বাহির থেকে অবলোকনকারীর নিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, সে নামাযরত অবস্থায় নেই। এ ধরনের কর্ম দ্বারা তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর তাকে নামাযরত বলে যদি ধারণা হয়, তাহলে একে আমলে কাসীর বলা হবে না, বরং আমলে কালীল বলা হবে। তাতে নামায নষ্ট হয় না।

[প্রমাণঃ হিদায়া, ১:১৪১ # বাহরুর রায়িক, ২:১১-১২ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১০১ # বাদায়িউস সানায়ে, ১:২২১ # ফাতহুল কাদীর ১:৩৫১]
{পৃষ্ঠা-২৯৭}
العمل الكثير يفسد الصلوة والقليل لا كذا في محيط السرخسي. اختلفوا في الفاصل بينهما على ثلاثة اقوال .... (والثالث) انه لو نظر اليه ناظرا من بعيد ان كان لا يشك انه في غير الصلاة فهو كثير مفسد وان شك فليس بمفسد وهذا هو الاصح هكذا في التبيين وهو الاحسن. (الفتاوى الهندية:101/1)

نফল নামাযে সিজদায় বাংলায় দু'আ করা জায়িয কি-না ?

জিজ্ঞাসাঃ নফল নামাযে সিজদায় বাংলায় দু'আ করা জায়িয কি-না ?

জবাবঃ নামাযের ভিতরে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আরবী ভাষার দু'আ ব্যতীত অন্য ভাষায় দু'আ পড়া জায়িয হবে না, বরং মাকরূহ্ হবে। কাজেই কেউ এ রকম করে থাকলে তার নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। তবে নামাযের পর মুনাজাত যে কোন ভাষায় করা জায়িয আছে।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩ : ৪৩২]

ودعاء بالعربية وحرم بغيرها نهر....الخ (الدر المختار:521/1)
ولا يبعد ان يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلوة وتنزيها خارجها فليتأمل وليراجع . (رد المحتار:521/1)

সুন্নাত তরীকার খেলাফ সিজদা আদায়ের হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ মুসল্লিরা প্রায় সবাই সিজদার মধ্যে হাঁটুর সাথে কনুই লাগিয়ে সিজদা দেয়, এতে কোন দোষ আছে কি-না জানতে চাই।

জবাবঃ পুরুষদের জন্য সিজদার মধ্যে সুন্নাত হলো পেটকে উরু থেকে পৃথক রাখা এবং বাহুদ্বয়কে জমিন, হাটু ও পাঁজড় থেকে পৃথক করে রাখা। কনুইদ্বয়কে মাটিতে বিছিয়ে অথবা হাঁটুর উপরে রাখলে খেলাফে সুন্নাত হওয়ার ফলে মাকরূহ্ হবে এবং এটা অলসতার পরিচায়ক।
[প্রমাণঃ হিদায়া, ১:১০৯ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৭৫ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭:২২০]

সিজদারত অবস্থায় মাটি থেকে পা উঠে যাওয়া।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে সিজদারত অবস্থায় যদি কখনও দু'পায়ের আঙ্গুল মাটি থেকে উঠে যায়, তাহলে কি নামায ভেঙ্গে যাবে?

জবাবঃ সিজদারত অবস্থায় কোন এক মুহূর্তের জন্য হলেও এক পায়ের কিছু অংশ জমিনে থাকা জরুরী। আর যদি পূর্ণ সিজদায় উভয় পা জমিন থেকে পৃথক থাকে অর্থাৎ, সম্পূর্ণ সিজদার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যও পায়ের কিছু অংশ জমিনে না লাগে তাহলে সিজদাহ্ সহীহ্ না হওয়ার কারণে নামায হবে না। সেই নামায দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।
{পৃষ্ঠা-২৯৮}

আর যদি সিজদারত অবস্থায় আঙ্গুল কিছু সময়ের জন্য জমিন থেকে উঠে যায় এবং উঠার পরেই আবার জমিনের সাথে মিলিয়ে নেয়, তাহলে তাতে নামায ভঙ্গ হবে না। তবে মাকরূহ্ হবে। কেননা, পূর্ণ সময় উভয় পা জমিনে রাখা এবং কিবলামুখী করে রাখা সুন্নাতে মু'আক্কাদা।
[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১:৪৪৭ # ফাতাওয়া তাতার খানিয়া ১:৫০৬ # হালাবী কবীর ১:৬৮৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪:৩৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩৯৮]

ولو سجد ولم يضع قدميه او احديهما على الارض في سجوده لا يجوز سجوده ولو وضع احديهما جاز. (حلبي الكبير:684/1)

মিম্বরের উপর সিজদা করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমরা বহুদিন যাবৎ গ্রামের জামে মসজিদে জুমু'আর নামায পড়ে আসছি। মসজিদের পাকা মিম্বরে খুৎবা পড়া হয়। ততপরে ফরয নামায পড়ার সময় একজন মুসল্লীর সিজদাহ্ মিম্বরের উপরে দিতে হয়। জনৈক আলেম মন্তব্য করেন যে, এতে নাকি ঐ ব্যক্তির নামায মাকরুহ্ হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত বিধান কি?

জবাবঃ উক্ত আলেম সাহেব ঠিক বলেন নি। কেননা সিজদার স্থান আধা হাত উঁচু হলেও নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। আর প্রয়োজনের সময় এর চেয়ে বেশী উঁচু জায়গায়ও সিজদাহ্ করা যায়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৩:৩৪৪ # আদদুররুল মুখতার ১:৫০৩]

ولو كان موضع سجوده ارفع من موضع القدمين بمقدار لبنتين منصوبتين جاز وان اكثر لا الا لزحمة. (الدر المختار:503/1)

নামাযে আঙ্গুল নাড়াচাড়া করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের মুরুব্বীগণ বলে থাকেন যে, নামাযের মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নাড়া চাড়া করলে, বা একটু আগে পিছে হটলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। একথা ঠিক কিনা?

জবাবঃ এটা একটা ভুল কথা দেশে প্রচলিত হয়ে গেছে– একথাটা ঠিক নয়। নামাযের মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল নাড়া চাড়া করলে তাতে নামায নষ্ট হয় না। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে নামাযের মধ্যে এরকম করা উচিত নয়। নামাযে স্থির থাকা নামাযের আদব

[ফাঃ দাঃ উঃ ৪:৪৯ # আলমগীরী ১:১০৩]

وان حرك رجلا واحدة لاعلى الدوام لا تفسد صلاته (الفتاوى الهندية:103/1)

{পৃষ্ঠা-২৯৯}

নামায আদায় করা অবস্থায় দাঁতের গোঁড়া দিয়ে রক্ত বের হলে।

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন ইমাম। আমার একটি দাঁত পোকায় ছিদ্র করে ফেলেছে বিধায় মাঝে মাঝে দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত বের হয়। উল্লেখ্য যে, নামাযের পূর্বে খুব ভাল ভাবে কুলি করে ও উযূ করে নামায আরম্ভ করার পরও দেখা যায়, মাঝে মাঝে উক্ত স্থান হতে রক্ত বের হয়। সুতরাং এই উযরসহ যেসব নামায আমার পড়া হয়েছে সেগুলো শুদ্ধ হয়েছে কি? যদি শুদ্ধ না হয়ে থাকে, তাহলে পূর্ববর্তী এসব নামাযের জন্য আমার করণীয় কি?

জবাবঃ নামায অবস্থায় রক্ত বের হলে এবং রক্ত থুথুর রঙের উপর প্রভাব বিস্তার করে নিলে আপনার নামায ও উযূ ভেঙ্গে যাবে। সুতরাং উক্ত নামায দ্বিতীয়বার আদায় করা জরুরী। অতীতে যতবার এরকম নামায হয়েছে, তন্মধ্যে হতে কোন একটি নামাযও সহীহ্ হয়নি। তাই মুসল্লীদেরকেও পূর্ববর্তী এরকম নামাযগুলো কাযা করতে বলবেন। আর ভবিষ্যতে যদি কখনো এরূপ হয়, তাহলে নামায ছেড়ে দিয়ে অন্য কাউকে নিজের খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) নিযুক্ত করে যাবেন। আর আপনি যদি ইমামতের যিম্মাদারী সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দেন, তাহলে সেটাই উত্তম। এ অবস্থায় আপনার জন্য ইমামতের যিম্মাদারী পালন করা খুবই কঠিন কাজ। তাই আমাদের পরামর্শ হচ্ছে,

আপনি ইমামতী ছেড়ে দিন। অন্যথায় দাঁতের ভাল চিকিত্সা নিন।
[প্রমাণঃ শামী, ১:১৩৮ # দারুল উলূম ১:১২৬]

وينقضه دم مائع من جوف او فم غلب على بزاق حكما للغالب او ساواه احتياطا. (الدر المختار:149/1)

তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা ঝুঁকানো।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় অনেকে মাথা ঝুঁকিয়ে হাত বাঁধে। এতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় মাথা সোজা রেখে, চেহারা কিবলার দিকে রেখে, দৃষ্টি জমিনের দিকে রাখা শরীয়তের নির্দেশ। এর ব্যতিক্রম করে মাথা ঝুঁকিয়ে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধাকে ফুকাহায়ে কিরাম বিদ'আত ও নাজায়িয বলেছেন। কারণ, এর দ্বারা চেহারা কিবলার দিকে থাকে না, বরং জমিনের দিকে হয়ে যায়, অথচ চেহারাকে কিবলার দিকে রাখার নির্দেশ এসেছে।
[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার, ১:৪৭৫ # ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১:৭৩]

ولا يطأطئ رأسه عند التكبير كذا في الخلاصة . (الفتاوى الهندية:73/1)
وأن لا يطأطئ رأسه عند التكبير فانه بدعة. (الدر المختار:475/1)

{পৃষ্ঠা-৩০০}

নামাযরত অবস্থায় লিখিত বস্তু পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ কোন নামাযী ব্যক্তির সামনে মসজিদের দেয়ালে যদি কোন ওয়াজ মাহফিলের পোষ্টার লাগানো থাকে, নামাযী ব্যক্তি যদি ঐ পোষ্টার পড়ে, তবে নামাযের ক্ষতি হবে কি-না?

জবাবঃ মসজিদে হোক বা অন্য কোথাও হোক, সর্বাবস্থায় মুসল্লীর দৃষ্টি লিখিত কোন বস্তুর উপর লাগার পড় যদি তা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে (অর্থাৎ, জিহ্বা , ঠোঁট ইত্যাদি নেড়ে) পড়ে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি মুখে উচ্চারণ না করে, শুধু দৃষ্টি ফেলার কারণে কি লেখা তা বুঝে ফেলে তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না। প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ভিতরের দেয়ালে বা বাহিরের দেয়ালে কোন প্রকার পোষ্টার লাগানো মসজিদের তা'যীমের পরিপন্থী হওয়ার কারণে নাজায়িয। কারণ, হাদীসে মসজিদের তা'যীমের ও মসজিদকে পরিষ্কার রাখার জন্য হুকুম করা হয়েছে। আর পোষ্টারিং ইত্যাদির দ্বারা মসজিদ নোংরা হয়।
[প্রমাণঃ হিদায়া, ১:১৩৭-৩৮]

وإذا قرأ الامام من المصحف فسدت صلاته عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا هي تامة الا انه يكره ولو نظر إلى مكتوب وفهمه فالصحيح انه لا يفسد صلا ته بالاجماع. (الهداية: 137/1)

দ্বিতীয় সিজদাহ্ আদায় না করলে।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ইমাম সাহেব ফরজ নামাযের কোন রাকা'আতে দ্বিতীয় সিজদাহ্ ভুলে আদায় করেননি। অতঃপর সাহু সিজদা দিয়ে নামায শেষ করলেন। এখন তার নামায সহীহ্ হবে কি-না? তিনি বললেন- দ্বিতীয় সিজদাহ্ করা ওয়াজিব। সঠিক বিধানটি কি ?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে দ্বিতীয় সিজদাও ফরজ। আর কোন ফরজ তরক হয়ে গেলে, নামায নষ্ট হয়ে যায়। তখন সিজদায়ে সাহু দিলেও হবে না, কারণ- সিজদায়ে সাহু দেয়া হয়, ভুলে কোন

ওয়াজিব তরক হলে। সুতরাং দ্বিতীয় সিজদা তরক করায় ইমাম সাহেবের নামায নষ্ট হয়ে গেছে। এখন ঐ নামায পুনরায় ইমাম ও সকল মুসল্লীকে দোহরিয়ে পড়তে হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:৭০ # আল বাহরুর রায়িক, ১:২৯৩]

ومنها السجود: السجود الثاني فرض كالاول باجماع الامة كذا في الزاهدي.

নাপাক জিনিস নিয়ে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ নাপাক কোন কাপড় বা অন্য কোন নাপাক জিনিস কোন কিছু দ্বারা পেঁচিয়ে পকেটে রেখে বা নিজের সাথে রেখে নামায আদায় করলে নামায সহীহ্ হবে কি ?
{পৃষ্ঠা-৩০১}

জবাবঃ ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক নাপাক কোন কাপড় বা অন্য কোন নাপাক জিনিস কোন কিছু দ্বারা পেঁচিয়ে বা এমনিতেই পকেটে বা নিজের সাথে রেখে নামায আদায় করলে দেখতে হবে যে, উক্ত নাপাকী জিনিস তরল কি-না ? যদি তরল হয় এবং উক্ত নাপাক এক টাকার কয়েন এর চেয়ে বেশী হয়, তেমনিভাবে নাপাকী গাঢ় হলে আনুমানিক সিকি তোলা পরিমাণ থেকে যদি বেশী হয়, তাহলে এ পরিমাণ নাপাকী সাথে নিয়ে নামায সহীহ্ হবে না।

আর উল্লেখিত পরিমাণ হলে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। সুতরাং উভয় সুরতে নামায পুনরায় আদায় করা উচিত। অবশ্য এর চেয়ে কম হলে নামায মাকরূহে তানযীহী হবে। সেক্ষেত্রে নামায দোহরানোর প্রয়োজন নেই।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:৩১৭ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:৪২ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৮:১০৮]

নামাযের মধ্যে চুলকানো।

জিজ্ঞাসাঃ চুলকানীর রোগ থাকলে, নামাযের মধ্যে চুলকালে, তার কি হুকুম?

জবাবঃ যদি নামাযের মধ্যে চুলকানো এমন জরুরী হয় যে, চুলকানো ব্যতীত খুশু-খুজুই ঠিক থাকবে না, তাহলে ১/২ বার চুলকালে নামায মাকরূহ্ হবে না। আর যদি ৩ বার এমনভাবে চুলকায় যে, প্রতি ২ বারের মাঝে এক রুকন (তিন তাসবীহ্ পরিমাণ) সময়ও বিরতি না হয়, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪১৬]

অপবিত্র ব্যক্তির নামাযীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা।

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন জায়গায় পৌছে যেখানে পানি ও মাটি নেই এবং নামাযের সময়ও একেবারে শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হয়, তাহলে এমতাবস্থায় তার করণীয় কী?

জবাবঃ উক্ত ব্যক্তি “তাশাব্বুহ্ বিল মুসাল্লীন” অর্থাৎ নামাযীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করে উক্ত নামায আদায় করবে। তবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কারোর জন্য ইচ্ছাপূর্বক এমন স্থানে যাওয়া জায়িয নয়, যেখানে নামায আদায় করা বা পবিত্রতা অর্জনের কোন ব্যবস্থা নেই।
[আদদুররুল মুখতার ১:২৫২]

والمحصور فاقد الماء والتراب (الطهورين) بأن حبس في مكان نجس ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما وقالا: يتشبه) بالمصلين وجوبا، فيركع ويسجد، إن وجد مكانا يابسا وإلا يومئ قائما ثم يعيد. (الدر .لمرض (يؤخرها عنده المختار للحصفكي - 1 / 272 (

{পৃষ্ঠা-৩০২}

তাকবীরে তাহরীমা বলার আগেই হাত বাঁধা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের সময় তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে অর্থাৎ, মুখে উচ্চারণ শেষ করার আগে কেউ যদি হাত বেঁধে ফেলে, তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না?

জবাবঃ তাকবীরে তাহরীমা মুখে উচ্চারণ শেষ করার আগেই যদি কেউ হাত বেঁধে ফেলে, তাতে তার নামায হয়ে যাবে। তবে এরূপ করা ভাল নয়, বরং তাকবীর বলতে বলতে হাত বাঁধবে। তাকবীর বলা শেষে হাত বাঁধাও শেষ হবে।

ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পূর্বেই মুক্তাদীর তাকবীরে তাহরীমা বলা।

জিজ্ঞাসাঃ ইমামের পিছনে নামায পড়ার সময় যদি কেউ ইমামের তাকবীর বলা শেষ করার আগেই তাকবীর বলে হাত বেঁধে ফেলে, তাহলে তাদের নামায হবে কি-না?

জবাবঃ তাকবীরে তাহরীমার সময় সহীহ্ নিয়ম হলো প্রথমে কান বরাবর হাত তুলবে, তারপর তাকবীর বলতে বলতে হাত বেঁধে নিবে।

কেউ যদি ইমামের তাকবীর শেষ হওয়ার আগেই তাকবীর বলে হাত বেঁধে ফেলে, তবে তার ইকতিদা সহীহ্ না হওয়ায় তার নামায সহীহ্ হবে না।

[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ৩:৪৪৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৩০৫]

ولا يصير شارعا بالمبتدأ فقط كالله، ولا بأكبر فقط هو المختار، فلو قال: الله مع الامام وأكبر قبله، أو أدرك الامام راكعا فقال: الله قائما وأكبر راكعا، لم يصح في الاصح، (الدر المختار للحصفكي:1 / 517)

ইমামের কিরা'আত পড়া অবস্থায় মুক্তাদীর ছানা পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব কিরা'আত পড়া অবস্থায় মুক্তাদী পূর্ণ ছানা পড়লে, নামায নষ্ট হবে কিনা বা নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ কোন মুসল্লী যদি ইমাম সাহেবকে কিরা'আত পড়া অবস্থায় পায়, আর সেই নামায যদি জাহরী কিরাআতওয়ালা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ছানা পড়া যাবে না, কারণ- জাহরী নামাযের মধ্যে ইমামের কিরা'আত শোনা ওয়াজিব। তবে আস্তে কিরা'আত ওয়ালা নামাযে ছানা পড়তে হবে। [দুররে মুখতার ১:৪৮৮]

الا اذا كان مسبوقا وامامه بجهر بالقرائة فلا يأتي به وفي الشامية ونبغي التفصيل ان الامام ان كان يجهر لا يثني وان كان يسر يثني فكان المعتمد مامشي عليه المصنف فافهم – الدر المختار 477/1

{পৃষ্ঠা-৩০৩}

মেয়েরা নামাযে জোরে কুরআন পড়া প্রসঙ্গে।

জিজ্ঞাসাঃ মেয়েরা ঘরের নিভৃতে যেখানে কোন গাইরে মাহরাম পুরুষ পৌঁছতে পারে না, সেখানে রাতে নফল নামাযে কিরা'আতে গুণগণ আওয়াজে পড়তে পারবে কি-না?

জবাবঃ এতটুকু গুণগুণ করে যদি পড়ে যে, শুধু তার কানে আওয়াজ পৌঁছে বা এক দেড় হাত দূর পর্যন্ত আওয়াজ যায় তাহলে তা জায়িয আছে। এর চেয়ে বেশী জোরে আওয়াজে যদি হয় যাতে ২/৩ হাত দূরের লোকেরা পড়ার আওয়াজ বুঝতে পারে তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, মেয়েরা ফরজ, নফল সব ধরনের নামাযে কিরা'আত আস্তে পড়বে। আর আস্তে কিরা'আত পড়ার পরিমাণ হল- সে নিজ কানে শুনবে। পার্শ্ববর্তী কেউ থাকলে সেও শুনতে পারবে।

[মাআরিফুস সুনান ৩:৪৪২, আদদুররুল মুখতার ১:৫৩৪, ৪০৬ আহকামুল কুরআন(থানভী) ৩:৪৩৫, দারুর উলূম ২:২১৯, ২৬৬]

نغمة المرأة عورة وتعلمها من القران من المرأة احب قال عليه و السلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن ان يسمعها الرجل ...... قال في الفتح وعلي هذا لو قيل اذا جهرت بالقرائة في الصلاة فسدت كان متجها – [رد المحتار 406/1]

আগরবাতি সম্মুখে জ্বালানো অবস্থায় নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ সম্মুখে আগরবাতি জ্বালানো অবস্থায় মসজিদে জামা'আতবদ্ধ হয়ে নামায আদায় করায় কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ মসজিদ অথবা অন্য যে সকল জায়গায় নামায আদায় করা বৈধ, সেখানে জামা'আতে কিংবা একাকী নামায আদায়কারীর সম্মুখে আগরবাতি, মোমবাতি বা অন্য কোন বাতি জ্বালানো অবস্থায় নামায আদায় করতে কোন ক্ষতি নেই।

তেমনিভাবে নামাযী ব্যক্তির ডানে, বামে বা পিছনে আগরবাতি বা মোমবাতি জ্বালানো থাকলেও নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদির উদ্দেশ্য থাকে সুগন্ধি ছড়ানো ও আলো দ্বারা উপকৃত হওয়া। এখানে আগুনের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা মোটেও উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং এর দ্বারা অগ্নিপূজকদের সাথে সামঞ্জস্যতা প্রকাশ পায় না। কেননা, অগ্নিপূজকরা এগুলোর পূঁজা করে না। তাই এ সুরতে নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।
[ফাতাওয়া শামীঃ ২:১৪৫, ১:২৫২ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৯:২০৫]
{পৃষ্ঠা-৩০৪}

মাকরূহের সংজ্ঞা ও হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ মাকরূহ্ কাকে বলে ? নামাযে মাকরূহ্ হলে, কি ধরনের ক্ষতি হয়?

জবাবঃ মাকরূহ্ অর্থ শরী'আতের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কাজ। মাকরূহ্ দু'প্রকার। (১) মাকরূহ্ তাহরীমী, (২) মাকরূহ্ তানযীহী। মাকরূহ্ তাহরীমী যা প্রমাণিত হয় প্রবল সম্ভাবনাময় নিষেধাজ্ঞা দ্বারা। যার অস্বীকারকারী ফাসিক বলে গণ্য হবে। ফলতঃ মাকরূহ্ তাহরীমীটি ওয়াজিবের বিপরীত। বিনা উযরে এমন কাজ করলে, আল্লাহর নিকট গুনাহগার ও শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

মাকরূহ্ তানযীহী ঐ কাজকে বলা হয়, যা না করলে সওয়াব হয়, আর করলে তিরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তবে সাংঘাতিক কোন বড় আযাবের উপযুক্ত হয় না।

আর বিনা উযরে মাকরূহ্ তাহরীমী কোন কাজ নামাযে সংঘটিত হলে, আল্লাহর দরবারে গুনাহগার এবং শাস্তির যোগ্য গণ্য করা হবে। নামাযের পরিপূর্ণ হক ও সুন্নাতের পরিপন্থী হওয়াতে নামায যথাযথভাবে আদায় হবে না। তবে এর জন্য সিজদাহ্ সাহু বা নামায দোহরানোর প্রয়োজন হবে না। এমনিভাবে সকল ইবাদতে একই হুকুম প্রযোজ্য।

المكروه في هذا الباب نوعان: احدهما ما يكره تحريما وهو المحمل عند اطلاقهم كما في زكاة الفتح وذكر انه في رتبة الواجب لا يثبت الا بما يثبت به الواجب يعني بالنهي الظني الثبوت او الدلالة فان الواجب يثبت بالامر الظني و كثيرا ما يطيقونه كما ذكره في الحلية فحينئذ اذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فان كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم الا لصارف النهي عن التحريم الي الندب وان لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغيرالجازم فهي تنزيهة قلت ويعرف ايضا بلا دليل نهي خاص بان تضمن ترك واجب او ترك سنة فالاؤل مكروها تحريما والثاني تنزيها – [رد المحتار639/1]
[ফাতাওয়া শামী, ১:৬৩৯]

পুরুষদের জন্য স্বর্ণ-রুপার অলঙ্কার পরিধান করে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ স্বর্ণালঙ্কার মহিলাদের পোষাকতুল্য। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় অনেক পুরুষ স্বর্ণের চেইন, স্বর্ণের আংটি, রুপার চেইন ইত্যাদি পরিধান করে থাকে। আবার অনেকে এগুলো পরে নামাযও আদায় করে থাকে, সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, এসব অলঙ্কারাদি পরিহিত অবস্থায় নামায আদায় করলে নামায সহীহ্ হবে কি ?

{পৃষ্ঠা-৩০৫}

জবাবঃ স্বর্ণ বা রুপার চেইন, আংটি বা অন্য যে কোন অলঙ্কার পরিধান করা পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হারাম ও কবীরা গুণাহ্। এরুপ হারাম বস্তু অথবা অন্য কোন হারাম পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করা আরো মারাত্মক অপরাধ ও গুণাহ্। এ অবস্থায় নামায আদায় করলে যদিও তা আদায় হবে, কিন্তু উক্ত কবীরা গুণাহে লিপ্ত থেকে নামায আদায়ের দরুন তা মাকরুহে তাহরীমী হবে। মাসআলা না জেনে এগুলো পড়ে থাকলে মাসআলা জানার পর অবশ্যই এগুলো খুলে ফেলা জরুরী এবং নামাযে তা পরে থাকা নিষেধ। তাই নামাযের সময় অবশ্যই এগুলো খুলে পকেটে রাখতে হবে। এগুলো পরে থাকা অবস্থায় নামায পড়লে মাকরুহ্ তাহরীমী হবে ও মারাত্মক গুনাহ্ হবে। পুরুষরা এসব অলঙ্কার নামাযে তো পরবেই না এমনকি নামাযের বাইরেও পরবে না।
[প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ, ১:৩০২ # ফাতাওয়া শামী, ১:৪০৪ # ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম, ৪:১৩৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪১৩]

নামাযের মধ্যে টুপি পরিধান করা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের মধ্যে যদি সিজদাহ্ অবস্থায় মাথা থেকে টুপি পড়ে যায়, তাহলে উভয় হাত দ্বারা টুপি উঠিয়ে পরে নিলে নামায ফাসিদ হবে কি না?

জবাবঃ টুপি যদি এক হাত দ্বারা উঠিয়ে মাথায় রাখা হয়, তাতে নামায ফাসিদ হবে না। কিন্তু যদি দু'হাত দ্বারা উঠিয়ে মাথায় পরা হয়, তবে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ, দু'হাত দ্বারা পরিধান করলে আমলে কাসীর। আর আমলে কাসীর দ্বারা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে।
[প্রমাণঃ দুঃ মুঃ ১:৬২৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪২০ # ফাতাওয়া শামী, ১:৬২৫]

হাতের কনুই পর্যন্ত খোলা রেখে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ শার্টের হাতা কনুইয়ের উপর পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নামায আদায় করলে তা সহীহ হবে কি-না?

জবাবঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে খালি মাথায় ও কনুই পর্যন্ত হাত গুটিয়ে রেখে নামায আদায় করলে মাকরুহ্ তাহরীমী হবে। উল্লেখিত পন্থায় নামাযের ফরজিয়্যাত আদায় হলেও কনুই খোলা থাকার কারণে তা মাকরুহ্ হবে। বিশেষ করে এর অভ্যস্ত হয়ে পড়লে, সেটা হবে আরো দোষণীয়।
[প্রমাণঃ সূরা আরাফ, ৩১ # মা'আরিফুল কুরআন, ৩:৫৪৪ # শামী, ১:৬৪০ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪০৬ # ফাতাওয়া রহীমিয়া, ৪:৩৭২]

টুপির হুকুম।

জিজ্ঞাসাঃ আজকাল অনেকে খালি মাথায় নামায পড়েন। সে সম্পর্কে হুকুম কি?

অনেকে শুধু নামাযের সময় মাথা ঢাকেন। নামায শেষে টুপি পকেটে নিয়ে বেরিয়ে যান। এ সুন্নাত কি শুধু নামাযের জন্যই প্রযোজ্য?

{পৃষ্ঠা-৩০৬}

জবাবঃ বিনা উযরে খালি মাথায় নামায পড়া ফুকাহায়ে কিরামগণ মাকরুহ্ লিখেছেন।

টুপি শুধু নামাযের জন্য খাস নয়, বরং সর্বদা মাথায় টুপি পরা সুন্নাত। সুতরাং নামায শেষে টুপি পকেটে রাখা সুন্নাত তরীকার পরিপন্থী।

টাই পড়ে নামায পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ অফিসে অনেক সময় টাই বাঁধা অবস্থায় অনেককে নামায পড়তে দেখা যায়। প্রশ্ন হলো–টাই পড়া অবস্থায় নামায পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি–না?

জবাবঃ টাই খৃষ্টানদের জাতীয় পোষাকের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং কোন মুসলমানদের জন্য তা পরিধান করা জায়িয নয়।

বিধর্মীদের অনুকরণে কোন পোষাক পরিধান করা সর্বাবস্থায় নাজায়িয। নামাযের সময় এমন পোষাক পরিধান করা জঘন্যতম অপরাধ। অতএব, যে ব্যক্তি এ পোষাক পরিহিত অবস্থায় যে সকল নামায পড়েছে সে নামাযগুলো মাকরূহ্ হয়েছে। তাওবা–ইস্তিগফার করা উচিত, ভবিষ্যতে এমনটি যেন না হয়। আর ঐ সকল নামায গুলো কাযা করতে পারলেই ভাল।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪২৯]

নামাযরত অবস্থায় মহিলাদের সতর ঢেকে রাখা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযরত অবস্থায় মেয়েলোকের সতরের কতটুকু অংশ এবং কতক্ষণের জন্য খোলা থাকলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে মহিলাদের মুখমন্ডল, দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ও দু'পায়ের পাতা ও আঙ্গুলগুলো খুলে গেলে কোন অসুবিধা হবে না। এসব ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের মধ্যে গণ্য। সুতরাং তা ঢেকে রাখা ফরজ। আর ফরজ তরক হলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে ফরজ তরকের ব্যাপারে বিস্তারিত ইলম থাকা দরকার। বিবরণ অনুযায়ী সতরের অন্তর্ভুক্ত কোন অঙ্গের এক চতুর্থাশেংর কম যদি অনিচ্ছাপূর্বক বা ভুলে খুলে যায় এবং তিন তাসবীহ্ বা তার চেয়ে বেশীক্ষণ খুলে থাকে, তাতেও নামায নষ্ট হবে না। কিন্তু যদি ইচ্ছাপূর্বক এক চতুর্থাংশ সতর সামান্য সময়ের জন্য কেউ খুলে রাখে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে। আর অনিচ্ছাকৃত ভুলে সতরের যে কোন অঙ্গের এক চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশী খুলে গেলে, তত্ক্ষণাৎ ঢেকে না দিলে যদি সতর খোলা অবস্থায় নামাযের রুকনসমূহ হতে কোন একটি রুকন আদায় করে অথবা সতর খোলা অবস্থায় এতটুকু সময় নামাযে রত থাকে, যে সময়ে নামাযের কোন একটি সংক্ষিপ্ত একটি রুকন আদায় করা যায়, তাহলে নামায ফাসিদ হয়ে যাবে এবং সে নামায পুনরায় পড়া জরুরী। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:৫৮–৫৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪০২]

{পৃষ্ঠা–৩০৭}

কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায আদায়।

জিজ্ঞাসাঃ কিস্তি টুপি মাথায় দিয়ে নামায পড়লে কি নামাযের কোন ক্ষতি হবে?

জবাবঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এমন টুপি পরিধান করা সুন্নাত যা মাথার সাথে মিশে থাকে। কেননা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর বাড়ীতে অবস্থানকালীন সময়ে টুপি মাথার সাথে মিশে থাকতো। অতএব, যে কোন প্রকার টুপি হোক না কেন, মাথার সাথে মিশে থাকলে এবং বিধর্মীদের সাথে সামঞ্জস্য না হলে তার দ্বারা সুন্নাত আদায় হবে এবং এর দ্বারা নামায পড়াও সহীহ্ হবে। সুতরাং কিস্তি টুপিও যেহেতু মাথার সাথে মিশে থাকে, তাই তা পরে নামায পড়লে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:১১৮]

নামাজে চোখ বন্ধ করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমি নামাযের মধ্যে অধিকাংশ সময় দাঁড়ানো এবং বসা অবস্থায় চোখ বন্ধ রাখি। কারণ-এর দ্বারা আমার নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি হয় এবং খুশু-খুজুর ব্যাপারে আমি নিশ্চিত থাকি। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এতে আমার নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি?

জবাবঃ সম্পূর্ণ নামাযে চক্ষু বন্ধ করে নামায পড়া মাকরূহে তানযীহী। তবে হ্যাঁ, যদি কেউ নামাযে একাগ্রতা সৃষ্টি করার জন্য মাঝে মধ্যে চক্ষু বন্ধ করে এবং মাঝে মাঝে খোলে, তাহলে নামায মাকরূহ্ হবে না। যেমন চক্ষু বন্ধ করে কিরা'আত পড়ে এবং রুকূতে যাওয়ার সময় চোখ খোলে, তাহলে তা জায়িয আছে। তবে সমগ্র নামাযে চক্ষু বন্ধ রাখা যাবে না। মাঝে মধ্যে খুলতে হবে। নতুবা সুন্নাতের পরিপন্থী হওয়ার দরুন মাকরূহ্ হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:১০৯]

وتكره تغميض عينيه للنهي الا لكمال الخشوع- [الدر المختار 645/1]

الا لكمال الخشوع بان خاف فوت الخشوع بسبب رؤية مايفرق الخاطر فلا يكره بل قال بعض العلماء انه الاولي- [رد المحتار 645/1]

সিজদায়ে সাহু ও সিজদায়ে তিলাওয়াত

প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়ে ফেললে।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মুক্তাদী জামা'আতে ৪ রাক'আত ফরয পড়ার সময় প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়েছে। এমতাবস্থায় তার নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৩০৮}

জবাবঃ তার নামায সহীহ্ হয়ে যাবে। ইমামের সাথে ভুল হওয়ার কারণে সাহু সিজদা করতে হবে না। [হিদায়া ১:১৫৯]

فان سهي المؤتم لم يلزم الامام و لا المؤتم السجود – [الهداية 159/1]

নামাযে সূরা মিলানো।

জিজ্ঞাসাঃ আমি জামে মসজিদের ইমাম। আমি মুসল্লীদেরকে নিয়ে একবার ফরজ নামায আদায় করি। কিন্তু প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর অন্য কোন সূরা মিলানো ব্যতীত রুকূতে চলে যাই, অতঃপর নামায শেষ করার পূর্বে সিজদায়ে সাহু আদায় করে নামায শেষ করি। এখন আমার প্রশ্ন নামায পরিপূর্ণ হল কি-না? না আবার দ্বিতীয় বার নামায পড়তে হবে?

জবাবঃ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা তিন আয়াত পরিমাণ মিলানো ওয়াজিব। আর ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে তার পরিবর্তে সিজদায়ে সাহু দিলে নামায আদায় হয়ে যায়। সুতরাং আপনার নামায সহীহ্ হয়েছে। দ্বিতীয় বার পড়তে হবে না।

[হিদায়াঃ ১:১০৪, ১৫৬ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১২৬ # দারুল উলূম ৪:৩৯৯, ৪১৩]

সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও সিজদা করা।

জিজ্ঞাসাঃ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও সিজদায়ে সাহু করলে, নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না?

জবাবঃ নামাযের ভিতর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব না হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ খামাখা ইচ্ছাকৃত ভাবে সিজদায়ে সাহু করে, তাহলে তার নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। তবে যদি কেউ এ ধারণার উপর সিজদায়ে সাহু করে যে, তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে অথচ বাস্তবে এরূপ ভুলের কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয় না, তাহলে তার নামায মাকরূহ্ হবে না। বরং মনের সন্দেহ দূরীভূত করতে এমতাবস্থায় সিজদায়ে সাহু করাটাই উত্তম।

ومما لا ينبغي اغفاله انه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري او بني علي الاقل – [عالمكيري 131/1]

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ১:৫৯৯]

চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে ইমামের সাথে এক রাকা'আত পেয়ে অবশিষ্ট নামাযের প্রথম রাকা'আতে না বসলে।

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি চার রাক'আতওয়ালা ফরজ নামাযে ইমামের সাথে এক রাক'আত পেল। অতঃপর ইমামের সালাম ফিরানোর পরে সে এক রাক'আত পড়ে বসতে ভুলে গিয়ে তার পরের রাক'আত পড়ে ইচ্ছা করে না বসে বাকী নামায শেষ করে সাহু সিজদাহ্ দিয়েছে । এমতাবস্থায় তার নামায হবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৩০৯}

জবাবঃ হ্যাঁ, এমতাবস্থায় তার নামায হয়ে যাবে। কারণ প্রথম বৈঠক তরক হয়েছে যা ওয়াজিব ছিল। পরে সাহু সিজদার দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেছে। তবে এক রাকা'আত পড়ে না বসা সত্ত্বেও ঐ ব্যক্তি যদি পরের রাক'আতে ইচ্ছা করে বৈঠক করতেন তাহলে সিজদায়ে সাহু ছাড়াই নামায সহীহ্ হতো।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৩৮৩ # ফাতাওয়া শামী, ১:৫৯৭ # আদদুররুল মুখতার ১:৫৯৬]

ويقضي أول صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط. (الدر المختار للحصفكي:1 / 596)

শেষ বৈঠক না করে ভুলে দাড়িয়ে গেলে বা তৃতীয় রাকা'আতে বসে গেলে সিজদাহ সাহু করা।

জিজ্ঞাসাঃ (ক) যদি কেউ নামাযে আখেরী বৈঠক না করে ভুলে দাঁড়িয়ে যায় এবং সিজদা করার পূর্ব মুহূর্তে স্মরণে আসায় বসে সাহু সিজদা করে তাহলে তার নামায হবে কি-না?

(খ) জামা'আতে ইমাম সাহেব তৃতীয় রাক'আতে বসে যায়, মুক্তাদীর লোকমা দেওয়ার কারণে ৪র্থ রাকাআতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে কি-না?

(গ) অনাবশ্যক সিজদায়ে সাহু করলে নামাযে কোন ত্রুটি হবে কি-না?

জবাবঃ (ক) বর্ণিত অবস্থায় নামায হয়ে যাবে। তবে তাশাহহুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তার পর ডান দিকে সালাম দিয়ে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। তারপর আবার আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাতে হবে।

(খ) চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে ইমাম তৃতীয় রাক'আতে ভুলে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ সময় বসে থাকলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে। আর যদি তার চেয়ে কম সময় বসে থাকে তা হলে সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

(গ) প্রয়োজন ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে সিজদায়ে সাহু করা মাকরূহ্। তবে কোন ভুল হওয়ায় সেক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু আসে কি-না তা সঠিকভাবে জানা না থাকলে সতর্কতা হিসেবে সাহু সিজদাহ্ করা যাবে।
[প্রমাণ: হালবী কাবীর, ৪৬২ # দারুল উলূম ৪:৪১৫ # শামী, ৪৬৯ # ফিকহী মাকালাত, ২:৩১]

وان سهى عن القعدة الاخيرة..... ويسجد للسهو لتأخير القعدة وبقي من الواجبات اتيان كل واجب او فرض في محله. (الدر المختار:469/1)

{পৃষ্ঠা-৩১০}

নিঃশব্দ কিরা'আতের স্থলে স্বশব্দে আর স্বশব্দের স্থলে নিঃশব্দে কিরা'আত পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ যোহর এবং আসরের নামাযে ইমাম সাহেব সাহেব যদি শুধু আলহামদু জোরে পড়ে তাহলে কি সাহু সিজদাহ্ ওয়াজিব হবে?

মাগরিব বা ইশায় ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে সূরা ফাতিহা পড়ে ফেলেছেন। এখন মনে হলে যে পর্যন্ত পড়া হয়েছে সেখান থেকে জোরে পড়বে? না কি শুরু থেকে পড়বে? এবং সাহু সিজদা কি ওয়াজিব হবে?

জবাবঃ কোন ব্যক্তি আস্তে কিরা'আতওয়ালা নামাযে যদি এ পরিমাণ কিরা'আত জোরে পড়ে, যার দ্বারা কিরা'আত ফরজ আদায় হয়ে যায় অর্থাৎ কমপক্ষে ছোট ছোট তিন আয়াত বা ৩০ (ত্রিশ) হরফ। তেমনি ভাবে জোরে কিরা'আতের জায়গায় এতটুকু পরিমাণ আস্তে পড়লে সিজদায় সাহু ওয়াজিব হবে, অন্যথায় হবে না ।

যোহর এবং আসরের নামাযে শুধু আলহামদু শব্দটি যদি কেউ জোরে পড়ে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

আর আস্তের জায়গায় জোরে পড়তে থাকলে মনে হওয়ার পর যতটুকু জোরে পড়েছে এরপর থেকে আস্তে পড়বে।

তেমনিভাবে কিরা'আত জোরের জায়গায় আস্তে পড়তে থাকলে সেখানে মনে পড়বে সেখান থেকে জোরে পড়বে একেবারে শুরু থেকে পড়বে না।
[প্রমাণঃ বুখারী শরীফ, ১:১০৭ # আদদুররুল মুখতার, ২:৮১ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১২৮ # আল বাহরুর রায়িক, ২:৯৬]

ومنها الجهر والاخفاء حتى لو جهر فيما يخافت او خافت فيما يجهر وجب عليه سجود السهو . (الفتاوى الهندية:128/1)

প্রথম বৈঠকে যে পরিমান দরূদ পড়লে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

জিজ্ঞাসাঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে যদি ১ম বৈঠকে তাশাহহুদ অর্থাৎ 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়া শুরু করে, তাহলে কতটুকু পরিমাণ পড়লে, সিজদাহ্ সাহু ওয়াজিব হবে? এবং কতটুকু পরিমাণ পড়লে, ওয়াজিব হবে না?

জবাবঃ ফরজ, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাতে মু'আক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর "আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদ" পর্যন্ত পড়লেই সাহু সিজদাহ ওয়াজিব হয়ে যাবে। আর এর চেয়ে কম পড়লে, সাহু সিজাদাহ্ ওয়াজিব হবে না।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:৩০]

{পৃষ্ঠা-৩১১}

ভুলবশতঃ কোন রাকা'আতে এক সিজদা করলে।

জিজ্ঞাসাঃ কোন নামাযী ব্যক্তি ভুলবশতঃ নামাযের কোন রাকা'আতে এক সিজদাহ্ করে দাঁড়িয়ে যায় এবং পরবর্তী রাকা'আতে তার এ বিষয়টি স্মরণ হয়। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির করণীয় কি?

জবাবঃ পূর্ব রাক'আতের ছুটে যাওয়া সিজদার কথা স্মরণ হওয়ার বিভিন্ন রূপ হতে পারে– যার বিশ্লেষণ নিরূপঃ

যদি তা নামাযের কোন রুকন যথা রুকু বা সিজদায় স্মরণ হয়, তাহলে সে অবস্থায়ই স্মরণ হওয়া মাত্র পূর্ববর্তী রাক'আতের সিজদাহ্ আদায় করে নিবে। পরে উক্ত রুকনকে দোহরিয়ে নেয়া মুস্তাহাব। তবে শেষে সিজদায়ে সাহু করে নিতে হবে।

আর যদি এ বিষয়টি তার নামাযের সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হয় এবং সে নামায ফাসিদ হওয়ার মত কোন কাজ না করে থাকে, তাহলে সে উক্ত অবস্থায়ই ভুলবশতঃ ছুটে যাওয়া সিজদাহ্ আদায় করে নিবে। অতঃপর তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে সাহু করে নিবে। অতঃপর তাশাহহুদ, দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে নামায শেষ করবে।

আর যদি সালাম ফিরানোর পর অন্যের সাথে কোন কথাবার্তা বলে থাকে, অথবা নামায ভঙ্গ হওয়ার মত কোন কাজ করে থাকে, তাহলে উক্ত নামাযে আর ছুটে যাওয়া সিজদাহ্ আদায় করার কোন সুযোগ নেই। বরং তখন ঐ নামায সম্পূর্ণ দোহরিয়ে পড়া জরুরী।

[প্রমাণঃ রুদ্দুল মুহতার, ১:৪৬৩ # আল বাহরুর রায়িক, ২:৯৪ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ২:২২২]

حتى لو نسي سجدة من الاولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لانه يبطل بالعود الى الصلبية التلاوة.

নামাজের রুকূ বা সিজদার মধ্যেই তিলাওয়াতে সিজদাহ্ আদায় করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ইশার জামা'আতে প্রথম রাকা'আতে সূরা 'আলাক সম্পূর্ণ পাঠ করেন– যার শেষে তিলাওয়াতে সিজদার আয়াত ছিল। কিন্তু সাধারণ ভাবেই নামায আদায় করলেন। নামায শুরুর পূর্বে বা শেষ করে তিনি কিছুই বলেননি। প্রশ্নোত্তরে ইমাম সাহেব জানালেন যে, ইমামের নিয়তেই সকলের ওয়াজিব সিজদা আদায় হয়ে গেছে, সকলের নিয়ত করার প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, নামাযের মধ্যে সিজদায়ে তিলাওয়াতের আয়াত যদি শেষ আয়াত হয়, তবে রুকুতে যাবার সময় তিলাওয়াতে সিজদার নিয়ত করে নিলে, ওয়াজিব সিজদাহ্ আদায় হয়ে যায়। এখন আমার প্রশ্ন,

{পৃষ্ঠা–৩১২}

আমাদের সকলের ওয়াজিব সিজদাহ্ কি আদায় হয়ে গেছে। তদুপরি মাসবূক পার্শ্ববর্তী রাস্তার পথচারী কেউ যদি নামাযের বাইরে ঐ আয়াত শ্রবণ করে থাকেন, তাহলে তাদের করণীয় কি? ইমাম সাহেবের অভিমত, তিলাওয়াতে সিজদার মাসআলা যাদের জানা নেই, তাদের জন্য সিজদাহ্ করা কোন অবস্থাতেই ওয়াজিব নয়। তাহলে কারো যদি শরী'আতের বিধান জানা না থাকে, তার উপর শরী'আতের বিধান মানার কি কোন বাধ্যবাধকতা নেই?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে আয়াতে সিজদাহ্ তিলাওয়াত করার সাথে সাথেই অথবা দুই তিন আয়াত তিলাওয়াত করার পর যদি রুকূ করে এবং রুকূতে সিজদায়ে তিলাওয়াতের নিয়ত করে, তাহলে রুকূর মধ্যেই সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যাবে। তবে ইমাম ও মুক্তাদী সকলেরই নিয়ত করা জরুরী। শুধু ইমামের নিয়তের দ্বারা মুক্তাদীদের সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হবে না।

বরং মুক্তদীগণকেও নিয়ত করতে হবে। প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে ইমাম যদি রুকূতে নিয়ত করে থাকেন, তাহলে শুধু তার সিজদাহ্ আদায় হয়েছে। আর মুক্তাদীগণের মধ্যে যারা নিয়ত করেছেন তাদেরও আদায় হয়ে গেছে। কিন্তু যারা নিয়ত করেননি, তাদের সিজদাহ্ আদায় হয়নি। আর যদি ইমাম সাহেব রুকূতে নিয়ত না করে থাকেন, তাহলে সিজদার মধ্যে নিয়ত ছাড়াই সকলের সিজদায়ে তিলওয়াত আদায় হয়ে গেছে। মুসল্লীদের যেহেতু নিয়তের মাসআলা জানা থাকে না, এ কারণে ইমামের জন্য রুকূতে নিয়ত না করা উচিত।

মাসবূক বা যে ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে হেটে যায়, সে যদি কোন নামাযীর আয়াতে তিলাওয়াত শুনে, তাহলে তাদের উপরও সিজদাহ্ করা ওয়াজিব, তবে ইমাম যে রাকা'আতে আয়াতে সিজদাহ্ তিলাওয়াত করেছে, ঐ রাক'আতে যদি মাসবূক শরীক হয়ে যায় তাহলে ইমামের সাথে মাসবূকও সিজদাহ্ করে নিবে। আর ইমামের সিজদাহ্ করার পরে শরীক হলে, নামাযের মধ্যে সিজদাহ্ করবে না, বরং নামাযের পরে সিজদাহ্ আদায় করে নিবে। এমনিভাবে রাস্তায় অতিক্রমকারীর উযর না থাকলে, সঙ্গে সঙ্গেই সিজদাহ্ আদায় করে নিবে। অসুবিধা থাকলে, পরে সুযোগমত আদায় করে নিবে। উল্লেখ্য, ইমাম সাহেবের অভিমতটি এক্ষেত্রে সঠিক নয়।

[আদদুররুল মুখতার ২:১১১]

وتؤدي بركوع صلاة اذا كان الركوع على الفور من قراءة آية او آيتين وكذا الثلاث على الظاهر كما في البحر ان نواه اي كون الركوع لسجود التلاوة على الراجح وتودى بسجودها كذالك اي على الفور وان لم ينو بالاجماع ولو نواها في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزه. (الدر المختار:111/2)

{পৃষ্ঠা-৩১৩}

স্মরণ থাকা অবস্থায় ওয়াজিব তরক করা।

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি, নামাযের কোন ওয়াজিব ভুলক্রমে ছুটে গেলে সাহু সিজদা করলেই নামায সহীহ্ হয়ে যায়। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে নামায হয় না। একদল মুসল্লী বিতর নামায দু'রাকা'আত পড়ার পর বৈঠক না করে সরাসরি তিন রাকা'আত পড়ে সাহু সিজদাহ্ না করে নামায শেষ করেন। এমতাবস্থায় তাদের নামায সহীহ্ হল কি-না?

জবাবঃ নামাযে প্রথম বৈঠক করা ওয়াজিব। যেহেতু তাঁরা প্রথম বৈঠক করেননি, তাই ওয়াজিব তরক হয়েছে বিধায় নামায হয়নি। কারণ, ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তরক করলে সাহু সিজদা করলেও নামায হয় না। আর ভুলে ওয়াজিব ছুটে গেলে, সাহু সিজদা আদায় করতে হয়। তারা তা করেননি।

[প্রমাণঃ শরহে বেকায়া, ১:১৪২]

وتجب القعدة الاولى فدر التشهد اذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية في ذوات الاربع والثلاث هو الاصح. (عالمكيري: 71/1)

সালাম ফিরানোর পর রাকা'আত বা কুনূতের ব্যপারে সন্দেহ হলে।

জিজ্ঞাসাঃ সালাম ফিরানোর পরে যদি সন্দেহ হয়, কত রাকা'আত পড়েছি, এখন কি করতে হবে? যদি মনে হয় চার রাকা'আতের স্থলে তিন রাকা'আত পড়েছি। তেমনিভাবে বিতর নামাযে তাশাহ্হুদ, দরূদ ও দো'আয়ে মাসূরা শেষ করার পর সন্দেহ হল- দু'আয়ে কুনূত পড়েছি কি-না? তাহলে কি করতে হবে?

জবাবঃ সালাম ফিরানোর পরে যদি সন্দেহ হয়-কত রাকা'আত পড়েছি, তাহলে শরী'আতের বিধান হল- তাহাররী করবে। অর্থাৎ, মনের সাথে বুঝাপড়া করে বাস্তব উদঘাটন করতে চেষ্টা

করবে। তারপর যেদিকে প্রবল ধারণা হয়, তাকেই প্রাধান্য দিবে। আর যদি উভয় দিক সমান হয়, তাহলে কম রাকা'আতকে মেনে নিয়ে বাকী নামায সম্পূর্ণ করবে। আর বিতরের নামায শেষ করার পূর্বে যদি সন্দেহ হয় দু'আয়ে কুনূত পড়েছি কি-না, তাহলে সিজদায়ে সাহু করে নিবে।
[প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন, ৩৬৮]

انه يجب سجود السهو في جميع صور الشك سواء عمل بالتحري او بنى على الاقل. (الفتاوى الهندية:131/1)
وان كثر شكه تحرى واخذ باكبر رأيه وان لم يترجح يبني على الاقل. (عالمكيري:131/1)
{পৃষ্ঠা-৩১৪}

সিজদায়ে তিলাওয়াত

একাধিক তিলাওয়াতে সিজদাহ্ বিলম্বে একসাথে আদায় করা।

জিজ্ঞাসাঃ তিলাওয়াতে সিজদাহ্ যদি ৩/৪ টা একসাথে দেয়া হয়, তাতে কি কোন ক্ষতি আছে? নাকি যথাসময়ে সিজদাহ্ দিয়ে আবার তিলাওয়াত শুরু করতে হবে? আর যদি ভুলে না দেয়া হয় তাহলে কি গুনাহ্ হবে?

জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সিজদায়ে তিলাওয়াত পূর্ণ কুরআনে ১৪টি জায়গায় আছে। এর কোন একটি আয়াত পড়লে বা শুনলে, সাথে সাথে সিজদাহ্ করে নেয়া উত্তম। তবে সবগুলো বা তিন চার স্থান পড়ে এক সঙ্গে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা সিজদাহ্ করলেও সিজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে। সিজদায়ে তিলাওয়াতের আয়াত পড়ার পর তিলাওয়াত বন্ধ করে সিজদাহ্ দিয়ে পুনরায় পড়া শুরু করতে পারে বা ঐ সময়ের তিলাওয়াত শেষে সিজদাহ্ করতে পারে। সিজদার কথা ভুলে গেলে, যখন স্মরণ হবে, তখনই আদায় করে নিবে।
[প্রমাণঃ শরহে বেকায়া, ১৯৩]

وهي على التراخي على المختار ويكره تأخيرها تنزيها ويكفيه ان يسجد عدد ما عليه بلا تعيين ويكون مؤديا. (الدر المختار:109/2)

নামাযের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদাহ্ না করা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাজের মধ্যে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদাহ্ না করলে, নামায শেষে আদায় করে নিলে নামায সহীহ্ হবে কি-না?

জবাবঃ সিজ দার আয়াত তিলাওয়াত করলে, তার নিয়ম হল- সাথে সাথে সিজদাহ্ করে নেয়া। চাই নামাযের ভিতরে হোক, বা নামাযের বাইরে।

কিন্তু নামাযের মধ্যে তিলাওয়াতের সিজদাহ্ আদায় না করে, নামায শেষে আদায় করে নিলে, সিজদাহ্ আদায় হবে না, বরং গুণাহগার হবে। তাওবা-ইস্তেগফার ব্যতীত মাফের অন্য কোন সুরত নেই। অবশ্য নামাযের বাইরে তাত্ক্ষণিক সিজদা না করে থাকলে, পরবর্তীতে আদায় করার সুযোগ থাকবে। তবে অযথা দেরী করা অনুচিত। উল্লেখ্য, নামাযে সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের পর তিন আয়াতের কমে রাকাআত শেষ হলে ঐ রাকা'আতের সিজদার সহিত তিলাওয়াতের সিজদাও আদায় হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ২:১০৯-১১২ # ইমদাদুল ফাতাওয়া জাদীদ, ১:৫৫৪ # মাহমূদিয়া, ২:৩৬৩, ৫৭১ # বেহেশতী জেওর, ২:৪৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:৬৮]

وتؤدى بسجودها كذلك اي الفور وان لم ينو بالاجماع. (الدر المختار:112/2)
وان لم تكن صلوية فعلى الفور لصيرورتها جزاء منها ويأثم بتأخيرها. (الدر المختار:109/2)
{পৃষ্ঠা-৩১৫}

সূরায়ে সোয়াদ-এ সিজদাহ্।

জিজ্ঞাসাঃ সূরা সোয়াদ-এর চব্বিশ নং আয়াতে সিজদাহ্ করতে হবে? না পঁচিশ নং আয়াতে সিজদাহ্ করতে হবে?

জবাবঃ এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত হল, সূরা সোয়াদ-এর চব্বিশ নং আয়াত শেষে অর্থাত اناب পর্যন্ত তিলাওয়াত করার পর সিজদাহ্ না করে পঁচিশ নং আয়াত শেষে অর্থাৎ حسن ماب পর্যন্ত তিলাওয়াত করে সিজদাহ্ করা উত্তম এবং এতে সতর্কতাও রয়েছে। কেননা, যদি পূর্বের আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদাহ্ করা হয়, আর বাস্তবে সেই আয়াতে সিজদাহ্ না হয়ে তার পরবর্তী আয়াতে সিজদাহ্ হয়ে থাকে, তাহলে প্রথম আয়াতে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করায় উক্ত সিজদাহ্ আদায় হবে না।

কিন্তু পরের আয়াত পড়ে যদি সিজদাহ্ করা হয়, আর বাস্তবে সেই আয়াতে সিজদাহ্ না হয়ে তার পূর্বের আয়াতে সিজদাহ্ হয়ে থাকে, তাহলেও সিজদাহ্ আদায় হয়ে যাবে। কারণ, সিজদার আয়াত তিলাওয়াতের এক দুই আয়াত পর সিজদাহ্ করলেও সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু সিজদার আয়াতের পূর্বে সিজদাহ্ করলে সে সিজদাহ্ আদায় হয় না। সুতরাং পরের আয়াতে সিজদাহ্ করাই উত্তম।

কিন্তু বাজারের অধিকাংশ কুরআন শরীফে পূর্বের আয়াতে যে সিজদাহ্ লেখা আছে এটা ঠিক হয়নি। প্রকাশকরা ভুল করেছেন। এটার সংশোধন হওয়া জরুরী।

[প্রমাণঃ শামীঃ ২:১০৩ # কিফায়াতুল মুফতী ৩:৩৬৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৬৮ # মারাকিল ফালাহঃ ৩৯৩]

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى وفي ص عند "وحسن مآب" وهو اولى من قول الزيلعي عند اناب. (الدر المختار:103/2)

প্রথম বৈঠক তরক করলে।

জিজ্ঞাসাঃ আসরের নামায জামা'আত সহ পড়ার সময় ইমাম সাহেব ১ম বৈঠক না করে দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুক্তাদীরা লোকমা দিলে ইমাম সাহেব পুনরায় বসে আত্তাহিয়্যাতু পড়েন এবং সিজদায়ে সাহু সহ নামায শেষ করেন। অতঃপর ঘোষণা করেন- নামায ফাসিদ হয়ে গেছে এবং নামায দোহরিয়ে পড়তে হবে। কারণ হিসেবে বলেন, দাঁড়ানো ফরজ, আর বৈঠক করা ওয়াজিব। ফরজ থেকে ওয়াজিবের দিকে ফিরে আসায় নামায ফাসিদ হয়ে গেছে, পুনরায় পড়তে হবে। পরে আমরা নামায দোহরিয়ে পড়লাম। কিছু নতুন মুসল্লী পরে ২য় জামা'আতে শরীক হয়েছেন। এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের নামায হয়েছে কি-না? যারা দ্বিতীয় জামা'আতে শরীক হলেন, তাদের নামায হয়েছে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৩১৬}

জবাবঃ প্রথম জামা'আতের সকলের নামাযই শুদ্ধ হয়েছে। কেননা ইমাম যখন সোজা দাঁড়িয়ে গেছেন, তখন নিয়মানুযায়ী মুক্তাদীর লুকমা দেয়া ঠিক হয় নাই। আর ইমামের জন্য ফিরে এসে বসাও ঠিক হয়নি। বরং ঐ অবস্থায় নামায শেষ করে সিজদায়ে সাহু করা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নিয়ম বহির্ভূতভাবে বসে যাওয়া সত্ত্বেও নামায নষ্ট হয়নি। ফাতাওয়া এটার উপরেই। কারণ এতে

ফরজ দেরী হলেও ফরজ তরক হয়নি। সুতরাং নামায বাতিল হওয়ার ঘোষণা দিয়ে দ্বিতীয়বার জামা'আত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তাদের নামাযতো হয়ে গেছে। তাই দ্বিতীয় জামা'আত তাদের জন্য নফল গণ্য হবে। আর আসরের পরে নফল না থাকায় তাদের এ নামায মাকরূহ্ হবে। এখন এই দ্বিতীয় জামা'আতের সময় নতুন কোন মুসল্লী শরীক হয়ে থাকলে, তার নামায সহীহ্ হয়নি। এজন্য যে, ইমামের ফরজ নামাযতো আগেই আদায় হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয় জামা'আত তার জন্য এবং প্রথম জামা'আতের মুসল্লীদের জন্য নফল গণ্য হচ্ছে। আর নফল পড়নেওয়ালার পিছনে ফরজ নামাযের ইকতিদা সহীহ্ নয়। তাই শুধু দ্বিতীয় জামা'আতে যারা শরীক হয়েছে, তাদের ঐ ওয়াক্তের নামায কাযা করতে হবে।
[আল-বাহরুর রায়িক ২:১০০, ১০১ # আদদুররুল মুখতার, ২:৮৩ # বেহেশতী জেওর, ২:৩৮]

সুন্নাতে মু'আক্কাদা নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ ও দোয়া পড়ে ফেললে।

জিজ্ঞাসাঃ যোহর অথবা অন্য যে কোন ওয়াক্তের চার রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাত নামাযের দুই রাকা'আতের পর তাশাহহুদ দরূদ ও দু'আয়ে মাসূরা পর্যন্ত পড়ে ফেললে সাহু সিজদাহ্ দিতে হবে কি-না?

জবাবঃ যোহরের পূর্বে কিংবা জুমু'আর পূর্বের ৪ রাকা'আত বিশিষ্ট সুন্নাতে মু'আক্কাদা নামাযে প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ না পড়া চাই। ভুলবশতঃ পড়লে সাহু সিজদাহ্ দিতে হবে। উল্লেখ্য, জুমু'আর নামাযের পরের চার রাকা'আত সুন্নাত নামাযে প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়তে হবে কি-না, এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। তবে ভুলে এ নামাযে প্রথম বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়ে ফেললে সাহু সিজদাহ্ দিতে হবে না। [প্রমাণঃ আলমগীরী, ১:১১৩ # দুররে মুখতার, ২:১৬ # রহীমিয়া, ১:১৯০]

১ম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ ও দু'আ পড়া।

জিজ্ঞাসাঃ চার রাকা'আতওয়ালা ফরজ ও সুন্নাত নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পরে দরূদ শরীফ দু'আয়ে মাসূরা ইত্যাদি পড়তে হবে কি-না?

জবাবঃ নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার গ্রন্থাদিতে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মু'আক্কাদাহ্ নামাযের প্রথম বৈঠকে শুধুমাত্র তাশাহহুদ পড়ার নির্দেশই বিধৃত হয়েছে। দরূদ শরীফ, দূ'আয়ে মাসূরা ইত্যাদি পড়া যাবে না বলে
{পৃষ্ঠা-৩১৭}
স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তবে সুন্নাতে গাইরে-মু'আক্কাদাহ্ যেমন- আসর ও ইশার পূর্বে দু'রাকা'আত বা চার রাকা'আত সুন্নাতে গাইরে-মু'আক্কাদাহ পড়ার জন্য উম্মতকে উত্সাহিত করা হয়েছে। উক্ত চার রাকা'আতওয়ালা নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ ও দু'আয়ে মাসূরা পড়ে শুধু সালাম বাকী রেখে দাঁড়িয়ে যাবে। অতঃপর পুনঃ ছানা আউযুবিল্লাহ্ পড়ে পরবর্তী দু'রাকা'আত আদায় করবে।

[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার, ২:১৬-১৮ # আল-বাহরুর রায়িক, ১:৩২৭ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:২৩১ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৪৯০ # মাজমুআতুল ফাতাওয়া, ১:২৩৭]

নামাযে সূরা ফাতিহার স্থানে তাশহহুদ পড়া বা এর উল্টোটা করা।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের মধ্যে যদি কেউ সূরা ফাতিহার স্থানে তাশাহহুদ পড়ে, অথবা তাশাহহুদের স্থানে সূরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না?

জবাবঃ সূরা ফাতিহার স্থানে তাশাহহুদ পড়ার দরুন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে যদি কেউ তাশাহহুদের স্থানে সূরা ফাতিহা পড়ে, তাহলে তার উপরে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য, যদি কেউ সূরায়ে ফাতিহা পড়ার পর সূরা মিলানোর স্থানে তাশাহহুদ পড়ে, তাহলে ওয়াজিব শুরু করতে বিলম্ব হওয়ায় সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। তবে যদি কেউ তাশাহহুদ পড়ার পর দরূদ শরীফ পড়ার পূর্বে সূরায়ে ফাতিহা পড়ে, তাহলে তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১:১২৭]

নামাযে সূরায়ে ফাতিহা দোহরিয়ে পড়লে সিজদায়ে সাহু।

জিজ্ঞাসাঃ নামাযে সূরা ফাতিহা বা সূরা ফাতিহার কোন আয়াত দোহরিয়ে পড়লে কি সাহু সিজদা দিতে হবে?

জবাবঃ নামাযে ভুলবশতঃ সূরা ফাতিহা দোহরিয়ে পড়লে, সাহু সিজদা দিতে হবে। অবশ্য যদি সূরা ফাতিহার কোন এক আয়াত দোহরিয়ে পড়ে, তাহলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪:৩৯৬, ৪০৬]

মুনাজাত

ফরজ নামাযের পর মুনাজাত।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে যে মুনাজাত করা হয়,
শরী'আতে এর কোন প্রমাণ আছে কি? অনেকে বলেছেন-'নামাযের পর মুনাজাত বলতে কিছু নেই। অতএব, তা বিদ'আত- এ ব্যাপারে শরী'আতের সঠিক ফয়সালা কি?

{পৃষ্ঠা-৩১৮}

জবাবঃ নামাযের পর বা ফরজ নামাযের জামা'আতের পর আমাদের দেশে যে মুনাজাত প্রচলিত আছে তা মুস্তাহাব আমল; বিদ'আত নয়। কারণ- বিদ'আত বলা হয় ঐ আমলকে, শরী'আতে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ উক্ত 'মুনাজাত' নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত দ্বারা প্রমাণিত। তাই যারা মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করেন, তারা ভুলের মধ্যে রয়েছেন; আর যারা ইমাম মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাতকে সর্ব অবস্থায় বিদ'আত বলেন, তাদের দাবীও ভিত্তিহীন এবং মুনাজাতকে যারা জরুরী মনে করে এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন এবং কেউ না করলে তাকে কটাক্ষ করেন, গালি দেন, তারাও ভুলের মধ্যে আছেন।

বিশ্লেষণঃ নামাযের পরের মুনাজাতকে সর্বপ্রথম যিনি ভিত্তিহীন ও বিদ'আত বলে দাবী তুলেছিলেন, তিনি হলেন-হাম্বলী মতাবলম্বী আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ)। পরে তদীয় ছাত্র আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর অনুসরণ করেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়্যা ও হাফিজ ইবনুল কায়্যিম (রহঃ) দাবী করেন যে, নামাযের পর মুনাজাত করার কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীসে নেই। যে সব রেওয়ায়েতে নামাযের পর দু'আ করার কথা আছে, এর অর্থ হচ্ছে-সালামের পূর্বের দু'আয়ে মা'সূরা।

তাদের এ ভিত্তিহীন দাবীর খন্ডনে আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী শারেহে বুখারী (রহঃ) বলেন, 'ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণের দাবী সঠিক নয়'। কারণ- বহু সহীহ্ হাদীসে সালামের

পর দু'আ করার স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। আর হাদীসে যে নামাযের শেষে দু'আ করার কথা আছে, তার অর্থ সালামের পূর্বের দু'আয়ে মাসূরা নয়। বরং নিঃসন্দেহে তা সালামের পরের দু'আ। [দেখুন ফাতহুল বারী, ২:৩৩৫ পৃঃ, ফতহুল মুলহিম, ২:১৭৬ পৃঃ]

এমনিভাবে ইবনুল কাইয়্যিম ও তাঁর উস্তাদের উক্ত দাবীর প্রতিবাদ করে আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– "ইবনুল কাইয়্যিম প্রমুখগণ নামাযের পরের দু'আকে অস্বীকার করে তত্সম্পর্কিত হাদীস সমূহকে সালামের পূর্বের দু'আয়ে মা'সূরা বলে বুঝাতে চেয়েছেন বটে কিন্তু তাঁদের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ– অনেক সুস্পষ্ট হাদীস তাদের এ ব্যাখ্যা বিরুদ্ধে বিদ্যমান। সুতরাং তাঁদের এ হাদীস বিরোধী ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়।"
[ইলাউস সুনান ৩:১৫৯ পৃঃ]

যারা নামাযের পরের মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করেন, তাদের জবাবে উল্লেখিত উদ্ধৃতিদ্বয়ই যথেষ্ট।
আর যারা বলেন যে, 'নামাযের পর একাকী মুনাজাত করা যায়; কিন্তু ইমাম ও মুক্তাদীগণের জন্য সম্মিলিত মুনাজাত করা বিদ'আত; তাদের এ দাবীর স্বপক্ষে যেহেতু কোন মজবুত দলীল বিদ্যমান নেই, তাই তাদের এ দাবীও গ্রহণীয় নয়।
{পৃষ্ঠা-৩১৯}

'নামাযের পর মুনাজাত প্রসঙ্গে হাদীসসমূহ ব্যাপকতা সম্পন্ন। এ হাদীস সমূহে মুনাজাতের কোন ক্ষেত্র বিশেষের উল্লেখ নেই। অতএব হাদীস সমূহের ব্যাপকতার ভিত্তিতে নামাযের পর সর্বক্ষেত্রের মুনাজাতই মুস্তাহাব বলে বিবেচিত হবে। মূলভিত্তি সহীহ্ হাদীসে বিদ্যমান থাকার পর বিদ'আতের প্রশ্নই উঠে না।
[ফাইযুল বারী ২:৪৩১]

হাদীসে সম্মিলিত মুনাজাতের গুরুত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। ফিকহের কিতাবসমূহেও ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত প্রচলিত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। অসংখ্য হাদীস বিশারদগণের রায়ও ইজতিমায়ী মুনাজাতের স্বপক্ষে স্পষ্ট বিদ্যমান। এমতাবস্থায় প্রচলিত মুনাজাতকে এ বিদ'আত বলা ঠিক নয়। নিম্নে মুনাজাতের স্বপক্ষের হাদীস সমূহ ফিকহের কিতাব সমূহের বর্ণনা এবং হাদীস বিশারদগণের রায় সম্বলিত দলীল সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলঃ

মুনাজাতের স্বপক্ষে হাদীসের দলীলঃ

হাদীস– ১ : [ফরয নামাযের পর মুনাজাত]

হযরত আবূ উমামা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করা হল-কোন সময়ে দু'আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা? রাসূলে আকবার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, 'শেষ রাত্রে এবং ফরজ নামাযের পরে।'
(জামি'য়ে তিরমিযী ২:১৮৭)

হাদীস– ২ : হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন তুমি ফরয নামায হতে অবসর হও, তখন দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে।'
[তাফসীরে ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), ৫১৪ পৃঃ]

হাদীস– ৩ : হযরত কাতাদাহ্, যাহ্হাক ও কালবী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তাঁরা বলেন– 'ফরজ নামায সম্পাদন করার পর দু'আয় লিপ্ত হবে।'
[তাফসীরে মাযহারী ১০:২৯ পৃঃ]

হাদীস– ৪ : [নামাযের পর মুনাজাতে হাত উঠানো]

হযরত ফযল ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নামায দুই দুই রাক'আত; প্রত্যেক দুই রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। ভয়-ভক্তি সহকারে কাতরতার সহিত বিনীতভাবে নামায আদায় করতে হয়। আর (নামায শেষে) দু'হাত তুলবে এভাবে যে, উভয় হাত প্রভু পানে উঠিয়ে চেহারা কিবলামুখী করবে। অতঃপর বলবে হে প্রভু ! হে প্রভু ! (এভাবে দু'আ করবে । যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, সে অসম্পূর্ণ নামাযী তাঁর নামায অঙ্গহীন সাব্যস্ত হবে)।
[জামি'য়ে তিরমিযী ১৮৭]

হাদীস- ৫ : [প্রসঙ্গ- ঐ]

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যে কোন বান্দা প্রত্যেক নামাযের পর দু'হাত তুলে এ দু'আ পড়বে- আল্লাহুম্মা ওয়া ইলাহা ...., আল্লাহ তা'আলা নিজের উপর নির্ধারিত করে নিবেন যে, তার হস্তদ্বয়কে
{পৃষ্ঠা-৩২০}
বঞ্চিত রূপে ফেরত দিবেন না। (হাদীসে বর্ণিত পূর্ণ দু'আটি এবং মুনাজাত সম্পর্কিত তত্ত্বহুল বিস্তারিত তথ্য শাইখুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক সাহেব সংকলিত মুসলিম শরীফ ও অন্যান্য হাদীসের ছয় কিতাব- ৫ম খন্ডে দ্রষ্টব্য।) এছাড়া মিশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১৯৫/১৯৬ পৃষ্ঠায় অনেকগুলো হাদীস বিদ্যমান আছে- সেগুলোর সার সংক্ষেপ হচ্ছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাজাত ও দু'আ করার সময় হাত উঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং এটাই দু'আর আদব।

হাদীস- ৬ : [মুনাজাত সালাম ফিরানোর পর]

হযরত ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ)-কে দেখেছি, তিনি এক ব্যক্তিকে সালাম ফিরানোর পূর্বেই হাত তুলে মুনাজাত করতে দেখে তার নামায শেষ হওয়ার পর তাকে ডেকে বললেন, 'রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল নামায শেষ করার পরই হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন, আগে নয়।'
[ইলাউস সুনান ৩:১৬১]

হাদীস- ৭ : [সম্মিলিত মুনাজাত]

হযরত হাবীব ইবনে সালাম (রাযিঃ) বর্ণনা করেন- রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- 'যদি কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে এভাবে দু'আ করে যে, তাদের একজন দু'আ করতে থাকে, আর অন্য লোকেরা 'আমীন' 'আমীন' বলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ অবশ্যই কবুল করে থাকেন।
[কানযুল উম্মাল ১:১৭৭ পৃঃ # তালখীসুয যাহাবী ৩:৩৪৭ পৃঃ]

হাদীস- ৮ : [ইমাম-মুক্তাদীর সম্মিলিত মুনাজাত]

হযরত সাওবান (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- 'কোন ব্যক্তি লোকদের ইমাম হয়ে এমন হবে না যে, সে তাদেরকে বাদ দিয়ে দু'আতে কেবল নিজেকেই নির্দিষ্ট করে। যদি এরূপ করে, তবে সে তাদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করল।'
[তিরমিযী শরীফ ১:৮২]

উল্লেখিত হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায়ঃ

(ক) ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা। তাই ফরজ নামাযের পর দু'আয় মশগুল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) নামাযের পর হাত তুলে দু'আ করা বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন আমল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নামাযের পর দু'আয় হাত উঠাতেন এবং অন্যদেরকে এর প্রতি উত্সাহিত করতেন। সুতরাং এটাই দু'আর আদব।

(গ) একজন দু'আ করবে; আর বাকীরা সবাই আমীন বলবে; এভাবে সকলের দু'আ বা সম্মিলিত মুনাজাত কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আর ইমাম সাহেব শুধু নিজের জন্য দু'আ করবেন না। দু'আতে মুসল্লীদেরকেও শামিল করবেন।

{পৃষ্ঠা-৩২১}

উল্লেখিত হাদীস সমূহের সমষ্টিদ্বারা নামাযের পর একাকী মুনাজাতের পাশাপাশি ফরজ নামাযের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলের সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণ দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। অতএব, তা মুস্তাহাব হওয়াই হাদীস সমূহের মর্ম ও সমষ্টিগত সারকথা।
[বিস্তারিত দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী ৩:৩০০ পৃঃ, ইলাউস সুনান, ৩:১৬১ পৃঃ]

উল্লেখ্য যে, বর্ণিত হাদীসসমূহ সম্পর্কে কেউ কেউ আপত্তি তুলেন যে, 'এ হাদীসসমূহের কোনটিতে ফরজ নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার কথা একসঙ্গে উল্লেখ নেই। কেননা, এগুলোর কোনটিতে শুধু দু'আর কথা আছে, কিন্তু হাত তোলার কথা নেই। আবার কোনটিতে শুধু হাত তুলে মুনাজাতের কথা আছে। কিন্তু তা একাকীভাবে, সম্মিলিত ভাবে নয়। আবার কোনটিতে সম্মিলিত মুনাজাতের কথা আছে সত্য, কিন্তু ফরজ নামাযের পরে হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। অতএব, এ হাদীস সমূহের দ্বারা প্রচলিত মুনাজাত প্রমাণিত হয় না।' তাঁদের এ আপত্তির জবাবে হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ্ (রহঃ) কিফায়াতুল মুফতী গ্রন্থে বলেন- "বিষয়গুলো যেমন কোন এক হাদীসে একত্রিতভাবে উল্লেখ হয়নি, তেমনি কোন হাদীসে তা নিষিদ্ধও হয়নি। কোন জিনিসের উল্লেখ না থাকার দ্বারা তা নিষিদ্ধ হওয়া কখনোও বুঝায় না। উপরন্তু উল্লেখিত হাদীসসমূহের বর্ণনা ভাব এমন ব্যপকতা সম্পন্ন, যা সম্ভাব্য সকল অবস্থাকেই শামিল করে। তাছাড়া বিভিন্ন রেওয়ায়েতে এ অবস্থাগুলোর পৃথক পৃথক উল্লেখ রয়েছে। যার সমষ্টিগত সামগ্রিক দৃষ্টিকোণে ফরজ নামাযের পর হস্ত উত্তোলন পূর্বক সম্মিলিত মুনাজাত অনায়াসে প্রমাণিত হয়। এটা তেমনি, যেমন নামাযের বিস্তারিত নিয়ম, আযানের সুন্নাত নিয়ম ইত্যাদি একত্রে কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। বিভিন্ন হাদীসের সমষ্টিতে তা প্রমাণিত হয়।"
[দেখুনঃ কিফায়াতুল মুফতী ৩:৩০০০ পৃঃ]

মুনাজাত অস্বীকারকারীগণের আরো কতিপয় অভিযোগ ও তার জওয়াবঃ

অভিযোগ- ১

নামাযের পর মুনাজাতের স্বপক্ষের হাদীসসমূহ কেবল নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অতএব, এর দ্বারা ফরজ নামাযের পর মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণিত হয় না।

জবাব

হযরত আল্লামা আনওয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, 'নামাযের পর মুনাজাত করার পক্ষের হাদীসগুলোর ব্যাপারে ফিকহবিদগণ নফল এবং ফরয উভয় নামাযকেই শামিল করেছেন।"
[ফায়যুল বারীঃ ৪:৪৭ পৃঃ]

{পৃষ্ঠা-৩২২}

মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী (রহঃ) বলেন, "ফরয নামাযের পর মুনাজাত নফল নামাযের পর মুনাজাত অপেক্ষা উত্তম।" [ইলাউস সুনান, ৩:১৬৭ পৃঃ]

অভিযোগ- ২

মুনাজাত মুস্তাহাব হয়ে থাকলে প্রচুর হাদীসে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আমল প্রমাণিত থাকতো। অথচ এ ব্যাপারে একটি রেওয়ায়েতও প্রমাণিত নেই।

জবাব

প্রথমতঃ মুনাজাতের ব্যাপারে 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আমল সম্পর্কিত একটি রেওয়ায়েতও প্রমাণিত নেই'- একথাটি ঠিক নয়। কারণ- এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট রিওয়ায়াত আমরা হাদীস অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয়তঃ মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল প্রমাণিত হওয়া মোটেও জরুরী নয়। কারণ বহু মুস্তাহাব আমল রয়েছে, যা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ মাসলিহাতের কারণে নিজে করতেন না, কিন্তু সে সবের প্রতি মৌখিকভাবে উম্মতদেরকে উত্সাহিত করতেন। যাতে উম্মত তার উপর আমল করে নিতে পারে। যেমন- চাশতের নামায, আযান (যাকে আফযালুল আ'মাল বলা হয়ে থাকে) ইত্যাদি। এগুলো রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মা'মূল হিসেবে প্রমাণিত নেই। অথচ তিনি এ নেক কাজ সমূহের প্রতি উম্মতদেরকে মৌখিকভাবে যথেষ্ট উত্সাহিত করে গিয়েছেন। তদ্রূপ মুনাজাতের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আমলী রেওয়ায়াত স্বল্প বর্ণিত হলেও মৌখিক রিওয়ায়াত প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। আর মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট। পরন্তু নিয়ম হল, মৌখিক রেওয়ায়েতের সাথে যদি আমলী রেওয়ায়েতের বিরোধ পাওয়া যায়, তবে যারা বলেন, মুস্তাহাব প্রমাণ হওয়ার জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৌখিক বর্ণনার পাশাপাশি আমলও থাকতে হবে, তারা সঠিক সরল পথ থেকে দূরে সরে পড়েছেন এবং একটি ফাসিদ জিনিসের উপর ভিত্তি করে কথা বলছেন।

[দ্রষ্টব্যঃ ফায়যুল বারী ২:৪১৩ পৃঃ]

অভিযোগ- ৩

মুনাজাতের স্বপক্ষে যেসকল হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়, সেগুলো অনেকটা যঈফ। অতএব, তা নির্ভরযোগ্য নয়।

জবাব

এ অধ্যায়ের কিছু হাদীস যঈফ থাকলেও যেহেতু তার সমর্থনে অন্য সহীহ্ রিওয়ায়াত বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, তা নির্ভরযোগ্যই বিবেচিত হবে। দ্বিতীয়তঃ সেই হাদীসসমূহ ফযীলত সম্পর্কিত। আর ফযীলতের ব্যাপারে যঈফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য।

(নূখবাতুল ফিকার দ্রষ্টব্য)

{পৃষ্ঠা-৩২৩}

অভিযোগ- ৪

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন ফরজ নামাযের সালাম ফিরাতেন, তখন এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়তেন যে, মনে হত- তিনি যেন উত্তপ্ত পাথরের উপর উপবিষ্ট আছেন। [উমদাতুল কারী ৬:১৩৯ পৃঃ]

এতে বুঝা যায়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন।

জবাব

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর উল্লেখিত আমলের এ অর্থ নয় যে, তিনি সালাম ফিরানোর পর মাসনূন দু'আ যিকর না করেই দাঁড়িয়ে যেতেন। কেননা- তিনি রাসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিরুদ্ধাচরণ কখনও করতে পারেন না। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে সালাম ফিরানোর পর বিভিন্ন দু'আ ও যিকর হাদীসে বর্ণিত আছে। সুতরাং রেওয়ায়াতটির মর্ম হল- হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) সালাম ফিরানোর পর সংক্ষিপ্ত দু'আ ও যিকির পাঠের অধিক সময় বসে থাকতেন না।

অতএব, উল্লেখিত রেওয়ায়াত দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর মুনাজাত করা ব্যতীত উঠে পড়া প্রমাণিত হয় না।
[আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিমঃ ৯৭ পৃঃ]

স্মর্তব্য যারা ইজতিমায়ী মুনাজাতের বিরোধী, তারা হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর আমলের অজুহাত দেখিয়ে সালাম ফিরানোর পর দেরী না করেই সুন্নাত ইত্যাদির জন্য উঠে পড়েন। অথচ এর দ্বারা নামাযের পর যে মাসনূন দু'আ ইত্যাদি রয়েছে, তা তরক করা হয়। দ্বিতীয়তঃ ফরজ ও সুন্নাতের মাঝখানে কিছু সময়ের ব্যবধান করার যে হুকুম হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, তা লঙ্ঘন করা হয়।

মুনাজাতের স্বপক্ষে ফিকহের কিতাবসমূহের দলীলঃ

ফিকহের কিতাব সমূহে মুনাজাতের স্বপক্ষে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে তার কিয়দাংশ উদ্ধৃত হলঃ

১. ফিকহে হানাফীর অন্যতম মূল কিতাব 'মাবসূত'- এর বর্ণনাঃ "যখন তুমি নামায থেকে ফারিগ হবে, তখন আল্লাহর নিকট দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে। কেননা, এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার বেশীekx সম্ভাবনা।"

২. প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব 'মিনহাজুল উম্মাহ্ ও আকায়িদুসসুন্নিয়্যাহ্'- এর বর্ণনাঃ "ফরজ নামাযের পর দু'আ করা সুন্নাত। এরূপভাবে দু'আর সময় হাত উঠানো এবং পরে হাত চেহারায় মুছে নেয়া সুন্নাত।"
{পৃষ্ঠা-৩২৪}

৩. তাহযীবুল আযকার'- এর বর্ণনাঃ "এ কথার উপর উলামায়ে কিরামের ইজমা হয়েছে যে, নামাযের পর যিকর ও দু'আ করা মুস্তাহাব।"

৪. শির'আতুল ইসলাম'- এর বর্ণানাঃ "ফরয নামাযের পর মুসল্লীরা দু'আ করাকে গণীমত মনে করবে।"

৫. 'তুহফাতুল মারগুবা' ও 'সি'আয়া- এর বর্ণনাঃ "নামায শেষে ইমাম ও মুসল্লীগণ নিজের জন্য এবং মুসলমানদের জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। অতঃপর মুনাজাত শেষে হাত চেহারায় মুছবেন।"

৬. 'ফাতাওয়া বাযযাযিয়া'- এর বর্ণনাঃ নামায শেষে ইমাম প্রকাশ্যভাবে হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়বেন এবং মুসল্লীগণও প্রকাশ্য আওয়াজে দু'আ পড়বেন। এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মুসল্লীদের দু'আ ইয়াদ হয়ে যাওয়ার পর সকলে বড় আওয়াযে দু'আ করা বিদ'আত হবে। তখন মুসলীগণ দু'আ আস্তে পড়বেন।

৭. 'ফাতাওয়া সূফিয়া' ও 'নূরুল ঈযাহ্'- এর বর্ণনাঃ "নামাযের পরে জরুরী মনে না করে হাত উঠিয়ে সম্মিলিত ভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব।"

উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হলো যে, নামাযের পর দু'আ করা মুস্তাহাব। আর তা হাত উঠিয়ে করা বাঞ্ছনীয়। আরো প্রমাণিত হল যে, মুনাজাত করা ইমাম-মুক্তাদী সবার জন্যই পালনীয় মুস্তাহাব আমল।

হাদীস বিশারদগণের রায় পর্যবেক্ষণ করলেও আমরা মুনাজাতের স্বপক্ষে অসংখ্য প্রমাণ পাই। নিম্নে কয়েকজনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রদত্ত হলঃ

১. সুপ্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ আল্লামা হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, "যে সকল ফরজ নামাযের পর সুন্নাত নামায নেই, সে সকল ফরজ নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণ আল্লাহর যিকরে মশগুল হবেন। অতঃপর ইমাম কাতারের ডান দিকে মুখ করে দু'আ করবেন। তবে সংক্ষিপ্তভাবে মুনাজাত করতে চাইলে কিবলার দিকে মুখ করেও করতে পারেন।"
[ফাতহুল বারী ২:৩৩৫ পৃঃ]

২. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রহঃ) বলেন, "এ হাদীস দ্বারা নামাযের পরে মুনাজাত করা মুস্তাহাব বুঝা যায়। কারণ সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐ সময়ে দু'আ কবুল হওয়ার বেশীekx সম্ভাবনা।" [উমদাতুল কারী ৬:১৩৯]

৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, 'নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা বিদ'আত নয়। কারণ- এ ব্যাপারে প্রচুর কাওলী রিওয়ায়াত বিদ্যমান। ফি'লী রিওয়ায়াতের মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে এ মুনাজাত করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এটাই সকল মুস্তাহাবের নিয়ম। তিনি নিজে সঙ্গত আমল বেছে নিতেন। আর অবশিষ্ট মুস্তাহাব সমূহের ব্যাপারে উম্মতকে উত্সাহ দিতেন। সুতরাং এখন যদি আমাদের কেউ নামাযের {পৃষ্ঠা-৩২৫}
পরে হাত উঠিয়ে দায়িমী ভাবে মুনাজাত করতে থাকে, তাহলে সে ব্যক্তি এমন একটা বিষয়ের উপর আমল করল, যে ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্সাহ দিয়ে গেছেন। যদিও তিনি নিজে সর্বদা আমল করেননি।" [ফায়যুল বারীঃ ২:১৬৭ পৃ ও ৪৩১ পৃঃ ৪:১৭ পৃ]

৪. শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া (রহঃ) বলেন, "ফরজ নামাযের পরে হাত উঠিয়ে মুনাজাত করাকে কেউ কেউ অস্বীকার করে থাকেন। কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ, এ ব্যাপারে প্রচুর হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। এ সকল হাদীস দ্বারা নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়।"
[আল-আবওয়াব ওয়াত-তারাজিমঃ ৯৭ পৃঃ]

৫. হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নোরী (রহঃ) মুনাজাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহ উল্লেখ পূর্বক বলেন, "মুনাজাত অধ্যায়ে যে সকল হাদীস পেশ করা হল, ওগুলোই যথেষ্ট প্রমাণ যে, ফরজ নামাযের পর সম্মিলত মুনাজাত জায়িয। এ হাদীস সমূহের ভিত্তিতেই আমাদের ফুকাহায়ে কিরাম উক্ত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলেন।"
[মা'আরিফুস সুনান ৩:১২৩ পৃ]

৬. মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা নববী (রহঃ) বলেন, সকল ফরজ নামাযের পরে ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদের জন্য দু'আ করা মুস্তাহাব। এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই।"
-(শরহে মুসলিম লিন- নববী)

৭. হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী (রহঃ) বলেনঃ "আমার নিকট এটাই সঠিক যে, ফরজ নামাযের পর সুন্নাতের পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু যিকর ও হাদীসে বর্ণিত দু'আ পড়ে নেয়া চাই।" [ফাতহুল মুলহিম ২:১৭৮ পৃঃ]

৮. হযরত মাওলানা যাফর আহমাদ উসমানী (রহঃ) বলেনঃ "আমাদের দেশে যে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রথা চালু আছে যে, ইমাম কোন কোন নামাযের পর কিবলামুখী বসে দু'আ করে

থাকেন। এটা কোন বিদ'আত কাজ নয়। বরং হাদীসে এর প্রমাণ রয়েছে। তবে ইমামের জন্য উত্তম হল– ডানদিকে বা বামদিকে ফিরে মুনাজাত করা।"
[ই'লাউস সুনান ৩:১৬৩ পৃঃ]

তিনি আরো বলেন, "হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হল যে, প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। যেমন–আমাদের দেশে এবং অন্যান্য মুসলিম দেশে প্রচলিত আছে। [ঐ ৩:১৬৭ পৃঃ]

মুহাদ্দিসীনে কেরামের বর্ণিত এ রায়সমূহ দ্বারা বুঝা গেল–

(১) নামাযের পর হাত উঠিয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব। এ সময় দু'আ কবুল হওয়ার খুবই সম্ভাবনা।

(২) মুনাজাত ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ সকলের জন্যই মুস্তাহাব আমল।

{পৃষ্ঠা–৩২৬}

(৩) ফরজ নামাযের পর ইমাম–মুক্তাদী সকলের ইজতেমায়ী মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

(৪) ফরজ নামাজের পর দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও কোন ক্ষতি নেই।

(৫) নামাযের পর মুনাজাত বি'দআত নয়। বহু কাওলী হাদিস দ্বারা এ মুনাজাত সাবেত আছে। মুস্তাহাব আমল যেহেতু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে যদিও তা মাঝে মধ্যে করেছেন। কিন্তু সকলকে তিনি এর প্রতি মৌখিকভাবে যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন।

(৬) প্রচলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলা এবং এর বিরোধিতা করা ঠিক নয়।

প্রচলিত মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে এমনি আরো বহু প্রমাণাদি বিদ্যমান। কেবল আমাদের মাযহাবেই নয়, ববং অন্যান্য সকল মাযহাবেও এ মুনাজাত মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয়েছে। [প্রমাণের জন্য ইমদাদুল ফাতওয়া দ্রষ্টব্য]

এ সকল বর্ণনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযের পর ইমাম, মুক্তাদী সকলের জন্য সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করাও মুস্তাহাব। এ মুনাজাতকে বিদ'আত বলার কোন যুক্তিই নেই। কারণ বিদ'আত বলা হয় সে আমলকে, শরী'আতে যার কোনই অস্তিত্ব নেই। মুনাজাত সেই ধরনের মূল্যহীন কোন আমল নয়। তবে যেহেতু মুনাজাত 'মুস্তাহাব আমল' তাই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা অনুচিত। মুস্তাহাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করা নিষিদ্ধ।

অতএব, কেউ মুনাজাতের ব্যাপারে যদি এমন জোর দেয় যে, মুনাজাত তরককারীকে কটাক্ষ বা সমালোচনা করতে থাকে, বা মুনাজাত না করলে তার সাথে ঝগড়া–ফাসাদ করতে থাকে, তাদের জন্য বা সেরূপ পরিবেশের জন্য মুনাজাত করা নিঃসন্দেহে মাকরূহ ও বিদ'আত হবে। মুনাজাত বিদ'আত হওয়ার এই একটি মাত্র দিক আছে। আর এটা কেবল মুনাজাতের বেলায় নয়, বরং সমস্ত মুস্তাহাবেরই এ হুকুম। অতএব, মুনাজাতও পালন করতে পারবে এবং বিদ'আত থেকেও বাঁচতে হবে। আর এর জন্য সুষ্ঠু নিয়ম আমাদের খেয়াল মতে এই যে, মসজিদের ইমাম সাহেবান মুনাজাতের আমল জারী রেখে জনগণকে মুনাজাতের দর্জাRv সম্পর্কে মুসল্লীগণকে ওয়াজ–নসীহতের মাধ্যমে বুঝাবেন এবং ফরয–ওয়াজিব ও সুন্নাত–মুস্তাহাবের দর্জা–ব্যবধান বুঝিয়ে দিয়ে বলবেন– ফরজ নামাযের পর মুনাজাত করা যেহেতু মুস্তাহাব সুতরাং যার সুযোগ আছে সে মুস্তাহাবের উপর আমল করে নিবে। আর যার সুযোগ নেই তার জন্য মুস্তাহাব তরক করার অবকাশ আছে। এমন কি কেউ যদি ইমামের সাথে মুনাজাত শুরু করে, তাহলে ইমামের সাথে শেষ করাও জরুরী নয়। কারণ, সালাম ফিরানোর পর ইকতিদা শেষ হয়ে যায়। সুতরাং কেউ চাইলে ইমামের আগেই তার মুনাজাত শেষ করে দিতে পারে। আবার কেউ চাইলে ইমামের মুনাজাত শেষ

{পৃষ্ঠা-৩২৭}
হওয়ার পরও দীর্ঘক্ষণ একা একা মুনাজাত করতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা শরী'আতে নিষেধ। এভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর ইমাম সাহেবান প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর দায়িমীভাবে মুনাজাত করলেও তাতে কোন ক্ষতি নেই। অনেকের ধারণা- 'মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মাঝে মাঝে তরক করত হবে।' কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য তরক করার কোনই আবশ্যকীয়তা নেই। যেমন- সকল ইমাম টুপি পরে নামায পড়ান। কেউ একথা বলেন না যে, মাঝে মাঝে টুপি ছাড়া নামায পড়ানো উচিত- যাতে মুসল্লীগণ বুঝতে পারেন যে, টুপি পরা ফরজ ওয়াজিব নয়। অতএব, মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য মুনাজাতকে কেন ছাড়তে হবে?

অনুরূপ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়িশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) দায়িমীভাবে চাশতের নামায পড়তেন। কখনও পরিত্যাগ করতেন না। উপরন্তু তিনি বলতেন, "চাশতের নামাযের মুহূর্তে আমার পিতা-মাতা জীবিত হয়ে এলেও আমি তাদের খাতিরে এ নামায পরিত্যাগ করব না। (মিশকাত শরীফ ১:১১৬) অথচ চাশতের নামায মুস্তাহাব পর্যায়ের। অতএব মাঝে মধ্যে তরক করে নয়, বরং ওয়ায নসীহতের মাধ্যমেই মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত । এটাই উদ্ভূত পরিস্থিতির উত্তম সমাধান।

ويترجح تقديم الذكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن المراد بدبر الصلاة ما قبل السلام وتعقب بحديث ذهب أهل الدثور فإن فيه تسبحون دبر كل صلاة وهو بعد السلام جزما فكذلك ما شابهه وأما الصلاة التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاءوا انصرفوا وذكروا....الخ. (فتح الباري: 2 / 390)

নামাজের পরে মুনাজাত মুস্তাহাব।

জিজ্ঞাসাঃ চট্টগ্রাম হাটহাজারীস্থ মেখল মাদ্রাসার সাবেক মুহতামিম মুফতী মাওলানা ইবরাহীম খান (রহঃ) কর্তৃক রচিত "শরীয়ত ও প্রচলিত কুসংস্কারvi" নামক কিতাবের ১৩৭-১৪৯ তের পৃষ্ঠাব্যাপী এক দীর্ঘ আলোচনায় বলা হয়েছে, ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা বিদ'আতে সায়্যিয়াহ। কিন্তু মাসিক রাহমানী পয়গাম '৯৬ আগষ্ট সংখ্যায় জিজ্ঞাসার জবাব কলামের দীর্ঘ আলোচনায় বলা হয়েছে এটা মুস্তাহাব। উভয় স্থানেই অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দলীল প্রমাণসহ আলোচ্য বিষয়টির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। "উলামায়ে কিরামের মতবিরোধ রহমত স্বরূপ"- এ উক্তির আলোকে উপরোক্ত বিতর্কের উপর
{পৃষ্ঠা-৩২৮}
আমাদের কোন আপত্তি বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমাকে মাঝে মধ্যেই ইমামতির দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছেঃ

(ক) আমি কি যে কোন একটি পন্থার উপর আমল শুরু করে দিতে পারি? নাকি আমার বিবেক খাটানোর অধিকার আছে?

(খ) সম্মিলিত মুনাজাতে মুক্তাদীগণ নিজেরাও কি দু'আর বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে? নাকি তারা কেবল আমীনই বলতে পারবে?

জবাবঃ (ক) নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত বিদ'আত অথবা মুস্তাহাব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ যদি কোন জায়গায় মুনাজাত করা জরুরী মনে করা হয় এবং কেউ মুনাজাত না করলে তাকে তিরস্কার করা হয়, তখন সে পরিবেশে মুনাজাত করা বিদ'আত হবে। কিন্তু কোন জায়গায় যদি সম্মিলিত মুনাজাত জরুরী মনে না করা হয় এবং কেউ মুনাজাতে শরীক না হলে

তাকে তিরষ্কার করা হয় না, তাহলে সে পরিবেশে সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ‘আত বলা যাবে না। বরং তা মুস্তাহাব হবে। কারণ, অনেক ইতিবাচক হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। সুতরাং অন্য কোন অসুবিধা না থাকলে সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ’আত বলা যায় না। কারণ, বিদ’আত বলা হয় শরীয়তে যার কোন ভিত্তিই নেই। অথচ ফরয নামাযের পর মুনাজাতের ব্যাপারটি তেমন নয়।

এখন যদি হযরত মাওলানা মুফতী ইবরাহীম খান সাহেব চট্টগ্রামে এ পরিস্থিতি দেখে থাকেন যে, সেখানে মুসল্লীগণ এটাকে জরুরী মনে করে, আর এই কারণে তিনি সেটাকে বিদ’আত বলেন, তাহলে তো সেটা বিদ’আতই হবে। কিন্তু যদি মুসল্লীগণ মুনাজাত করা জরুরী মনে করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় এরূপ করাকে তিনি বিদ’আত বলে থাকেন, তাহলে তাঁর এ কথা দলীলের ভিত্তিতে সহীহ্ নয়। তাই আপনি মুসল্লীদেরকে মাসআলাটা ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন এবং জরুরী মনে না করে বরাবর নামাযের পর মুনাজাত করে যেতে পারবেন। কারণ মুস্তাহাবকে জরুরী মনে করলে বিদ’আত হয়। কিন্তু মুস্তাহাবকে জরুরী মনে না করে তা সবসময় করলেও বিদ’আত হয় না । তবে মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। এ কথা বুঝানোর জন্য যে, মুনাজাত নামাযের অংশ নয়। বরং এটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস এবং এর মধ্যে ইমামের ইকতিদা নেই । সুতরাং ইমামের আগে বা পরে ইচ্ছামত মুনাজাত শেষ করতে পারে।

(খ) ইজতিমায়ী মুনাজাতে মুক্তাদীগণ উভয় কাজই করতে পারে। অর্থাৎ, ইচ্ছা করলে তারা যার যার মনের উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্খা আল্লাহর দরবারে পেশ করতে পারে। কিংবা ইমাম সাহেব উচ্চঃস্বরে দু‘আর বাক্যগুলো উচ্চারণ করবেন এবং মুক্তাদীগণ ইমামের দু‘আয় ‘আমীন’ ‘আমীন’ বলবেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে মুনাজাতের দু‘আর আওয়াজে

আরীফ তেজগাহ এর দেখা প্রুফ

328- 383

{পৃষ্ঠা-৩২৯}

মাসবূকের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় । আর বিশেষ কোন উপলক্ষ ছাড়া আওয়ায না করে প্রত্যেকের নিজ নিজ দু’আ করাই উত্তম এবং মুনাজাত চুপে চুপে করা মুস্তাহাব ও এতে ফজীলত বেশী । শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ, অন্যের ইবাদতে অসুবিধা না হলে উচ্চৈঃস্বরে দু’আ করা জায়িয আছে । [প্রমাণঃ ই’লাউস সুনান ৩ : ১৬৪ # কিফায়াতুল মুফতী ৩ : ৩০৭]

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ - قَالَ - فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ « رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ - أَوْ تَجْمَعُ - عِبَادَكَ » (رواه مسلم حـ:1676)

আল্লাহুম্মা আমীন বলে মুনাজাত শুরু করা

জিজ্ঞাসাঃ মুনাজাতে প্রথমে আল্লাহুম্মা আমীন বলে মুনাজাত আরম্ভ করা এবং মুনাজাতের শেষে বহক্কে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে মুনাজাত সমাপ্ত করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত ?

জবাবঃ মুনাজাতের শুরুতে হামদ- সালাত পড়ে দু’আ শুরু করা তেমনিভাবে মুনাজাতের শেষে হামদ-সালত এবং আমীন বলে দু’আ শেষ করার কথা হাদীসে প্রমাণিত আছে । প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থা কোন কিতাবে বর্ণিত নেই । সুতরাং তা শরীয়ত পরিপন্থী এবং এ ধরনের প্রথাকে অভ্যাসে পরিণত

করা বিদ'আত । অতএব তা বর্জন করা মুসলমানদের দ্বীনী দায়িত্ব । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৭৪ # মিশকাত ২৭ পৃঃ]

প্রথম কাতারে মাসবূক থাকা অবস্থায় ইমাম সাহেবের মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসা

জিজ্ঞাসাঃ নামাযের জামা'আতে প্রথম কাতারে কোন ব্যক্তি যদি মাসবূক থাকেন, তবে কি ইমাম সাহেব দু'আর উদ্দেশ্যে মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসতে পারবেন ?

জবাবঃ সাধারণতঃ ফজর ও আসরের জামা'আতে ইমাম সাহেব ডানে-বামে মুখ করে বসেন । প্রথম কাতারে মাসবূক না থাকলে, মুসল্লীদের দিকেও মুখ করে বসতে পারেন । কারো চেহারার দিকে মুখ করে নামায পড়া যেহেতু মাকরূহ, তাই প্রথম কাতারে ইমামের বরাবর কোন মাসবূক থাকলে উক্ত ব্যক্তিকে মাকরূহ হতে রক্ষা করণার্থে ইমাম সাহেব সে দিকে মুখ করে বসবেন না । তাছাড়া হযরত উমর (রাঃ) নামাযীর দিকে মুখ ফিরে বসার কারণে বেত্রাঘাত করতেন ।

তবে দ্বিতীয় কাতার বা পরের কাতারগুলোতে মাসবূক থাকলেও ইমাম সাহেবের সে দিকে মুখ করে বসতে কোন অসুবিধা নেই । [প্রমাণঃ কিফায়া ১ : ৩৬১ # ফাতহূল কাদীর ১ : ৩৬১]

والحاصل ان ماجرى به العرف في ديارنا من ان الامام يدعو في دبر بعض الصلوات مستقبلا للقبلة ليس ببدعة بل له اصل في السنة . (اعلاء السنن:163/3)

{পৃষ্ঠা-৩৩০}

মাসবূক, লাহেক, মুদরিক

মাসবূক ব্যক্তি সানা কখন পড়বে

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুক্তাদী ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ রাক'আতে শামিল হলে ছানা পড়বে কি-না ? পড়লে কখন ?

জবাবঃ যেই মুসল্লীর প্রথম দিকে নামায ছুটে যায় তাকে মাসবূক বলা হয় । মাসবূক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানোর পর নিজের ছুটে যাওয়া নামায আদায়ের সময় শুরুতে ছানা পড়বে । তাছাড়া ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে কিরাআত পড়া অবস্থায় ইমামের সাথে নিয়ত বেঁধেও ছানা পড়তে পারে তাতে কোন অসুবিধা নেই । আর ইমাম সাহেব জোরে কিরাআত পড়া অবস্থায় কিরাআত শুনা ফরয বিধায় তখন ছানা পড়া নিষেধ । [প্রমাণঃ রুদ্দুল মুহতার ১ : ৪৮৮ # ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২ : ১৫৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৩৮২]

أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس بفرض، بل يسن تعظيما للقراءة فكان سنة غير مقصودة لذاتها وعدم قراءة المؤتم في وأما الثناء فهو سنة مقصودة لذاتها، وليس ثناء الامام. غير حالة الجهر لا لوجوب الانصات، بل لان قراءة الامام له قراءة ثناء للمؤتم، فإذا تركه يلزم ترك سنة مقصودة لذاتها للانصات الذي هو سنة تبعا، بخلاف تركه حالة الجهر.

(رد المحتار:488/1)

মাসবূক যদি এক রাকা'আত পায়

জিজ্ঞাসাঃ তিন রাক'আত অথবা চার রাক'আত ওয়ালা নামাযের এক রাক'আত পাইলে বাকী নামায আদায় করার নিয়ম কি ?

জবাবঃ কোন ব্যক্তি যদি তিন রাক'আত ওয়ালা অথবা চার রাক'আত ওয়ালা ফরয নামাযের জামা'আতে শামিল হয়ে এক রাক'আত ইমাম সাহেবের সাথে পায়, তাহলে বাকী রাক'আত গুলো তাকে এভাবে পড়তে হবে যে, প্রথমে নিজে এক রাক'আত পড়ে বসবেন এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বেন । তার পরে উঠে অবশিষ্ট রাক'আত আদায় করে নিয়ম মত নামায শেষ করবেন । এটাই তার জন্য উত্তম ।

অবশ্য যদি তিনি এক রাক'আত পড়ে না বসে দুই রাকা'আত পড়ে বসেন, তাও তার জন্য জায়িয আছে । সে ক্ষেত্রে তার জন্য সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না । কারণ মাসবূকের অবশিষ্ট নামায পড়ার সময় এক রাক'আতের পর বসা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়নি । সুতরাং যিনি এটা তরক করে দ্বিতীয় রাক'আতে বসেন, তিনি কোন ওয়াজিব তরক করেননি শুধু উত্তমের খেলাফ করেছেন ।
{পৃষ্ঠা-৩৩১}
উল্লেখ্য, কোন মাসবূক যদি ভুলে এক রাক'আতের পরে না বসেন, তাহলে তার উচিত দ্বিতীয় রাক'আতে বসা । এর দ্বারা তার বসার ওয়াজিব আদায় হবে যাবে । যদি তিনি মাসআলা জানার পরে ইচ্ছা পূর্বক দ্বিতীয় রাক'আতেও না বসেন, তাহলে তার নামায সহীহ হবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৫৯৬ # ইমদাদুল আহকাম ১ : ৪৫৪]

ويقضي أول صلاته في حق قراءة، وآخرها في حق تشهد، فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما، وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط ولا يقعد قبلها (إلا في أربع) فكمقتد أخذها. [الدر المختار:596/1]
(قوله ويقضي أول صلاته في حق قراءة إلخ) هذا قول محمد كما في مبسوط السرخسي ، وعليه اقتصر في الخلاصة وشرح الطحاوي والإسبيجابي والفتح والدرر والبحر وغيرهم وذكر الخلاف كذلك في السراج لكن في صلاة الجلابي أن هذا قولهما وتمامه في شرح إسماعيل . وفي الفيض عن المستصفى : لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة عند أبي حنيفة . وقالا: ركعة بفاتحة وسورة وتشهد ثم ركعتين أولاهما بفاتحة وسورة وثانيتهما بفاتحة خاصة . اهـ .
وظاهر كلامهم اعتماد قول محمد (قوله وتشهد بينهما) قال في شرح المنية : ولو لم يقعد جاز استحسانا لا قياسا ، ولم يلزمه سجود السهو لكون الركعة أولى من وجه .اهـ . (رد المحتار:596/1)

ইমাম সাহেবকে রুকূতে পাওয়া গেলে

জিজ্ঞাসাঃ (ক) কোন এক ব্যক্তি মসজিদে এসে দেখল ইমাম সাহেব রুকূতে আছেন । এমতাবস্থায় সে যদি শুধু তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত না বেঁধে রুকুতে চলে যায়, তাহলে তার নামায সহীহ হবে কি-না ? নাকি রুকূর জন্য আলাদা তাকবীর বলতে হবে ?
(খ) রুকূতে গিয়ে ইমামের সাথে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা কি জরুরী ? নাকি শুধু শরীক হলেই ঐ রাক'আত পেয়েছে বলে ধরা হবে । একজন তাকবীর বলে রুকূর জন্য ঝুকলো আর ইমাম সাহেব ঐ মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন তাহলে এই ব্যক্তি কি ঐ রাক'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে ?
জবাবঃ (ক) ইমামকে রুকূতে পেয়ে কেউ যদি দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত না বেঁধে রুকূর তাকবীর না বলেই সরাসরি রুকূতে চলে যায়,
{পৃষ্ঠা-৩৩২}
তাহলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে । তবে সুন্নাতের খেলাফ হবে । সুন্নাত তরীকা হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমা বলার পর হাত না বেঁধে স্বতন্ত্রভাবে রুকূর তাকবীর বলে রুকূতে শরীক হওয়া ।
তবে যদি সোজা দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে তাহরীমা শেষ না হয়, বরং তাকবীরে তাহরীমা বলতে বলতেই রুকূর জন্য ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তার নামায সহীহ হবে না । কেননা, তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হওয়ার জন্য তা দাঁড়ানো অবস্থায় বলা শর্ত । এ শর্ত পাওয়া না গেলে তাকবীরে তাহরীমা সহীহ হবে না । আর তাকবীরে তাহরীমা সহীহ না হলে পূর্ণ নামাযই বাতিল হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৪৪২-৪৫২ # আল বাহরুর রায়িক ২ : ২৭৬ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৮৮]
(খ) ইমামের সাথে রুকূতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা জরুরী নয় । বরং শুধু শরীক হলেই ঐ রাক'আত পেয়েছে বলে গণ্য হবে । এমনকি কেউ যদি এমন সময় রুকূর জন্য ঝুঁকে যখন

ইমাম সাহেব রুকূ থেকে মাথা উঠায় । কিন্তু এখনও এতটুকু সোজা করতে পারেনি যে, তার হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছেনা । ইতিমধ্যে মক্তাদী এতটুকু ঝুঁকে গেছে যে, তার হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তাহলে উক্ত মুক্তাদী এ রাক'আত পেয়েছে বলে ধরা হবে এবং তার জন্য ঐ রুকূতে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরী করা ওয়াজিব । অতঃপর অবশিষ্ট তাসবীহ না পড়ে দাঁড়িয়ে ইমামের ইত্তিবা করা তার জন্য ওয়াজিব । [প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর ১ : ৪২১ # আল বাহরুর রায়িক, ১ : ২৯৩ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৮৭]

وفي فتح القدير ومدرك الامام في الركوع لا يحتاج الى تكبيرتين خلافا لبعضهم ولو نوى بتلك التكبيرة الواحدة الركوع لا الافتتاح جاز ولغت نيته . (البحر الرائق:76/2)

ومنها الركوع بحيث لو مد يديه نال ركبتيه. (الدر المختار:447/1)

ولنا ان الشرط هو المشاركة في جزء من الركن لانه يطلق عليه اسم الركوع وقد وجد فيقع موقعه ويعتبر من حين مشاركة الركوع المقتدي فيه كانه لم يوجد قبله شيئ. (فتح القدير:421/1)

القدر المفروض من الركوع اصل الانحناء والميل وفي الحاوي فرض الركوع انحناء الظهر وفي منية المصلي الركوع طأطأة الرأس. (البحر الرائق:293/1)

মাগবীবের নামাজে মাসবূক হলে

জিজ্ঞাসাঃ (ক) মাগরিবের নামায জামা'আতের সাথে শেষ রাক'আতে পেলে প্রথম দু'রাক'আত কিভাবে পড়তে হবে ? এই দু'রাক'আতের মাঝে কি তাশাহহুদ পড়তে হবে, না স্বাভাবিক দু'রাক'আতের মত পড়তে হবে বিস্তারিত জানাবেন ।

{পৃষ্ঠা-৩৩৩}

জবাবঃ কোন ব্যক্তি যদি তিন রাক'আত ওয়ালা নামাযের জামাআতে শরীক হয়ে এক রাক'আত ইমাম সাহেবের সাথে পায়, তাহলে বাকী রাক'আতগুলো তাকে এভাবে পড়তে হবে- প্রথমে নিজে এক রাক'আত সূরা মিলিয়ে পড়ে বসবেন এবং আত্তাহিয়্যাতু পড়বেন । তারপর উঠে অবশিষ্ট এক রাক'আত সূরা মিলিয়ে আদায় করে নিয়ম মত নামায শেষ করবেন । এটাই তার জন্য উত্তম । অবশ্য যদি তিনি এক রাক'আত পড়ে না বসে দুই রাক'আত পড়ে বসেন তাও তার জন্য জায়িয আছে । সেক্ষেত্রে তার উপর সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে না ।

উল্লেখ্য কোন মাসবূক যদি ভুলে এক রাক'আতের পরে না বসেন, তাহলে তার উচিত দ্বিতীয় রাক'আতের পরে বসা । এর দ্বারা তার বসার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১ : ৫৯৬ # কিতাবুল আছার ২৭ # ইমদাদুল আহকাম ২ : ১৬১]

ইমামের প্রথম ও শেষ বৈঠকে মাসবূক কি পড়বে ?

জিজ্ঞাসাঃ আমি যোহর অথবা আসর অথবা ইশার নামায মসজিদে পড়তে গিয়ে দেখি জামা'আতে এক রাক'আত নামায হয়ে গেছে । আমি দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল হলাম । ইমাম সাহেব ও মুসল্লিরা যারা প্রথম হতে জামা'আতে শামিল ছিলেন তারা দ্বিতীয় রাক'আত অন্তে বৈঠকে বসলেন এবং তাশাহহুদ পড়লেন । আমিও তাদের সাথে বৈঠকে বসলাম । কিন্তু এ সময় আমার মাত্র এক রাক'আত নামায আদায় হয়েছে । এই বৈঠকে এ সময় আমার কি আমল করতে হবে? তদুপরি ইমাম সাহেব তাঁর চার রাক'আত শেষে যখন বৈঠকে বসবেন, তখনই বা আমার কি আমল করতে হবে?

জবাবঃইমামের অনুসরণ জরুরী হওয়ার কারণে প্রথম বৈঠকে মাসবূকের (যার শুরুতে রাক'আত ছুটে গিয়েছে) যিম্মায় তাশাহহুদ পড়া ওয়াজিব হবে । না পড়লে, গুণাহগার হবে । তবে নামায হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৩৭৫]

অনুরূপভাবে ইমাম সাহেব যখন আখিরী বৈঠকে বসবেন, তখনও মাসবূকের শুধু তাশাহহুদ পড়তে হবে । কিন্তু দরূদ শরীফ পড়বে না । সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে সময় কাটানোর জন্য মাসবূক ধীরে ধীরে তাশাহহুদ পড়বে এটাই উত্তম । তা সত্ত্বেও যদি ইমামের পূর্বেই মাসবূক তাশাহহুদ থেকে ফারিগ হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় ২য় বার তাশাহহুদ পড়বে, অথবা তাশাহহুদের শেষে যে কালিমায়ে শাহাদাত আছে, ইমামের সালাম ফিরানো পর্যন্ত তা দোহরাতে থাকবে, অথবা একবার তাশাহহুদ পড়ার পর চুপচাপ বসে থাকবে - এ তিন অবস্থায় যে কোনটি করা মাসবূকের জন্য জায়িয । তবে প্রথমটি উত্তম । [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ২ : ৩৪]

{পৃষ্ঠা-৩৩৪}

من ادرك الامام في القعدة الاولى فقعد معه فقام الامام قبل شروع المسبوق في التشهد فانه يتشهد تبعا لتشهد امامه. (رد المحتار:85/2)

اما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام امامه وقيل يتم وقيل يكرر كلمة الشهادة. (الدر المختار:511/1)

قوله فيترسل أي يتمهل ، وهذا ما صححه في الخانية وشرح المنية في بحث المسبوق من باب السهو وباقي الأقوال مصحح قال في البحر وينبغي الإفتاء بما في الخانية كما لا يخفى ، ولعل وجهه كما في النهر أنه يقضي آخر صلاته في حق . أيضا قال ح : وهذا في قعدة الإمام الأخيرة كما هو صريح قوله يفرغ عند . التشهد ويأتي فيه بالصلاة والدعاء ، وهذا ليس آخرا ومثله في الحلية (قوله وقيل يكرر كلمة الشهادة) ا هـ. سلام إمامه ، وأما فيما قبلها من القعدات فحكمه السكوت كما لا يخفى (رد المحتار:511/1). كذا في شرح المنية

নামাযের শেষ বৈঠকে শরীক হওয়া

জিজ্ঞাসাঃ শেষ বৈঠকে মুকতাদী জামা’আতে শরীক হয়ে বসার পর পরই যদি ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেয় । তাহলে মুকতাদী কি সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবে, না আত্তাহিয়্যাতু পড়ে দাঁড়াবে ?

জবাবঃ শেষ বৈঠকে মুকতাদী জামা’আতে শরীক হয়ে বসার পর পরই যদি ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেয় তাহলে মুকতাদী সাথে সাথে দাড়াবে না । বরং আত্তাহিয়্যাতু পূর্ণ পড়বে । অতঃপর দাঁড়িয়ে নিজের নামায নিয়মানুযায়ী আদায় করবে ।

উল্লেখ্য যে, নামাযে শরীক হয়ে বসার পূর্বেই যদি ইমাম সাহেব সালাম ফিরিয়ে দেন, তাহলে ইক্তিদা সহীহ হবে না । সুতরাং এক্ষেত্রে পুনরায় তাহরীমা বেঁধে একাকী নামায পড়বে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১ : ৪৯৬ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ৩৪০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৩ : ৩৮০]

মাসবূক ভুলবশতঃ ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে ফেললে

জিজ্ঞাসাঃ (ক) কোন ব্যক্তি চার রাক’আত ওয়ালা ফরয নামাযের তিন রাক’আত ইমাম সাহেবের সাথে আদায় করেছে । সে ভুলবশতঃ ইমাম সাহেবের সাথে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দিয়েছে । সাথে সাথে মনে হল যে, তার এক রাক’আত বাকী রয়েছে । তাই ইমাম সাহেব বাম দিকে সালাম ফিরানোর সময় সে উঠে বাকী রাক’আত আদায় করল । এতে তার নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী তার নামায সহীহ হয়ে গেছে, তবে ইমামের একদম সাথে সাথে সালাম ফিরিয়ে থাকলে সাহু সিজদা লাগবে না । আর যদি ইমামের ‘আসসালামু’ শব্দ শেষ হওয়ার পর সালাম ফিরিয়ে থাকে, তাহলে সাহু সিজদাহ করে নিলে তার নামায সহীহ হয়ে যাবে ।

{পৃষ্ঠা-৩৩৫}

উল্লেখ্য, তিনি ইমামের বাম দিকে সালামের সময় যে অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করার জন্য উঠেছেন, এটা মুস্তাহাব নিয়ম নয় । বরং মুস্তাহাব নিয়ম হল- ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর

সামান্য দেরী করে তারপরে উঠা । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ৮২ # আল বাহরুর রায়িক ২ : ১০০ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ২৪]

মাসবূক যদি নিজ নামাযে ভুল করে

জিজ্ঞাসাঃ ইমামের পিছনে যে কোন রাক'আত নামাযে (জামা'আতে) অংশ নিয়ে ইমামের সালাম ফিরানোর পরে অবশিষ্ট নামায একাকী আদায় করার সময় যদি মুক্তাদির কোন ফরয বা ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে মুক্তাদির কি করণীয় হবে ?

জবাবঃ ইমামের সালাম ফিরানোর পরে যদি মাসবূক মূক্তাদীর কোন ফরয ছুটে যায়, তাহলে সাথে সাথে তার নামায ভেঙ্গে যাবে । এবং উক্ত নামায শুরু থেকে দ্বিতীয়বার পড়া জরুরী । উক্ত সুরতে সিজদায়ে সাহু দিলেও হবে না । কারণ, সিজদায়ে সাহু দেয়া হয় ভুলে কোন ওয়াজিব তরক হলে । আর মাসবূকের নিজস্ব নামাযে যদি কোন ওয়াজিব ভুল ক্রমে ছুটে যায়, তাহলে শেষ বৈঠকে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে । মোদ্দাকথা, ইমাম কিংবা মাসবূক বা একাকী নামাযী ব্যক্তির যদি কোন ফরয ছুটে যায়, তাহলে পুনরায় নামায পড়তে হবে । আর যদি কোন ওয়াজিব ভুল ক্রমে ছুটে যায়, তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৯২ # ফাতাওয়া শামী ১ : ৩৩৮, ১ ৪৪০]

ইমামের পিছনে মুক্তাদির করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ জামা'আতে নামাযরত অবস্থায় ইমামের পিছনে মুক্তাদীরা কি কি পড়ার অধিকার রাখে ? মুক্তাদীগণ ২য় রাক'আতে বৈঠকের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু পড়তে পারবে কি ? অথবা ৪র্থ রাক'আতে বৈঠকের মধ্যে আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দু'আয়ে মাসূরা পড়তে পারবে কি ?

জবাবঃইমামের পিছে মুক্তাদীর কোন রাক'আতে কিরাআত পড়তে হবেনা । বরং চুপ থাকবে । কিরাআত শুনা গেলে মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকবে আর কিরাআত না শুনা গেলে অন্তরে (মুখে নয়) সূরা ফাতিহা খেয়াল করতে থাকবে । যেমন- হাদীস শরীফে আছে যে ব্যক্তির ইমাম থাকে তার ইমামের কিরাআতই তার জন্য কিরাআত (মুসলিম শরীফ) । অন্য হাদীসে এসেছে ইমামের পিছে সূরা ফাতিহার খেয়াল করা আর কিরাআতের সময় চুপ থাকা । এমনিভাবে এ ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস আছে । কিন্তু কিরাআত ব্যতীত অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে যেমন তাশাহহুদ বা অন্যান্য সকল দু'আ, তাসবীহ-এর ব্যাপারে এ ধরণের কোন হাদীস নেই যে, ইমাম পড়লে তার পক্ষ

{পৃষ্ঠা-৩৩৬}

থেকে পড়া হয়ে যাবে । বরং এগুলো পড়ার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে । সুতরাং এগুলো ইমাম-মুক্তাদী, একা নামাযী সকলেরই এতটুকু আওয়াযে মুখে পড়তে হবে যাতে হালকা আওয়ায নিজের কানে আসে । [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১ : ৮১ # ইমদাদুল আহকাম ২ : ৯৭]

মাসবূক যদি ইমামের পিছনে ভুল করে

জিজ্ঞাসাঃ 'মাসবুক' যদি ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দরূদ শরীফ পড়ে ফেলে, তাহলে একাকী অবশিষ্ট নামায শেষ করার পর সিজদায়ে সাহু দিতে হবে কি-না ?

জবাবঃ মুক্তাদী যদি ইমামের পিছনে কোন সাহু অর্থাৎ ভুল করে ফেলে তাহলে, মুক্তাদীর জন্য সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয় না । সুতরাং মাসবূক(যে মুসল্লীর কিছু রাক'আত ছুটে গেছে) যদি ইমামের সাথে শেষ বৈঠকে দরূদ শরীফ পড়ে ফেলে তাহলে পরে একাকী নামাযের শেষে সিজদায়ে সাহু আদায় করতে হবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২ : ৮২, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ৪০৪]

لا سهو اصلا لان معناه لا قبل السلام للزوم مخالفة الامام ولا بعده لخروجه من الصلوة بسلام الامام لانه سلام عمد ممن لا سهو عليه كما في البحر. (رد المحتار:82/2)

নামাজের মধ্যে উযু ভেঙ্গে গেলে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি বলে থাকেন, নামাযের মধ্যে উযু ভেঙ্গে গেলে কারো সাথে কথা না বলে পুনরায় উযু করে যে কয় রাক'আত বাকী ছিল তা পড়ে নিলেই চলবে । নামায পুনরায় শুরু থেকে পড়তে হবে না । এটা কি সঠিক ?

জবাবঃ কোন ব্যক্তির নামাযে উযু ভেঙ্গে গেলে সে কোন কথাবার্তা না বলে উযু করে এসে পূর্বের নামাযের সাথে যোগ করে বাকী নামায আদায় করবে, এটা জায়িয । তবে যোগ না করে পুনরায় তাকবীরে তাহরীমা বলে নতুন করে নামায পড়াই উত্তম । অতএব, জনৈক ব্যক্তির কথা ঠিক আছে । তবে নামায শুরু থেকে পড়া উত্তম কথাটিও তার বলে দেয়া ভাল ছিলো । যা না বলার কারণেই মূলতঃ বিষয়টি প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয় ।

ومن سبقه الحدث في الصلوة انصرف.... وتوضأ وبنى..... ولنا قوله عليه السلام من قاء او رعف او امذى في صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته مالم يتكلم والاستيناف افضل تحرزا عن شبهة الخلاف. (الهداية:128/1)

{পৃষ্ঠা-৩৩৭}

বিতর, সুন্নাত ও নফল নামায

বিতর নামায কিভাবে আসল ?

জিজ্ঞাসাঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মি'রাজের রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে হাদিয়া স্বরূপ এনেছেন । কিন্তু বিতরের নামায কিভাবে আসল এবং কখন থেকে এ নামায আদায় করা হয় ?

জবাবঃবিতর নামায ওয়াজিব হওয়ার নির্ধারিত তারিখ যদিও সঠিকভাবে জানা যায় নাই, তবে বিভিন্ন কিতাবে যেমন মা'আরিফুস সুনান ৪ : ১৭৬ এবং উমদাতুল কারী ৭ : ১২ থেকে বুঝা যায় যে, বিতরের নামায মক্কা বিজয়ের পরে এবং হজ্জ ফরয হওয়ার পূর্বে শুরু হয়েছে । অর্থাৎ, অষ্টম ও নবম হিজরীর মধ্যবর্তী কোন এক সময়ে ওয়াজিব হয়েছে ।

বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়ার সূচনা এই যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)বলেন- আমরা অনেক দিন যাবত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে আসছিলাম । একদা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে একত্রিত হতে বললেন । আমরা একত্রিত হলাম । নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হামদ-ছানার পর আমাদের লক্ষ্য করে বললেন- আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য আরো একটি নামায বৃদ্ধি করেছেন- যা আদায় করা লাল উটের চেয়েও উত্তম । তারপর আমাদেরকে বিতরের নামায পড়ার নির্দেশ দেন ।

عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِىُّ - قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِىَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِىَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ ». (سنن أبي داودـ:1420)

فإذن يكون وجوب الوتر بعد فتح مكة. (معارف السنن:176/4)

বিতরের কাযা নামাযে দুআয়ে কুনূতের পূর্বে হাত না উঠানো

জিজ্ঞাসাঃ"বিতরের নামাযের কাযা আদায়ের সময় ৩য় রাক'আতে দু'আয়ে কুনূতে পূর্বের তাকবীর-এর সময় হাত না উঠিয়ে শুধু আল্লাহু আকবার বলে পরে দু'আয়ে কুনূত পড়ে নামায আদায় করবে ।"

আপনাদের দারসুল ফিকহের এ মাসআলাটা কোন কিতাবের উদ্ধৃতি (রেফারেন্স) হতে উল্লেখ করেছেন, দয়া করে ঐ কিতাবের নাম উল্লেখ করবেন কি ?
জবাবঃ এ মাসআলাটি ফাতাওয়া শামী– ২য় খন্ডের ৬ নং পৃষ্টায় উল্লেখ আছে । মাসআলায় লিখা আছে– "বিতর নামায কাযা করার সময় দু'আয়ে কুনূতের পূর্বে তাকবীর বলবে, কিন্তু হাত উঠাবে না ।"
{পৃষ্ঠা–৩৩৮}
قوله: (رافعا يديه) أي سنة إلى حذاء أذنيه كتكبيرة الاحرام، وهذا كما في الامداد عن مجمع الروايات لو في الوقت، أما في القضاء عند الناس فلا يرفع حتى لا يطلع أحد على تقصيره. (رد المحتار:2 / 6)

বিতরের তৃতীয় রাকা'আতে হাত উঠানোর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বিতরের নামাযে তৃতীয় রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত তোলা হয় কেন ? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক ?
জবাবঃ বিতরের তৃতীয় রাক'আতে দু'আয়ে কুনূতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার ন্যায় হাত উঠানো সুন্নাত । সহীহ হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও একাধিক সাহাবীর আমল দ্বারা প্রমাণিত বিধায় উঠানো হয় । [প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১ : ২৩৯]

বিতরের নামাযে হাত উঠানোর প্রচলন কখন থেকে ?

জিজ্ঞাসাঃ বিতরের নামাযে তৃতীয় রাক'আতের তাকবীর বলার সময় হাত উঠানোর প্রচলন কখন থেকে শুরু হয়েছে ? রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কেন হাত উঠায়েছেন ?
জবাবঃ হাদীস দ্বারা এতটুকু বুঝা যায় যে, বিদায় হজ্বের কিছু পূর্বে বিতর নামায ওয়াজিব হয় । তখন থেকে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বিতর নামাযের তৃতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পরে হাত তুলেন । সুতরাং হুজুরের যামানা থেকেই তা চলে আসছে ।
বিতর নামাযের তৃতীয় রাক'আতে আল্লাহ তা'আলার হুকুমেই হাত তুলেছেন । কেন উঠিয়েছেন তা জানা যায় না এবং তা জানার মধ্যে কোন ফায়দাও নেই । আমাদের তা জানতে বলা হয় নাই । সুতরাং এর জন্য সময় নষ্ট করা যাবে না । এতটুকু বুঝে নেয়াই যথেষ্ট যে, কিরাআত ও দু'আর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যই হাত তোলা হয় । [প্রমাণঃ নাসবুর রায়াহ ১ : ৩৯০ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ১৫৩]
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن . تكبيرة الافتتاح وتكبيرة القنوت . [نصب الراية:390/1, فتاوى دار العلوم:153/4]

বিতরের কাযার ৩য় রাকা'আতে তকবীর বলা ও হাত উঠানোর হুকুম কি ?

জিজ্ঞাসাঃ বিতরের কাযা আদায়ের সময় ৩য় রাক'আতে দু'আয়ে কুনূতের পূর্বে তাকবীরের সময় হাত না উঠিয়ে শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলে পরে দু'আয়ে কুনূত পড়ে নামায আদায় করবে । এখন আমার প্রশ্ন হল– যদি কেউ তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর দেয়, তবে কি নামায ফাসিদ হবে ?
{পৃষ্ঠা–৩৩৯}
৩য় রাক'আতে যে তাকবীর দেয়া হয় সেটা কি ? ওয়াজিব, সুন্নাত, না মুস্তাহাব ?
জবাবঃ বিতরের নামায কাযা হয়ে গেলে নিয়ম হল– তা গোপনে আদায় করে নিবে । কিন্তু যদি মানুষের সামনে কাযা হিসেবে আদায় করে, তাহলে ৩য় রাক'আতে তাকবীর বলার সময় মানুষের খারাপ ধারণা থেকে বাঁচার জন্য হাত উঠাবে না । কিন্তু যদি কেউ ঐ কাযা নামায আদায় করার সময় হাত উঠায় তাতে নামায ফাসিদ হবে না ।

বিতর নামায আদায়ের সময় ৩য় রাক'আতে যে তাকবীর দেয়া হয়, তা নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সুন্নাত । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৪৯ # ফাতাওয়া শামী ২ : ৬]
رافعا يديه: اي سنة الى حذاء اذنيه لتكبيرة الاحرام وهذا كما في الامداد عن مجمع الروايات لو في الوقت اما في القضاء عند الناس فلا يرفع. (رد المحتار:6/2)

বিতরের নামাযে মাসবূক হলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ রামাযান মাসে বিতর নামাযের জামা'আতে মাসবূক হলে তৃতীয় রাক'আতে তাকবীর বলে হাত উঠিয়ে দু'আয়ে কুনূত পড়তে হবে কি-না ?

জবাবঃ রমাযান মাসে বিতরের নামাযে মাসবূক হলে ইমামের সাথে হাত উঠায়ে দু'আয়ে কুনূত পড়াই যথেষ্ট । অবশিষ্ট নামায আদায় করার সময় দ্বিতীয় বার দু'আয়ে কুনূত পড়বে না । [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ২ : ১১ # গুনিয়াতুল মুসতামলী ৪১২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ১৬৮-৪২১]
واما المسبوق فيقنت مع امامه فقط ويصير مدركا بادراك ركوع الثالثة – [الدر المختار 11/2

দুই সালামে বিতরের নামায আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ সৌদিতে বিতরের ৩ রাক'আত নামায এভাবে পড়া হয়, প্রথম দু'রাক'আতে নামায পড়ে সালাম ফিরিয়ে আবার এক রাক'আত নিয়্যত করে যথারীতি রুকূ শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের নেতৃত্বে দু'আয়ে কুনূত মুনাজাতে হাত তুলে পড়া হয় ও মুক্তাদীগণ আমীন বলতে থাকে । আমরা কি তাদের নিয়মে পড়বো, নাকি বাংলাদেশের নিয়মে একাকী বা ঘরে ভিন্ন জামা'আত করে পড়বো ?

জবাবঃবিতর নামায তিন রাক'আত এক সালামে পড়াটাই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । সুতরাং হানাফী মাযহাব অনুসারীগণ এর উপরই আমল করবে । তারা প্রশ্নে বর্ণিত নিয়মে বিতর নামায পড়বেন না এবং একাকী বা ঘরের ভিতরে বা অন্যত্র ভিন্ন জামা'আত করে নামায পড়বেন । [প্রমাণঃ ফাতওয়া আব্দুল হাই ১ : ৩৩৫]
{পৃষ্ঠা-৩৪০}
عن ابي سعيد – ان هشام ان عائشة رضي الله تعالي عنها حدثته ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر- [نسائي191/1]
وروي ابن مسعود مرفوعا : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : وتر الليل ثلث كوتر النهار صلوة المغرب وهو ثلث ركعات بتسلمة كالمغرب – [الدر المختار 5/2]

দু'আয়ে কুনূত না পড়ে রুকূতে চলে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ বিতর নামাযের মধ্যে ৩য় রাক'আতে তাকবীর বলে দু'আয়ে কুনূত পড়া ছাড়াই রুকূতে চলে যায় অতঃপর স্মরণ হয়, তার এমতাবস্থায় কি করণীয় ?

জবাবঃ বিতর নামাযে কেউ যদি দু'আয়ে কুনূত পড়া ছাড়া ভুলে রুকূতে চলে যায় এবং সেই নামাযের পরে স্মরণ হয়, তাহলে সিজদায়ে সাহু করলেই নামায পূর্ণ হয়ে যাবে । রুকূ থেকে উঠে পড়বে না ।

প্রকাশ থাকে যে, বিতর নামাযে তৃতীয় রাক'আতে রুকূর পূর্বে দু'আ পড়া ওয়াজিব । আর প্রত্যেক ওয়াজিবেরেই একই হুকুম । যদি তা ভুলবশতঃ যথাস্থলে আদায় করা না হয় তবে, সিজদায়ে সাহু আদায় করলে নামায সহীহ হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ আপকে মাসায়িল ২ : ৩৬৮]
ولو نسيه اي القنوت ثم تذكره في الركوع لا يقنت فيه لفوات محله و لا يعود الي القيام........وسجد للسهو – [الدر المختار 10-9/2]

কুনূত না পড়ে রুকূতে যাওয়ার উপক্রম হলে

জিজ্ঞাসাঃ বিতর নামাযে দু'আয়ে কুনূত পড়া ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম দু'আয়ে কুনূত না পড়ে তাকবীর বলে রুকূতে যাওয়া শুরু করলেন। অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ রুকূতে গেলেন তখন মুক্তাদীগণ তাকবীর বললেন, ইমাম সাহেব দাঁড়ায়ে দু'আয়ে কুনূত পড়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকূ সিজদা করে নামায শেষ করলেন, এমতাবস্থায় এ নামাযের হুকুম কি ? লোকমা দানকারী মুসল্লীদের নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না ?

জবাবঃ জামা'আতে নামাযরত অবস্থায় ইমাম সাহেবের কোন ভুল হতে থাকলে মুক্তাদীদের কর্তব্য ইমামকে 'সুবহানাল্লাহ' বা 'আল্লাহু আকবার' বলে সতর্ক করে দেয়া। এতে তাদের নামাযের কোন ক্ষতি হবে না। উল্লেখিত অবস্থায় যদিও মুক্তাদীরা তাকবীর বলে ফরয থেকে ওয়াজিবের দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য সতর্ক করছিল, (ইমাম তা গ্রহণ না করে শেষে সিজদা সাহু করে নিলেই পারতেন) তথাপি তাদের নামায ফাসিদ হবে না। [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক ২ : ১০]

{পৃষ্ঠা-৩৪১}

কর্তব্য যে হাটুতে হাত পৌঁছে এ পরিমাণ নীচু হলেই ফরয রুকূ হয়ে যায়। রুকূতে মাথা কোমর ও পিঠ বরাবর রাখা সুন্নাত। এ হিসেবে প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে যদি এক তৃতীয়াংশ রুকূর পরিমাণ ফরয রুকূর সমান বা অধিকাংশ হয়ে থাকে, তাহলে দু'আয়ে কুনূত পড়ার জন্য ফিরে না এসে শেষে সিজদা সাহু করলেই চলতো। আর এটা করাই ইমাম সাহেবের কর্তব্য ছিল। অবশ্য রুকূ থেকে কাওমায় দাঁড়িয়ে দু'আয়ে কুনূত পড়ে দ্বিতীয়বার রুকূ না করে সরাসরি সিজদায় যেয়ে নামায শেষ করলেও নামায হয়ে যেত। তবে এরূপ ক্ষেত্রে সিজদায়ে সাহু করতে হতো। কিন্তু পুনরায় রুকূ করাটা অনুচিত বটে তবে নামায হয়ে যাবে এবং এ সুরতেও সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে। [প্রমাণঃ আলমগীরী ১ : ১১১ # দারুল উলূম ২ : ১৫৬]

ولو فتح علي امامه فلا فساد لانه تعلق به اصلاح صلواته- [البحر الرائق 10/2]

তাহিয়্যাতুল উযু ও দুখূলুল মসজিদের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ নামায শিক্ষা গ্রন্থে অথবা হুজুরদের কাছ থেকে শোনা যায়- জুমু'আর দিনে মসজিদে ঢুকেই তাহিয়্যাতুল উযু দুই রাক'আত, দুখূলুল মসজিদ দুই রাক'আত নামায পড়তে হয়। এ দুই রাক'আত কি শুধু জুম'আর দিনেই পড়তে হয়, না কি অন্যান্য ওয়াক্তে নামায পড়ার জন্য মসজিদে ঢুকলে সে সময়ও পড়া যায় ?

জবাবঃ তাহিয়্যাতুল উযু দুই রাক'আত নামায প্রত্যেকবার উযু করার পর পড়া মুস্তাহাব। শুধু জুমু'আর নামাযের পূর্বেই পড়তে হয় এমন নয়। বরং নামাযের জন্য বা এমনিতে উযু করেও উক্ত দুই রাক'আত নামায পড়া ভাল এবং সাওয়াবের কাজ। তবে ফজরের ফরজের পূর্বে এবং বাদ ফজর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং মাগরীবের পূর্বে এবং ও আসরের পরে তা পড়বে না। এমনি ভাবে প্রত্যেকবার মসজিদে প্রবেশের পর দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামায) পড়া মুস্তাহাব এবং সাওয়াবের কাজ। তবে এ নামাযও উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে পড়বে না। বুঝা গেল এই দুই প্রকার নামায পড়া মুস্তাহাব। পড়তেই হবে, এমন জরুরী নয়। অনেক সময় খুতবার পূর্বে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়ার সময় দেয়া হয়। তখন এ নামায না পড়া ভাল। কারণ এ সময় উক্ত নামায পড়তে গেলে সুন্নাত ৪ রাক'আত খুতবার সময় পড়তে হয়। অথচ খুতবার সময় নামায, দু'আ ও কথাবার্তা বলা সবই নিষিদ্ধ। সুতরাং সময় কম থাকলে এ নামায না পড়ে শুধু জুমু'আর ৪ রাক'আত সুন্নাত (কাবলাল জুমু'আ) পড়ে নিবে। [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৩ : ২৭৪]

{পৃষ্ঠা-৩৪২}

ফজরের আযানের পর সুন্নাত ছাড়া অন্য কোন নফল

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের আযানের পর সুন্নাত পড়ার পূর্বে দুখূলুল মসজিদ বা অন্য কোন নফল নামায পড়া যাবে কিনা ?

জবাবঃ সুবহে সাদিক হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন নফল ও সুন্নাত পড়া মাকরূহ । সুতরাং দুখূলুল মসজিদ বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি নফল নামায পড়াও জায়িয হবে না । তবে উক্ত সময় মসজিদে বসে যিকির-আযকার, তাসবীহ তাহলীল ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি ইবাদত আদায় করার দ্বারাও দুখূলুল মাসজিদ নামায আদায় করার সাওয়াব পাওয়া যায় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ১৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৮১]

في القهستاني وركعتان او اربع و هي افضل لتحية المسجد إلا اذا دخل فيه بعد الفجر او العصر فانه يسبح ويهلل و يصلي علي النبي صلي الله عليه فانه حينئذ يؤدي حق المسجد – [رد المحتار 17/2]

ফজরের পর ফজরের নামাজের সুন্নাত আদায়

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের নামাযের সুন্নাত যদি ফজরের পূর্বে পড়ার সময় না পাওয়া যায়, তাহলে সূর্য উদিত হওয়ার পর উক্ত সুন্নাত আদায় করা, না করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি ?

জবাবঃসূর্য উদিত হওয়ার পর হতে আরম্ভ করে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মাঝে তা আদায় করা যাবে । তবে এ নামায নফল হিসেবে গণ্য হবে । [প্রমাণঃ হিদায়াহ, ১ : ১৫২]

واذا فاتته ركعتا الفجر لايقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقي نفلا مطلقا- [الهداية:152/1]

ফজরের জামা'আত শুরু হলে সুন্নাত পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ফজরের জাম'আত শুরু হয়ে গেলে সুন্নাত পড়ার নিয়ম কি ? এবং যদি সুন্নাত ফজরের নামাযের পূর্বে পড়তে না পারে, তবে কখন পড়বে ?

জবাবঃ ফজরের জাম'আত শুরু হয়ে গেলে, সুন্নাত পড়ার নিয়ম হল ইমামের সাথে যদি দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ পাওয়ার প্রবল ধারণা হয়, তাহলেও ফজরের সুন্নাত আগে পড়ে নিবে । তারপরে জামা'আতে শরীক হবে । যতদূর সম্ভব সুন্নাত কাতার থেকে দূরে আলাদা জায়গায় গিয়ে পড়বে । জামা'আতের কাতারের মধ্যে কোন অন্তরাল ব্যতীত সুন্নাত পড়া মাকরূহে তাহরীমী । আর যদি দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে সুন্নাত না পড়েই

{পৃষ্ঠা-৩৪৩}

জামা'আতে শরীক হয়ে যাবে । সেক্ষেত্রে ফজরের সুন্নাত-এর কাযা করা জরুরী নয় । তবে কেউ পড়তে চাইলে সূর্য উদয়ের পরে পড়ে নিতে পারে । সূর্য উদয়ের আগে না পড়া উচিত । তবে অসুবিধার কারণে কেউ পড়লে বাধা দেয়ার দরকার নেই । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ২৫৭ # ফাতাওয়ায়ে রাশীদিয়া ৩০৪ # হিদায়া ১ : ১৫২ # বেহেশতী যেওর, ১১ : ৬৩ # আপকে মাসায়েল আওর উনকে হল, ২ : ৩৪০-৪১]

ومن انتهي الي الامام في صلواة الفجر وهو يصلي ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته ركعة و يدرك الاخري يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشي فوتها دخل مع الامام – لان ثواب الجماعة اعظم و اذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقي نفلا مطلقا و هو مكروه بعد الصبح – [الهداية 152/1]

অপারগতা বশতঃ তাহাজ্জুদ নামায রাতের অগ্রভাগে আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ সাধারণতঃ মিলের শ্রমিক-কর্মচারীরা শিপটওয়ারী রাত দশটায় ডিউটি সেরে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে শয়ন করলে তাহাজ্জুদের সাওয়াব পাবে কি-না ? কেননা, সারাদিন ও রাত দশটা

পর্যন্ত ডিউটি করে শুইলে নির্দিষ্ট সময়ে উঠে তাহাজ্জুত পড়া সম্ভব হয় না বিধায় রাত দশটায় তাহজ্জুদ পড়লে তার সাওয়াব পাওয়া যাবে কি-না ?
জবাবঃ অপারগতা বশতঃ যদি কোন ব্যক্তি তাহাজ্জুদের নির্দিষ্ট সময়ে উঠতে অক্ষম হয়, তাহলে সে ব্যক্তির জন্য ইশার সুন্নাতের পর বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে নফল নামায আদায় করলে সে ব্যক্তি তাহজ্জুদের নামাযের সাওয়াবের অধিকারী হবে । কেননা, তবরানী শরীফে উল্লেখ আছে যে, ইশার নামাযের পর একটি ছাগল দোহন করতে যতটুকু দেরী হয়, ততটুকু সময়ের পর যে সমস্ত নফল নামায পড়া হয়, সেগুলো তাহাজ্জুদ নামাযের অন্তর্ভুক্ত । হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) অনেক রাত পর্যন্ত হাদীস মুখস্ত করতেন । শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়া তার জন্য কঠিন ছিল । এ জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে ইশার সুন্নাতের পরে বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন । [প্রমাণঃ রদ্দুল মোহতার ২ : ২৪ পৃঃ # দারুল উলূম ৪ : ৩০৫ # আহসানূল ফাতাওয়া ৩ : ৪৯৩]

তাহাজ্জুদ নামায জামাআতে পড়া

জিজ্ঞাসাঃ তাহাজ্জুদ নামায জামা'আতে পড়া যায় কি-না ?
জবাবঃ যে সব নামায জামা'আত বন্দী হয়ে পড়ার কথা শরীয়তে বলেছে, তা জামা'আতের সাথে পড়া চাই । আর যে সমস্ত নামায একাকী পড়ার কথা বলা হয়েছে, সেগুলো একাকী পড়াই পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্তির উপায় এবং আল্লাহ ও
{পৃষ্ঠা-৩৪৪}
রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের সরল পথ । হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সুযোগ্য সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবিয়ীন তাবি'তাবিয়ীনগণ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন এবং আমাদের জন্য চিরস্থায়ী সুন্নাত হিসেবে তার গুরুত্ব বর্ননা করেছেন । তবে তাঁরা কখনোও জামা'আত বন্ধী হয়ে তাহাজ্জুদ পড়েছেন এমন কোন প্রমাণ আমাদের জানা মতে নেই । সুতরাং জামা'আতের সাথে তাহাজ্জুদ পড়া উচিত নয় । তাহাজ্জুদ নামায একাকী পড়াই সুন্নাত তরীকা । যদি ঘটনা ক্রমে দু'তিন জন একত্রিত হয়ে জামা'আতের সাথে তাহাজ্জুদ পড়ে ফেলে তাহলে মাকরূহ হবে না । আর যদি ৪/৫ জন মিলে ডাকাডাকি না করে জামা'আত করে, বা ডাকাডাকি করে ২/৪ জন মিলে জামা'আত করে, তাহলে উক্ত জামা'আত ফুকাহায়ে কিরামের মতে মাকরূহ হবে । [প্রমাণঃ মাবসূত ২ : ১৪৪ # আল বাহরুর রায়িক, ১ : ৬০৪ # আদদুররুল মুখতার ২ : ৪৮-৪৯ # বাদায়েউস সানায়ে, ১ : ২৮০ # রহীমিয়া ১ : ১৭৭ # রশীদীয়া ২৯৬]
يكره ذالك علي سبيل التداعي بان يقتدي اربعة بواحد كما في الدرر – [الدر المختار 2/48-49]

সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ সালাতুল তাসবীহ আদায়ের নিয়ম কি ?
জবাবঃ সালাতুত তাসবীহ আদায়ের নিয়ম কিতাবে দু'ধরনের এসেছেঃ
প্রথমতঃ এই নামাযের জন্য নির্দিষ্ট কোন সূরা নেই । অন্যান্য নামাযের ন্যায় (যথা নিয়মে) সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা মিলানোর পরে রুকূতে না গিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় এ কালিমা ১৫ বার পড়তে হবেঃ - سبحان الله و الحمد لله ولا اله الا الله و الله اكبر
অতঃপর রুকূতে গিয়ে (রুকূর তাসবীহ পড়ে) আবার ওই কালিমাগুলো ১০ বার পড়বেন । অতঃপর রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে পুনরায় ওই কালেমাগুলো ১০ বার তারপর সিজদায়ে গিয়ে সিজদার তাসবীহ পড়ে আবার ওই কালিমাগুলো ১০ বার পড়বেন । প্রথম সিজদা থেকে উঠে বসে, বসা অবস্থায় পুনরায় কালিমাগুলো ১০ বার পড়বেন । অতঃপর দ্বিতীয় সিজদায় গিয়ে পুনরায় ১০ বার

পড়বেন । দ্বিতীয় সিজদা থেকে উঠে বসবেন এবং বসা অবস্থায় পুনরায় ১০ বার পড়বেন । এভাবে এক রাক'আতে তাসবীহটি ৭৫ বার পড়া হলো । প্রত্যেক রাক'আতে এই নিয়মেই তাসবীহটি পড়া হবে । এভাবে চার রাক'আতে তাসবীহটি (৭৫×৪)মোট ৩০০ বার পড়তে হবে । এই নামাযকে "সালাতুত তাসবীহ" বলা হয় । [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১ : ১১৭ # আবূ দাউদ শরীফ ১ : ১৮৪ # বেহেশতী যেওর ২ : ৩১]

{পৃষ্ঠা-৩৪৫}

দ্বিতীয়তঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক হতে এর আরেকটি নিয়ম বর্ণিত রয়েছে । তা হচ্ছে- প্রথম রাক'আতে উল্লেখিত দু'আটি সূরা ফাতিহা ও কিরাআতের আগেই ১৫ বার এবং কিরাআতের আগে ১০ বার পড়বে । এ সুরতে দ্বিতীয় সিজদার পর বসে যে ১০ বার পড়ার কথা পূর্বের নিয়মে উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রয়োজন পড়বে না বরং দ্বিতীয় সিজদাতে ৭৫ বার শেষ হবে । দ্বিতীয় এ সুরতটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর সূত্রে বর্ণিত হাদীস শরীফেও উল্লেখিত রয়েছে । এ নামায দ্বারা সব ধরনের গুনাহ মাফ হয়ে যায় । এ নামায প্রতি সপ্তাহে একবার এবং তা জুম'আর দিন হওয়া অতি উত্তম । [প্রমাণঃ ইহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন ১ : ২১৪]

সালাতুত তাসবীহ পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ সালাতুত তাসবীহ পড়া কি ? জীবনে একবারও না পড়লে, গুণাহগার হতে হবে কি ? উক্ত নামাযের জামা'আত কায়িম করা যাবে কি-না ?

জবাবঃ সালাতুত তাসবীহ নফল নামায । ফরয বা ওয়াজিব নয় । তা জীবনে একবারও না পড়লে গুণাহগার হবে না । তবে সে ব্যক্তি একটি বিরাট ফযীলত ও সাওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত রইল । ডাকাডাকি করে অথবা চার জন বা চার জনের বেশী লোক নিয়ে সালাতুত তাসবীহ বা অন্য কোন নফল নামাযের জামা'আত করা হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মাকরূহ হবে । তবে রাত্রে একজন উচ্চৈঃস্বরে নফল নামাযের কিরাআত পড়লে ২/১ জন নিজস্ব ভাবে তার সাথে শরীক হয়ে নামায পড়তে পারে । সে ক্ষেত্রে মাকরূহ হবে না । আর সালাতুত তাসবীহ নিতান্তই ব্যক্তিগতভাবে পড়ার নামায । জামা'আতে এ নামায পড়তে গেলে তাসবীহের হিসাব গোলমাল হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক । [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১ : ১১৭, ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ ; ৩১৩ # বেহেশতী যেওর ২ : ৩০]

নফল নামায

জিজ্ঞাসাঃ (ক)পাক অবস্থায় নফল নামায যত ইচ্ছা পড়া যাবে কি-না ?
(খ) তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও সালাতুত তাসবীহ নফল না, সুন্নাতের নিয়তে পড়তে হয় ?
(গ) বিতরের নামায পড়ে শুয়ে গেলে ভোর রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি-না ?

জবাবঃ (ক) হ্যাঁ, মাকরূহ ওয়াক্ত না হলে নামায যত ইচ্ছা পড়া যায়। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১ : ৪০ # বেহেশতী যেওর ২ : ২৯]

তবে সারা দিনে কখন কত রাক'আত নফল, কিভাবে পড়তে হবে তা কোন হক্কানী আলেম বা মুফতী সাহেব-এর নিকট থেকে ভালোভাবে জেনে নিন ।

{পৃষ্ঠা-৩৪৬}

(খ) তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও সালাতুত তাসবীহ শুধু উক্ত নামাযের নিয়তে পড়লেই হয়ে যাবে । যেমন- বলতে হবে দুই রাক'আত ইশরাক পড়েছি । সুন্নাত বা নফল বলার প্রয়োজন নেই । একান্ত বলতে হলে, যে কোনটাই বলতে পারেন । কারণ, উক্ত নামায সুন্নাতে গাইরে মু'আক্কাদাহ । যাকে নফলও বলা যায় । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৫৫]

(গ) তাহাজ্জুদের অর্থ হল রাত্রে ঘুম থেকে উঠে নামায পড়া । তবে উত্তম হল শেষ রাত্রে আট রাক'আত বা বার রাক'আত নফল নামায পড়া এবং সুবহে সাদিকের পূর্বে শেষ করা । যদি কেউ বিতরের নামায পড়ে শুয়ে পড়ে এবং শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ে, এতে কোন অসুবিধা নেই । বস্তুতঃ যারা নিয়মিত উঠতে পারে, শেষ রাত্রে উঠতে কোন অসুবিধা হয় না, তাদের জন্য তাহাজ্জুদের পরে বিতর পড়া ভালো, জরুরী নয় । [প্রমাণঃ হিদায়া ১ : ৮৪ # বেহেশতী যেওর ২ : ৩০]

নফল নামায জাম'আতে পড়া

জিজ্ঞাসাঃ নফল নামায কি জামা'আতে পড়া যায়, যেমন শবে কদর, শবে বরাত ইত্যাদির নামায ?

জবাবঃ যে কোন নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়া মাকরূহে তাহরীমী । নফল নামায জামা'আতে পড়ার প্রমাণ কোন যুগেই পাওয়া যায় না । তবে কেবল মাত্র তারাবীহের নামায, নামাযে ইস্তিকা ও নামাযে কুসূফ জামা'আতে পড়ার শরীয়তে বিধান রয়েছে । [প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর ১ : ৪০৯ # শামী ২ : ৪৯ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ১৭৭]

يكره ذالك علي سبيل التداعي بان يقتدي اربعة بواحد – [الدر المختار 2/48-49]

নফল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত

জিজ্ঞাসাঃ সুন্নাত বা নফল নামাযে উচৈঃস্বরে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করায় কোন ক্ষতি আছে কি ? উল্লেখ্য যে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত করায় অধিক মনোযোগ আসে ।

জবাবঃ হ্যাঁ, রাতের সুন্নাত বা নফল নামাযে উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করা যাবে । তবে একদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে এর দ্বারা অন্যের অসুবিধা বা কষ্ট না হয় । অবশ্য দিনের নফল নামাযে কিরাআত আস্তেই পড়তে হবে । [ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৭২]

اما نوافل النهار فيخفي فيها حتما و في نوافل الليل يتخير - [عالمكيري 76/1]

{পৃষ্ঠা-৩৪৭}

চাশত নামাযের ফযীলত

জিজ্ঞাসাঃ (ক) চাশত নামায কত রাক'আত এবং কখন আদায় করা হয় ? আর এ নামায পড়লে কি পরিমাণ সাওয়াব হবে ?

জবাবঃ(ক) চাশতের নামায দুই রাক'আত থেকে বার রাক'আত পর্যন্ত পড়া যায় । সূর্য উপরে উঠার (আনুঃ ১৫ মিনিট) পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত এই নামাযের সময় । তবে উত্তম হলো দিনের এক চতুর্থাংশ যাওয়ার পরে পড়া । হাদীস শরীফে এতদসম্পর্কে অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে । এক হাদীসে আছে যে, দিনের প্রথমাংশে (চাশতের) চার রাক'আত নামায পড়লে আল্লাহ তা'আলা দিনের শেষ পর্যন্ত তার যাবতীয় কাজকর্ম ও জরুরতের দায়-দ্বায়িত্ব নিয়ে নিবেন এবং সকল কাজ আসানির সাথে করে দিবেন । [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১১৬ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪ : ২৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩ : ৪৬৫]

عن ابي الدرداء و ابي ذر رضـ قال رسول الله صلي الله عليه و سلم عن الله تبارك و تعالي انه قال يابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره- [مشكواة شريف 116/1]

ইশরাক নামাযের নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ ইশরাকের নামায কত রাক'আত ? এ নামাযের জন্য বিশেষ কোন নিয়ম আছে কি ? অনেকে বলে থাকেন, প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিনবার পড়তে হয় । এ

মত কতটুকু সঠিক ? ইশরাক নামাযের ফযীলত সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে জানতে ইচ্ছুক
।
জবাবঃ ইশরাকের নামায চার রাক'আত, দু' রাক'আতও পড়তে পারে । তা আদায় করার পদ্ধতি হুবহু অন্যান্য নফল নামাযের মতই । এর জন্য পৃথক ও ভিন্ন কোন নিয়ম নেই । পবিত্র কুরআন ও রাসূলের হাদীসে এতদসংক্রান্ত অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত রয়েছে । হাসীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-"হে মুমিনগণ ! তোমরা দিনের প্রথম ভাগে আমার জন্য চার রাক'আত নামায পড় । আমি তোমাদের পুরো দিনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব ।" [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১ : ১১৬]
হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করে সূর্যোদয় পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকে, অতঃপর দুই রাক'আত নামায আদায় করে সে একটি পূর্ণ হজ্ব ও উমরার সাওয়াব পাওয়া পাবে । [প্রমাণঃ মিশকাত ১ : ১১৬ # আহসানুল ফাতওয়া ৩ : ৪৬৫]
{পৃষ্ঠা-৩৪৮}
সালাতুল খাউফ পড়ার সহীহ পদ্ধতি
জিজ্ঞাসাঃ বর্তমানে সালাতুল খাওফ পড়া সহীহ কি-না ? যদি সহীহ হয় তবে তা আদায়ের পদ্ধতি কি ? প্রমাণসহ জানতে ইচ্ছুক ।
জবাবঃ যদি নিশ্চিতভাবে বা প্রবল ধারণার ভিত্তিতে শত্রুর ভয় থাকে আর সকলে একই ইমামের পিছনে নামায পড়তে চায়, তাহলে সালাতুল খাওফ বর্তমানেও বৈধ হবে । সালাতুল খাওফ আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি বেহেশতী যেওর কিতাবে দেখে নেয়া যেতে পারে । [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ২ : ১৮৬ # হিন্দিয়া ১ : ১৫৪]
অসুস্থ ও মা'যূরের মাসায়েল
ট্রেনে, বাসে ও লঞ্চে নামায আদায়ের পদ্ধতি
জিজ্ঞাসাঃ সফর অবস্থায় ট্রেনে, বাসে বা লঞ্চে বসে ফরয নামায আদায় করা যাবে কি-না ? গেলে তার নিয়ম কি ?
জবাবঃ এখানে তিনটি বিষয় জেনে রাখার দরকারঃ
১মঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়া ।
২য়ঃ কিবলার দিকে মুখ রাখা ।
৩য়ঃ নিয়ম মুতাবিক রুকু-সিজদা সহ নামায পড়া । অর্থাৎ, ইশারায় রুকূ সিজদা না করা । যদি ট্রেন বা লঞ্চে বা বাসে উল্লেখিত তিনটির কোন একটি করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে নামায ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় পড়ে নিবে । কিন্তু পরে দোহরানো জরুরী ।
গাড়ীতে লঞ্চে বা বাসে নামায পড়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে তাহরীমা বাঁধার পর পড়ে যাওয়ার ভয় থাকলে হেলান দিয়ে বা কোন কিছু ধরে দাঁড়াবে । মনে রাখতে হবে- হাত বাঁধা সুন্নাত । কিন্তু দাড়ানো ফরয । কাজেই প্রয়োজনের সময় সুন্নাত তরক করে ফরয আদায় করতে হবে । গাড়ী, লঞ্চ ও বাস কিবলা থেকে ঘুরতে থাকলে মুসল্লীও ঘুরবে এবং সর্বদা কিবলামুখী থাকবে । সিজদার সময় পিছনের সিটে পা ঝুলিয়ে বসে সামনের ছিটে কম করে ১ তাসবীহ পরিমাণ সময় সিজদা করবে । আর খালি জায়গা পেলে লঞ্চে, বাস বা ট্রেনের ফ্লোরে সিজদাহ করবে । আর যদি সিজদা করার মত কোন খালি জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে ইশারায় রুকূ-সিজদা করে নামায পড়ে নিবে । তবে এ ক্ষেত্রে গন্তব্যে স্থলে পৌঁছে নামায দুহরিয়ে পড়তে হবে । তবে যানবাহনে যদি কেউ বিনা ওযরে বসে নামায পড়ে বা কিবলা থেকে চেহারা ফিরে যায়,

তাহলে নামায দুহরিয়ে নিতে হবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ৮৮ # ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়াহ ২ : ১২০]

{পৃষ্ঠা-৩৪৯}

অসুস্থতার কারণে কোন জিনিস উচু করে তার উপর সিজদা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতা অসুস্থ । তিনি অপরাগতার কারণে নামাযে সিজদা করতে পারছেন না । সিজদার সময় কোন জিনিষ তার কপালের দিকে উঁচু করে রাখলে জায়িয হবে কি-না ? যার উপর তিনি সিজদা করবেন ।

জবাবঃ অপারগতার কারণে সিজদা না করতে পারলে তার জন্য ইশারায় (মাথা সম্ভব মত নীচু করে রেখে) সিজদা করাই যথেষ্ট । কোন কিছু উঁচু করে ধরার প্রয়োজন নেই । [প্রমাণঃ খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১ : ১৯৬ # আলমগীরি ১ : ১৩৬]

মুসল্লীর পা কর্তিত হওয়া ও শুয়ে নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ যার একটি পা কেটে গিয়েছে সে কিভাবে নামায পড়বে ? তেমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির বিছানায় শুয়ে নামায আদায়ের পদ্ধতি কি হবে ?

জবাবঃ যে ব্যক্তির এক পা কেটে গিয়েছে তার পক্ষে যেহেতু দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব নয় । সুতরাং তিনি বসে নামায আদায় করবেন ।

আর এমন অসুস্থ ব্যক্তি, যে ঘরে বসেও নামায আদায় করতে অক্ষম, সে শুয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে । আর এর পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মাথা পূর্ব দিকে দিয়ে উভয় পা কিবলামূখী করে চিত হয়ে শুয়ে মাথা দ্বারা ইশারা করে নামায আদায় করবে । আর মাথার নিচে কোন বালিশ অথবা অন্য কোন উঁচু জিনিস রাখবে ।

অথবা কিবলার দিকে চেহারা করে পার্শ্ব ফিরে শয়ন করবে । অর্থাৎ, মাথা উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে করে রাখবে । কিন্তু চেহারা থাকবে পশ্চিম দিকে । প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়িক ২ : ১১৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ৪৩৭]

ঘন ঘন বায়ু নির্গত হলে

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির খুব ঘন ঘন বায়ু বের হয় । যেমন- দু রাক'আত নামায আদায় করতে ৫/৭ বার বায়ু বের হয় । এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ?

জবাবঃ যে ব্যক্তির ঘন ঘন বায়ু বের হয় এবং পূর্ণ ওয়াক্তের ভিতরে এতটুকু সময় বায়ু নির্গত হওয়া বন্ধ হয় না যে, উযু করে কোন মতে ফরয নামায আদায় করতে পারে, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মা'যূর বলা হয় । আর মা'যূরের নামায পড়ার নিয়ম হল, যখন কোন নামাযের সময় হবে তখন একবার উযু করে উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত ও সব ধরনের নামায পড়তে পারবে । অনুরূপভাবে প্রত্যেক ওয়াক্তেই একবার উযু করতে হবে ।

{পৃষ্ঠা-৩৫০}

বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে তার উযু নষ্ট হবে না । বরং ওয়াক্ত থাকা পর্যন্ত তার উযু বহাল থাকবে যদি উযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ পাওয়া না যায় । [প্রমাণঃ হিদায়া ১ : ৬৭ # আহসানুল ফাতাওয়া ২ : ৭৫]

রুগ্ন ব্যক্তির নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতা মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত । তার স্মরণশক্তি দারুণভাবে লোপ পেয়েছে । অসুস্থতার কারণে তিনি বসে নামায আদায় করতে অক্ষম । শুয়ে নামায আদায় করতে গিয়েও প্রায়ই ভুল করেন । নির্ধারিত রাক'আত শেষ হওয়ার পূর্বেই সালাম ফিরিয়ে দেন অথবা কোন সূরা

আরম্ভ করে মাঝখান থেকে বাদ দিয়ে দেন । এমতাবস্থায় আমরা যদি তার পার্শে দাঁড়িয়ে নামাযের আহকাম ও সূরা-কিরাআত বলে দেই, আর সে অনুযায়ী তিনি নামায শেষ করেন, তাহলে নামায শুদ্ধ হবে কি ? আর যদি না হয়, তাহলে এরূপ রুগ্ন ব্যক্তির নামায আদায়ের পদ্ধতি কি হবে ?
জবাবঃ মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি-যদি সম্পূর্ণ ঠিক থাকে তাহলে তার উপর নামায ফরয । তবে যদি সে শারীরিক দিক দিয়ে অক্ষম বা মা'যূর হয়, সে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে অক্ষম হলে শুয়ে শুয়ে আদায় করবে । এতেও যদি অক্ষম হয়, তাহলে পরবর্তীতে আদায় করে নিবে বা ওসীয়্যাত করে যাবে । কিন্তু যদি তার আকল-বুদ্ধি ও হুঁশ-জ্ঞান ঠিক না থাকে, যেমন- প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তাহলে এমন ব্যক্তির উপর আর নামায ফরয থাকে না । সুতরাং আপনার পিতার আকল বুদ্ধি সম্পূর্ণ ঠিক না থাকায় তার উপর নামায ফরয নয় । তবে আপনারা তাকে যেভাবে পড়াচ্ছেন, সেভাবে নামায পড়াতে থাকুন । ফরয না হলেও এর দ্বারা তিনি সাওয়াব পাবেন এবং উযরের কারণে তার নামায হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ২ : ১০০ # তাকরীরাতে রাফেয়ী ১০৪]

অসুস্থতার কারণে নামায ছেড়ে দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ অসুস্থতার জন্য প্রায়ই জামা'আত ছুটে যায় । একদিন বলে ফেলল আর নামায পড়ব না । নামায পড়ে কি লাভ? বালা-মুসীবত দূর হচ্ছে না । যারা নামায পড়ে না তারা কত সুখে আছে । এই কথার দ্বারা কি কি ক্ষতি হতে পারে এবং কি করণীয়?
জবাবঃ কোন মুসলমানের জন্য নামাযের ব্যাপারে এ ধরনের উক্তি করা কুফুরী কাজ । এতে ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল আশংকা থাকে । সুতরাং সে ব্যক্তির জন্য খালিস দিলে তাওবা করে সতর্কতামূলক নতুন করে ঈমান গ্রহণ করা ও বিবাহ দুহরিয়ে নেওয়া উচিত । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৪ : ২৪৭ # ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ৫ : ৩৯৪]

{পৃষ্ঠা-৩৫১}

নামযের কাযা / কাফফারা / ফিদয়া

ভুলে কাযা নামায না পড়ে ওয়াক্তিয়া পড়লে

জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তির ফযরের নামায কাযা হয়েছে । তার স্মরণ না থাকায় যোহরের নামায পড়েছে । এখন তার ঐ নামায হবে কি-না ?
জবাবঃ ভুলে ফজরেরে নামাযের কথা স্মরণ না থাকাবস্থায় যোহরের নামায আদায় করে নিলে, যোহরের নামায সহীহ হয়ে যাবে । তবে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রথমে যোহরের নামায আদায় করে, তারপর ফজরের নামায কাযা পড়ে, তবে তার যোহরের নামায সহীহ হবে না । দ্বিতীয়বার পড়া জরুরী । তবে যদি কোন কারণে ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকে, তবে উপস্থিত নামায আদায় করার পর কাযা নামাযগুলো আদায় করতে অসুবিধা নেই । [প্রমাণঃ বাদায়িয়ুস সানায়ে, ১ : ১৩২/ ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম ৪ : ৩২৭/ মিশকাত শরীফ, ৬৭ পৃঃ/হিদায়া]
الاصل فيه ان الترتيب بين الفوائت و فرض الوقت عندنا مستحق ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الاصل....... الا ان يزيد الفوائت علي ستة صلوات – [الهداية 154/1]

কাযা নামাযের ফিদয়া দেওয়ার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ এখন থেকে ৪০ বৎসর পূর্বে এক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে প্রায় ২/৩ মাস পর্যন্ত নামায রোজা আদায় করতে পারেনি । এখন ঐ নামায রোজা আদায় করার মত শক্তিও তার নেই । ঐ রোযা ও নামাযের জন্য তার কি করতে হবে ? যদি ফিদয়া দিতে হয়, তা কিভাবে দিবে ? ৪০

বৎসর পূর্বে যে রকম মাল-জিনিসের মূল্য ছিল এখন অনেক বেড়েছে, এ অবস্থায় এখন তা কিভাবে আদায় করবে ?
জবাবঃ এমতাবস্থায় তার প্রতি শরীয়তের বিধান হল, যদি সে দাড়িয়ে বা বসে অথবা ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিগত দিনের নামায কাযা আদায় করে নিবে । এমতাবস্থায় শুধু ফিদয়া আদায় করে দায়িত্বমুক্ত হতে পারবে না । তবে যদি উল্লেখিত কোন অবস্থায়ই মৃত্যু পর্যন্ত আর নামায আদায়ে সক্ষম না হয়, তাহলে ফিদয়া আদায় করবে ।
তেমনিভাবে রোযার হুকুম ।
নামাযের ফিদয়ার নিয়ম হচ্ছে-প্রতিদিন ছয় ওয়াক্ত নামাযের হিসাবে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া "পৌনে দুই সের গম বা তার বর্তমান বাজার মূল্য" আদায় করে দেয়া । আর একটি রোযার ফিদয়া এক ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়ার সমপরিমাণ । টাকায় পরিশোধ করতে চাইলে বর্তমান মূল্য দ্বারা পরিশোধ করবে । [প্রমাণঃ আলমগীরী ১ : ১২৫ # আলমগীরী ১ : ২০৭, # হিদায়া, ১ : ২২২]
{পৃষ্ঠা-৩৫২}
الشيخ الفاني الذي لا يقدر علي الصيام يفطر و يطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات.....من مات و عليه قضاء رمضان فاوصي به اطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر او صاع من تمر او شعر – [الهداية 222/1]
নামাযের কাফফারা আদায়
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে । এ অবস্থায় নয় মাস অতিবাহিত হয়ে যায় । উল্লেখ্য যে, উক্ত নয় মাসে তার হুশ জ্ঞান ছিল । নয়মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন । এখন প্রশ্ন হলো, তার এত দিনের কাযা নামায সমূহের কাফফারা কিভাবে আদায় করতে হবে ?
জবাবঃ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক থাকে ততক্ষণ তার উপর নামায ফরয থাকে । আর জ্ঞান-বুদ্ধি ও মস্তিস্ক যদি ঠিক না থাকে তাহলে তার উপর আর নামায ফরয থাকে না । জ্ঞান-বৃদ্ধি ঠিক থাকার পর যদি শারীরিক অসুস্থতার কারণে বা বার্ধক্যের কারণে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী নামায আদায়ে অপারগ হয় অর্থাৎ সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার পরও যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে বসে নামায আদায় করবে । তাও সম্ভব না হলে শুয়ে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করবে । আর যদি ইশারার মাধ্যমেও নামায আদায় করার ক্ষমতা না থাকে এবং এ অবস্থা একদিনের চেয়ে বেশী সময় বিদ্যমান থাকে, তাহলে তার জন্য নামায মাফ হয়ে যাবে । অন্যথায় মাফ হবে না ।
অতএব, হুশ-জ্ঞান ঠিক থাকার পরও যদি কমপক্ষে ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করার সামর্থ থাকে, তারপরও নামায আদায় না করে থাকে, তাহলে সুস্থ হওয়ার পর ছুটে যাওয়া নামাযগুলো কাযা করতে হবে । কিন্তু যদি কাযা করার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায় এবং ইন্তেকালের পূর্বে কাফফারার ওসীয়্যাত করে গিয়ে থাকে এবং তার সম্পদও থাকে, তাহলে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কাফফারা আদায় করতে হবে ।
কিন্তু যদি তিনি মাল না রেখে যান, কিংবা মাল রেখে গেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোন ওসিয়্যাত করে যাননি, এমতাবস্থায় তার পক্ষ থেকে কাফফারা আদায় করা ওয়ারিসদের জন্য জরুরী নয় । তবে ওয়ারিসগণ নিজেদের পক্ষ হতে আদায় করে দিতে পারেন । আর তাদের জন্য এরূপ করাই উত্তম এবং এর দ্বারা মৃত ব্যক্তি শাস্তি হতে মুক্তি পেতে পারেন ।
{পৃষ্ঠা-৩৫৩}

আর কাফফারার পরিমাণ হচ্ছে, প্রতিদিন বিতর নামায সহ ছয় ওয়াক্ত নামায হিসেব করে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য পৌনে দু'সের গম বা আটা অথবা এর বাজার মূল্য গরীব মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে । অথবা প্রতি ওয়াক্তের পরিবর্তে একজন গরীবকে দু'বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ৭২ / আদদুররুল মুখতার ২ : ৯৫-১০০]
ولو مات وعليه صلوات فائته و اوصي بالكفارة يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر كالفطرة و كذا حكم الوتر و الصوم انما يعطي من ثلث ماله- [الدر المختار – 76/2]
واما اذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات انه يجزيه ان شاء الله تعالي – (رد المحتار:72/2 , الدر المختار 95/2-100)

নামাযের কাফফারা বিশ্বাস না করলে

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক যদি নামাযের কাফফারাকে বিশ্বাস না করে তাহলে তার কি ধরনের গুনাহ হবে ?

জবাবঃ নামাযের কাফফারা যেহেতু কুরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, বরং রোযার কাফফারার উপর কিয়াস করে নির্ধারণ করা হয়েছে তাই এটা কেউ অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা যাবে না । এটা যেহেতু শরীয়তের একটি বিধান এবং ইবাদত, তাই সে ব্যক্তি গুণাহগার ও পথভ্রষ্ট বলে গণ্য হবে । এজন্য তার তাওবা করা উচিত । [প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৩৮ # আযীযুল ফাতাওয়া, ২৫২ # ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া, ১০ : ৯২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৫৬]

উমরী কাযা নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ উমরী কাযা নামাযের নিয়ম কানুন জানতে ইচ্ছুক ।

উমরী কাযার মাগরীব ও বিতর নামাযের নিয়ম দয়া করে জানাবেন । অনেকে বলে থাকেন যে, এগুলোর উমরী কাযা চার রাক'আত পড়তে হয় ।

জবাবঃ ওয়াক্তিয়া নামায ও উমরী কাযার নিয়ম-কানুনে তেমন কোন পার্থক্য নেই । তবে নিয়্যাতের বেলায় এভাবে বলবে যে আমার যিন্দেগীর প্রথম ফযর/ যোহর / আসর-এর কাযা আদায় করছি । প্রত্যেক ওয়াক্তে এভাবে নিয়ত করতে থাকবে । কত দিনের উমরী কাযা পড়বে তার হিসাব করার নিয়ম হচ্ছে প্রথমে গভীর ভাবে চিন্তা করবে । চিন্তা করে নিজের প্রবল ধারণা অনুযায়ী কত বছর কতমাস হয় তার সিদ্ধান্ত করে নিবে । এরপর উক্ত হিসাবটা নোট করে নিবে এবং এ হিসাবকেই চূড়ান্ত হিসেবে ধরে নিতে হবে । অতঃপর নিজের

{পৃষ্ঠা-৩৫৪}

সুবিধা মত যখন যে নামাযের কাযা পড়ার সুযোগ হয় তাই পড়বে । তবে প্রত্যেক ওয়াক্তের সাথে ঐ ওয়াক্তের উমরী কাযা পড়া হিসাব রাখার জন্য সুবিধাজনক । কোন ওয়াক্ত ছুটে গেলে রাত্রে তা পুরা করে নিবে । এভাবে এক দিনে কমপক্ষে এক দিনের উমরী কাযা করে নিবে । এভাবে যা পড়া হবে তা থেকে বাদ দিবে । এভাবে সব নামায হয়ে গেলে ভাল । নতুবা যিন্দেগীর শেষ মুহূর্তে অবশিষ্ট নামাযের ফিদয়া দেয়ার ওসীয়ত করে যাবে । উল্লেখ্য যে, সুন্নাত নামাযের কাযা নেই । শুধু ফরয ও বিতরের কাযা করতে হবে । [প্রমাণঃ মারাকিল ফালাহ, ৩৬২-৩৬৩ # হিদায়া, ১ : ১৫৫, # হালবী কাবীর, ৫২৯ # ফাতাওয়া শামী, ২ : ৬৮ # দারুল উলূম, ৪ : ৩৩২, # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৩৭ # কিফায়াতুল মুফতী, ৩ : ৩৩৭]
واذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والاوقات...... فاذا اراج تسهيل الامر عليه نوى اول ظهر عليه ادرك وقته ولم يصله فاذا نواه كذلك فيما يصليه يصير اولا فيصح بمثل ذلك. (مراقي الفلاح:362)

মাগরীব ও বিতরের কাযা তিন রাক'আত পড়তে হবে চার রাক'আত পড়া জায়িয হবে না । বরং তিন রাক'আতের নিয়মেই পড়তে হবে । অর্থাৎ বিতর হলে বিতরের মত, আর মাগরীব হলে মাগরীবের মত । এগুলোর জন্য আলাদা কোন নিয়ম নেই । পূর্বোল্লেখিত নিয়মেই হিসাব ও নিয়্যত করবে । অবশ্য বিতরের কুনূতের পূর্বে শুধু তাকবীর বলবে হাত উঠাবে না ।
উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি নামায কাযা না থাকা সত্বেও এই নিয়তে কাযা নামায পড়ে যে,"আমার যিম্মায় কাযা থাকতেও পারে তাই সতর্কতামূলক কাযা পড়ছি । ঐ ব্যক্তির জন্য হুকুম হল, সে মাগরিব এবং বিতরের নামায তিন রাক'আতের জায়গায় চার রাক'আত পড়বে । কারণ, তখন তার উক্ত নামাযটি নফল হিসাবে গণ্য হবে । আর নফল তিন রাক'আত হয় না বিধায় চার রাক'আত পড়বে । উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে বিতেরের মধ্যে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে ও তৃতীয় রাক'আতে তাশাহহুদ পরিমাণ বসে চতুর্থ রাক'আত নফলের নিয়তে পড়বে ।
যেরূপ ভাবে ওয়াক্তিয়া ফরয নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়তে হয় তদ্রূপ কাযা নামাযেও শুধু প্রথম দু'রাক'আতে সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে । আর শেষের এক বা দুই রাক'আতে শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে । [প্রমাণঃ তাহত্বাভী, ২৪৩/ ফাতাওয়া শামী, ২ : ৩৭ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২ : ৬১১ # ফাতাওয়া দারুর উলূম, ৪ : ৩৫০]
{পৃষ্ঠা-৩৫৫}
ولاتعاد عند توهم الفساد للنهي وما نقل ان الامام قضى صلاة عمره. فان صح نقول كان يصلي المغرب والوتر اربعاغ بثلاث قعدات. (الدر المختار:37/2)

কাযা নামায পড়ার সময়

জিজ্ঞাসাঃ কাযা নামায জামা'আতের আগে পড়তে হবে না জামা'আতের পরে পড়লেও চলবে, বিস্তারিত জানতে চাই ।
জবাবঃ কোন ব্যক্তির যিম্মায় যদি পাঁচ ওয়াক্ত অথবা এর চাইতে কম নামায কাযা থাকে তাহলে সে সাহেবে তারতীবের অন্তর্ভুক্ত । এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির জন্য জরুরী হবে প্রথমে কাযা নামায গুলো পড়ে নেওয়া । তারপরে ওয়াক্তিয়া নামায পড়া । যদিও এর কারণে জামা'আত ছুটে যায় । আর যদি ছয় বা ততোধিক ওয়াক্তের নামায কাযা থাকে, তাহলে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার পরেও কাযা নামায পড়লে কোন অসুবিধা নেই । যদি তা মাকরূহ সময়ে না হয়ে থাকে । তেমনি ভাবে কেউ যদি কাযা নামাযের কথা ভুলে জামা'আতের সাথে শরীক হয়ে যায় এবং জামা'আত শেষ হওয়ার পর কাযা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রেও জামা'আতের পরে কাযা নামায পড়তে পারবে । [প্রমাণঃ আদদুররুদুল মুখতার, ২ : ৬৮, # আল বাহরুর রায়িক, ২ : ৮২, # শহরে বেকায়া, ১ : ১৮২-১৮৩ # বেনায়া, ২ : ৭০৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৩১]

ঋতুস্রাবের পূর্বে কাযা নামায

জিজ্ঞাসাঃ একটি মেয়ে ১৯৭৫ সালের ২৭ শে জুন জন্ম গ্রহণ করে । মেয়েটি ৮৭ সালের কোন এক মাস থেকে নামায পড়া শুরু করে । কিন্তু মেয়েটির ৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঋতুস্রাব হয় । ৮৭ সালের আগে মেয়েটির বালেগা হবার কোন লক্ষণই দেখা যায়নি । তাছাড়া নামায সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা আগ্রহ তখন তার হয়নি । এমতাবস্থায় মেয়েটি পূর্বের জীবনের অর্থাৎ ৮৭ সালের আগে কতদিনের নামায কাযা আদায় করবে ? বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব ।
জবাবঃ কোন মহিলার ৯ বত্সর বয়সের পরে যে কোন সময় ঋতুস্রাব শুরু হলে সে মহিলা বালেগা (পূর্ণ বয়স্কা) হয়ে থাকে । তখন থেকে শরীয়তের সকল হুকুম পালন করা তার জন্য কর্তব্য হয়ে

যায় । আর পনের বৎসর বয়স হওয়ার পর ঋতুস্রাব না হলেও তাকে বালেগা ধরা হবে । উক্ত মেয়ের পূর্বেকার নামাযের কাযা আদায় করতে হবে না । কারণ, ১৫ বছরের পূর্বে ঋতুস্রাব না হওয়ায় সে বালেগা হয়নি । সুতরাং তার উপর নামায ফরয হয়নি । তাই উক্ত মেয়ের ৮৯ সালে ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পর থেকে যে সব নামায কাযা হয়েছে তা আদায় করে নিতে হবে । ৮৯ সালের পূর্বের নামায কাযা করার প্রয়োজন নেই । [প্রমাণঃ হিদায়া ৩ : ৩৪১] {পৃষ্ঠা-৩৫৬}
وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشر سنة وهذا عند ابي حنيفة وقال اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن ابي حنيفة. (الهداية:341/3)

নামায সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনার নিরসন

জিজ্ঞাসাঃ কোন এক মাসিক পত্রিকায় লিখেছে"আলিমগণের মতে অজ্ঞাত পরিমাণ কাযা নামাযের জন্য আন্তরিক তাওবাই যথেষ্ট ।" এটা কতটুকু নির্ভরযোগ্য ?

জবাবঃ ইসলামী আহকামের মধ্যে নামায একটি সর্বশ্রেষ্ট হুকুম । ইচ্ছা করে নামায তরক করা কবীরা গুণাহ । নামায তরক হলে তা নিয়ম মাফিক কাযা করা জরুরী । চাই ইচ্ছায় কাযা হোক বা অনিচ্ছায় হোক । কম কাযা হোক বা বেশী । সর্বাবস্থায় কাযা করতে হবে । আর শারীরিক শক্তি না থাকলে ফিদয়া দিতে হবে বা ওসীয়ত করে যেতে হবে । তাওবার দ্বারা কাযা নামায মাফ হবে না । যদিও সারা জীবনের নামায কাযা হোক না কেন । তবে কেউ যদি কাযা করা আরম্ভ করে আর এর মধ্যে তার মৃত্যু এসে পরে এবং ফিদয়া দিতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে ব্যক্তি ইস্তিগফার করতে থাকবে । তাহলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন । তবে শুধুমাত্র তাওবাই যথেষ্ট বলা যাবে না । [প্রমাণঃ হালবী কাবীর, ৫২৯ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৩২-৩৩৬ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ৩৩৮ # কিফায়াতুল মুফতী, ৩ : ৩৩৮, তাহতাভী, ৩৬৩ # খাইরুল ফাতাওয়া, ২ : ৬০৭]

বেলা উঠার পর ফজরের নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ বেলা উঠার পরে ফজরের নামায পড়ার হুকুম কি ?

জবাবঃ নামায কাযা হয়ে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই তা কাযা করবে । বিনা উযরে দেরী করা জায়িয নয় । তাই ফজরের নামায কাযা হয়ে গেলে বেলা উঠার পর পড়বে এবং কাযার নিয়্যত করবে । তবে ঐ দিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে পড়লে সুন্নাতেরও কাযা পড়বে । আর যদি দ্বি-প্রহরের পরে পড়ে বা অন্য কোন দিন পড়ে তাহলে শুধু ফরয এর কাযা পড়বে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ১২১ # ফাতাওয়া শামী ২ : ১৫ # হিদায়া ১ : ১৫২]

ফজরের সুন্নাত কাযা হয়ে গেলে

জিজ্ঞাসাঃ আমি নূরুল ঈযাহ কিতাবে পড়েছি- ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত নামায না পড়ে থাকলে আর পড়তে হয় না । কিন্তু বর্তমান সমাজে প্রচলন আছে- ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত নামায না পড়তে পারলে সূর্য উদয় হলে সুন্নাত নামায পড়ে । আসলে সুন্নাত না পড়লে কোন গুনাহ বা অসুবিধা হয় কি-না ?

{পৃষ্ঠা-৩৫৭}

জবাবঃ ফজরের সুন্নাত অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে অধিক গুরুত্ব রাখে । তাই যদি জামা'আত শুরু হয়ে যায় আর দ্বিতীয় রাকা'আত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তা আদায় করে নিতে হবে । ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যদি ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে সুন্নাত পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে সূর্য উদয় হওয়ার পর কাযা করে নিবে । [হিদায়া, ১ : ১৫২]

قال : وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقى نفلا مطلقا وهو مكروه بعد الصبح ولا بعد ارتفاعها عند أبي حنيفة و أبي يوسف رحمهما الله وتعالى وقال محمد رحمه الله تعالى : أحب إلي أن يقضيهما إلى وقت الزوال لأن عليه الصلاة و السلام قضاهما بعد ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس. (الهداية:152/1)

মহিলাদের ঋতুস্রাবের কারণে কাযা নামাযের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ মহিলাদের ঋতুস্রাত হওয়ার কতদিন পর নামায পড়তে হবে ? এ কারণে যে নামাযগুলো কাযা হবে সেগুলো সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি ?

জবাবঃ যদি ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার পর দশম দিনে শেষ হয়, তাহলে যেই নামাযের ওয়াক্তে শেষ হল, সেই ওয়াক্ত হতেই নামায আদায় করা জরুরী । যদি নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার এক মিনিট আগেও মাসিক বন্ধ হয়, তবুও উক্ত ওয়াক্তের নামায কাযা করা জরুরী । আর যদি দশ দিনের কম সময়ে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়, তাহলে যদি সেই ওয়াক্তের নামাযের সময় শেষ পর্যায়ে হয় এবং ওয়াক্তের নামাযের যদি এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যে, গোসল করে তাকবীরে তাহরীমা "আল্লাহু আকবার" বলা সম্ভব, তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামাযও কাযা করা জরুরী । আর যদি এ পরিমাণ সময় না থাকে, তাহলে উক্ত ওয়াক্তের নামায পড়া জরুরী নয় । আর ঋতুস্রাব চলাঅবস্থায় যে নামাযগুলো ছুটে গেছে, তা মাফ হয়ে যাবে এবং সেগুলোর কাযা করার প্রয়োজন হবে না । [প্রমাণঃ শরহে বিকায়া, ১ : ১১৪-১১৫/ মুখতাসারুল বিকায়াহ, ১ : ১১৪-১১৫/ হিদায়াহ, ১ : ৬৫]

قال : وإذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام لم يحل وطؤها حتى تغتسل لأن الدم يدر تارة وينقطع أخرى فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع ولو لم تغتسل ومضى عليها أدنى وقت الصلاة بقدر أن تقدر على الاغتسال والتحريمة حل وطؤها لأن الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهرت حكما ولو كان انقطع الدم دون عادتها فوق الثلاث لم يقربها حتى تمضي عادتها وإن اغتسلت لأن العودة في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وإن انقطع الدم لعشرة أيام حل وطؤها قبل الغسل. (الهداية:32/1)

وقال في الدراية تحت قوله: لعشرة ايام: وحاصله انه يشترط تمكن الاغتسال والتحريمة في الوقت في الصورة الاولى دون الثانية, نهاية. (الهداية:65/1)

{পৃষ্ঠা-৩৫৮}

ইশা ও বিতর কাযা পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ইশার নামায কাযা হলে, তা কোন সময় আদায় করতে হয় এবং বিতর নামায কাযা করা জরুরী কি-না ?

জবাবঃ ইশার নামায কাযাকারী যদি সাহেবে তারতীব হয় তাহলে ইশার নামাযের কাযা ফজরের পূর্বেই পড়তে হবে । সাহেবে তারতীব না হলেও ফজরের পূর্বে কাযা পড়া উচিত । তবে ফজরের পূর্বে কাযা না পড়লেও ফজরের নামায সহীহ হয়ে যাবে ।

বিতরের নামায কাযা হলে তার কাযা আদায় করা ওয়াজিব । [প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার, ২ : ৬৫ # হিদায়া, ১ : ১৫৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৪২]

নামাযে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

জিজ্ঞাসাঃ তারতীব বা নামাযে ধারাবাহিকতা বজায় কিভাবে রাখতে হয় ?

জবাবঃ তারতীব হলো, যে ব্যক্তির ছয় ওয়াক্তের কম নামায কাযা হয়েছে, সে ব্যক্তি ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করার পূর্বে কাযা নামাযগুলো তারতীবের সাথে অর্থাৎ যে নামায প্রথম কাযা হয়েছে তা প্রথমে আদায় করবে । এমনিভাবে সব কাযা নামায আদায় করার পর ওয়াক্তিয়া নামায আদায় করবে । একেই তারতীব বলে । এই তারতীবের দিকে খেয়াল রাখা ওয়াজিব । তবে এই তারতীব

তিন কারণের যে কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে তখন আর তারতীব বজায় রাখা ওয়াজিব থাকে না । তখন তারতীব ছাড়া নামায আদায় করলেও নামায আদায় হয়ে যায় । কারণগুলো হল-
(১) ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় এত কম হয়ে যাওয়া যে, যদি কাযা নামায পড়ে তাহলে ওয়াক্তিয়া নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে । তাহলে তারতীব ছেড়ে দিবে এবং ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে নিবে ।
(২) কাযা নামাযের কথা ভুলে গেলে ।
(৩) পাঁচ ওয়াক্তের বেশী কাযা হয়ে গেলে । [প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার, ২ : ৬৫-৬৭ # হিদায়া, ১ : ১৫৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৩৪]

ফজরের নামায কাযা পড়ার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি । কিন্তু প্রায় সময়েই ফজরের নামায যথাসময়ে বা জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারি না । তার প্রথম কারণ হল-ঘুম, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক নাপাকী । এখন কথা হলো- ফজরের নামায সূর্যোদয়ের পর আদায় করলে কি নিয়মে পড়তে হবে ? কাযা নিয়ত করতে হবে কি ? ঘুম থেকে জাগার সাথে সাথে বা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে যদি আদায় করি (সূর্যোদয়ের পর), তাহলে কি কাযা পড়তে হবে ?
{পৃষ্ঠা-৩৫৯}
জবাবঃ ঘুমের কারণে প্রতিদিন ফজরের নামায কাযা হবে- এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন গ্রহণযোগ্য উযর নয় । কারণ ঘুম থেকে উঠার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ কোন কঠিন ব্যাপার নয় । এর জন্য উচিত যে, যাদের উঠতে কষ্ট হয়, তারা রাত্রে একটু আগে ভাগেই নিদ্রা যাবে এবং ফজরের সময় উঠার জন্য এলার্ম ঘড়ি ব্যবহার করবে বা আশে পাশের লোকজনকে ডেকে দেয়ার জন্য অনুরোধ করবে । এটা অত্যন্ত দুঃখ জনক যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অনেকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে পারে না । কিন্তু দুনিয়াবী বিশেষ দরকারে বা নিজের কলিজার টুকরো সন্তানদিগকে খৃষ্টানদের স্কুলে পড়ানোর জন্য ইংরেজ ও খোদার দুশমনদের হাতে পৌঁছে দিয়ে তাকে জাহান্নামে পৌঁছানোর ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করার জন্য ফজরের কয়েক ঘন্টা আগে জেগে রেডী হতেও কোন কষ্ট বোধ করে না । বরং খুশি থাকে । আবার অনেকে চাকুরী রক্ষার জন্য অনেক আগে ঘুম থেকে উঠে পড়ে । অনেকে দূরে কোথাও যেতে যানবাহন ধরার জন্য খুব ভোরে উঠে । এগুলো কিভাবে সম্ভব হয় ? আল্লাহর সন্তুষ্টি কি গান্ধা দুনিয়া থেকে নিম্নমানের হয়ে গেল ? নাপাকীর প্রশ্নও অনর্থক । কারণ নামাযের ১৫/২০ মিনিট আগে উঠেও পাক হওয়া সম্ভব । সুতরাং সর্বাবস্থায়ই আপনাকে ফজরের পূর্বেই উঠতে হবে এবং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরেও যদি কদাচিৎ কখনোও ঘুম না ভাঙ্গে এবং সূর্যোদয়ের পরে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে এমন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিতে সূযোদয়ের পর কাযা পড়া ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই । [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ, ১ : ২৩৮]

বেনামাযী মৃত ব্যক্তির জন্য ওয়ারিসদের করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাবা নামায পড়তেন না । তিনি মারা গেছেন, এখন তার জন্য আমরা কি করতে পারি ?
জবাবঃ যদি কারও নামায ছুটে গিয়ে থাকে এবং কাযা করার পূর্বে মৃত্যু এসে পড়ে তাহলে মৃত্যুর পূর্বে ঐসব নামাযের ফিদয়া দেয়ার ওসীয়্যাত করে যাওয়া তার উপর ওয়াজিব । এরূপ অবস্থায় ফিদয়া দেয়ার ওসীয়্যাত করে গেলে ওয়ারিশগণ তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে কাযাকৃত সকল নামায হিসাব করে ফিদয়া দিয়ে দিবে । আর এক তৃতীয়াংশ মালের দ্বারা তার সকল ফিদয়া আদায় না হলে যে পরিমাণ সম্পদ অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে তা সকল

ওয়ারিশদের সম্মতিতে নিতে হবে । তবে নাবালেগদের অংশ থেকে নেয়া যাবে না । যদিও সে সম্মতি দেয় । এমনিভাবে ওসীয়্যাত করে গিয়ে থাকলে রোযা,হজ্জ যাকাত ও সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি ফরয কাজগুলি যদি আদায় না করে থাকে তাহলে সেগুলিও আদায় করে দেওয়া উচিত । আর হজ্জের জন্য বদলী হজ্জ আদায় করা যায় ।

{পৃষ্ঠা-৩৬০}

নামায, রোযা ও সদকায়ে ফিতর ইত্যাদির ফিদয়া হল ৮০ তোলার সেরে ১ সের বার ছটাক (১ কেজি ৬৬২ গ্রাম) গম বা আটা কিম্বা তার বর্তমান বাজার মূল্য কোন গরীব মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে । ফিদয়ায় গম ও যব ইত্যাদি শষ্য দেয়ার চেয়ে তার মূল্য দেয়া উত্তম । প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামায এবং বিতর নামাযের বদলে এক একটা ফিদয়া আদায় করতে হবে ।
প্রতিদিনের পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের এবং বিতর সহ মোট ছয় ওয়াক্ত নামাযের ফিদয়া আদায় করতে হবে । আর যদি আপনার বাবা মৃত্যুর পূর্বে তার কাযা নামায ইত্যাদির ফিদয়া দেয়ার ওসীয়্যাত করে না থাকে তথাপিও আপনারা যারা বালেগ উত্তরসূরী আছেন, তারা নিজেদের সম্পত্তি থেকে স্বেচ্ছায় তার ফিদয়া আদায় করে দেন তাহলেও আশা করা যায় এর উসীলায় তার অনেক ফায়দা হবে ।
আর তার পুরা জীবনের ফিদয়া এক সাথে যতটুকু আদায় করা সম্ভব হয় সেই পরিমান ফিদয়া নিজে পরিপূর্ণ দ্বীনের উপরে থেকে আদায় করতে থাকবেন । আর তার মাগফিরাত ও জান্নাত লাভের জন্য সর্বদা আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করতে থাকবেন । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ১২৫, ২০৭ # আদ-দুররুল মুখতার ২ : ৭২, ৬৫-৬৮ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৩৬৪]

মুসাফিরের নামায

কসরের নামায

জিজ্ঞাসাঃ আমি ঢাকা হতে চাঁদপুরে বেড়াতে গিয়ে নামায কসর পড়ে থাকি । চাঁদপুর হতে আমাদের গ্রামের বাড়ী ২৫/২৬ মাইল । সেখানে গিয়ে আবার পুরো নামায পড়ি । ফেরার পথে আমাদের গ্রামের বাড়ী হতে নানার বাড়ীর দূরত্ব ৪/৫ মাইল । সেখানে গিয়ে আবার কসর পড়ি । আমার জন্য উল্লেখিত পন্থায় নামায আদায় করা ঠিক হচ্ছে কি-না ?
জবাবঃ যখন কোন ব্যক্তি ৪৮ মাইল দূরত্বের সফরের নিয়্যাত করে নিজ এলাকা থেকে বের হয়ে যায়, তখন থেকেই শরীআতের দৃষ্টিতে সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হয় ।গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পূর্বে বা সেখানে পৌঁছে পনের দিন বা তার অধিক কাল থাকার নিয়ত করার পূর্ব পর্যন্ত এবং পুনরায় নিজের বাসস্থানে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত তাকে নামায কসর পড়তে হবে । এই কসর আমাদের মাযহাব মতে ওয়াজিব ।
সুতরাং আপনি যদি ঢাকায় সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করার নিয়ত করে থাকেন এবং মাঝে মাঝে গ্রামের বাড়ীতে যান এবং সেটাকেও নিজ বাড়ী হিসেবে বহাল রাখেন, অর্থাৎ ভবিষ্যতে সেখানে বসবাসের ইচ্ছা থাকে, তাহলে উভয়টিই

{পৃষ্ঠা-৩৬১}

আপনার জন্য ওয়াতনে আসলী । আর যদি ঢাকাতে একা অবস্থান করে ব্যবসা বাণিজ্য বা চাকুরী ইত্যাদি করেন এবং প্রথম একবার একটানা পনের দিন ঢাকাতে অবস্থান করে থাকেন, সেক্ষেত্রে ঢাকা

আপনার জন্য ওয়াতনে ইকামত গণ্য হবে । সুতরাং ঢাকা থেকে সরাসরি চাঁদপুরে গিয়ে নামায কসর পড়া যেমন ঠিক হয়েছে, তেমনি গ্রামের বাড়িতে গিয়েও পূর্ণ নামায পড়া যথার্থ হয়েছে । যদি বাড়ী হতে ঢাকায় ফেরার নিয়তে বের হয়ে পথে নানার বাড়ীর হয়ে আসেন, তাহলে সেখানে নামায কসর পড়বেন । [প্রমাণঃ আদ দুররুল মুখতার, ২ : ১২৩ # আর বাহরুর রায়িক, ২ : ১৩৬ # মাসায়িলে সফর, ১০১ ও ১০৩]

কসরের জন্য ঢাকা শহরের সীমানা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসাফির ঢাকা শহরে এসে ১৫ দিন থাকার নিয়্যত করলে, মুকীম হয়ে যায় । এখন প্রশ্ন হলো গাবতলী, মিরপুর, যাত্রাবাড়ী, ও উত্তরা ঢাকা শহরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না ?
জবাবঃ ঢাকা শহরের আবাদী ধারাবাহিকভাবে যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, ততদূর পর্যন্ত এলাকা ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে । তবে মাঝখানে যদি কোন কৃষিক্ষেত থাকে, অথবা ১৩৭.১৬ মিটারের বেশী খালি জায়গা থাকে, তাহলে সেখান থেকে অন্য শহর ধরা হবে । এই সংঙ্গা অনুযায়ী গাবতলী, যাত্রাবাড়ী, মিরপুর, সায়েদাবাদ, উত্তরা প্রভৃতি ঢাকা শহরের মধ্যে গণ্য হবে । অতএব, সফরে যাওয়ার সময় এই স্থানগুলো অতিক্রম না করা পর্যন্ত কসর পড়া যাবে না । তদ্রুপ ঢাকায় আসার সময় ঐ স্থানগুলোতে পৌঁছলেই মুকীম হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ২ : ১২১-২২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ৭২]

من خرج من عمارة موضع اقامته من جانب خروجه و ان لم يجاوز من الجانب الاخر وفي الخانية ان كان بين الفناء و المصر اقل من غلوة و ليس بينهما مزرعة يشترط مجاوزته و الا فلا و في الشامي : اقل من غلوة هي ثلث مائة ذراع الي اربع مائة هو الاصح . [الدر المختار:121-22/2]

ইচ্ছে পূর্বক কসর আদায় না করলে ও এক ঘন্টার কম সময়ে ৪৮ মাইল অতিক্রম করলে

জিজ্ঞাসাঃ যদি সফরে গিয়ে ইচ্ছা পূর্বক নামায কসর না করি, তাহলে কি গুণাহ হবে ?
তিন দিনের দূরত্বে যাবার নিয়্যত করলে নামায কসর করতে হয় ? কেউ ওয়াতনে ইকামাত থেকে বাড়ীতে যাচ্ছে, তার বাড়ীর দূরত্ব ৪৮ মাইলের বেশী । কিন্তু এখন ৪৮ মাইল যেতে মাত্র একঘন্টা বা তার কম সময় লাগে, তাহলে সে ব্যক্তি কি পথে কসর করবে ?

{পৃষ্ঠা-৩৬২}

জবাবঃমুসাফিরের জন্য একাকী নামায পড়ার ক্ষেত্রে চার রাক'আত ওয়ালা ফরয নামাযে দুই রাক'আত পড়া (কসর করা) ওয়াজিব । তবে যদি সে কোন মুকীম ইমামের পিছনে ইকতিদা করে থাকে, তাহলে তার জন্য চার রাক'আতই পড়া জরুরী । যদি কোন মুসাফির ইচ্ছা পূর্বক চার রাক'আত ওয়ালা ফরয নামাযে কসর না করে, তাহলে সে গুণাহগার হবে । তার নামায দোহরিয়ে পড়তে হবে এবং ইস্তিগফার করতে হবে । আর যদি ভুলে চার রাক'আত পড়ে থাকে, তাহলে প্রথম বৈঠক করে থাকলে সিজদায়ে সাহু করে নিলে, তার নামায সহীহ হয়ে যাবে । [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার, ২ : ১২৩-২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, # ৪ : ৭৭ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ৭ : ১৬১]

তিন দিনের (৪৮ মাইল) রাস্তা ১ ঘন্টায় কেন, তার চেয়ে কম সময়ে যদি কেউ অতিক্রম করে, তখনও পথে নামাযের ওয়াক্ত হলে এবং বাড়ীতে পৌঁছে পড়ার সময় পাওয়া না গেলে অর্থাৎ, পথে না পড়লে, নামায কাযা হওয়ার আশংকা থাকলে, পথের মধ্যে নামায কসর পড়তে হবে । কারণ, কসর করা নির্ভর করে দূরত্বের উপর, সময়ের উপর নয় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ১২৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ৮২]

চাকুরীস্থল থেকে নিজ বাড়ীতে গেলে জামা'আতের সহিত কসর আদায়ের নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ চাকুরীস্থল বর্তমানে আমার স্থায়ী ঠিকানা। চাকুরীস্থল থেকে যদি নিজ গ্রামের বাড়ীতে ২/৪ দিনের জন্য বেড়াতে যাই, তাহলে কি নামায কসর পড়তে হবে ? আমার গ্রামের বাড়ী চাকুরীস্থল থেকে ৪৮ মাইল দূরে।
জামা'আতের সহিত কসর নামায পড়তে হলে, কি নিয়মে পড়তে হবে ? যেমন- ইমাম সাহেব ৪ রাক'আত যোহরের ফরয নামাযের নিয়্যত করলেন। আমি দুই রাক'আত কিভাবে পড়বো ? আর ইমাম সাহেব মুসাফির হলে, মুক্তাদী মুকীম হলে, নামায কিভাবে পড়বে ?
জবাবঃ আপনার নিজ গ্রামের বাড়ীতে যদি আপনার ঘর-বাড়ী থাকে এবং সেখানে আপনার পরিবার-পরিজন বসবাস করে এবং আপনি সেখানেই পরিবার-পরিজন রেখে হায়াত কাটানোর ইচ্ছা রাখেন, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার নিজ গ্রামের বাড়ীটি ওয়াতনে আসলী (আসল বাড়ী) গণ্য হবে এবং চাকুরীস্থলটি ওয়াতনে ইকামত (অবস্থান বাড়ী) গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে চাকুরী স্থলে ১৫ দিন থাকার নিয়ত করলে, সেক্ষেত্রে আপনি মুকীম হবেন এবং পূর্ণ নামায পড়বেন। আর যদি সেখানে ১৫ দিন থাকার নিয়ত না করেন, তাহলে মুসাফির সাব্যস্ত হবেন। সেক্ষেত্রে ৪ রাক'আতওয়ালা ফরয নামায একা পড়লে বা শুধু মুসাফিরগণ মিলে জামা'আত করলে, ফরয নামায ২ রাক'আত পড়বেন।
{পৃষ্ঠা-৩৬৩}
গ্রামের বাড়ী ওয়াতনে আসলী হওয়ায় ২/৪ দিনের জন্য বেড়াতে গেলেও আপনাকে পুরা নামায পড়তে হবে।
আর যদি আপনি নিজ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চাকুরীস্থলকে স্থায়ী বাড়ী বানিয়ে ফেলেন। আপনার পরিবার পরিজনকে চাকুরীস্থলের বাড়ীতে রাখেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট হায়াত কাটানোর নিয়্যত রাখেন, তাহলে সেটাই আপনার জন্য ওয়াতনে আসলী গণ্য হবে এবং সেক্ষেত্রে নিজ গ্রামের বাড়ীতে ২/৪ দিনের জন্য বেড়াতে গেলে কসর পড়তে হবে।
ইমাম সাহেব যদি মুকীম হন, আর মুক্তাদী মুসাফির হয়, তাহলে মুকীম ইমামের পিছনে ইক্তিদা করার কারণে মুসাফির মুক্তদীকেও চার রাক'আত পুরা পড়তে হবে। আর যদি ইমাম সাহেব মুসাফির হন মুক্তাদীগণও মুসাফির, তাহলে চার রাক'আত ফরয নামায সকলেই দুরাক'আত পড়বেন। আর যদি ইমাম মুসাফির হন, আর মুক্তাদীগণ মুকীম হয়, তাহলে মুসাফির ইমাম সাহেব দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দিবেন। আর মুকীম মুক্তাদীগণ বাকী দু'রাক'আত কিরাআত ছাড়া নিজে নিজে পড়ে নিবেন। [শামী ২ : ১২৯-৩০-৩২ পৃঃ]
وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده وندب للامام ان يقول بعد التسليمتين في الاصح اتموا صلاتكم فاني مسافر لدفع توهم انه سها و اما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت و يتم لا بعده فيما يتغير - الخ
সফরে থাকাকালীন নামায আদায়
জিজ্ঞাসাঃ যে সমস্ত লোক সর্বদা পরিবহনে চাকুরী করে, যেমন- বাসে, লঞ্চে ও স্টীমারে ইত্যাদি। তারা কি কসর নামায পড়বে, না পূর্ণ নামায আদায় করবে ?
স্ত্রীর বাপের বাড়ীতে নামায কসর পড়বে, নাকি পূর্ণ নামায আদায় করবে ?
জবাবঃ যে সমস্ত লোক সর্বদা পরিবহনে চাকুরী করে এবং তা নিজ বাড়ী থেকে ৪৮ মাইল দূরবর্তী হয়, তারা সফর অবস্থায় সর্বদা নামায কসর পড়বে। যখন বাড়ীতে ফিরবে তখন শুধু পূর্ণ নামায পড়বে। [প্রমাণঃ শামী ২ : ১২৫ পৃঃ # ফাতাওয়া দারুর উলূম, ৪ : ৪৫৫ ও ৪৭৬]

মহিলারা বিবাহের পরে যদি বাপের বাড়ীতে আসে এবং বাপের বাড়ীতে মাঝে মাধ্যে যাতায়াত জারি থাকে তাহলে বাপের বাড়ীতে পূর্ণ নামায পড়বে । কারণ, সেটাও তার আসল বাড়ী । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২ : ১৩১ হালবী কাবীর, ৫৪৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪ : ৪৫৮]

{পৃষ্ঠা-৩৬৪}

মুসাফিরের পিছনে মুকিমের নামায

জিজ্ঞাসাঃ মুসাফিরের পিছনে যদি মুকীম নামায পড়েন তাহলে অবশিষ্ট দুই রাক‘আত নামাযে মুকীম ক্বিরাআত পড়বে কি-না ? যদি পড়ে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে কি-না ?

জবাবঃ যদি কোন মুসাফিরের পিছনে মুকীম ইক্তেদা করে তাহলে মুসাফির ইমাম উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর উক্ত মুকীম তার অবশিষ্ট দুই রাক‘আত লাহেক বলে গণ্য হবে ।

সুতরাং উক্ত মুকীম তার অবশিষ্ট দুই রাক‘আত নামায আদায় করার সময় কোন ক্বিরাআত পড়বে না এবং যদি কোন ভুল করে ফেলে তাহলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে না । [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার #শামী, ২ : ১২৯]

وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فاذا قام الي الاتمام لايقرأ ولا يسجد للسهو في الاصح لانه كاللاحق – الخ. (رد المحتار:129/2)

রেলগাড়ী বা পানির জাহাজে চাকুরীজীবির নামায

জিজ্ঞাসাঃ যারা রেল গাড়ীতে বা কোন পানির জাহাজে চাকুরী করেন তারা কি মুসাফির, না মুকীম ? বলা বাহুল্য, রেলগাড়ী এবং জাহাজ প্রায় সব সময় চলন্ত অবস্থায় থাকে ।

জবাবঃ যারা কোন গাড়ী বা পানীয় জাহাজে চাকুরী করেন এবং নিজের বাসস্থান থেকে সফরের দূরত্বে ভ্রমণ করতে থাকেন, তারা সর্বাবস্থায় নামায কসর পড়বেন । কারণ, সমুদ্রজাহাজ ইত্যাদি ইকামতের স্থানই নয় । আর স্থলের গাড়ীতে চাকুরীরত যারা দূর-দূরান্তের সফরে থাকেন, তারা এক স্থানে অবস্থানের সুযোগ পান না । সুতরাং ভ্রমণরত অবস্থায় পূর্ণ নামায পড়া জায়িয হবে না । কেননা, ফরয নামাযের এই কসর পড়া হানাফী মাযহাব মতে ওয়াজিব ।

উল্লেখ্য, মুসাফির একা নামায পড়লে বা ইমাম হলে চার রাক’আতওয়ালা ফরয নামাযে কসর পড়তে হয় । কিন্তু কোন মুকীম ব্যক্তির পিছনে ইক্তিদা করলে মুসাফিরদের চার রাক‘আতই পড়া জরুরী । সেক্ষেত্রে কসর হবে না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৩৯ # আদদুররুল মুখতার, ২ : ১২৫ # বাদায়িয়ুস সানায়ে, ১ : ৯৮ # মাজমু‘আতুল ফাতাওয়া, ১ : ২০২ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১ : ৫৭৪,৭৯]

কসর নামাযের কাযা আদায়

জিজ্ঞাসাঃ যদি সফর অবস্থায় কারো নামায কাযা হয়, মুকীম অবস্থায় কাযা আদায় করতে কসর পড়তে হবে, না পূর্ণ নামায পড়তে হবে ?

{পৃষ্ঠা-৩৬৫}

জবাবঃ সফর অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায মুকীম অবস্থায় কাযা পড়ার সময় কসর পড়তে হবে, পূর্ণ নামায পড়া যাবে না । তেমনিভাবে মুকীম অবস্থায় ছুটে যাওয়া নামায সফরে আদায় করলে পূর্ণ নামায পড়তে হবে । সার কথা হল- যে ধরণের নামায কাযা হয়েছে পরবর্তীতে সে নামাযই আদায় করতে হবে । চাই মুকীম, মুসাফির যে অবস্থায়ই আদায় করুক না কেন । [প্রমাণঃ শামী ২ : ১৩৫ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৪৫২]

فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو اداها و كذا فاتته الحضر تقضي في السفر تامة . (الشامي: 135/2)

৪৮ মাইল দূর শ্বশুরবাড়ীতে কসর পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাড়ী ঝিনাইদহ । আমার শ্বশুর বাড়ী ঢাকায় এবং আমি চাকরী করি যশোরে । আমি মাঝে মাঝে শ্বশুর বাড়ী যাই । তবে ১৫ দিনের বেশী থাকি না । এমতাবস্থায় আমার কসর পড়তে হবে কি ?

জবাবঃ আপনার বাড়ী থেকে যেহেতু আপনার শশুর বাড়ীর দূরত্ব ৪৮ মাইলের বেশী, সেখানে আপনি স্ত্রীকে যদি স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা না করে থাকেন, সেক্ষেত্রে যদি আপনি শ্বশুর বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ১৫ দিনের কম থাকার নিয়্যত করেন তাহলে আপনি শ্বশুর বাড়ীতে নামায কসর আদায় করবেন । আর যদি শ্বশুর বাড়ীর দূরত্ব আপনার বাড়ী থেকে ৪৮ মাইলের কম হতো কিংবা তথায় আপনার স্ত্রীর স্থায়ীভাবে বসবাস করার ব্যবস্থা করেন, তাহলে শ্বশুর বাড়ীতে আপনি নামায কসর করতে পারবেন না । পূরো নামাযই পড়তে হবে । এরূপে কসরের স্থানে অন্যূন ১৫ দিন অবস্থানের নিয়্যত করলেও নামায পুরো পড়তে হয় । কসর করতে হয় না । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৪২ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ৯৭-১১০]

মুসাফির ইমামের পিছনে মুকিমের অবশিষ্ট নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি যে, মুসাফির ইমামের পিছনে মুকীমের ইক্তিদা সর্বাবস্থায় জায়িয । মুসাফির ইমাম চার রাক‘আত বিশিষ্ট নামায দু’রাক‘আত পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর মুকীম মুক্তাদী আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়াবে । এখন প্রশ্ন হলো, অবশিষ্ট দুই রাক‘আত নামাযের ভিতর তার ক্বিরাআত পড়তে হবে কি-না ? এবং মুসাফিরের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায পড়তে হবে কি-না ?

জবাবঃ মুসাফির ইমাম যখন চার রাক’আত ওয়ালা নামাযের দুই রাক’আত নামায পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরাবেন, তখন মুকীম মুক্তাদী দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট দুই রাক‘আত নামায সূরা ক্বিরাআত ব্যতীত আদায় করে নিবে । অর্থাৎ, সূরা ফাতিহা ও কেরাআত পড়তে যতটুকু সময় ব্যয় হয় ততটুকু সময় দাঁড়িয়ে বাকী দুই রাক‘আত নামায রুকূ সিজদা করে শেষ করে নিবে । আর

{পৃষ্ঠা-৩৬৬}

মুসাফির ব্যক্তি যদি নিরাপদ, নির্ভয়, সবল ও ক্লান্তিমুক্ত হন, তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ পড়ে নেয়াটাই ভাল । আর যদি সুস্থির না হন, বরং তাড়াতাড়ি সফর শেষ করতে হবে এবং শত্রু ইত্যাতির আশংকা থাকে, তাহলে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ ছেড়ে দিতে পারেন । তবে কতক ফুকাহায়ে কিরাম বলেছেন, তবুও যেন ফজরের সুন্নাত না ছাড়েন । কারণ, এর প্রতি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন । উল্লেখ্য সফরে জামা‘আত তরক করার উযর না পাওয়া গেলে, জামা‘আত তরক করবে না । কারণ, শুধু সফর জামা‘আত তরকের জন্য কোন উযর নয় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১ : ১৩৯ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৪ : ৪৪৫]

وصح اقتداء المقيم بالمسافر في الوقت وبعده فاذا قام المقيم الي الاتمام لا يقرأ و لا يسجد للسهو في الاصح لانه كالاحق [129/2]

والمختار انه لايأتي بها في حال الخوف وياتي بها في حال القرار والامن هكذا في الوجيز الكردري . (عالمكيري:139/1)

সফর অবস্থায় জামা’আতে নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ সফর অবস্থায় জামা‘আতে নামায পড়া কোন পর্যায়ের হুকুম সাব্যস্ত হয় ?

জবাবঃ স্বাভাবিক অবস্থায় জামা‘আতে নামায পড়া ওয়াজিব । সফর অবস্থায় জামা‘আতের হুকুম তার জন্য শিথিল হয়ে মুস্তাহাব হয়ে যায় । তবে সফর অবস্থায় যদি কোন প্রকার পেরেশানী না থাকে এবং স্বস্তির অবস্থায় থাকে, তাহলে জামা‘আতে নামায পড়াই বাঞ্ছনীয় । তবে যদি কোন

ব্যস্ততা থাকে, যেমন গাড়ী ছেড়ে দিবে বা সাথীরা তাকে রেখে চলে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে এ অবস্থায় জামা'আত ছেড়ে দেয়ার অনুমতি রয়েছে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৮৩ # আল বাহরুর রায়িক ১ : ৩৪৬]

وتسقط الجماعة بالمطر........او كان اذا حرج يخاف ان يحبسه غريمه في الدين اويريد سفرا واقيمت الصلاة فيخشي ان تفوته القافلة....... الخ. (عالمكيري:83/1)

কর্মস্থলে পূর্ণ নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ চাকুরী অস্থায়ী হলে আমি কতদিন ওখানে অবস্থান করবো তার নিশ্চয়তা না থাকলে নামায কসর করব কি-না ?

জবাবঃ চাকুরীর স্থলে যদি আপনার থাকার ব্যবস্থা থাকে, চাই আপনার নিজ ঘর হোক বা ভাড়ার হোক এবং আপনার প্রয়োজনীয় সামান পত্রও সেখানে থাকে, তাহলে সে স্থানে ১৫ দিন বা তার চেয়ে বেশী দিন থাকার নিয়্যত

{পৃষ্ঠা-৩৬৭}

করলে উক্ত জায়গা আপনার জন্য ওয়াতনে ইকামাত বলে গণ্য হবে । আপনি সেখানে মুকীম বলে বিবেচিত হবেন । সুতরাং আপনার জন্য উক্ত স্থানে কসর পড়া জায়িয হবে না । বরং পূর্ণ নামায পড়তে হবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া হিন্দিয়া, ১:১৪২ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৯৮-১০২

وطن اقامة وهو البلد الذي ينوي المسافر الاقامة فيه خمسة عشر يوما واكثر...الخ. (عالمكيرية:142/1)

কর্মস্থলের অস্থায়ী আবাসস্থলে কসর বা পূর্ণ নামায আদায়ের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের অনেক ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক বা অনেক চাকুরীজীবী এমন আছেন, যারা প্রয়োজনীয় সামান-পত্র নিয়ে চাকুরীস্থলের সন্নিকটে কোথাও অবস্থান করেন । সেখান থেকে সময়মত কর্মস্থলের দায়িত্ব পালন করেন । তাদের পরিবার- পরিজন দেশের বাড়ীতে বা দূরে কোথাও থাকে । এমতাবস্থায় উক্ত ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষক ও চাকুরীজীবীগণের চাকুরীর স্থানকে কোন ধরণের ওয়াতন ধরা হবে ? তাছাড়া উক্ত স্থান হতে দ্বীনী, অফিসিয়াল বা ব্যক্তিগত কোন প্রয়োজনে তারা অনেক সময় ৪৮ মাইল বা তার চেয়ে বেশী দূরে সফরে বা স্থায়ী বাড়ীতে যান । এমতাবস্থায় যখত তারা উক্ত অবস্থান স্থলে ফিরে আসেন, তখন পূর্ণ নামায পড়তে হবে ? না কি তাদের পুনরায় ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করতে হবে ? নাকি দু'চার দিন (অর্থাত ১৫ দিনের কম) থাকার নিয়্যত থাকলেও তাদের পূর্ণ নামায পড়তে হবে ?

জবাবঃ যখন তারা কর্মস্থলের সন্নিকটস্থ জায়গায় প্রয়োজনীয় সামানপত্র সহ একবার ১৫ দিন বা অধিক দিন অবস্থান করার নিয়্যত করে নেয়, তখন থেকে উক্ত স্থান তাদের জন্য ওয়াতনে ইকামাত হিসেবে গণ্য হবে এবং সেখানে তারা পূর্ণ নামায পড়বেন । কসর পড়া তাদের জন্য জায়িয হবে না । প্রয়োজনীয় সামান নিজ দায়িত্বে সেখানে রেখে সেখান থেকে ৪৮ মাইল দূরে সফরে গেলেও তাদের এ ওয়াতনে ইকামাত বাতিল হবে না । সুতরাং উক্ত স্থানে ফিরে আসার পর পূর্ণ নামায পড়ার জন্য ১৫ বা তার অধিক দিন অবস্থানের নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই । তবে কোন সময় যদি সমস্ত সামানাপত্রসহ উক্ত স্থান ত্যাগ করেন, যার দ্বারা বুঝা যায় যে, এই শহর বা গ্রামে তার আর থাকার ইচ্ছা নাই, সেক্ষেত্রে তার এ ওয়াতনে ইকামাত বাতিল গণ্য হবে এবং আবারো কোন সময় এ স্থানে আসলে মুকীম হওয়ার জন্য কমপক্ষে ১৫ দিন থাকার নিয়্যতে অবস্থান করা জরুরী হবে । [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ৯৭-১১০ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৪২ # আল-মুহীত, ২ : ১৪৮]

{পৃষ্ঠা-৩৬৮}

তারাবীহ

জামা'আতের সাথে কিছু তারাবীহ ছুটে গেলে বিতর কখন পড়বে?

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি তারাবীহের নামায ইমাম সাহেবের সাথে কয়েক রাক'আত পড়তে না পারে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি ইমামের সাথে বিতর নামষ আদায় করে তারাবীহ নামাযের অবশিষ্ট রাক'আতগুলো আদায় করবে? নাকি উক্ত রাক'আতগুলো আদায় করে তারপর বিতর নামায পড়বে?

জবাবঃ এমতাবস্থায় জামা'আতর সাথে ইমামের পিছনে বিতর নামায আদায় করার পর ছুটে যাওয়া তারাবীহ নামাযের রাকা'আতগুলো আদায় করতে হবে । তবে তারাবীহ নামাযের ফাঁকে-ফাঁকে ও ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো পড়ে নিতে পারবে ।

তারাবীহ নামাযের শরয়ী হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহ নামায কোন পর্যায়ে পড়েছে? শুধু সুন্নাত, নাকি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ,নাকি নফল?

জবাবঃ ২০ রাক'আত তারাবীহ নামায পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য সুন্নাতে মুআক্কাদাহ । তবে পুরুষদের জন্য তারাবীহর জামা'আত করা সুন্নাতে মুআক্কাদায়ে কিফায়া । মেয়েরা জামা'আত ছাড়াই নিজেরা পড়ে নিবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২:৪৫#আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৫২৪-৫২৫পৃঃ]

মহিলাদের তারাবীর নামাযে ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ হাফেজদের মত কুরআন শরীফ স্মরণ রাখার জন্য যদি মহিলা হাফেজা অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে জাম'আতে খতম তারাবীহ পড়েন, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি আছে কি?

জবাবঃ সকল শ্রেণীর মহিলাদের জন্য মসজিদের ও ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়া নিষেধ । তেমনিভাবে শুধু মহিলাদের জন্য তারাবীহ বা অন্য নামাযের জামা'আত করার অনুমতি নেই । বরং হানাফী মাযহাবে মহিলাদের জন্য জামা'আত করা ও মাকরুহ । যদি ও কোন মহিলা হাফেজা হন না কেন ।কুরআন শরীফ স্মরন রাখার জন্য অন্য কোন অন্য কোন হায়েজা মেয়ের সাথে দাওর করতে পারেন, বা একাকী তারাবীহ নামাযে খতম পড়তে পারেন । যদি কোথাও আটকে যান, নামাযর শেষে দেখে নিয়ে সামনে অগ্রসর হবেন । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪:৩৯৮]

বাড়িতে জামা'আতের সাথে তারাবীহের নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের বাড়ী থেকে দেড়শ' গজ দূরে একটি মসজিদ রয়েছে । এমতাবস্থায় আমরা প্রতি বৎসর কয়েক বাড়ীর লোকজন মিলে মসজিদের পরবর্তে কোন এক বাড়ীতে তারাবীহ নামায জামা'আতের সাথে আদায় করি । এরুপ করা জায়িয আছে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৩৬৯}

জবাবঃ বাড়িতে তারাবীহর জামা'আত আদায় করা সহিহ আছে। মহল্লার মসজিদে তারাবীহর জামা'আত হলেও বাসায় জামা'আত করাতে কোন অসুবিধা নেই । তবে এর জন্য শর্ত হচ্ছে - মসজিদেও যেন তারাবির ভিন্ন একটি জামা'আত হয়। অথাৎ এমন যেন না হয় যে , বাড়িতে জামা'আতের কারনে মসজিদের জামা'আত বন্ধ না হয়ে যায়। তবে উল্লেখ্য যে বাড়িতে তারাবীহর নামায আদায় করার পূর্বে ইশার নামাযের জামা'আত মসজিদেই আদায় করা উচিত। ফরয নামায আদায় করার পরিবর্তে মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করলে সাতাস গুন বেশী সাওয়াব এবং তা জামে মসজিদে আদায় করায় পাচঁশত গুন সাওয়াব হয়। সুতরাং রামাযান মাসে অধিক সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিত নয়।

[প্রমানঃ মিশকাত শরীফ, ১:৭২ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫২০]

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه بخمس مائة صلاة . وصلاته في المسجد الأقصى بخمسين ألف صلاة . وصلاته في مسجدي بخمسين ألف صلاة . وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) (ابن ماجه حـ:1413)

তারাবীহের নামাযে ১০ রাক'আত পর ইমাম পরিবর্তন

জিজ্ঞাসাঃ অনেক মসজিদে তারাবীহ নামাযে ১০ রাকা'আতের পরে হাফেজ সাহেব পরিবর্তন হয়। এটাই কি সহীহ পদ্ধতি? নাকি ১২ রাক'আতের পর পরিবর্তন করা উচিত?

জবাবঃ তারাবীহ নামাযে ১০ রাক'আতের পরে হাফেয পরিবর্তন করা মুস্তাহাবের খিলাফ । বরং পরিবর্তন করতে চাইলে, যে কোন চার রাক'আত শেষে আরাম করার পরে হাফিয বা ইমাম পরিবর্তন করবে। যেমনঃ ৮ রাক'আতের পর বা ১২ রাক'আতের পর প্রভৃতি।

[প্রমাণঃ আলমগীরী , ১:১১৬ # জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া, ১:২২]

وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّرَاوِيحَ بِإِمَامٍ وَاحِدٍ فَإِنْ صَلَّوْهَا بِإِمَامَيْنِ فَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ انْصِرَافُ كُلِّ وَاحِدٍ عَلَى كَمَالِ التَّرْوِيحَةِ فَإِنْ انْصَرَفَ عَلَى تَسْلِيمَةٍ لَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ . (الفتاوى الهندية:116/1)

তারাবীহ নামাযে কুরআন শরিফ দেখে পড়া-৪ রাক'আত পরপর প্রচলিত দোয়া পড়া

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহ নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেব যদি কুরআন শরিফ দেখে পড়েন, আর মুক্তাদীরা যদি নামাযের মধ্যে কুরআন খুলে ইমামের অনুসরন করেন, তাহলে তাদের নামায সহীহ হবে কিনা? {পৃষ্ঠা–৩৭০}

তারাবীহের ২ রাক'আত ও ৪ রাকা'আত শেষে সাধারনভাবে বাংলাদেশে যে দু'আ পড়া হয়ে থাকে সৌদিতে ঐ ধরনের দু'আ পরা হয় না । এর জন্য কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে ইমাম বা কেউ কুরআন শরীফ দেখে দেখে পড়লে অথবা মুক্তাদী দেখে দেখে ইমামের পরা অনুসরন করলে, (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী) নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। তারাবীহ নামাযে প্রতি চার রাক'আত পর কিছুক্ষন বিরতি দেয়ার যে নির্দেশ এসেছে , সেই সময় কেউ দুয়া পড়লে পড়তে পারে। আর কেউ চুপ করে বসে থাকলে থাকতে পারে।

আর প্রচলিত দু 'আ যেমন পড়া যায় তেমনি অন্য কোন দু'আ বা দরুদও পড়তে পারবে।

[প্রমাণঃ শামী ১:৬২৪ # আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৪৫]

قرأته من مصحف اي ما فيه قرآن مطلقا لانه تعلم . (الدر المختار:623/1)

وفي الشامي: انه تلقن من المصحف فصار كما اذا تلقن من غيره . (رد المحتار:624/1)

তারাবীর নামাযে তারতীবের খেলাফ সুরা পরা

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহ-এর নামাযে ঊনিশতম রাক'আতে সূরায়ে নাস এবং বিশতম রাক'আতে আলিফ- লাম- মিম থেকে পরলে তারতীব-এর খেলাফ হওয়ার কারনে নামায মাকরুহ হবে কি- না ?

জবাবঃ তারাবীহ-এর নামাযে খতমে কুরআনের সময় ঊনিশতম রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে ফালাক্ব ও নাস এবং বিশতম রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা এবং সূরায়ে বাক্বারার কিছু অংশ , যেমন শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত পরা মুস্তাহাব । সুতরাং খতমে কুরআনের সময় এভাবে পড়ার কারনে তারতীবের খেলাফ হওয়া সত্তেও নামায মাকরূহ হবে না । খতমে কুরআন ব্যতিত অন্য সময় ইচ্ছাপূর্বক এভাবে তারতীবের খেলাফ করলে নামায মাকরূহ হয়ে যাবে।

[প্রমানঃ আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫০৮ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৪:৩৮৩]

وفي من يختم القرآن في الصلوة اذا فرغ من المعوذتين في الركعة الاولى يركع ثم يقوم في الركعة الثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب وشيئ من سورة البقرة..... جائزة. (شرح منية:463)

তারাবীহ নামাযে মুক্তাদিগনের নিয়্যত করা

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহ নামায পাঠকালে ছানা, আউযুবিল্লাহ ইত্যাদি পড়তে হবে কিনা এবং ইমাম সাহেব খুব দ্রুত নিয়্যত করে কিরাআত শুরু করলে, আমাদের অর্থাৎ মুক্তাদীদের আর নিয়্যত পড়তে হবে কি- না

{পৃষ্ঠা-৩৭১}

জবাবঃ ইমামের জন্য তারাবীহের নামাযে প্রথম রাক'আতে ছানা, আঊজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে শুধু বিসমিল্লাহ পড়া সুন্নাত । মুক্তাদিগন প্রথম রাক'আতে শুধু ছানা পড়বে। ২য় রাক'আতে এগুলোর কিছুই পড়বে না।

[প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক, ১:৩০৯-৩১১]

ইমাম সাহেব নিয়্যত বেঁধে দ্রুত কিরাআত শুরু করলেও মুকতাদীগনের জন্য নামাজের এবং ইক্বতিদার নিয়্যত করা জরুরী । কেননা, এ নিয়্যত ছাড়া নামাযই হয় না । তবে এখানে শুধু নির্দিষ্ট নামায যেমন-যোহরের ফরয এ ইমামের পিছে পড়ছি মনে মনে শুধু এ নিয়্যত করাটাই যথেষ্টর । আর তারাবীহের বিস্তারিত ভাবে নিয়্যত না করলেও চলবে। কেননা, সুন্নাত ও নফল নামাযে শুধু নামাযের নিয়্যতই যথেষ্ট।

[প্রমাণঃ আল- বাহরুর রায়িক, ১:২৭৮]

আমাদের দেশে প্রচলিত নামায শিক্ষা বইয়ে প্রত্যেক নামাযের যে আরবী নিয়্যত দেয়া হয়েছে, এ নিয়্যত পড়া জরুরী নয় । পড়া নিষেধও নয় । তবে অনেক ক্ষেত্রে তা নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। যেমন – জামা'আতের বেলায় অনেক সময় এটা তাকবীরে ঊলার ফযীলত পেতে বাধাগ্রস্ত করে।

ويكفيك مطلق النية للنفل والسنة والتراويح...الخ. (البحر الرائق:278/1)

তারাবীহের নামাযে কুরআন খতম করা

জিজ্ঞাসাঃ রামাযান মাসে তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ খতম করা কোন ধরনের সুন্নত? জবাবঃ রামাযান মাসে তারাবীহের জামা'আতে পবিত্র কুরআন শরীফ খতম করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আলাল কিফায়া ।[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া , ৭:১৭৫ # ফাতাওয়া রশীদিয়া , ৩৯৩ # দারুল উলুম , ৪:২৪৭]

তারাবীহের নামাযে কিরাআত পড়ার মুস্তাহাব তরীকা কি?

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহের নামাযে সূরায়ে ফাতিহা মিলিয়ে পড়বে না কিভাবে পড়বে? এবং উভয় রাক'আত কিরাআতের ব্যাপারে সমান রাখবে না ছোট বড় করা যাবে?

জবাবঃ তারাবীহের নামাযে অন্যান্য মুস্তাহাবের ন্যায় সূরায়ে ফাতিহা মুস্তাহাব তরীকায় আদায় করা উচিত। অর্থাৎ সাত আয়াত সাত শ্বাসেই পড়বে। কেননা তারাবীহের নামাযেও তাড়াহুরা করা , আঊজুবিল্লাহ , বিসমিল্লাহ বর্জন করা , স্থিরতা রক্ষা না করা মাকরুহ । সে হিসেবে সূরায়ে ফাতিহা মিলিয়ে না পড়ে ধীরস্থির ভাবে সাত শ্বাসেই পড়া উত্তম ।

[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ১:৫২৩ # ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম, ৪:২৫৭]

{পৃষ্ঠা-৩৭২}

তারাবীহের নামাযেও উভয় রাক'আত সমান রাখা মুস্তাহাব । অবশ্য মাঝে মধ্যে এর ব্যতিক্রম হওয়ায় কোন অসুবিধা নেই। তবে এরুপ অভ্যাসে পরিণত করা মুস্তাহাবের খেলাফ হবে।

[প্রমাণঃ রহীমিয়া৪:৩৯২ # মাহমূদিয়া১৪:২০১]

এক ইমামের দ্বারা খতম তারাবীহ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ খতম তারাবীহ একজন হাফেজ দ্বারা পড়ালে আদায় হবে কি- না । জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ যদি হাফেজ ভাল হয় , ইয়াদ ভাল থাকে তাহলে একা পড়ালেও খতম তারাবীহ হয়ে যাবে। যদি কোন জায়গায় সন্দেহ লাগে যে ভুল হয়ে গেছে তাহলে সালাম ফিরানোর পর দেখে নেবে । যদি বাস্তবেই ভুল হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ভুলকৃত স্থানটি পড়ে নিবে । অবশ্য সাথে ভুল ত্রুটি শুধরে দেয়ার জন্য আরেকজন হাফেজ থাকলে ভাল।
[প্রমাণঃ আযিযুল ফাতাওয়া ২৫১ পৃষ্ঠা]

তারাবীহের সময়ে সুবহানা যিল মুলকি দু'আটি পরার হুকুম কি?
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশে পবিত্র রামাযান শরীফে তারাবীহ নামায ৪ রাক'আত পরে যে সুবহানা যিল মুলকি নামে একটি দু'আ পরা হয় , এটা সহীহ কি-না?
জবাবঃ তারাবীহ নামাযে প্রতি চার রাক'আত অন্তর যে তারবীহা বা কিছুক্ষন বসে থাকা হয় , সে সময় আল্লাহতা'আলার প্রশংসা সম্বলিত যে কোন দু'য়া- দরুদ ও ইস্তিগফার পাঠ করা বা চুপ থাকা সবই জায়িয আছে। প্রচলিত প্রসিদ্ধ দু'আটিতে আল্লাহ্র প্রশংসা সম্বলিত হওয়ার কারনে কেউ জরুরী মনে না করে পড়লে তা জায়িয । শরয়ী দৃষ্টিকোণে তাতে কোন দোষ নেই। তা বিদ'আত ও নয় । তবে কেউ এটা পড়া জরুরী মনে করলে, তার জন্য বিদ'আত হবে । জরুরি মনে না করে সব সময় পড়লেও বিদ'আত হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২/৪৬]
মসজিদে তারাবীহের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহন
জিজ্ঞাসাঃ মসজিদে মহিলাদের যদি পৃথকভাবে নামাযের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে মহিলাগন জামা'আতের সাথে তারাবীহের নামায আদায় করতে পারবে কি- না ?
জবাবঃ মেয়েদের জন্য যথাসম্ভব গোপনস্থানে ও অন্দর মহলে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে নামায পরার মধ্যে সাওয়াব বেশী । হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন- একজন মেয়ে লোকের জন্য ঘরে নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম এবং ঘরের ভিতর ছোট হুজরার মধ্যে নামায পড়া ঘরের সাধারন অংশে নামায পড়ার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় ।
[আবু দাঊদ শরীফ]
{পৃষ্ঠা-৩৭৩}
অন্য এক হাদিসে এসেছে মেয়েদের জন্য জামা'আতে নামায পরার চেয়ে একা নামায পড়ায় ২৫ গুন বেশী সাওয়াব রয়েছে । নিজের ঘরে বেশী সাওয়াব হওয়ার পর মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ায় সোন্দর্যের প্রদর্শনী ছাড়া আর কোন প্রয়োজন থাকতে পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যদিও মেয়েদের দ্বীনের নিত্য নতুন হুকুম- আহকাম শিক্ষা করার জন্য কঠোর শর্ত – শারায়েতের সাথে মসজিদে হাজির হয়ে জামা'আতের সাথে নামায পরার অনুমতি ছিল । কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর ইন্তেকালের পরে ধীরে- ধীরে যখন ফেতনা- ফাসাদ বৃদ্ধি পেতে লাগল । তখন হযরত উমর (রাঃ) মেয়েদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিলেন । হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এই অভিযোগ করা হলে তিনি বললেন হযরত উমর (রাঃ) যে অবস্থার প্রেক্ষিতে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষেধ করেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এই অবস্থা দেখতেন তাহলে তিনিও মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন । (আবু দাঊদ শরীফ) এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ফুক্বাহায়ে ক্বিরামের অভিমত হলো সকল শ্রেণীর মহিলাদের জন্য মসজিদে নামায পড়তে যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী । চাই তা ফরয নামাযের জন্য হোক বা জুম'আ অথবা তারাবীহের জন্য হোক ।

অতএব, মহিলাদের জন্য একাকী ভাবে ঘরেই তারাবীহ পড়া উত্তম । মসজিদে যাওয়ার কোন অনুমতি নাই। মসজিদে যাওয়া তাদের জন্য ফ্যাশন ছাড়া আর কিছুই নয় । কারন অধিক সাওয়াব যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মসজিদের তুলনায় ঘরের অন্দর মহলে নামায আদায় করা তাদের জন্য বেশী উপযুক্ত ।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া, ১:১৭১]

ঘরে তারাবীহের জামা'আতে মহিলাদের অংশগ্রহন

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি রামাযান মাসে মসজিদে ইশার নামায জামায়াতের সাথে পড়ে বাড়ীতে এসে খতম তারাবী পড়ায় । এটা কি তার জন্য ঠিক হবে । অনেক মাহরাম-গাইরে মাহরাম মহিলারাও উক্ত খতম তারাবীতে তার পিছে ইক্তিদা করে । এখন প্রশ্ন হল উক্ত তারাবীতে মহিলাদের অংশগ্রহন করা এবং হাফেজ সাহেবের পিছনে ইকতিদা করা সহীহ হবে কি ?

জবাবঃ মসজিদে ইশার নামায জামা'আতের সাথে পড়ে বাড়িতে এসে তারাবীহের জামা'আত করতে কোন অসুবিধা নেই । বরং যে সব হাফেযদের তারাবীহ নামাযে ইমামতির সুযোগ না হয় তাদের এরুপ করা চাই । এতে তাদের তারাবীহের সাওয়াব কম হবে না । আর মহিলাদের তারাবীহএর

{পৃষ্ঠা-৩৭৪}

জামা'আতে অংশগ্রহনের জন্য নিজ ঘরোয়া পরিবেশ ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া নাজায়িয ও মাকরূহ । অবশ্য নিজ ঘরোয়া পরিবেশে তারাবীহের জামা'আতে অংশগ্রহন করা নিম্নবর্ণিত সুরতগুলোতে জায়িয আছে।

পুরুষ ইমামের পিছে যদি অন্য পুরুষ মুক্তাদি থাকে তাহলে ইমাম সাহেবের মাহরাম, গাইরে মাহরাম অথবা শুধু গাইরে মাহরাম সব মহিলাদের ইক্তিদা শহীহ হবে । অবশ্য মহিলাদের কাতার পুরুষদের কাতারের পিছনে হবে এবং গাইরে মাহরাম মহিলারা পর্দার আড়াল থেকে ইক্তিদা করবে ।

যদি ইমাম সাহেবের পিছে কোন পুরুষ মুক্তাদি না থাকে এবং মহিলাদের মাঝে ইমাম সাহেবের মাহরাম মহিলাও থাকে, তাহলে তার পিছে গাইরে মাহরাম পর্দার আড়াল থেকে ইক্তিদা করতে পারবে । পক্ষান্তরে যদি ইমাম সাহেবের পিছে কোন পুরুষ বা তার কোন মাহরাম মহিলা জামা'য়াতে অংশগ্রহন না করে তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু গাইরে মাহরাম মহিলার ইক্তিদা উক্ত ইমাম সাহেবের পিছে সহীহ হবে না বরং মাকরূহ হবে । উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য সর্বাবস্থায় অন্দর মহলে একাকী নামায পড়াই উওম এবং বেশী সাওয়াবের কাজ ।

[প্রমাণঃফাতাওয়ায়েশামী, ১: ৫৬৫ # আবুদাঊদ১:৮৪ # ফাতাওয়ায়েদারুলউলুম, ৪:২৫০]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِى بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِى مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِى بَيْتِهَا ». (سنن أبي داود حـ:570)

নাবালেগ হাফিযের পিছনে তারাবীহ নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ রাহমানী পয়গাম "৯৯ জানুয়ারী সংখায় ২৬১ নং প্রশ্নের উত্তরে লেখা রয়েছে-নাবালেগ হাফেজদের পিছনে বালেগ মুসল্লীদের তারাবীহ নামায হবে না । কিন্তু আমাদের এলাকায় এক মুহাদ্দিস সাহেব বলেন যে , নাবালেগ হাফেযজর তারাবীহ নামায পড়ানোর ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে । অর্থাৎ কোন ইমাম বলেছেন - এভাবে তারাবীহ পড়ানো যায় । আবার কোন ইমাম বলেছেন-পড়া যায় না । সেই হিসেবে নাকি মাঝে-মাঝে নাবালেগ হাফেজের পিছনে নামায পড়া যায় । এখন প্রশ্ন হচ্ছে- এই মুহাদ্দিস সাহেবের কথা ঠিক ; না রাহমানী পায়গামের বর্ণনা ঠিক ?

জবাবঃ নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী , নাবালেগ হাফেযের পিছনে তারাবীহ নামায পড়া নাজায়িয । সুতরাং রাহমানী পায়গামের বর্ণনা সঠিক । আর আপনাদের মুহাদ্দিস সাহেবের বর্ণনা দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় । কেননা , তিনি বলেছেন-এর মাঝে মতভেদ আছে । আর যখন কোন মাসআলায়
{পৃষ্ঠা-৩৭৫}
জায়িয-নাজায়িয নিয়ে মতবিরোধ হয় , তখন তা পরিত্যাগ করা উচিত । যাতে মতবিরোধের অবসান হয় । তবে মুহাদ্দিস সাহেবের উচিত ছিল যে , "মতভেদ –এর মধ্যে কোন মত উপর ফতওয়া সেটা বলে দেয়া" । যাতে নতুন সমস্যায় পড়তে না হয় । এ ধরনের আরো অনেক মাসআলা রয়েছে , যেগুলোতে মতবিরোধ রয়েছে-কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মতের উপর আমল করা জরুরি । অনির্ভরযোগ্য মতটির উপর আমল করা জায়িয নয় । সুতরাং মুহাদ্দিস সাহেব মাঝে-মধ্যে আমল করার যে কথা বলেছেন তা সঠিক নয় । উক্ত মুহাদ্দিস সাহেব যদি মুফতী না হয়ে থাকেন তাহলে তার ফাতওয়া না দেওয়া উচিত ।

তারাবীহ নামায পড়ানোর জন্য হাফেজ এবং ইমাম নিয়োগের ইন্টারভিউ

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের অনেক মসজিদে দেখা যায় রামাযান মাসে তারাবীহ পড়ানোর জন্য হাফেজ নিয়োগের ঘোষনা করা হয় এবং হাফেজ সাহেবগনকে জমা করা হয় । তাদের মধ্য হতে মসজিদ কমিটির সাধারন লোক অর্থাৎ যারা আলেম নয় , এমন লোক পড়া-শুনে ,কন্ঠস্বর ইত্যাদি দেখে , যার ব্যাপারে বেশী লোক রায় দেয় তাকে নির্বাচন করে থাকে । এখন আমার প্রশ্ন হলো,
ক) এই ভাবে হাফেজ নির্বাচন বা ইমাম নিযুক্ত করা সহীহ আছে কি-না?
খ) এবং হাফেজে কুরআনের জন্য এরুপ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করা বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ ক) উক্ত পদ্ধতিতে হাফেজ নিযুক্ত করা সমীচীন নয় । কারন , এভাবে যিম্মাদার নিয়োগ করার প্রচলন ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না । তাছাড়া এর দ্বারা হাফেজে কুরআনদের অবমাননা হয় । এভাবে যিম্মাদার নিয়োগের এই গণতান্ত্রিক নিয়ম সর্বপ্রথম ইংরেজরা আবিষ্কার করেছে এবং ক্ষমতা বলে বা কৌশলে তা সর্বত্র চালু করেছে । আর জনগন দ্বীনী ব্যাপারে অজ্ঞ থাকার কারনে ইংরেজ ও ব্রিটিশদের অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে অফিস – আদালতের গণ্ডি পার হয়ে মসজিদ – মাদ্রাসায়ও তা জারী করতে শুরু করেছে । এ ব্যাপারে সহীহ পদ্ধতি হলো – হক্কান্নী উলামাদের মাধ্যমে যিম্মাদার নিয়োগ করা বা যেসব স্থানে হাফেজ আলেম তৈরী হয় , সেখানে গিয়ে তাদের পড়া শুনে – জেনে সেখানের উস্তাদদের থেকে লোক নেয়া । এর নযীর সাহাবায়ে কিরামের যামানায় বহু রয়েছে । আর ঐ যামানায় খলিফা থেকে শুরু করে পাহারাদার নিযুক্ত করা পর্যন্ত কাউকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিযুক্ত করা হত না । বরং বিজ্ঞ লোকদের পরামর্শের মাধ্যমে যিম্মাদার নিয়োগ করা হত ।
{পৃষ্ঠা-৩৭৬}
(খ) কোন ইমাম বা হাফেযের জন্য উক্ত প্রকারের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করা উচিত হবে না । এতে কুরআন ও নিজের অবমাননা হয় । কুরআনের অবমাননা করা, এমনি ভাবে নিজেকে অপমান করা শরীয়তে নিষেধ ।
[প্রমাণঃ সূরায়ে আন'আম , ১১৬ # তিরমিযী শরীফ , হাদিস নং২২৫৪ ও ইবনে মাজা , হাদিস নং৪০১৬ # মিশকাত শরীফ , ২য় খন্ড , পৃষ্ঠা ৪৬৯]

তারাবীর নামাযে সূরার শুরুতে উচ্চঃস্বরে বিসমিল্লাহ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ তারাবীহ নামাযে প্রত্যেক সূরাহর শুরুতে উচ্চঃস্বরে বিসমিল্লাহ উচ্চৈঃস্বরে হানাফী মাযহাবে সহীহ আছে কি ?
জবাবঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী তারাবীহ এর প্রত্যেক সূরাহর শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চঃস্বরে পড়া যাবে না । কারন হানাফী মাযহাবের সমস্ত ইমামগন এই ব্যাপারে একমত যে , নামাযের মধ্যে বিসমিল্লাহ আস্তে পড়তে হবে । অবশ্য যে কোন এক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ উচ্চঃস্বরে পড়তে হবে । উল্লেখ্য , হানাফীগন যদিও ইমাম আসিম (রাহঃ)-এর কিরাআত পড়েন এবং তিনি প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তেন । হানাফীগনও প্রত্যেক সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়ে তার উপর আমল করবে বটে । কিন্তু সেজন্য উচ্চৈস্বরে পড়ার কোন প্রয়োজন নাই । কারন , তাতে হানাফী ফুক্বাহাদের মতের বিরোধিতা করা হবে । আর নিঃশব্দে পড়লে সকলের কথার উপর আমল হয়ে যাবে ।[প্রমাণঃনাসায়ী১:১০৫ # ফাতাওয়ায়েশামী, ১: ৪৫৭ # ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম, ৪:২৬৪ # ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৩৪৭]
তারাবীহ পড়িয়ে টাকা নেয়া
জিজ্ঞাসাঃ আমরা সাধারনতঃ তারাবীহ নামাযের জন্য বাহির হতে হাফেজ রেখে থাকি এবং রোযার শেষ দিকে মুসুল্লীদের নিকট এলান দিয়ে তাদের নিকট থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত হাদিয়া উঠিয়ে হাফেজ , ইমাম , মুআযযিন ও খাদেমের মধ্যে বিতরন করে থাকি । শরীয়াতের হুকুম অনুযায়ী এটা জায়িয কি- না ?
জবাবঃ ইমাম , মুআযযিন ও খাদেমদেরকে রামাযান বা ঈদ উলপক্ষে বেতনের পরও কিছু বোনাস ইত্যাদি মসজিদ ফান্ড থেকে অথবা মুসল্লিরা স্বেচ্ছায় দিলে তা দেয়া জায়িয আছে । কিন্তু হাফেয সাহেবকে তারাবীহ্ পড়ানোর জন্য কোন ফান্ড থেকেই টাকা বা বিনিময় দেয়া ও হাফেয সাহেবের জন্য তা নেয়া জায়িয নয় । আমাদের দেশে মসজিদ কমিটি খাতা- কলম নিয়ে যেভাবে হাফেয সাহেবের জন্য চাইতে থাকেন এবং মসজিদে এলান দেন, তাতে এটাকে কোন মতেই হাদিয়া বলা চলে না । হাদিয়া মুহাব্বতের নিদর্শন । যা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার । সুতরাং আমাদের দেশের এ ধরনের লেন-দেন কুরআনের অবমাননা ও নাজায়িয
{পৃষ্ঠা-৩৭৭}
কাজ । এতে খতমে তারাবীহের সাওয়াব বাতিল হয়ে যেতে পারে । হাফেজগনকে আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামত দান করেছেন, তার শুকরিয়া এটাই যে , তারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারাবীহ নামাযে কুরআন শুনাবে এবং এর মহাপ্রতিদান আল্লাহ্র দরবার থেকে পাওয়ার আশা রাখবে । হিফজের মত এতবড় দৌলত সারা দুনিয়া যার বদলা হতে পারে না , সেই দৌলতকে অতি নগণ্য সামান্য টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করার মত বেওকুফি আর হয় না । হাফেজগন আল্লাহ্র ওয়াস্তে কুরআন শুনাবে । আল্লাহ তা'আলা তাঁদের দুনিয়ার জরুরত পুরা করে দিবেন । কোথা থেকে করবেন , তা তিনিই ভাল জানেন । তাঁর দরবারে কোন অভাব নেই । তিনি অকল্পনীয়ভাবে বান্দাকে রিযিক দেন । তবে হ্যাঁ, কেউ যদি ঐ হাফেয সাহেবকে তার দ্বনিদারীর কারনে তাকে মুহাব্বত করেন , তাহলে মুহাব্বতের নিদর্শন স্বরূপ ব্যক্তিগতভাবে যে কোন সময় বা যখনই তাওফীক হয় , হাফেয সাহেবের মুহাব্বতে কিছু হাদিয়া পেশ করবেন । তবে এটা তারাবীহের শেষে না হওয়া উচিত । যাতে করে বুঝা যায় যে , এটা বাস্তবেই ব্যক্তিগত মুহাব্বতের হাদিয়া । দুনিয়াবী বিনীময় ছাড়া কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তেই নামায পড়াবে । এমন মুখলিস হাফেয পাওয়া না গেলে , ওয়াক্তিয়া ইমামের পিছনে সূরা তারাবীহ পড়া, পেশাদার হাফেযের পিছনে খতমে তারাবীহ পড়া থেকে উত্তম ।

[প্রমানঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া১:৪৮৪ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫১৪ # ইমদাদুল মুফতীন, ৩৬৫]
{وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} [البقرة : 41]
ان القرآن بالاجرة لايستحق الثواب لا للميت ولا للقارئ. (رد المحتار:56/6)
عن عبد الله بن مغفل انه صلي الناس في شهر رمضان فلما كان يوم الفطر بعث اليه عبد الله بن زياد محلبة وبخمس مائة درهم فردها و قال انا لا نأخذ علي القران اجرا. [مصنف ابن ابي شيبة -1292/2]
وان القران لشيئ من الدنيا لا تجوز وان الاخذ و المعطر اثمان لان ذلك يشبه الاستجار علي القرائة و نفس الاستئجار عليها لا يجوز – (رد المحتار-73/6)
ইদানীং অনেকে এরুপ একটা সুরাতকে জায়িয বলে মনে করেছেন যে, হাফেয সাহেবকে যদি রামাযানে একমাসের জন্য ৫ ওয়াক্ত বা নির্দিষ্ট দুই তিন ওয়াক্তের জন্য ইমাম বানিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য টাকা নেয়া জায়িয ।
{পৃষ্ঠা-৩৭৮}
কিন্তু হযরত মাওঃ আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) ইমদাদুল ফাতাওয়ার ১:৪৮৫ পৃষ্ঠায় এই সুরাতকেও এই জন্য নাজায়িয বলেছেন যে, যদিও তাকে রামাযান মাসের জন্য ইমাম বানিয়ে নেওয়া হয়, তবুও তার মূল উদ্দেশ্য থাকে তারাবীহের নামায । কেননা- উক্ত হাফেয সাহেব যদি শুধু ওয়াক্তিয়া নামায পড়ান আর তারাবীহ না পড়ান , তাহলে তাকে ইমাম রাখা হবে না । তাই দ্বীনী ব্যাপারে এরুপ হীলা জায়িয নয় । উল্লেখ্য ফাতাওয়ার কিতাবে উলামাগনের ইখতিলাফ বর্ণনা করতে যেয়ে শক্তিশালী ও দুর্বল উভয় ধরনের কাওল উল্লেখ্য থাকে । শেষে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ মতটি বর্ণিত হয় , সেটার উপরই মুফতীয়ানে কিরাম ফাতওয়া দিয়ে থাকেন ।কিন্তু অধুনা নামদারী কিছু আলেম ফাতাওয়ার কিতাবের দুর্বল কাওলের ভিত্তিতে তারাবীহ নামাযের বিনিময় নেয়া জায়িয বলছেন । হাক্কানী উলামাগনের নিকট এটা সহীহ নয় । সুতরাং মুসলমানদের উচিত নিজেদের আমলের হেফাজতের লক্ষ্যে যার তার ফাতাওয়ার উপর আমল না করা । বর্তমানে নিঃস্বার্থ ও হাক্কানী উলামাগনের সংখ্যা খুবই কম । খুঁজে বের করে তাদের অনুসরন করতে হবে।
[প্রমানঃইমদাদুল ফাতাওয়া, ১:৪৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৩:৫১৪ # ইমদাদুল মুফতীন, ৩৬৫ # ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া , ৩৯২ # তালীফাতে রশীদিয়া, ৩২৫ # ফাতাওয়ায়ে মাহ্মূদিয়া , ১৪:৩২ # শামী, ৫:৩৮]
ই'তিকাফ অবস্থায় হাফেজ সাহেবের অন্য মসজিদে তারাবীহ পড়ানো
জিজ্ঞাসাঃ কোন হাফেজ এক মসজিদে ই'তিকাফ করা অবস্থায় অন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়াতে পারবে কি- না ?
জবাবঃ যদি হাফেজ সাহেব ই'তিকাফ করার সময় এরুপ নিয়্যত করে যে , আমি অত্র মসজিদে ই'তিকাফ করব এবং তারাবীর সময় গিয়ে অন্য মসজিদে নামায পড়াবো, তাহলে তারাবীহ পড়ানোর জন্য অন্য মসজিদে যাওয়া জায়িয হবে । তবে তার ই'তিকাফ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ হিসাবে আদায় হবেনা বরং নফল ই'তিকাফ বলে গণ্য হবে ।
আর যদি ই'তিকাফের সময় এ ধরনের নিয়্যত না করে তাহলে তারাবীহের জন্য অন্যত্র যাওয়া সহীহ হবে না । গেলে তার সেদিনের ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং পরে কাযা করতে হবে ।
[প্রমানঃ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ১:২১২, ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম ৬:৫১২]
ولو شرط وقت النذر والالتزام انه يخرج الي عبادة المريض وصلاة الجنازة وحضور مجلس العلم يجوز له ذلك-
[عالمكيري:212/1]
{পৃষ্ঠা-৩৭৯}

জুমু'আ / খুৎবা

জুমু'আর খুৎবার সময় টাকা কালেকশন

জিজ্ঞসাঃ জুমু'আর নামাযের সময় খুৎবাহ চলাকালীন সময়ে মসজিদের দান বাক্স চালান এবং নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে হেঁটে- হেঁটে টাকা-পয়সা কালেকশন করা জায়িয কি-না?

জবাবঃ জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বারে বসেন এবং খুৎবার আযান শুরু হয়ে যায় , তখন থেকে বাক্স চালানো নাজায়িয ও হারাম । শুধু বাক্স চালানো নয় , বরং নামাযের সময় যেসব বিষয় নাজায়িয , খুৎবার সময়ও ঐসব বিষয় নাজায়িয ।

নামাযীর সামনে দিয়ে যেমন মুসল্লীদের যাতায়াত নাজায়িয । তদ্রুপভাবে মুসল্লী ছাড়া অন্য যে কোন জিনিসের যাতায়াত করানোও নাজায়িয ।

মোটকথা, নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে বা খুৎবাহ চলাকালীন সময়ে খুৎবা শ্রবণকারীদের সামনে দিয়ে এমন কোন কাজ করা জায়িয নয়, যার দ্বারা নামাযের মধ্যে বা খুৎবা শ্রবনের মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় । সুতরাং তার সামনে দিয়ে বাক্স চালান বা হেঁটে-হেঁটে টাকা-পয়সা কালেকশন করা জায়িয নয় ।

[প্রমানঃফাতাওয়া শামী, ২:১৫৯পৃঃ]

وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها اي الخطبة بل ان يجب عليه ان يستمع و يسكت بلا فرق بين قريب وبعيد في الاصح ..... الخ (رد المحتار 159/2)

জুমু'আর ছানী আযানের উৎপত্তি ও তার আদায়ের স্থান

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ছানী আযান মসজিদের ভিতরে দাঁড়িয়ে দিতে হবে , না বাহিরে দাঁড়িয়ে? কখন থেকে এ আযানের প্রচলন আরম্ব হয়? তাছাড়া মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে এ আযান দেওয়া কোন ক্ষতি আছে কি?

জবাবঃ জুমু'আর ছানী আযান বলতে সেই আযানকে বুঝায়- যা খুৎবা পাঠ করার পূর্বে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া হয় । এ আযানের সুন্নাত তরীকা হলো- মসজিদের ভিতরে খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া । এ আযান মসজিদের বাহিরে দাঁড়িয়ে দেয়ার অনুমতি নেই । এ আযানের প্রচলন শুরু হয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগ থেকে ।

হযরত উসমান (রাযিঃ)- এর যুগে দ্বীনী প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি উক্ত আযানের পূর্বে আরেকটি আযানের প্রচলন করেন । যা মসজিদের বাহিরে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে দেয়া হত । এরপর থেকে সে নিয়মই চলে আসছে ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ .... قال المحشي تحت قوله اذا نودي للصلوة المراد بهذا النداء الاذان عند قعود الخطيب علي المنبر اذا جلس علي المنبر اذن علي باب المسجد فاذا نزل قام الصلوة....الخ. (تفسير جلالين:460)

واذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام الي تمامها خلاقضاء فائتة......الخ- [رد المحتار 158/2]

واذا جلس الامام علي المنبر اذن المؤذن بين يديه الاذان الثاني للتوارث- الخ [حلبي كبير 561]

[প্রমানঃ শামী২:১৫৮ # জালালাইন শরীফ, ৪৬০পৃঃ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:১২৬ # শরহুন্ নিক্কাংয়াহ, ১:২৯৭ # হালবী কাবীর, ৫৬১]

{পৃষ্ঠা-৩৮০}

ছানী আযানের জওয়াব ও দু'আর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ছানী আযানের জওয়াব দেয়া ও দু'আ পড়া জায়িয আছে কি?

জবাবঃ জুমু'আর ছানী আযানের জওয়াব ও তার দু'আ মুখে দেওয়া মাকরূহ । হ্যাঁ , মনে মনে দিতে পাড়বে।

[প্রমানঃ শামী, ২:১৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪:১২৫ # মাবসূত২:২৯]

واذا خرج الامام فلاصلوة ولاكلام الي تمامها خلا قضاء فائتة.....الخ- [رد المحتار 158/2]

একাধিক ব্যক্তি মিলে জুমু'আর খুৎবা পড়া

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর নামাযের প্রথম খুৎবা দুইজন পড়তে পারবে কি-না? অথবা প্রথম খুৎবা একজন এবং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজন পরতে পারবে কি-না?

জবাবঃ জুমু'আর খুৎবা একজনকেই পড়তে হবে। ধারাবাহিকতার সহিত এ নিয়মই চলে আসছে। প্রথমে খুৎবা দু'জনে বা প্রথম খুৎবা একজন এবং দ্বীতীয় খুৎবা অন্যজন পড়ার নযীর আমাদের জানা নাই।

[প্রমানঃশামী২:১৫৯ # মদাদুল ফাতাওয়া, ১:৬৭৫]

মসজিদের মিম্বারে বসা

জিজ্ঞাসাঃ সাধারণতঃ একটি মিম্বারের তিনটি সিঁড়ি থাকে। অনেক আলেম বলে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরের সিঁড়িতে বসে ওয়ায করতেন এবং দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করতেন। তাই উপরের সিঁড়িতে বসে ওয়ায বা খুৎবা পাঠ করা আমাদের কোন ক্রমেই উচিত নয়। আবার অনেককে দেখতে পাই, প্রথম সিঁড়ির উপর বসে ওয়ায - নসীহত করতে। কিন্তু খুৎবা পাঠ

{পৃষ্ঠা-৩৮১}

করেননা। প্রথম সিঁড়ির উপর বসা নিয়ে মাঝে মধ্যে দলীলও দিয়ে থাকেন। সবাই এটা মেনে নিতে পারে না। তাই উপরোক্ত সমস্যার সমাধান দিয়ে আমাদের দ্বিধা সংকোচকে দূর করার জন্য অনুরোধ করছি।

জবাবঃ মসজিদে নববীতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য সর্বপ্রথম কাঠের যে মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিল। তার তিনটি তাক বা স্তর ছিল। এ কারনে মিম্বারে তিনটি তাক হওয়া সুন্নাত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করতেন। এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফত কালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সম্মানার্থে উপরের তাকে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ না দিয়ে মাঝের তাকে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। এরপর হযরত উমর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতের যমানায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত আবু বকরের (রাযিঃ) প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে উপরে এবং মাঝের তাকে না দাঁড়িয়ে নীচের তাকে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দিতেন। এখন ইমামের জন্য যেকোন তাকে দাঁড়িয়ে খুৎবাহ দেওয়ার অনুমতি আছে। কেননা- তিনটি পদ্ধতিই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামদের থেকে প্রমাণিত আছে।

[প্রমানঃশামী, ২:১৬১, # ইমদাদুল মুফতীন, ৩৭৪পৃঃ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২০]

اذا جلس علي المنبر..... ومن السنة ان يخطب عليه اقتداء به صلي الله عليه وسلم ومنبره صلي الله عليه وسلم كان ثلاث درج غير المسماة بامستراح- (رد المحتار:161/2)

জুমু'আর ছানী আযানের জওয়াব

জিজ্ঞাসাঃ একজন মুফতি সাহেব জুমু'আর খুৎবার আগে মুসুল্লীদের বলে দিলেন যে, খুৎবার আযানের (ছানী আযানের) জওয়াব দেয়া জায়িয নেই।

আবার অন্য দিকে মিরপুরে একটি জামে মসজিদের খতিব বললেন যে, খুৎবার আযানের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। এখন প্রশ্ন হলো কার কথা সঠিক? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

জবাবঃ কোন আযানের মৌখিক জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়। বরং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের মৌখিক জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। আর জুমু'আর দ্বিতীয় আযান অর্থাৎ খুৎবার পূর্বের

আযানের জওয়াব মুখে দেয়া মাকরূহ । সুতরাং যিনি জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জওয়াব দেওয়াকে ওয়াজিব বলেছেন তাঁর কথা ঠিক নয় । অবশ্য মুখে জবাব না দিয়ে দিলে জবাবের শব্দগুলো চিন্তা করলে কোন অসুবিধা নেই ।

[প্রমানঃ দুররে মুখতার, ১:৩৯৯ # ফাতাওয়ায়ে দারুল উলুম, ২:৯১]

قال وينبغي ان لايجيب بلسانه اتفاقا في الاذان بين يدي الخطيب وان يجيب بقدمه اتفاقا في الاذان الاول.........الخ- [الدر المحتار 399/1]

{পৃষ্ঠা-৩৮২}

খুৎবা চলাকালীন সময় দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন কোন লোকের মুখে শুনি যে, ইমাম জুমু'আর দিন খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে উঠলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম আসলেও কোন প্রকার দরূদ পড়া যাবে না । এর বাস্তবতা জানিয়ে বাধিত করবেন ।

জবাবঃ খুৎবা যেহেতু নামাযের মত ইবাদত এবং খুৎবার সময় নামায-কালাম এমনকি আমর বিল মারুফ, নাহি আনিল মুনকার (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) ও নিষিদ্ধ এবং এর দ্বারা জুমু'আর ফযীলত বাতিল হয়ে যায় । এই সহীহ হাদিসের কারণে খুৎবার মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক শুনলে দিলে দিলে দরূদ পড়ে নিবে , কিন্তু মুখে উচ্চারণ করে পড়বে না ।

দরূদ পড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম –এর মহাব্বত তো প্রকাশ করতেই হবে । তবে তা নিজের মর্যী মত নয় । বরং শরীয়তের নির্দেশ মত ।

[প্রমানঃ ফাতাওয়া শামী, ২:১৫৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ২:১৫৯ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫:২৮ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৩পৃঃ]

ইমামের উপস্থিতিতে অন্যের খুৎবা পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম যদি জুম'আর দিন মুসল্লীদের অনুমতি ব্যতিরেকে নিজের কোন যোগ্য আত্মীয়কে খুৎবা পড়তে বলেন, তাহলে মুসল্লীরা এতে কোন আপত্তি জানাতে পারবে কি-না? এবং শরীয়ত মতে এরূপ করা জায়িয কি-না?

জবাবঃ উত্তম হল- যিনি নামায পড়াবেন, তিনিই খুৎবা পড়াবেন । তবে ইমাম সাহেবের উপস্থিতিতে অন্য কেউ খুৎবাহ পাঠ করলে এবং ইমাম সাহেব নামায পড়ালে তাও জায়িয আছে । আর জায়িয কাজে আপত্তি না করাই কর্তব্য । কিন্তু ইমাম সাহেবের অনুপস্থিতিতে অন্য কাউকে দিয়ে খুৎবা পাঠ করানো ও ইমাম সাহেব পরে এসে নামায পড়ানো জায়িয নয় ।

[প্রমানঃ শামী ২:১৬২পৃঃ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১১ # আযীযুল ফাতাওয়া ৩৯৯]

و لا ينبغي ان يصلي غير الخطيب...............الخ- [رد المحتار 162/2]

খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বয়ান করা

জিজ্ঞাসাঃ “দাওয়াতুল হক্ব”- এর এক মজলিসে শুনতে পেলাম যে,“জুমু'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বারে বয়ান করার যে পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু রয়েছে তা সুন্নাত পরিপন্থী । কারন, এর দ্বারা জুমু'আর গুরুত্ব হ্রাস পায়।” অতঃপর সে অনুযায়ী আমল ও আরম্ভ করা হয় অর্থাৎ, জুমু'আর খুৎবার পূর্বের

৩৮৩ ---- ৩৮৪ পৃষ্ঠা নেই

{পৃষ্ঠা-৩৮৩}
বয়ানের জন্য মিম্বারের পার্শ্বে একটি চেয়ার রাখাহয় এবং খতীব সাহেব তাতে বসেই বয়ান করেন। কিন্তু এতে বিখিন্ন রকম প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে; বিধায় যথোপযুক্ত প্রমাণসহ বিস্তারিত জানিয়ে কৃতাথ© করবেন বলে আশা করি।
জবাবঃ মসজিদে চেয়ার এন তাতে বসে ওয়ায নসীহত করা সম্পূণ© জায়িয। আর জুমু'আর ফরয নামাযের পূর্বে বা পরে মিম্বরে বসে ওয়ায নসীহত না করে চেয়ারে বসে তা করাটাই উত্তম এবং এটাই সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ভিতরে চেয়রে বসে স্বয়ং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওয়াজ নসীহত করেছেন। যেমন মুসলিম শরীফের একটি হদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত আবু রিফা'আহ রাযি. বণ©না করেন যে, আমি নবীজীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিকট এমতাবস্থায় পৌঁছেছি যে, তখন তিনি তখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এক অপরিচিত মুসাফির ব্যক্তি এসেছে। সে দ্বীন সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ বিধায় সে এ সম্পর্কে জানতে চায়। তিনি বণ©না করেন যে, এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দেয়া স্থগিত রেখে আমার দিকে অগ্রসর হলেন এবং একেবারে আমার নিকটে চলে এলেন। এরপর সেখানে চেয়ার আনা হল। তিনি (সাহাবী) বলেন, আমার মনে হয় চেয়ারের পায়াগুলো লোহার ছিল। তিনি উক্ত চেয়ারে বসে আমকে সেই জিনিসগুলো শিক্ষা দিলেন যেগুলো তাকে শিক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং মহান রাব্বুল আলমীন। অতঃপর তিনি খুতবা ব্যতীত ওয়ায-নসীহত করার জন্য মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করেছেন এবং মিম্বরে বসে ওয়য করেননি; সুতারাং এটা সুন্নাত।
বত©মানে আমাদের সমাজে মসজিদের ভিতরে চেয়ারে বসে ওয়ায নসীহত করাকে যেরূপভাবে নাজায়িয বাখারাপ মনে করে বিভিন্ন প্রশ্ন করা হয়ে থাকে এরূপ প্রশ্ন এর পূর্বেও কিছু লোক করেছে। যেমন ফাতাওয়া মাহমূদিয়ায এ ধরণের প্রশ্ন রয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, উক্ত হাদীস ইমাম বুখারী রহ. তার কিতাব “আদাবুল মুফরাদ” এর মধ্যে এনেছেন। সুতরাং যে ব্যাপারে স্পষ্ট হাদীস রয়েছে সে ব্যাপারে অযথা প্রশ্ন করা অজ্ঞতা ও মূখ©তা বৈ কিছুই নয়। [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া:২/৩১৭]

{পৃষ্ঠা-৩৮৪}

قال ابو رفاعة انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسئل عن دينه لا يدري مادينه قال فاقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك الخطبة حتى انتهى الي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا, قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يعلمني مما علمه الله ثم اتى خطبة فاتم اخرها . [رواه مسلم:287/1]

তাছাড়া আগলাতুল অওয়ামের ৭৩নং পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, নামাযের পরেও যদি খুতবার অথ© শুনানো হয়, তাহলেও মিম্বর থেকে সরে যাওয়া উত্তম। কারণ, যাতে খুতবা ড়ার সাদৃশ্য থেকে দুরে থাকে। অথচ জুমু‘আর খুতব পড়া হয় নামাযের পূর্বে। নামাযের পরে পড়া হয় না। আর নামযের পরে কোন খুতবার সাদৃশ্য না হয়ে যায়। তাহলে নামাযের পূর্বে ওয়ায-নসীহত করার সময়তো মিম্বার থেকে সরে যাওয়া শুধু উত্তমই নয়; বরং জরুরী বুঝা যায়। কারণ, ঐ সময়তো খুতবা পাঠের সাদৃশ্য হয়ে যায়। তাই চেয়ারে বসে বা মিম্বর ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওয়ায-নসীহত করা চাই। আর এটাই উত্তম ও সুন্নাত। [প্রমাণ: মুসলিম শরীফ:১/২৮৭, ফতাওয়া মাহমুদিয়া:২/৩১৭, আগলাতুল আওয়াম:৭৩]

এ কারণে হযরত উমর ফারুক রাযি. এর যামানায় তার নির্দেশে যখন খুতবার পূর্বে ভিন্নভাবে বয়ানের নিয়ম চালু হয়, তখন খুতবার পূর্বে হযরত আবু হুরাইর ও তামীমে দারী রাযি. বয়ান করতেন। অবশ্য উভয়িই মিম্বার থেকে দূরে থেকে বয়ান করতেন। তাদের কেউ উক্ত বয়ান মিম্বরে বসে করতেন না। তারপর যখন হযরত উমর ফারুক রাযি. জুমু‘আর খুতবা দেয়ার জন্য উপস্থিত হতেন, তখন তারা বয়ান বন্ধ করে দিতেন।

উল্লেখ্য মিম্বারে বসে বয়ন না করার যে হুকুম বণ©না করা হলো, তা শুধু জুমু‘আর সময়ের ব্যাপারে খাছ। জুমু‘আ ব্যতীত অন্য যে কোন সময় মিম্বরে বসে বয়ান করা যায় এতে কোন অসুবিধা নাই।   [প্রমাণঃ প্রাগুক্ত]

ছানী আযান দেয়ার জায়গা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার এক শ্রেণীর লোক বলে যে, জুমু‘আর নামাযের ছানী আযান মসজিদের ভেতরে ইমামের সামনে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। অন্য এক শ্রেণীর লোক বলে যে, মসজিদের বাহিরে দরজার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে দিতে হবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের রায় কি ?

[৩৮৪-438]

{পৃষ্ঠা–৩৮৫}

জবাবঃ জুমু'আর নামাযের ২য় আযান ইমামের সামনে এমন স্থানে দিতে হবে-যেখানে দাঁড়ালে সকল মুসল্লীগণ আযান শুনতে পান। মুসল্লীগণের সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করে প্রয়োজন অনুসারে আগে পিছে দাঁড়ানো যেতে পারে-যাতে করে সব মুসল্লী আযান শুনতে পায়। এক হাদীসে রয়েছে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর যুগে জুমু'আর আযান ইমামের সামনে দরজার কাছে দেয়া হতো। যার উপর ভিত্তি করে কিছু লোক মসজিদের বাহিরে ছানী আযান দিতে বলেন। তাদের এ বক্তব্য যথোচিত নয়। কারণ-হাদীস বিশারদগণ উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- আযান নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম–এর সামনে নিকটবর্তী স্থানেই দেয়া হতো। আর তখন যেহেতু মসজিদে নববী বেশী চওড়া ছিল না এবং মসজিদের মিম্বর বরাবর সামনের দিকে একটি দরজাও ছিল, সুতরাং নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর সামনে আযান দিতে গেলে তা দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে দিতে হত। এভাবে ইমামের সামনে আযান দেয়াই সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদীয়ার আমল হয়ে আসছে।

[প্রমাণঃ শামী ২:১৬১#   আবূ দাউদ শরীফ ১:১৫৫#   এলাউস্‌সুনান ৮:৭৬#   আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৭#   ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২:৫৮#   মাসায়েলে নামাযে জুমু'আ ১৫৭-১৫৮]

عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا جلس علي المنبر يوم الجمعة علي باب المسجد.................[ابو داؤد:155/1]

থুৎবার পূর্বে বাংলায় ওয়ায করা ও থুৎবার তরজমা করা

জিজ্ঞাসাঃ খুৎবাতুল আহকামে খুৎবা পড়ার নিয়মের মধ্যে লিখা আছে, জুমু'আর খুৎবার পূর্বে খুৎবার বিষয়বস্তু স্থানীয় ভাষায়, যেমন বাংলায় তরজমা শুনানো বিদ'আত। কিন্তু প্রায় সকল মসজিদেই জুমু'আরা খুৎবার পূর্বে স্থানীয় ভাষার খুৎবার তরজমা শুনানো হয়। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত জানতে চাই।

জবাবঃ জুমু'আর দিন খুৎবার পূর্বে মিম্বর থেকে দূরে দাঁড়িয়ে বা চেয়ারে বসে কিছুক্ষণ দীনী আলোচনা করা এবং ওয়ায নছীহত করা চাই। অনেক সাহাবা (রাযিঃ) থেকে এর প্রমাণ মিলে। বিশেষ করে হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এর যামানায় খুৎবার পূর্বে হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিঃ) ও তামীমে দারী (রাযিঃ) মিম্বর থেকে দূরে সরে বয়ান করতেন। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) খুৎবা দেয়ার জন্য উপস্থিত হলে তারা বয়ান বন্ধ করে দিতেন। খুলাফায়ে রাশেদীন এর যুগে

{পৃষ্ঠা–৩৮৬}

তাদের নির্দেশে হওয়ায় এটাকে বিদ'আত বা নাজায়িয বলার অবকাশ নাই। তবে আরবীতে খুৎবা পড়ে খুৎবার সাথে সাথে বা খুৎবার শেষে তার তরজমা স্থানীয় ভাষায় করা এটা শরী'আতে নিষেধ। আর এটাকেই খুৎবাতুল আহকামে বিদ'আত বলা হয়েছে। খুৎবার পূর্বে ওয়ায করাকে বিদ'আত বলা হয় নাই।

[প্রমাণঃ শামী ১:৪৮৪, ৫:১১৯# ইমদাদুল আহকাম ১:৬৫৯, # দারুল উলূম খুৎবাতুল আহকাম ২পৃঃ]

জুমু'আর খুৎবা মাতৃভাষায় দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর খুৎবা আরবী ভাষায় পড়া জরুরী কি-না? না মাতৃভাষায় দিলেও চলবে?

জবাবঃ খুৎবা আরবী ভাষায় পড়া গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতে মুআক্কাদা। এটা এমন একটি সুন্নাত-যার উপর হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও তাবয়ে-তাবেয়ীন সকলের যুগে ধারাবাহিকভাবে আমল হয়ে আসছে এবং কেউ এর বিপরীত করেননি। আরবীতে খুৎবা না পড়ে তার পরিবর্তে সে সময় শুধু তার তরজমা করা বা অন্য কোন ভাষায় ওয়ায-নসীহত করা মাকরুহ। অনেকে খুৎবাকে ওয়ায-

নসীহত মনে করে এবং এজন্য তারা মাতৃভাষায় বলার দাবী করে। কিন্তু কুরআনে সূরায়ে জুমু'আর ৯নং আয়াতে খুৎবাকে যিকির বলা হয়েছে, যা একটি ইবাদত। সুতরাং নামাযের ক্বিরাতের অর্থ মুসল্লীগণ না বঝুলেও যেমন বাংলায় বলা যায় না, তেমনিভাবে খুৎবা না বুঝলেও তা বাংলায় বলা যায় না। তবে যদি কথা প্রসঙ্গে কোন বিষয় এসে যায়, তবে তা মুসল্লীদের বোধগম্য ভাষায় বলতে পারে। যেমন খুৎবার সময় কেউ কথা বলছে, তাকে তখন মাতৃভাষায় নিষেধ করা। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, মুসলমানগণ বহু ভাষা শিখে। কিন্তু আরবী ভাষার শিক্ষা বা তার অর্থ বুঝার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। উল্টা খুৎবা বাংলায় পড়ার জন্য আবদার করতে থাকে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদীয়া ২:২৯৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৬৪৭/৪৯# শামী ১:৪৮৪]

জুমু'আর খুৎবার পূর্বে প্রচলিত ওয়ায ও ওয়াযের সময় দুখুলুল মসজিদ নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর দিন খুৎবা দেওয়ার পূর্বে ওয়ায শুরু করার সময় দুখুলুল মসজিদ নামায পরে পড়তে বলাতে কোন অসুবিধা আছে কি-না? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তো খুৎবার পূর্বে ওয়াযের প্রচলন ছিল না। তাই এ ওয়াজ কি বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে? এই হিসাবে তো জায়িয না হওয়ার কথা তাই-জুমু'আ আদায় করা কিভাবে সহীহ হবে?

{পৃষ্ঠা–৩৮৭}

জবাবঃ মসজিদে প্রবেশ করার পর সাথে সাথেই দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুন্নাত। তবে কোন মসজিদের খতীব সাহেব যদি খুৎবার পূর্বে দীনী মাসআলা সম্পর্কে ওয়ায বা আলোচনা করেন এবং ওয়াযের পরে সুন্নাত পড়ার সময় দেন, তাহলে ওয়াযের সময় সুন্নাত ও অন্যান্য নামায না পড়া চাই। কেননা, দীনের মাসআলা শিক্ষা করা নফল নামায থেকে উত্তম। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে, "রাতের কিছু সময় দীনের ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া সমস্ত রাতের নফল ইবাদত থেকে উত্তম"।

[মিশকাত শরীফ ১:৩৬]

খুৎবার পূর্বে ওয়ায করা জায়িয আছে। কেননা, হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) ও হযরত উসমান (রাযিঃ) খুৎবার পূর্বে ভিন্ন ভাবে ওয়ায করতেন। হযরত তামীমে দারী (রাযিঃ) ও হযরত উমরের (রাযিঃ) ইজাযতে জুমু'আর খুৎবার পূর্বে ওয়ায করতেন। (মুসনাদে আহমদ) আর নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন- তোমাদের জন্য আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নাত মান্য করা জরুরী।

[মিশকাত শরীফ ৩০]

সুতরাং হুযুরের জমানায় ছিল না বলে বিদ'আত বলা যাবে না। তবে বয়ানের কারণে মসজিদে ঢুকেই তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে না পারলে পরে আর পড়ার দরকার নেই। আমাদের দেশে সহীহ তরীকা না থাকায় সাধারণ লোক গুণাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায়। কারণ, প্রথম আযান দেয়ার পর মসজিদরে দিকে রওয়ানা হওয়া বা তার তৈরী করা ওয়াজিব এবং মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি ছাড়া মসজিদের বাইরে সমস্ত জায়িয কাজও হারাম হয়ে যায়। অতএব, প্রত্যেক ইমাম ও খতীবদের উচিত, আযানের পূর্বেই ওয়ায শুরু করে দেয়া। অতঃপর ওয়াযের শেষে আযান দিয়ে সুন্নাত পড়ার পর এবং বাক্স চালানোর (যদি প্রয়োজন হয়) পরে খুৎবার আযান আরম্ভ করা। যাতে করে সাধারণ লোক গুণাহ থেকে বাঁচতে পারে। উল্লেখ্য যে, খুৎবার সময় বাক্স চালানো নিষেধ।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ১:২৬৪-২৬৫# মাহমূদিয়া ১৪:২৫০# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৮]

এক জনের খুৎবা ও অন্যজনের ইমামতী

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানতাম জুমু'আর নামাযে খুৎবা যিনি দিবেন, ইমামতীও তিনি করবেন। কিন্তু আমাদের এলাকার মসজিদে গত জুমু'আর ইমাম সাহেব খুৎবা দিলেন এবং পীর সাহেবকে নামায পড়াতে অনুরোধ করায় তিনি নামায পড়ালেন। এতে কোন অসুবিধা আছে কি-না?

জবাবঃ জুমু'আ বা ঈদের নামাযে যিনি খুৎবা দিবেন, তিনিই ইমামতী করবেন- এটাই উত্তম। তবে অন্য কেউ ইমামতী করলেও জায়িয হবে। চাই কোন উযর হোক বা না-হোক উভয় সুরতে অন্যেও ইমামতী করতে পারেন। [প্রমাণঃ শামী ২:১৬২পৃঃ]

{পৃষ্ঠা-৩৮৮}

নৌকা, লঞ্চ বা ট্রলারে জুমু'আর নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাড়ী চর এলাকায়। আমাদের এলাকায় আমরা জুমু'আর নামায পড়ে থাকি। গত বৎসর বন্যায় কারণে আমাদের এলাকার প্রায় সব কয়টি মসজিদে জুমু'আর নামায পড়া বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় আমাদের এলাকার কোন এক জুমু'আর মসজিদের সাধারণ ইমাম ও মুসুল্লীগণ মসজিদের সাথে ট্রলার বেধে ট্রলারে জুমু'আর নামায আদায় করে নেয়। এ অবস্থায় তাদের নামায হয়েছে কি-না।

জবাবঃ আপনাদের এলাকায় যদি জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে মসজিদে বন্যার পানি উঠার কারণে তার সাথে ট্রলার বেঁধে উহার উপর জুমু'আর নামায আদায় করা সহীহ হবে। [প্রমাণঃ দুররে মুখতার ২:১৩৭-১৫৩# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১১৭]

আখেরী যোহর পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আখেরী যোহর নামায পড়তে হবে কি-না?

জবাবঃ আখেরী যোহর নামে জুমু'আর পর যে চার রাক'আত নামায কেউ কেউ পড়ে। যে সব শহরে বা বড় গ্রামে জুমু'আ পড়া ফরয, সেখানে আখেরী যোহর পড়ার কোন অবকাশ নেই। অবশ্য কেউ যদি এমন কোন স্থানে পৌঁছে, যেখানে জুমু'আ সহীহ হয় কি-না তা সন্দেহজনক, সেখানে যদি লোকেরা জুমু'আ পড়ে, তাহলে আগন্তুক ব্যক্তির জন্য জুমু'আ পর ৪ রাক'আত ইহতিয়াতুয যোহর বা আখেরী যোহর পড়া উচিত। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৩৭/৪৬# আল বাহরুর রায়িক ২;১৩৯# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১৪০-১৩৯]

{পৃষ্ঠা-৩৮৯}

বা'দাল জুমু'আ চার রাকাত নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ফরযের পর চার রাক'আত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা কি-না? তেমনিভাবে এ সুন্নাতে মুআক্কাদা ছেড়ে দিলে জুমু'আর নামাযের কোন ক্ষতি হবে কি-না? সুন্নাতে মুআক্কাদা পরিত্যগকারীদের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের করণীয় কি?

জবাবঃ জুমু'আর ফরযের পর চার রাক'আত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদা। তারপরে নির্ভরযোগ্য মত হিসাবে আরও দু'রাক'আত ওয়াক্তিয়া সুন্নাত পড়া কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, সুন্নাতে মুআক্কাদা তরক করলে জুমু'আর নামায হয়ে যাবে; তবে সুন্নাতে মুআক্কাদা তরক করার জন্য পৃথক গুণাহ হবে। মুসল্লীরা যেন বা'দাল জুমু'আর সুন্নাত যথাযথভাবে আদায় করেন এ ব্যাপারে ইমাম ও অন্যান্য মুসল্লীদের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা এ শ্রেণীর মুসল্লীগণকে বুঝিয়ে সুন্নাত পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে ক্ষমতাও প্রয়োগ করতে পারেন। [প্রমাণঃ আদ-দুররল মুখতার ২:১২পৃঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৮৬# ফাতাওয়া শামী ২:১২]

বা'দাল জুমু'আ ছয় রাকাত না চার রাকাত

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ফরযের পর সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামায ৪ রাক'আত নাকি ৬ রাক'আত পড়তে হবে? আর তা পড়ার নিয়ম কি?
জবাবঃ জুমু'আর নামাযের সুন্নাতে বা'দিয়া অর্থাৎ ফরযের পরবর্তী সুন্নত সম্বন্ধে হানাফী উলামাদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ৪ রাক'আত এবং সাহেবাইন ৬ রাক'আত বলেছেন। দু'টি কারণে ৬ রাক'আত প্রাধান্য দেয়া হয় প্রথমতঃ ৬ রাক'আত পড়লে, ৪রাক'আত পড়া হয়ে যায়। কিন্তু ৪ রাক'আত পড়লে ৬ রাক'আত পড়া হয় না। অতএব, ৬ রাক'আতের উপর আমল করলে, উভয় ক্বওলের উপর আমল হয় এবং মতভেদ থেকে বাঁচা যায়। [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক ২:৪৯পৃঃ# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১৩৬ আযীযুল ফাতাওয়া ১:২৪০]
দ্বিতীয়তঃ ফিকাহ এর উসূল এই যে, ইবাদতের মধ্যে সর্বদাই আবূ হানীফা (রহঃ) এর ক্বওলের উপর আমল করতে হয়। কিন্তু যদি আবূ হানীফা ক্বাওল অন্য মাযহাবের মুজতাহিদদের ক্বওলের সাথে মিলে যায়, তবে সাহেবাইনের ক্বওলের উপর আমল করা হয়। আর এই ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) –এর ক্বওল ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এর একটি ক্বওলের সাথে মিলে যায়। অতএব, সাহেবাইনের ক্বওলের উপর আমল করা বাঞ্ছনীয়। এই ৬(ছয়) রাক'আত পড়ার তারতীব হল-প্রথমে ৪ রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত পড়বে। [প্রমাণঃ দরসে তিরমিযী ২:২৯]
বে-নামাযীর জুমু'আর নামায
জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি জুমু'আর নামায ব্যতীত অন্য কোন নামায না পড়ে, তাহলে তার জুমু'আর নামায সহীহ হবে কি?
জবাবঃ হ্যাঁ, এমন ব্যক্তির জুমু'আর নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে অন্যান্য ফরয নামাযসমূহ না পড়ায় মারাত্মক গুনাহ হবে। [প্রমাণঃ হিদায়াহ ১:১৩৮]
জুমু'আর নামাযের জন্য সায়ী করা
জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর কোন আযানের সময় সায়ী করা (মসজিদে রওয়ানা হওয়ায় সচেষ্ট হওয়া) জরুরী?
জবাবঃ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর যমানায় জুমু'আতেও শুধু একটি আযান ছিল। যা খতীবের সামনে দাঁড়িয়ে দেয়া হত। কিন্তু হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর যমানায় মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেলে জামা'আতের লোকসংখ্যা অধিক হতে শুরু করলো। তখন হযরত উসমান (রাযিঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শে মসজিদরে বাইরে জুমুআর আরেকটি আযান বৃদ্ধি
{পৃষ্ঠা-৩৯০}
করেন। ফলে ইজমায়ে সাহাবায়ে কেরামের শরয়ী দলীল দ্বারা জুমু'আর প্রথম আযান ছাবিত হয়। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এ প্রথম আযানের সময় সায়ী করা অর্থাৎ মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়া জরুরী। এই প্রথম আযানের পরে বাড়ীতে বসে নফল নামায, কুরআন তিলাওয়াত, বা অন্য কোন ইবাদত জায়িয নেই। বরং মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়া অপরিহার্য। আমাদের দেশে জুমু'আর প্রথম আযান ৪০/৫০ মিনিট পূর্বে দিয়ে বয়ান শুরু করা হয়। তার অনেক পরে খুৎবার আযান দেয়া হয়। এ কারণে অনেক মুসুল্লীরা ইচ্ছে করেই জুমু'আয় দেরী করে আসে। তারা বয়ান শুনতে চায় না। শুধু জুমু'আর জামা'আতে শরীক হতে চায়। কিন্তু সায়ী তরক করার কারণে তারা সকলেই গুনাহগার হচ্ছে। আর এ গুনাহের জন্য দায়ী হচ্ছে ইমাম সাহেব এবং মসজিদ

কমিটি। কারণ- তারা আযান ও বয়ানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেননি। জুমু'আর দিন এটাই উত্তম যে, আনুমানিক ১২.৪৫ মিনিট প্রথম আযান হবে। উক্ত আযানের পর সকল মুসল্লীগণ কাবলাল জুমু'আ পড়ে নিবেন। [প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৪# শামী ২:১৬১পৃঃ]

সরকারী জায়গায় জুমা'আর নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ সরকারী কর্মচারীদের অনুমতি সাপেক্ষে সরকারী জায়গায় জুমু'আর নামায বৈধ হবে কি-না?

জবাবঃ যদি সরকারী জায়গায় সর্বসাধরণের নামায পড়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অনুমতি থাকে অথবা সরকারের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী না হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত জায়গায় জুমু'আর নামায বৈধ হবে। তবে শরয়ী মসজিদ তৈরী করতে হলে, সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমতি নেয়া কর্তব্য। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৩৮ ও ১৫১# ফাতাওয়া দারুল উলূম৫:৮৪]

ওয়াকফ বিহীন মসজিদে জুমু'আ পড়া

জিজ্ঞাসাঃ ওয়াকফ বিহীন মসজিদে কি জুমু'আর নামায পড়া যায়?

জবাবঃ শরয়ী মসজিদের জন্য জমি ওয়াকফকৃত হওয়া জরুরী। মৌখিকভাবে ওয়াকফ হোক বা লিখিতভাবে ওয়াকফ হোক। ওয়াকফকৃত জায়গা ছাড়া মসজিদ হলে, সেটা শরয়ী মসজিদ হবে না, তবে মালিক থেকে অনুমতি নিয়ে মসজিদ তৈরী করলে, সেটা নামাযের ঘর হবে এবং সেখানে জুমু'আ বা অন্য যে কোন নামায বিনা দ্বিধায় পড়া যাবে এবং জামা'আতের সাওয়াব হাসিল হবে। তবে সেখানে শরয়ী মসজিদের জামা'আতের ন্যায় ছাওয়াব হাসিল হবে না।

উল্লেখ্য, মালিক যদি কখনও উক্ত নামায ঘর সরিয়ে নেয়ার আদেশ দেয় তাহলে উক্ত মসজিদ সরিয়ে নেয়া জরুরী। [প্রমাণঃ ইমদাদুল মুফতীন ৭৭১-৮১২-৮১৩]

{পৃষ্ঠা-৩৯১}

গ্রামে জুমু'আর নামায আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ গ্রামাঞ্চলে জুমু'আর নামায জায়িয কি-না? আমাদের গ্রামে রাস্তা-ঘাট আছে, মোটামুটি প্রয়োজনীয় জিনিস দোকানে পাওয়া যায়। শিক্ষা-দিক্ষার ব্যবস্থাও আছে?

জবাবঃ গ্রামে জুমু'আ জায়িয কি-না একথা জানার পূর্বে গ্রাম কাকে বলে এবং শহর কাকে বলে তা জানা প্রয়োজন। কারণ- জুমু'আর নামায সহীহ হওয়ার জন্য শহর, উপশহর বা বৃহৎগ্রাম হওয়া শর্ত। ছোট গ্রামে জুমু'আ সহীহ হয় না। শহর ও বৃহৎগ্রামের সংজ্ঞা জানলেই বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে জুমু'আ সহীহ হওয়া-না হওয়া সহজে নিরুপণ করা যাবে।

শহর ও বৃহৎ গ্রাম-এর সংজ্ঞা বহির্ভূত যে সকল ছোট পল্লী পাওয়া যাবে, তাতে জুমু'আ সহীহ হবে না। [হিদায়া ১:১৬৮]

শহর ও বৃহৎ গ্রামের সংজ্ঞা

হযরত ইমাম ইউসুফ (রাহঃ) হতে একটি রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে, যার অর্থঃ শহর বা বৃহৎ গ্রাম ঐ আবাদীকে বলা হয়, যে থানকার প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ লোকগণ সেখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদে একত্রিত হলে, মসজিদে স্থান সংকুলান হয় না। শহর বা বড় গ্রামের সংজ্ঞার ব্যাপারে অনেক মত থাকলেও হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রাহঃ) এর উল্লেখিত সংজ্ঞাই অধিকাংশ ফুকাহাগণ গ্রহণ করেছেন এবং এর উপরই ফাতওয়া দিয়েছেন।

অতএব, যে আবাদীর বয়ঃপ্রাপ্ত সুস্থ পুরুষের সংখ্যা এত বেশী যে, সেখানকার বড় মসজিদে একত্রিত হলে মসজিদের তাদের সংকুলান হয় না, তাকে শরয়ী শহর বা বৃহৎ গ্রামের অন্তর্ভূক্ত বলা হবে এবং সেখানে জুমু'আ

আদায় করা জরুরী হবে। এই সংজ্ঞা যেখানে পাওয়া যাবে না, তাকেই গ্রাম বলা হবে। এরূপ গ্রামে জুমু'আ সহীহ হবে না। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের পরিভাষায় যে গ্রামের প্রচলন আছে, তার অধিকাংশই শরী'আতের দৃষ্টিতে শহর বা শহরতুল্য বড় গ্রামের আওতায় পড়ে। তাই সেখানে জুমু'আ পড়া জরুরী। না পড়লে, গুনাহগার হতে হবে এবং হাদীসে এর উপর যেই ধমকি এসেছে, তার কোপানলে পড়তে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন- যে ব্যক্তি বিনা উযরে ইচ্ছাপূর্বক তিন জুমু'আ তরক করে, তার উপর (নাফরমানীর) মহর মেরে দেয়া হয় (আবূ দাউদ শরীফ) । উক্ত মাসআলার আলোকে বর্ণনা অনুযায়ী

{পৃষ্ঠা–৩৯২}

প্রশ্নে বর্ণিত গ্রামটি শহরের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং উক্ত গ্রামে জুমু'আর নামায সহীহ হবে। বরং উক্ত গ্রামে জুমু'আর নামায পড়া জরুরী। না পড়লে, সকলেই গুনাহগার হবে। প্রশ্নে বর্ণিত গ্রামটি যদিও আমাদের পরিভাষায় গ্রাম। কিন্তু শরী'আতের পরিভাষায় তা শহর বা বৃহৎগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, এরূপ স্থানে অনেকে 'আখিরী যোহর' বা 'ইহতিয়াতুল যোহর' পড়ে থাকেন তা নিতান্তই ভুল ও বর্জনীয়।

[প্রমাণঃ আদ-রুররুল মুখতার ২:১৩৭# বাদায়েয়ূস সানায়ে ১:২৬০# আল-বাহরুল রায়িক২:২৪৫]

شرط ادائها المصر........شرط صحتها ان توادي في مصر حتي لا تصح قرية....مفازة لقول علي رضـ : لا جمعة و لا تشريف ولا صلاة فطر ولا اضحي الا في مصر جامع او في مدينة عظيمة – البحر الرائق-245/2

নামায ঘরে জুমু'আর নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমরা ইন্ডিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকুরী করি। নামায আদায় করার জন্য এক কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি। ফজরের নামায ব্যতীত বাকী ৪ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে ওখানেই হয়ে থাকে। এই নামায ঘরেই জুমু'আর নামায আদায় করে থাকি। (অনুমতি ব্যতীত) জনসাধারণ উক্ত নামায কক্ষে এসে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারে না। আশে পাশে ২/১ মাইলের ভিতরে মসজিদ নেই। অফিস টাইম চলাকালীন সময়ে বাইরে যেয়ে জুমু'আ আদায় করার মত সুযোগ নেই। এমতাবস্থায় আমরা উক্ত নামায ঘরে জুমু'আর নামায আদায় করতে পারবো কি-না?

জবাবঃ বর্ণিত অবস্থায় উক্ত দূতাবাসের মধ্যে জুমু'আর নামায আদায় করলে নামায সহীহ হবে। যদিও অন্যান্য লোকের প্রবেশ করার অনুমতি নেই। কারণ, শুধু দূতাবাসের চাকুরীজীবীদের জন্য অনুমতি থাকাটাই জুমু'আর জন্য শর্তকৃত ব্যাপক অনুমতির জন্য যথেষ্ট হবে।

[প্রমাণঃ আল-দুররুল মুখতার ২:১৫২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৯৬:১১০# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২১]

(الإذن العام) من الإمام، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي ، نعم لو لم يغلق لكان أحسن- (رد المحتار:152/2)

জুমু'আর নামাযে কায়দায়ে বাগদাদীতে লিখিত নিয়্যত পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক জুমু'আর নামাযে কায়দায়ে বাগদাদীতে লেখা নিয়্যতটা পড়ে থাকেন, এটা পড়া কি সুন্নাত?

{পৃষ্ঠা–৩৯৩}

জবাবঃ 'নিয়্যত' দিলের ইচ্ছাকে বলে। সুতরাং কোন নামাযেরই নিয়্যত মুখে বলা জরুরী নয়। অবশ্য মুখে বলা মুস্তাহাব । প্রত্যেক ব্যক্তি তার বোধগম্য ভাষায় (উদাহরণ স্বরূপ) এভাবে বলবে, আমি জুমু'আর দু'রাক'আত ফরজ নামায এ ইমামের পিছনে আল্লাহর ওয়াস্তে আদায় করছি। তারপরে তাকবীরে তাহরীমা বলবে। কায়দায়ে

বাগদাদীতে আরবী গদ হিসেবে যে নিয়্যত লেখা আছে কুরআন, হাদীস বা ফিকহের কিতাবে তার কোন প্রমাণ নেই। শুধুমাত্র কায়দায়ে বাগদাদীতৈ এ ধরনের অনেক নিয়্যত লেখা আছে। এইভাবে নিয়্যত লেখার কারণে মুসল্লীরা মুখস্ত করতে বৃথা চেষ্ট করে অনেকে তা বাদ দেন এবং শেষ পর্যন্ত নামাযও পড়েন না। আর যারা কষ্ট করে মুখস্ত করেন তারা অর্থ না বুঝার কারণে প্রায়ই নিয়্যত করতে গিয়ে প্যাচে পড়ে যান। কি পড়বেন, না পড়বেন দিশা করতে পারেন না। শেষ পর্যন্ত অনেকেরই তাকবীরে ঊলা ছুটে যায়। আর যারা রুকূর কিছু পূর্বে পৌঁছে, তারা অনেকেই এই নিয়্যত পড়তে গিয়ে রাক'আত হারিয়ে ফেলেন। কাজেই এই নিয়্যত সাধারণ লোকদের জন্য না পড়াই উচিত। হ্যাঁ, যদি কেউ আলেম হন, আবরী সম্পর্কে ভাল অভিজ্ঞতা রাখেন, তবে তিনি আরবীতে নিয়্যত পড়ে নিতে পারেন।

' [প্রমাণঃ শামী ১:৪১৪-১৫# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:১৪]

জুমু'আর নামাযের শরয়ী হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর নামাযের যাবতীয় শর্ত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে জুমু'আর নামায প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরযে আইন, ওয়াজিব, না সুন্নাত? বর্তমান অবস্থায় জুমু'আর নামাযের সমস্ত শর্ত পাওয়া যাওয়ার পরে স্বেচ্ছায় কেউ জুমু'আর নামায তরক করে যোহরের নামায আদায় করলে, সে ফরযে আইন তরককারী সাব্যস্ত হবে কি-না? বর্তমান বাংলাদেশের সর্বত্র যেমন-শহর, বন্দর ও বাজার তথা গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত জুমু'আর নামায চালু আছে। এটা কি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী সম্পূর্ণ জায়িয?

জবাবঃ আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থান এমন যেখানে শহরের বা বড়গ্রামের সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। তাই আমরা বলব, আমাদের দেশের অধিকাংশ স্থানে জুমু'আ ফরয এবং যদি এমন কোন দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চল পাওয়া যায়, যা শহর বা বড় গ্রামের সংজ্ঞায় পড়ে না, তাহলে তথায় জুমু'আ সহীহ হবে না। সেখানে যোহর পড়া জরুরী।

যে জায়গায় জুমু'আর শর্ত পাওয়া যায়, সে জায়গায় জুমু'আর নামায পড়া বালেগ পুরুষের জন্য ফরজে আইন।

[প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ২:১৩৭ পৃঃ]

ইচ্ছাকৃতভাবে জুমু'আ তরক করা হারাম। যে তরক করবে, সে ফাসিক।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১১৮ ,৫:৫৬পৃঃ]

{পৃষ্ঠা-৩৯৪}

জুমু'আ তরক করায় দরুন মারাত্মক গুনাহগার হবে। এমনকি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে- যে ব্যক্তি বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে তিন জুমু'আ না পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তর মুনাফেকীর মহর মেরে দেন। [মিশকাত ১:১২১# ফাতাওয়া শামী ২:৩৭পৃঃ]

পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা শহর বা বড় গ্রামের আওতায় পড়ে। সুতরাং, সেখানে জুমু'আ পড়া জরুরী।

বিঃদ্রঃ শহর ও বড় গ্রামের সংজ্ঞা অন্যত্র বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

খুৎবার পূর্বে বয়ান দেয়ার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ জুমু'আর ফরয নামাযের ও খুৎবার পূর্বে খতীব সাহেব যে বয়ান করেন, এই বয়ানের সহীহ তরীকা কি?

জবাবঃ প্রথম আযানের পূর্বেই নির্দিষ্ট সময় থেকে ওয়ায শুরু করবেন। ওয়াযের মধ্যে সময় উপযোগী মাসনূন আমলসমূহ এবং অন্যান্য জরুরী মাসআলা-মাসায়িল আলোচনা করবেন। মুসল্লীগণ মসজিদে এসে ওয়ায শুনতে থাকবেন। অতঃপর খুৎবার পনের মিনিট পূর্বে ওয়ায বন্ধ করে দিয়ে জুমু'আর প্রথম আযানের ইন্তিযাম করবেন। তারপর সকলেই ধীরস্থিরভাবে সুন্নাত আদায় করবেন। অতঃপর খুৎবা পাঠ করে নামায শুরু করবেন। আবার এটাও করতে পারেন যে, জুমু'আর নামাযের পরে বয়ান করবেন। যাদের আগ্রহ থাকে, তারা বসে ওয়ায শুনবে। একান্ত যদি জুমু'আর পরে বয়ান করা সম্ভব না হয়, তাহলে খুৎবার পূর্বেই বয়ান করবেন। তবে খুৎবা পূর্বে বয়ান করাকে জরুরী মনে করা ঠিক নয়। বরং মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিলেও কোন ক্ষতি নেই। এটা হিদায়াত –নসীহতমূলক আমল মাত্র। নামাযের কোন সংশ্লিষ্ট অঙ্গ নয়।

খেয়াল রাখতে হবে- ওয়ায যেন অল্প সময়ে হয়, সংক্ষিপ্ত হয়। যাতে মুসল্লীদের অনীহা ভাবের সৃষ্টি না হয়। অবশ্য ওয়াযের সময় দু'ট জিনিসের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। কেউ সুন্নাত পড়তে চাইলে তাকে বুঝিয়ে বলবেন, একটু বসুন। পরে সুন্নাত পড়ার জন্য সময় দেয়া হবে।

২। যদিও ওয়ায-নসীহত জুমু'আর কোন ফরয বা ওয়াজিব আমল নয়। তথাপিও এটাকে সবাই আগ্রহ সহকারে শুনবে। আর বয়ানে বিশেষভাবে জরুরী দীনী মাসায়িল বর্ণনা করা দরকার। কিচ্ছা কাহিনী ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা করা অনুচিত। মিম্বরের উপরে না বসে দাঁড়িয়ে বা কোন চেয়ার বসে বয়ান করতে চেষ্টা করা ভাল। তবে মিম্বরে বসে বয়ান করা জায়িয আছে। খুৎবার পূর্বে বা ওয়াযের সময় উক্ত খুৎবার বাংলা তরজমা করা জরুরী নয়। তবে খুৎবায় জরুরী সমসাময়িক মাসনূন আমলের বর্ণনা থাকলে বাংলা ভাষার তা পূর্বে

{পৃষ্ঠা–৩৯৫}

বুঝিয়ে দেয়া। যাতে সে বিষয়ে সকলের আমল করা সহজ হয়। অবশ্য মূল খুৎবা আরবীতে হওয়া জরুরী। নামায ও খুৎবাকে কুরআনে যিকর বলা হয়েছে। (সূরাহ জুমু'আ) নামাযের ক্বিরাআত যেমন আরবী ব্যতীত অন্য ভাষার হয় না, তেমনিভাবে খুৎবাও আরবীতে হওয়া জরুরী। অনেকে এটাকে ওয়ায নসীহত মনে করেন। তাই বাংলা ভাষায় খুৎবা দিতে চান। এটা তাদের কুরআন–হাদীসের সহীহ ইলম না থাকার প্রমাণ।

[প্রমাণঃ মাসায়েলে নামাযে জুমু'আ ২১১# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১২৮]

দুই ঈদ

ঈদের নামাযান্তে খুৎবা পাঠ করা অবস্থায় টাকা কালেকশন

জিজ্ঞাসাঃ কোন ঈদের মাঠে ঈদের নামাযান্তে ইমাম সাহেব যখন খুৎবা পাঠ শুরু করেন, তখন ঈদের মাঠ, মসজিদ ও ইমাম সাহেবের জন্য রুমাল ধরে কাতারের মাঝে গিয়ে টাকা আদায় করা হয়। শুধু তাই নয়, কমিটির পক্ষ থেকে ইমাম সাহেবেকে টাকা আদায়ের দিক লক্ষ্য রেখে খুৎবা ধীরে ধীরে পড়ার হুকুম দেয়া হয়। ইমাম সাহেবও সেই অনুযায়ী খুৎবা পাঠ করেন। এটা কি সহীহ হবে? না হলে তা কেমন অপরাধ? এবং এজন্য কে দায়ী?

জবাবঃ ইমাম সাহেবের খুৎবা দেয়ার সময় চাঁদা উঠানো বা টাকা আদায় করা তো দূরের কথা, হাদীস শরীফ এসেছে যে, ইমাম সাহেব যখন খুৎবা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হন, তখন থেকে কোন প্রকার নামায, তাসবীহ-তাহলীল ও কথা-বর্তা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই কমিটির জন্য এমন হুকুম করা শরী'আত বিরোধী হয়েছে। আর ইমাম

সাহেবেরও ঐ আদেশ মেনে খুৎবা ধীরে পড়া ঠিক হয়নি। তার উচিত ছিল খুৎবার পূর্বে বা পরে চাঁদা উঠানোর ব্যবস্থা করে খুৎবার সময় চাঁদা উঠানো বন্ধ করার ব্যবস্থা করা এবং কমিটিকে এই মাসআলা বুঝানো।
উল্লেখ্য, ইমাম বা মুআযযিনের জন্য আলাদা ভাবে সাহায্য আদায় করা বা কালেকশন করা তাদের চরমভাবে বেইযযত করার নামান্তর। সুতারং এভাবে না তুলে ঈদগাহ ফাণ্ডের জন্য কালেকশন করে তাদেরকে সম্মানী ভাতা দিবে। [প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতার ২:১৫৯]

وكل ما حرم في الصلوة حرم فيها اي في الخطبة خلاصة وغيرها فيحرم اكل وشرب كلام ولو تسبيحا او رد سلام او امر بمعروف بل يجب عليه ان يستمع ويسكت...الخ. (رد المحتار:159/2)

{পৃষ্ঠা-৩৯৬}

ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর ছুটে গেলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ ঈদের নামাযের প্রথম রাক'আতের অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবীরগুলো যদি কোন মুক্তাদীর ছুটে যায়; তাহলে এগুলো সে কিভাবে আদায় করবে?

জবাবঃ ঈদের নামাযের প্রথম রাক'আতের অতিরিক্ত ওয়াজিব তাকবীর গুলো ছুটে গেলে, সেগুলো পরে আদায় করতে হবে। আদায় করার নিয়ম এই যে, ইমাম সাহেব প্রথম রাক'আত কিরআতের মধ্যে থাকেন, তাহলে নিয়্যত বেঁধে অতিরিক্ত তাকবীর বলে কিরআত শুনতে থাকবে। আর যদি ইমাম রুকুতে থাকা অবস্থায় জামা'আতে শামিল হয়, তাহলে দেখতে হবে তিনটি তাকবীর বলে ইমামকে রুকূতে পাওয়া যাবে কি-না? যদি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে রুকূতে যাওয়ার আগেই তাকবীর তিনটি বলে রুকূতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আর যদি ইমাম সাহেবকে রুকূতে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, বরং রুকূই ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে তাকবীর না বলেই রুকূতে শরীক হতে হবে এবং রুকূতেই হাত না উঠিয়ে কেবল তাকবীর বলে নিতে হবে। কারণ, রুকূতে গিয়ে তাকবীর পূর্ণ করার পূর্বেই ইমাম সাহেব রুকূ থেকে উঠে যান, তাহলে অবশিষ্ট তাকবীর গুলো তার দায়িত্ব থেকে রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি ইমাম সাহেবের সাথে প্রথম রাক'আতের রুকূ শেষ করার পূর্বে শরীক হওয়া না যায়, তাহলে পরে একাকী অবশিষ্ট এক রাক'আত নামায আদায়ের সময় অতিরিক্ত তাকবীরগুলো আদায় করে নিতে হবে।

[প্রমাণঃ ফাতহুল কাদীর ২:৪৬ # তাহতাবী ৪৩৭-৩৮]

المسبوق يقضي اول صلاته في حق الاذكار وان ادرك الامام راكعا احرم قائما وكبر تكبيرات الزوائد قائما ايضا ان امن فوت الركعة بمشاركته الامام في الركوع والا يكبر للاحرام قائما ثم يركع شاركا للامام في الركوع ويكبر الزوائد منحنيا بلا رفع يد...الخ. (طحطاوي:437)

ওয়াকফকৃত ঈদগাহ ত্যাগ করে অন্য স্থানে নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ ওয়াকফকৃত 'ঈদগাহ পরিবারিক কারণে রাগ করে ছেড়ে বিনা ওয়াকফকৃত ঈদগাহে নামায সহীহ হবে কি-না? অথবা সমস্ত গ্রামবাসীকে মিলানোর উদ্দেশ্যে ওয়াকফকৃত মাঠ ত্যাগ করে অন্য স্থানে ঈদের নামায জায়িয হবে কি-না? এক্ষেত্রে প্রথম স্থানটি কি করা সঙ্গত হবে?

{পৃষ্ঠা-৩৯৭}

জবাবঃ পারিবারিক কারণে রাগ করে ওয়াকফকৃত ঈদগাহ বাদ দিয়ে অন্যত্র 'ঈদের নামায পড়া সঠিক হবে না। যদিও এতে ঈদের ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু দুনিয়াবী কারণে মুসলমানদের জামা'আতের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করার দরুন গুনাহগার হবে। হ্যাঁ, অন্যত্র যদি সকলকে মিলানো যায়, তাহলে সেখানে ঈদের নামায দুরস্ত হবে। তবে সেই দ্বিতীয় স্থানটি ওয়াকফ করে নেয়া ভাল। সে ক্ষেত্রে প্রথম ঈদগাহে যদি আর ঈদের নামায না পড়া

হয়, তাহলে সেখানে মসজিদ বা মাদ্রাসা বানানো জায়িয হবে। [প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:৪৬৯]

খেলার মাঠে ঈদের নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের একাকায় একটি খেলার মাঠ রয়েছে। এই মাঠ এক ব্যক্তি খেলার জন্য ইউ.পি. কে দান করে গেছেন। কিন্তু বর্তমানে জায়গার অভাবে ঐ খেলার মাঠে ঈদের নামায পড়া হচ্ছে। জনৈক ইমাম সাহেব বলেছেন যে, খেলার মাঠে নামায হয় না। এমতাবস্থায় ঐ খেলার মাঠে পরবর্তী ঈদের নামায পড়া জায়িয হবে কি-না? বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উক্ত খেলার মাঠে নামায পড়া যাবে?

জবাবঃ যদিও উক্ত মাঠটি শরয়ী ঈদগাহ হবে না। কিন্তু উক্ত খেলার মাঠটিতে ঈদের নামায পড়তে শরী‘আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। মসজিদে ঈদের নামায পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী। একান্ত প্রয়োজন না হলে মসজিদে ঈদের নামায পড়া উচিত নয়। উক্ত মাঠে ঈদের নামায পড়লেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।

[প্রমাণঃ শামী ২:১৬৬পৃঃ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০:১৯৬# ইমদাদুল মুফতীন ৭৯৮]

ঈদের নামাযের পরে মু’আনাকা

জিজ্ঞাসাঃ ঈদের নামাযের পরে মু’আনাকা করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ কেবর ঈদের নামাযের পরে মু’আনাকা করার যে রীতি প্রচলিত হয়ে গেছে শরী‘আতে এর কোন ভিত্তি নেই। ফুকাহায়ে কিরাম একে মাকরুহ ও বিদ’আত বলেছেন। এমনিতেই যে কোন সময় মুসলমানগণের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় মুসাফাহা এবং অনেক পরে সাক্ষাত হলে মু’আনাকা করা বিধিবদ্ধ। কিন্তু ঈদের নামাযের সাথে এর কোন বিশেষত্ব নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রশীদিয়া ১৪৮# ফাতাওয়া রহীমিয়া ১:২৮০# শামী ৬:৩৩৬পৃঃ]

মসজিদের মাঠে ঈদের নামায আদায়

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামের বাড়ীতে বহুপূর্বে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। নির্মাণকাল থেকেই এ মসজিদে ওয়াক্তিয়া ও জুমু’আর নামায আদায় হয়ে আসছে। মসজিদের সামনে মসজিদের নামে একটি মাঠ আছে। উল্লেখ্য যে,

{পৃষ্ঠা-৩৯৮}

মসজিদের মাঠ ও জমি সরকারীভাবে ওয়াকফ হয়নি। মৌখিক দানের উপর ভিত্তি করে নামায আদায় হয়ে আসছে। গত ৩/৪ বৎসব পূর্বে মুরুব্বীরা মসজিদ ও সামনের মাঠ মসজিদের নামে মৌখিক ওয়াকফ করে দেন। এখন প্রশ্ন হলো মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত মাঠে ঈদের জামা’আত কায়িম করা জায়িয হবে কি-না? যেহেতু গ্রামে অন্য কোন মাঠ নেই।

জবাবঃ প্রশ্নে উল্লেখিত গ্রামে যেহেতু অন্য কোন মাঠ নেই, তাই মসজিদের মাঠে ঈদের নামায পড়া জায়িয হবে। শরী‘আতের বিধান মুতাবিক এতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যেহেতু জায়গা মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত বিধায় সেটাকে ঈদের মাঠ হিসেবে নির্ধারিত করা যাবে না। শুধু নামায পড়া যাবে।

[প্রমাণঃ শামী ২:১৬৮পৃঃ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:২০০# কিফায়াতূল মুফতী ২:৩০২# শামী ১:১৫৯ পৃঃ]

খুৎবার সময় মুক্তদীর জন্য ঈমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক বলা

জিজ্ঞাসাঃ দুই ঈদের নামাযের খুৎবার সময় মুক্তাদীরা ইমামের সাথে তাকবীরে তাশরীক পড়তে পারবে কি-না? পড়া জায়িয থাকলে আস্তে না জোরে ?

জবাবঃ ইমাম সাহেব ঈদের খুৎবার পড়ার সময় অথবা খুৎবার তাকবীরে তাশরীক পড়ার সময় মুক্তাদীগণের জন্য নামায, দু'আ-কালাম বা তাকবীরে তাশরীক আস্তে বা উচ্চৈঃস্বরে কোন ভাবেই পড়া জায়িয নয়। সকল মুকতাদীর জন্য চুপচাপ বসে মনোযোগ সহকারে খুৎবা শুনা ওয়াজিব। [প্রমাণঃ আদ-দুররুল মুখতার ২:১৮০ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪;১১৩]

ঈদের নামাযে সিজদাহ সাহু করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় ঈদগাহে ঈদুল আযহার নামাযে ইমাম সাহেব প্রথম রাক'আত অতিরিক্ত তাকবীর ভুলে ছেড়ে দিয়ে সিজদায়ে সাহু করে নামায শেষ করলেন। আমরা জানি ঈদের নামাযে সাহু সিজদা নেই। এখন সাহু সিজদার কারণে নামায বাতিল হবে কি?

জবাবঃ ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর অথবা যে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে মূলতঃ সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সিজদায়ে সাহুর দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ হয়। তবে ঈদ ও জুমু'আর নামাযের জামা'আত সাধারণতঃ অনেক বড় হয়। বিভিন্ন ধরনের লোকের উপস্থিতি ঘটে। সেহেতু এখানে সিজদায়ে সাহু করলে অনেকে মাসআলা না জানার দরুন বিভ্রান্তির শিকার হতে পারে। এজন্য ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ জুমু'আ ও ঈদের বড় জামা'আতে সিজদায়ে সাহু ছেড়ে দিতে বলেছেন। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি সতর্কতা অবলম্বন পূর্বক সিজদায়ে সাহু করে নেয়, তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:১৭৪ও ১৮০পৃঃ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:১৮৯]

{পৃষ্ঠা-৩৯৯}

ঈদের নামাযের তাকবীর?

জিজ্ঞাসাঃ ঈদের নামাযে কয় তাকবীর বলতে হবে? এ তাকবীর বলা সুন্নাত না ওয়াজিব? কুরআন-হাদীসের আলোকে এর সমাধান জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ উভয় ঈদে দুই রাক'আতে অতিরিক্ত ছয়টি করে তাকবীর দিতে হবে। এ তাকবীর ওয়াজিব। [মিশকাত শরীফ ১২৬# আল-রাহরুক রায়িক ১:৩০১# আবু দাউদ শরীফ ১:১৬৩]

ঈদের নামাযে মাসবূক হলে

জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ ঈদের নামাযে মাসবূক হয়, তাহলে সে কেমন করে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করবে?

জবাবঃ (ক) যদি কেউ প্রথম রাক'আতের অতিরিক্ত তাকবীরের পর ইমামের ইকতিদা করে, তাহলে সে প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলে অতিরিক্ত তাকবীর তিনটি বলবে। যদিও ইমাম কিরাআত আরম্ভ করে দিয়ে থাকে।

(খ) আর যদি কেউ ইমামকে প্রথম রাক'আতের রুকূ অবস্থায় পায়, তাহলে সে ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমার পরে অতিরিক্ত তাকবীর বলে রুকূতে যাবে। আর যদি তার আশংকা থাকে যে, অতিরিক্ত তাকবীর বলতে গেলে ইমামকে রুকূ অবস্থায় পাবে না, তাহলে সে প্রথমে রুকূতে যাবে। রুকূতে থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত তাকবীরগুলো হাত উঠানো ব্যতীত আদায় করবে। আর যদি তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ থেকে উঠে যায়, তাহলে অবশিষ্ট তাকবীরগুলো তার জন্য মাফ হয়ে যাবে।

(গ) আর যদি সে দ্বিতীয় রাক'আতে শরীক হয়ে দ্বিতীয় রাক'আতের অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে পারে, তাহলে সে ইমামের দুই দিকে সালাম ফিরানোর পর উঠে দাঁড়াবে এবং কিরাআত শেষ করে রুকূতে যাবে। কারণ, এটা তার দ্বিতীয় রাকা'আত আর ইমামের সঙ্গে যে রাক'আত পড়েছে ,তা প্রথম রাক'আত গণ্য হবে।

(ঘ) আর যদি কেউ ইমামের দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূতে শরীক হয়, তাহলে প্রথম রাক'আতের রুকূতে মাসবূক হলে, যেভাবে নামায আদায় করে, সে ভাবেই নামায আদায় করবে। অর্থাৎ রুকূতে যাওয়ার পূর্বে তাকবীরগুলো বলে তারপর রুকূতে যাবে। আর যদি তাতে রুকূ না পাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে রুকূর মধ্যে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো আদায় করে নিবে। আর যদি শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকূ থেকে উঠে যায়, তবে বাকী তাকবীর মাফ হয়ে যাবে। আর যদি কেউ ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাক'আতের রুকূ শেষ হওয়ার পর সালামের আগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে শরীক হয়, তাহলে ইমামের সালাম

{পৃষ্ঠা-৪০০}

ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে যাবে এবং ইমামের সাথে যেভাবে নামায আদায় করা হয় ঠিক সেভাবেই পূর্ণ নামাম আদায় করবে। অর্থাৎ প্রথমে ছানা পড়বে, তারপর অতিরিক্ত তাকবীর আদায় করে কিরাআত পড়ে প্রথম রাক'আত শেষ করবে। অতঃপর দ্বিতীয় রাক'আতের পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীর আদায় করবে। তারপর রুকূর তাকবীর বলে রুকূতে যাবে এবং নিয়মিত ভাবে নামায শেষ করবে। [প্রমাণঃ খুলসাতুল ফাতাওয়া ১:২১৫# আদ-দুররুল মুখতার ১:৬১৬# ফাতাওয়া সুলতানিয়া ১:৮২# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১৪৩]

মাইক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এক বা তিন সিজদাহ করলে

জিজ্ঞাসাঃ ঈদের নামায পড়া অবস্থায় ২য় রাক'আতেই ইমাম যখন সেজদায় গেছে হঠাৎ মাইকের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে পিছেন যারা ছিল তারা ইমামের আওয়াজ না শুনার কারণে কেউ তিন সেজদা কেউ দুই সিজদা কেউ এক সিজদা করে। ইমাম যখন সালাম ফিরিয়েছে তখন অনেকে সিজদা থেকে উঠেছে। এখন উল্লেখিত লোকগুলির হুকুম কি? জানাইলে কৃতজ্ঞ হব।

জবাবঃ যারা দুই সিজদা করেছে কিন্তু ইমামের সাথে করতে পারেনি বরং পরে করেছে তাদের নামায হয়ে গেছে। কারণ ইমামের পিছে পিছে আদায় করলেও ইকতিদা করা হয়ে যায়। আর যারা তিন সিজদা করেছেন তারা যদি তিন সিজদাহ ভুলে করে থাকেন, তাহলে তাদের ওয়াজিব তরক হওয়া সত্ত্বেও নামায হয়ে যাবে। আর যারা ইচ্ছা করে তিন সিজদা করেছেন বা শুধু এক সিজদা তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে গেছে। এদের নামায কাযা করতে হবে। [প্রমাণঃ দুর্‌রুল মুহতার ১:৪৪৭# আলবাহরুক রাইাক ১:৫১১ # আলমগীরী ১:৭০# হালবী কাবীর ৪৫৬]

ঈদগাহ মাঠের শরয়ী হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ ঈদগাহ মাঠ হিফাযতের হুকুম কি? সর্বক্ষেত্রে জামে মসজিদের মতই? না কোন পার্থক্য রয়েছে? যেমনঃ (ক) মহিলারা মাসিক চলাকালীন অবস্থায় ঈদগাহ মাঠে প্রবেশ করতে পারবে কি-না? (খ) ঈদগাহ মাঠের উপর দিয়ে জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা বানানো যাবে কি-না? (গ) মৃত ব্যক্তির লাশ ঈদগাহ মাঠের ভিতরে রেখে জানাযার নামায পড়া যাবে কি-না? (ঘ) ঈদগাহে দুনিয়াবী কোন জনসভা, সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে কি-না? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ কোন কোন কিতাবে ঈদগাহ সম্পূর্ণ মসজিদের হুকুমে বলা হয়েছে। তবে নির্ভরযোগ্য মত অনুযায়ী ঈদগাহ কোন কোন দিক দিয়ে মসজিদের হুকুম। সুতরাং ঈদগাহকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও ঈদগাহের মর্যদার প্রতি

{পৃষ্ঠা-৪০১}

বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরী। ঈদগাহের অবমাননা হয়, এমন কোন কাজ সেখানে করা যাবে না। ঈদগাহের উপর দিয়ে চলাচলের রাস্তা বানানো ঈদগাহের মর্যাদার পরিপন্থি কাজ। অনুরুপভাবে ঈদগাহে কোন

মিছিল, মিটিং বা নির্বাচনী জনসভা অথবা প্রচলিত বিবাহ অনুষ্ঠান ইত্যাদি করা ঈদগাহের অবমাননার শামিল। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। তবে মসজিদে সুন্নাত তরীকায় বিবাহ কার্য সমাধা করার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজনে তা ঈদগাহে করা যাবে। তেমনিভাবে ঈদগাহে ওয়ায মাহফিল করা যাবে। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত কোন কাজে ঈদগাহ ব্যবহার করা যাবে না।

একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঈদগাহ যেহেতু সম্পূর্ণরুপে মসজিদের হুকুমে নয়, সুতরাং হায়িয বা মাসিক চলাচালীন মহিলাদরে ঈদগাহে প্রবেশ করা বা সেখানে অবস্থান করা জায়িয। তবে যতদূর সম্ভব এরুপ না করাই উত্তম। আর ঈদগাহ মাঠের সীমার ভিতরে মৃত ব্যক্তির লাশ রেখে জানাযার নামায আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই। [প্রমাণঃ তাতারখানিয়া ৫:৮৪৫# আল বাহরুর রায়িক ৫:২৪৮# কিফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৬;৪২৮]

মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ঈদগাহ নির্মাণ করা

জিজ্ঞাসাঃ গ্রাম্য জামে মসজিদের সামনে উক্ত মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ঈদগাহ নির্মাণ করা শরী‘আত সম্মত কি-না? ঈদগাহের জন্য বড় মাঠের প্রয়োজন আছে কি? কয়েকটি জামে মসজিদের মুসল্লীরা এক ঈদগাহে নামায আদায় করবে? না প্রত্যেক জামে মসজিদের মুসল্লীরা পৃথক ঈদগাহ কায়িম করবে?

জবাবঃ শরী‘আতের দৃষ্টিতে মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে স্থায়ীভাবে ঈদগাহ স্থাপন করা জায়িয নয়। তবে বিশেষ অসুবিধা ক্ষেত্রে উক্ত মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে ঈদের নামায আদায় করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, ঈদ ইসলামের একটি শি’আর বা প্রতীক। তাই মুসলমানদের শান-শওকত, শৌর্য-বীর্য ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ঈদের নামায মসজিদে আদায় না করে সম্মিলিভাবে বড় ময়দান তথা ঈদগাহে পড়তে শরী‘আতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেজন্য গ্রামের সকলের উচিৎ বড় একটি মাঠ ওয়াকফ করে নেয়া। প্রত্যেক মসজিদের জন্য পৃথক ঈদগাহ নির্মাণ জরুরী নয়।

[প্রমাণঃ রাদ্দুলমুহতার ২:১৬৯ # কাওয়ায়িদুল ৮৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৯]

{পৃষ্ঠা-৪০২}

ঈদগাহে ধান-পাট শুকানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের অঞ্চলে ঈদগাহে ধান-পাট শুকানো হয়; এমনকি মহিলারা পর্যন্ত সেখানে এসে ধান-পাট শুকায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে–

(ক) ঈদগাহে ধান-পাট শুকানো শরী‘আতের দৃষ্টিতে জায়িয কি-না?

(খ) যে মাঠ খেলা-ধূলা করার জন্য নির্ধারিত হয়েছে সেই মাঠে ঈদের জামা’আত জায়িয কি-না? এবং এ ধরনের মাঠ থাকা অবস্থায় মসজিদে ঈদের নামায আদায় করা মাকরুহ হবে কি? পক্ষান্তরে কোন মাঠ যদি কেবলমাত্র ঈদের নামায আদায় করার জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে খেলা-ধূলা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ (ক) বিভিন্ন দিক দিয়ে ঈদগাহ মসজিদের হুকুমভুক্ত। সুতরাং ঈদগাহকে পরিষ্কার-পরিছন্ন রাখা এবং ঈদগাহের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। ঈদগাহে এ ধরনের কোন কাজ করা যাবে না, যার দ্বারা ঈদগাহের অবমাননা হয়। সুতরাং ঈদগাহে ধান, পাট ইত্যাদি শুকানো, খেলা-ধূলা করা অথবা ব্যক্তিগত কোন কাজে ব্যবহার করা জায়িয নয়; বরং তা মাকরুহ। এ জাতীয় কাজ থেকে বিরত থাকা সকলের জন্য অপরিহার্য। [প্রমাণঃ তাতার খানিয়া ৫:৮৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৬৫৭# আল-বাহরুর রায়িক্ব ৫:২৪৮# কিফায়াতুল মুফতী ৭:১০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৬:৪২৮]

(খ) যে মাঠ সারা বছর খেলা-ধূলার জন্য নির্ধারিত সে মাঠে যদি ঈদের নামায পড়ার অনুমতি থাকে, তাহলে সেখানে ঈদের নামায আদায় করা জায়িয হবে। আর এ ধরনের মাঠ থাকা অবস্থায় বিনা উযরে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করা সুন্নাত পরিপন্থী।
[প্রমাণঃরাদ্দুল মুহতার ২:১৬৯# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫০# আল-রাহরুর রায়িক্ব ২;১৫৯]
ঈদের নামাযে মুনাজাতের সময়
জিজ্ঞাসাঃ অনেক ইমামকে দেখা যায় যে, তারা ঈদের নামাযের পর দু'আ করেন। খুৎবার পর দু'আ করেন না। আবার অনেক ইমাম নামাযের পরে দু'আ করেন না, শুধু খুৎবার পর দু'আ করে শেষ করেন। আসল নিয়ম কোনটি?
জবাবঃ দু'আ নামাযের কোন অংশ নয়। দু'আ ছাড়াই নামায সহীহ হয়ে যায়। তবে নামাযের পর দু'আ করা যেহেতু একটি ভিন্ন মুস্তাহাব আমল, তাই ঈদের নামাযের পর অর্থাৎ খুৎবার পূর্বে দু'আ করাই শ্রেয়। তবে ঈদের খুৎবার পরে মুনাজাত করার কোন উল্লেখ কিতাবে পাওয়া যায় না। তবে যদি কেউ শরী'আতের নিয়ম মনে না করে মুসলমানদের ইজতিমা উপলক্ষ্যে খুৎবার পর মুনাজাত করে, তাবে তা করতে পারে। কিন্তু শরী'আতের নিয়ম মনে করে করা ঠিক হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:২১৯]
{পৃষ্ঠা–৪০৩}
ঈদের নামাযে খুৎবার পর মুনাজাত
জিজ্ঞাসাঃ (১) ঈদের নামাযের খুৎবার পর সম্মিলিতভাবে মুনাজাত শরী'আত সম্মত কি-না?
(২) কোন ইমাম সাহেব যদি ঈদের নামাযের পর মুনাজাত করেন এবং খুৎবার পর না করেন, এতে কিছু সাধারণ মুসল্লী আপত্তি করেন এই বলে যে, "এই নতুন নিয়মের স্থলে আমাদের পূর্বেই নিয়ম অর্থাৎ খুৎবার পর মুনাজাতই উত্তম"। অর্থাৎ তারা খুৎবার পর মুনাজাতকে জরুরী মনে করছেন। এ পরিস্থিতিতে খুৎবার পর মুনাজাত কি জায়িয?
(৩) কিছু লোক খুৎবার পূর্বে মুনাজাত এ কারণে পছন্দ করেন না যে, এতে ঈদের মাঠ ইত্যাদির জন্য টাকা তোলার অসুবিধা হয়। তাদের এ দাবী গ্রহণযোগ্য কি-না? যদি খুৎবার পূর্বে মুনাজাত করা হয় তবে টাকা তোলার শরয়ী পন্থা কি?
(৪) কোন ইমাম যদি একথা বলেন যে, আমার মুসল্লীগণ খুৎবার পর মুনাজাত জরুরী মনে করে না, তাই আমি মুনাজাত করি। তাহলে তার সত্যতা যাচাইয়ের উপায় কি?
জবাবঃ (১-২) ঈদের নামাযের পর বা ঈদের খুৎবার পর দু'আ করার কোন স্পষ্ট রেওয়ায়েত রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের থেকে পাওয়া যায় না। তবে নামাযের পর দু'আ করার প্রতি হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর ঈদের নামাযও যেহেতু অন্যান্য নামাযের মত নামায; সুতরাং ঐ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ঈদের নামাযের পরেও দু'আ করা মুস্তাহাব। তবে দু'আ করাকে জরুরী মনে করা ঠিক নয়।
আর খুৎবার পরও সুন্নাত বা মুস্তাহাব মনে না করে দু'আ করা যেতে পারে।
[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:৮৮# বুখারী শরীফ ১:১৩৬# দারুল উলূম ৫:২১৩# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১১৫# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:৩০৮ও৩১১]

(৩) নামায শুরু হওয়ার পর থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সময়ের মধ্যে টাকা তোলা যাবে না। বরং যদি টাকা তুলতে হয় বয়ানের শেষে নামাযের পূর্বে অথবা খুৎবার শেষে তুলতে পারে।
[প্রমাণঃ তহাবী শরীফ ১:২৫১]
(৪) ইমাম বা খতীব সাহেব যদি এসব মাসআলা বার বার বুঝিয়ে বলেন তাহলে মুসল্লীদের কি ঠেকা পড়েছে যে তারা একটা মুবাহ বা জায়িযকে জরুরী মনে করবে। যতস্থানে মুবাহকে জরুরী মনে করা হয়ে থাকে বুঝানোর অভাবে হয়ে থাকে
{পৃষ্ঠা-৪০৪}
ঈদুল ফিতর সংক্রান্ত ত্রুটি
জিজ্ঞাসাঃ ঈদুল ফিতর সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো জানিয়ে কৃতার্থ করবেন বলে আশা করি।
জবাবঃ (১) মুসলমানদের মাঝে কতক লোক এমন রয়েছে যারা ঈদের নামাযের নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই রাখে না। কেবলমাত্র অন্যের দেখাদেখি নামায আদায় করে থাকে বলে তাদের নামাযও শুদ্ধ হয় না। ঈদের আট দশদিন পূর্বেই উক্ত নামাযের নিয়ম-কানুন জেনে নেয়ার সুযোগটুকু তাদের হয়ে উঠে না। সত্যিই এটা খুব লজ্জার কথা।
(২) অধিকাংশ স্থানেই বিশেষভাবে গ্রামাঞ্চলে ঈদের নামায খুব বিলম্বে আদায় করা হয়। অথচ সেটা সুন্নাতের খেলাফ।
(৩) অনেক জায়গায় ইমামগণ হয়ে থাকেন গাইরে-আলেম ও একেবারে মূর্খ। এদের মধ্যে অনেকে এমন আছে যারা সূরা ফাতিয়া ও খুৎবা পর্যন্ত বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে জানে না। নামাযের মধ্যে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তা শুধরানোর পদ্ধতিও তাদের জানা থাকে না। এরা কেবলমাত্র পৈতৃকসূত্রে ইমামতীর এ সুযোগ লাভ করে থাকে।
এ সমস্যার সহজতর সমাধান হচ্ছে এই যে, গ্রামের নেতৃস্থানীয় লোকজন এ শ্রেণীর ইমামকে অপসারিত করে তার জায়গায় কোন সুযোগ্য আলেম ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ইমামতীর বিষয়টিকে চিরতরে উৎখাত করে দিবেন।
(৪) ঈদের নামায ময়দানে বা ঈদগাহে পড়া সুন্নাত, বিনা উযরে মসজিদে পড়া সুন্নাতের পরিপন্থী। অনেক লোক এমন রয়েছে, যারা নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যাহিরের উদ্দেশ্যে ঈদগাহ ছেড়ে মহল্লার মসজিদে ঈদের নামায আদায় করে থাকে। অথচ মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত নামাযে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াব হওয়ার ফযীলত থাকা সত্ত্বেও রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আজীবন ঈদগাহেই ঈদের নামায আদায় করেছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সওয়াবের আধিক্যের বিষয়টি ফরয নামাযের সাথেই সংশ্লিষ্ট। অথচ দীন সম্পর্কে অজ্ঞ লোকেরা ঈদগাহের উপর মসজিদকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে।
তবে ঘটনাক্রমে যদি ঈদগাহে যেতে কোন উযর দেখা দেয়, যেমনঃ বৃষ্টি-বাদল তাহলে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।
(৫) অনেক লোক নিজেরা ও নিজেদের শিশুদেরকে এমন সব পোশাক পরিধান করিয়ে ঈদের ময়দানে উপস্থিত হয়, যা শরী'আত আদৌ অনুমোদন করে না।
{পৃষ্ঠা-৪০৫}

যেমন সিল্ক বা রেশমী কাপড়, বা অমুসলিমদের মত দেখা যায়, এমন লেবাস, এগুলো পরিধান করা হারাম, স্বর্ণ এবং সিল্ক পুরুষদের জন্য হারাম এবং মহিলাদের জন্য জায়িয। সুতরাং এসব পোষাক পরিধান করে নামায আদায় করলে সেই নামাযও কবুল হয় না।

(৬) প্রায় সর্বত্রই ঈদের জামা'আতের কাতারগুলো থাকে অবিন্যস্ত ও বাঁকা। অথচ কাতার সোজা হওয়া ও বিন্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে হাদীসে শরীফে কঠোরভাবে তাকিদ করা হয়েছে।

(৭) ঈদের নামাযের পর খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব। অথচ অনেকে এটাকে অর্থহীন কাজ মনে করে। সকল মুক্তাদীই যদি এরুপ মনে করে তাহলে ইমাম কাদেরকে খুৎবা শুনার জন্য বলবে। লোকজন খুৎবা না শুনে পরষ্পরের কথাবার্তা করতে থাকে। এটাও গুনাহের কাজ।

(৮) অনেক মুসল্লী খুৎবার সময় ইমামের সাথে উচ্চস্বরে তাকবীর পড়তে থাকে অথচ মুসল্লীদের জন্য এ সময় চুপ থাকা জরুরী এবং কিছু পড়া হারাম।

(৯) অনেক স্থানে ঈদের নামাযের পরে মুনাজাত না করে খুৎবার পরে মুনাজত করে। অথচ নামাযের পর মুনাজাত করা মুস্তাহাব।

(১০) অনেকে ঈদের নামায শেষে আপোষে মুসাফাহা ও মু'আনাকা বা আলিঙ্গন করতে থাকে। অথচ এটা ঈদের কোন সুন্নাত বা মুস্তাহাব কাজ নয়। বরং ঈদের সুন্নাত মনে করা বিদ'আত। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তির সাথে অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হলে প্রথম সাক্ষাতের সময় তার সাথে আলিঙ্গন করা সুন্নাত। সে হিসাবে কোন ব্যক্তির সাথে করা যায়।

[প্রমাণঃ শামী ১:১৫৯# ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত ১৫৭-১৫৮]

নামাযের বিবিধ মাসাইল

নামাযে খুশু-খুযু হাসিলের তরিকা

জিজ্ঞাসাঃ নামায কিভাবে মনোযোগের সাথে পড়া যায়? দেখা যায় যে, নামায পড়ার সময় দুনিয়ার সব চিন্তা মাথায় আসে, আবার হঠাৎ মনোযোগ নষ্ট হয়ে যায়। এর প্রতিকার কি?

জবাবঃ নিয়্যত ও হুজুরে ক্বলব (অর্থাৎ একাগ্রতা ও ধ্যান) নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার জন্য খুবই জরুরী। সুতরাং এর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তা হাসিল করার জন্য নামযের মধ্যে যা পড়া হয় এবং যে কাজ করা হয়, মনের মধ্যেও সেরকম ভাব পয়দা করতে চেষ্টা করতে হবে।

{পৃষ্ঠা–৪০৬}

যেমনঃ মুখে যখন 'আল্লাহু আকাবার' বলা হয়, তখন মনও যেন সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হতে বড় কোন কিছু নাই। এমনিভাবে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা কালে আল্লাহর অফুরন্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করে ভক্তিতে মন পরিপূর্ণ হওয়া কর্তব্য। উল্লেখ্য যে, অর্থ বুঝতে অক্ষম হলে কমপক্ষে শব্দগুলোর উচ্চারণের প্রতি খুব খেয়াল রাখবে। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) আরেকটি পদ্ধতি লিখেছেন, অন্তত এতটুকু যেন হয় যে, নামাযের প্রতিটি রুকন অভ্যাসগতভাবে আদায় না করা। বরং প্রতিটি কাজ ইচ্ছাপূর্বক আদায় করবে। যেমন, রুকূতে যাওয়ার সময় একথা মনে রেখে রুকূ করা যে, আমি রুকূতে যাচ্ছি। রুকূতে গিয়ে এখন রুকূর তাসবীহ পড়ছি। আল্লাহর বড়ত্ব বয়ান করছি ইত্যাদি। ইনশাআল্লাহ এভাবে নামায পড়তে থাকলে এমন একদিন আসবে যে, নামাযের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত খেয়ালকে বাদ দিয়ে একাগ্রতার সাথে

নামায পড়া সহজ হয়ে যাবে। আরো একটি কাজ একাগ্রতা হাসিলের জন্য খুবই উপকারী। আর তা হলো কোন হাক্কানী আলিম থেকে নামাযের বাস্তব প্রশিক্ষণ নিয়ে সে অনুযায়ী নামায পড়বে। সারকথা, মনে করবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখেছেন। সেদিকে খেয়াল রেখে নামায আদায় করবে এবং অর্থ বুঝলে অর্থের দিকে খেয়াল রাখবে। আর অর্থ না বুঝলে শব্দের দিকে খুব খেয়াল রাখবে।

[প্রমাণঃ শামী ১:৪১৭# তাবলীগে দীন (বাংলা) ১০ # তালীমুদ্দীন (বাংলা) ১৭৭]

নামাযে হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর নাম পড়লে দরুদ পড়ার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ "সূরা ফাতহ"-এর ২৯ নং আয়াতের শুরুতে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ শব্দ আছে। এখন প্রশ্ন হল- ইমাম সাহেব যদি উক্ত আয়াত নামাযের মধ্যে তিলাওয়াত করেন, আর যদি দরুদ পড়ে ফেলেন, তখন তার হুকুম কি?

জবাবঃ ইমাম সাহেব নামাযের মধ্যে উক্ত আয়াত পাঠ করলে, ইমাম সাহেব বা মুক্তাদীগণ কেউ দরুদ শরীফ পড়বেন না। যদি কেউ পড়ে ফেলেন তাহলে তার নামায ফাসিদ হবে না।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৩৩]

তবে শুধু (নামায ছাড়া) তিলাওয়াতের সময় কেউ উক্ত আয়াত তিলাওয়াত করলে বা শুনলে দরুদ শরীফ পড়তে পারে।

তবে যিনি তিলাওয়াত করেন, তার জন্য উত্তম হল তিলাওয়াত শেষে দরুদ শরীফ পড়ে নেয়া। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:৫১৯ পৃঃ# খাইরুল ফাতাওয়া ১:২৬৫]

ولو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ لا يجب ان يصلي وان فعل ذلك تعد فراغه من القرآن فهو حسن كذا في الينابيع. (ردالمحتار:519/1)

{পৃষ্ঠা–৪০৭}

সফরাবস্থায় পুরুষ ও মহিলার নামায

জিজ্ঞাসাঃ সফরকালে পুরুষ লোক যে কোন অবস্থায় নামায পড়তে পারে। সাথে স্ত্রী লোক থাকলে সে নামায কিভাবে পড়বে, তাদের নামায তো পর্দা অবস্থায় পড়তে হয়?

জবাবঃ নামায আল্লাহর এক মহান হুকুম যা পালন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। কেউ যদি শরয়ী উজর ছাড়া নামায কাজা করে তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তির কথা হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে। যেমনঃ হাদীসে আছে- "যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিল, সে অবশ্যই কুফরী কাজ করল"। অন্য হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামায ছেড়ে দিবে, আল্লাহ তা'আলা তার আমল নষ্ট করে দিবেন এবং তার থেকে আল্লাহ তা'আলার জিম্মাদারী উঠে যাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর দিকে ফিরে না আসে ততক্ষণ সে আল্লাহর যিম্মার বাইরে থাকবে"।

[প্রমাণঃ আততারগীব ওয়াততারহীন ১:৩৮৫-৮৬]

উল্লেখ্য যে, "সফর" নামায কাজা করার জন্য শরয়ী কোন উজর নয়, তাই পুরুষ হোক বা মহিলা, মুকীম হোক বা মুসাফির, সর্বাবস্থায় প্রত্যেকেরই ওয়াক্তমত নামায পড়তে হবে। নামায কাজা করার কিছুতেই অনুমতি নেই। মেয়েরা বোরকা বা বড় চাদর পড়ে দাঁড়িয়ে মসজিদের এক কোনে বা যেখানে সুযোগ হয়, সেখানেই নামায আদায় করে নিবে। বোরকা পড়ার পর ফাঁকা জায়গাতেও নামায পড়তে কোন চিন্তা করবে না। তাই পর্দায় অজুহাত দেখিয়ে নামায তরক করার কোন অবকাশ নেই।

ফরয নামাযের পর সুন্নাত আদায়ে বিলম্ব করা

জিজ্ঞাসাঃ ফরয নামায আদায়ের পর কয়েক মিনিট পাখা দ্বারা বাতাস করে এরপর সুন্নাত নফল আদায় করায় কোন ক্ষতি আছে কি?

জবাবঃ ফরয নামায আদায়ের পর সেই নামাযের ওয়াক্তের মধ্যে যখন মন চায়, তখনই সুন্নাত-নফল আদায় করা যায়। এতে ফরয নামাযের কোনরুপ ক্ষতি হবে না; আর তা নষ্ট হওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তবে উজর ব্যতীত ওয়াক্তী সুন্নাত নামায আদায় অযথা বিলম্ব করা অনুচিত, যথাসম্ভব বিলম্ব না করে ফরযের সাথে সাথেই তা আদায় করা উত্তম।

উল্লেখ্য যে, ৩/৪ মিনিট বিলম্বে সুন্নাত আদায় করায় তা নষ্ট হয়ে যাবে, এরুপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাছাড়া শরী'আতের মাসআলা-মাসায়িল সম্পর্কে যাদের সঠিক জ্ঞান নেই, তাদের জন্য ফাতওয়া প্রদান করা জায়িয নয়।

[প্রমাণঃ শামী ২:২২# তিরমিযী শরীফ ১:৯৮ # শামী ২:২২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৪:২০৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪৯১]

{পৃষ্ঠা-৪০৮}

والافضل في النفل غير التراويح المنزل الا لخوف شغل عنها والاصح افضلية ما كان اخشع واخلص...الخ   (فتارى شامي:22/2)

জায়নামাযে দাঁড়িয়ে ইন্নীওজ্জাহতু পড়া

জিজ্ঞাসাঃ আমরা যখন নামাযের মুসাল্লায় দাঁড়াই, তখন আমরা ইন্নীওজ্জাহতু এই পূর্ণ দু'আটি পড়ি। এই দু'আটি পড়ার কোন দলীল আছে কি-না?

জবাবঃ নামাযে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করার পূর্বে জায়নামাযের দু'আ হিসেবে ইন্নী ওজ্জাহতু দু'আটি পড়ার যে প্রচলন রয়েছে, কুরআন ও হাদীসে এর কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না। বরং হাদীসে নফল নামাযের ছানার স্থানে এ দু'আটি পড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম থেকে প্রমাণিত আছে। সুতরাং তাকবীরে তাহরীমা পূর্বে দু'আটি না পড়া উচিত।

[প্রমাণঃ আল বাহরুর রায়িক ১:৩১০# ইমদাদুল মুফতীন ৩১৬]

তাকবীরে তাহবীমায় এক আলিফের বেশী টানা

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম সাহেব নামাযে তাকবীরে তাহরীমা বলে হাত বাঁধার সময় আল্লাহ শব্দের মধ্যে ও ছালাম ফিরানোর সময় ছালামের মধ্যে ৩-৪ আলিফ টানেন। শরী'আতের দৃষ্টিতে ঐ নামায কতটুকু সহীহ এবং তাতে তার ইমামতি করা সহীহ হবে কি-না?

জবাবঃ 'আল্লাহ' ও 'আসসালামু' শব্দের লামের উপর মদ্দে তবায়ী যার পরিমাণ এক আলিফ। আর হরকতের উচ্চারণকে দ্বিগুন করলেই এক আলিফ টানা হয়ে যায়। এতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক আলিফ টান অতি সামন্য তাই তাববীরে তাহরীমা এর লাম এক আলিফ হতে লম্বা করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। কারণ উল্লেখিত স্থান সমূহে 'আল্লাহ' ও 'আসসালামু' শব্দ বাক্যের মধ্যে আসায় মদ্দে আরজী হচ্ছে না। বরং মদ্দে তবায়ী থাকছে। সেহেতু এক আলিফ-ই-টানতে হবে। বহু মুহাক্কিক আলিম এক আলিফকে পরিমাণ হতে কম বা পরিমাণ হতে বেশী টানাকে নাজায়িয বলেছেন। কারণ, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার নাম বিগড়ানো হয়। এটা মারাত্মক অন্যায়। এটা কোন মামুলী ব্যাপার নয়।

তাছাড়া ইমাম হয়ে তাকবীরে তাহরীমা ৩/৪ আলিফ টানলে যে মারাত্মক ক্ষতিটা হচ্ছে, সেটা হলো, মুক্তাদীদের তাকবীরে তাহরীমা বলতে হয়, ইমামের আলিফ টানলে, মুক্তাদিদের 'আল্লাহ আকবার' তাকবীরে তাহরীমা বলায় আগে শেষ হয়ে যাওয়ার তাদের ইমামের ইক্তিদা সহীহ হচ্ছে না। সুতরাং মুসল্লীদের

{পৃষ্ঠা-৪০৯}

নামায হচ্ছে না। তেমনিভাবে ইমাম আসসালামু এর “লা” বেশী টানলে, অনেক মুকতাদী ইমামের আগেই আসসালামু বলে ফেলে, তাতেও তাদের নামায মাকরুহে তাহরীমা হয়ে যায়।

কারণ প্রথম সালামের আসসালামু পর্যন্ত ইকতিদা অব্যাহত রাখা জরুরী। কোন মুসল্লী ইমামের আসসালামু বলার আগেই আসসালামু বলে থাকলে, তিনিই আগেই ইকতিদা শেষ করে ফেললেন, এটা বড় ধরনের ভুল।

ইমাম সাহেবের এরুপ উদাসীনতার কারণে কত হাজার মুক্তাদীর নামায যে সহীহ হচ্ছে না বা মাকরুহে তাহরীমী হচ্ছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাই উক্ত ইমামের উচিত, কোন মুহাক্কিক ক্বারী সাহেবের নিকট মাশক করে এক আলিফ মদ্দ ঠিক করে সে অনুযায়ী আমল করা। যাতে মুক্তাদীদের নামায সহীহ হয়।

[প্রমাণঃ তাতারখানিয়া ১:৮৭# হিন্দিয়া ১:৬৮]

فان قال المقتدي الله اكبر ووقع قوله الله مع الامام وقوله اكبر وقع قبل قول الامام ذلك قال الفقيه ابو جعفر الاصح انه لايكون شارعا عندهم وكذا لو ادرك الامام في الركوع فقال الله اكبر...الخ (فتاوى عالمكيرية:67/1-69)

নামাযে পরকালের খেয়াল করা

জিজ্ঞাসাঃ তাবলীগ জামা’আতের একজন মুরুব্বী বললেন, নামাযরত অবস্থায় দুনিয়াবী কথা মনে পড়লে, এ ধারণা করা উচিত যে, আমি পুলসিরাতের উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পিছনে আজরাঈল ফিরিশতা, সামনে আল্লাহ তা’আলা, ডানে বেহেশত, বামে দোযখ, এরুপ ধারণা করলে নামায শুদ্ধ হবে কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, উক্ত খেয়াল সমূহের সাথে নামায পড়লে, নামায হয়ে যাবে। বরং ভালভাবে আদায় হবে। কেননা, নামায খুশু-খুযু থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর এ জাতীয় খেয়াল দ্বারা নামাযে মন বসে এবং নামাযে খুশু-খুযু পয়দা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হাদীসের মাধ্যে এসেছে, যখন তুমি নামায পড়বে, তখন ধারণা করবে এটাই আমার জেন্দেগীর শেষ নামায। এজন্যই বুযুর্গানে দীন উক্ত খেয়ালের সাথে নামায আদায় করছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। হযরত থাবনী (রহঃ) লিখেছেন, “নামাযে মন বসানোর জন্য উত্তম পন্থা হলো, নামাযে যা কিছু পড়বে, ইচ্ছা-পূর্বক খেয়াল করে পড়বে। কোন কিছু মুখস্থভাবে বা বে-খেয়ালীর সাথে পড়বে না”।

[প্রমাণঃ শামী ৬৪১# মিশকাত শরীফ ২:৪৪৫# আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১:২৫৫]

{পৃষ্ঠা-৪১০}

নামাযে কুরআন তিলাওয়াতে আজেবাজে চিন্তা আসলে করণীয়

জিজ্ঞাসাঃ আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। আমি যখন নামায পড়ি এবং কুরআন তিলাওয়াত করতে বসি, তখন আমার মনে আজেবাজে কথা স্মরণ হয়। মন অন্যদিকে চলে যায়। আমি এ অবস্থায় কি আমল করতে পারি?

জবাবঃ নামাযের মধ্যে বা কুরআন তিলাওয়াত সময় মনে আজেবাজে চিন্তা আসা বা মন এদিক-সেদিক ছুটে যাওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেকেরই এমন অবস্থা হয়। তবে এ সময় মনকে ধরে এনে আবার নামাযে বা তিলাওয়াতে বসাতে পারলে, পরিপূর্ণ নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। কুরআন তিলাওয়াতের সময় মনকে স্থির রাখার উপায় হল- তিলাওয়াতের শুরুতে পাক-পবিত্র অবস্থায় মিসওয়াক ও উযু করবে। গোলমাল শূন্য নীরব স্থানে কিবলামুখী হয়ে নামাযে বসার ন্যায় আদবের সাথে বসে প্রথমে কয়েক বার দরুদ শরীফ পড়ে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পুরা পড়ে তিলাওয়াত শুরু করবে। অন্তরে কালামে পাকের মাহাত্ম্য সম্বদ্ধে এ চিন্তা করবে যে, মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা’আলারই এ কালাম। অর্থ না বুঝলেও প্রতি অক্ষরে ১০টি করে নেকী পাবে এবং নিজের কান দু’টিকে একনিষ্ঠ করে নিবে। মনে করবে যে, আল্লাহর আদেশে কুরআন পাঠ করে তাকে শুনাইতেছি।

সুতরাং সুন্দর আওয়াজ, তাজবীদের সাথে তিলাওয়াত করবে। এভাবে তিলাওয়াত করলে আশা করা যায়, মন স্থির থাকবে।

আর নামাযের মধ্যে মন স্থির রাখার জন্য উপায় হল- নামাযের তাকবীর তাহরীমা বলার সময় আল্লাহ তা'আলার আজমত ও মহত্বের কথা খেয়াল রেখে তাকবীরে তাহরীমা বলবে এবং মনে মনে খেয়াল করবে যে, সব কিছু থেকে আমার আল্লাহ বড়। সুতরাং তার খেয়াল ছেড়ে কম দামী বা আজেবাজে জিনিসের চিন্তা চরম নির্বুদ্ধিতা। অতঃপর ক্বিরাআত, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি খুবই মনোযোগ সহকারে ঠিক মত আদায় করবে। যা কিছু মুখে পড়বে, সেদিকে খুবই খেয়াল রাখবে। আর যদি ইমামের ক্বিরাআত না শুনা যায়, তাহলে দিলে দিলে সূরা ফাতিহা আওড়াতে থাকবে। এতেও নামাযের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য, নামাযে ও তিলাওয়াতে একাগ্রতা সৃষ্টি করতে গুনাহ তরক করা কর্তব্য। বিশেষ করে বদনেগাহীর (কুদৃষ্টির) অভ্যাস থাকলে, তা ত্যাগ করা জরুরী।

[প্রমাণঃ শামী ১:৫৪৬-৪৫]

লাইট বন্ধ করে ফজরের জামাআত আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ সিজদার স্থান দেখতে অসুবিধা হবে না, এমতাবস্থায় লাইট বন্ধ করে ফজরের জামা'আত আদায় করা দূষণীয় কি-না?

{পৃষ্ঠা–৪১১}

জবাবঃ অন্ধকারের মধ্যে নামায পড়া সহীহ আছে। সিজাদার জায়গায় দিকে নজর রাখা সুন্নাত। কিন্তু তার জন্য ঐ জায়গা দেখতে পাওয়া বা দেখতে থাকা জরুরী নয়। তবে জামা'আতে নামায পড়ার সময় কাতার সোজা করার জন্য রাত্রে আলোর প্রয়োজন। কাতার সোজা করার পর আর আলোর প্রয়োজন নেই।

সুতরাং কাতার সোজা করতে যদি কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, তাহলে লাইট বন্ধ করে ফজরের জামা'আত আদায় করতে কোন অসুবিধা নেই।   [প্রমাণঃ শামী ১:৪৭৭পৃঃ]

من آداب الصلوة نظره الى موضع سجوده حال قيامه والى ظهر قدميه حال ركوعه...الخ   (شامي:477/1)

হাফ শার্ট বা গেঞ্জী পরে নামায আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ হাফ শার্ট এবং গেঞ্জী পরে যদি কেউ নামায আদায় করে, তাবে তা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ হাফ শার্ট বা গেঞ্জী পরিধান করে নামায পড়তে পারে। তবে যদি কেউ হাফ শার্ট বা গেঞ্জী পরিধান করে কোন মজলিসে বা অনুষ্ঠানে যেতে লজ্জাবোধ করে, তবে তা পরিধান করে নামায পড়া তার জন্য মাকরুহ হবে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৪০৮]

তালের টুপি পরে নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ তালের টুপি, চাটাইয়ের টুপি মুসল্লীদের জন্য সারিবদ্ধভাবে মসজিদে রেখে দেয়া হয় এবং এই টুপি পরে নামায পড়া হয়। এটা কেমন?

জবাবঃ নামাযের সময় তালের টুপি বা চাটাইয়ের টুপি পরিধান করা উচিত নয়। কারণ-যে টুপি পরে লোক সমাজে যেতে শরম বোধ হয়, নামাযের সময় সেরুপ টুপি বা লেবাস পরিধান করা অনুচিত এবং এরকম টুপি মসজিদে রাখাও অনুচিত।   [আদ্দুররুল মুখতার ১:৬৪০]

নামায আদায় করা সত্ত্বেও অপর্কম করা

জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে, নামায সমস্ত বেহায়াপনা এবং অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। অথচ আমরা দেখি অনেকে নামায পড়েন এবং অশ্লীল কাজও করেন। অনুগ্রহপূর্বক ব্যাপারটি তথ্যসহ জানতে ইচ্ছুক।
জবাবঃ পবিত্র কুরআনের যে আয়াতে বলা হয়েছে নামায যাবতীয় অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, সে আয়াতেই কিভাবে নামায আদায় করলে নামায অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে তাও বর্ণনা করা হয়েছে।
{পৃষ্ঠা-৪১২}
বস্তুতঃ নামায তখনই অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে, যখন নামায কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম যেভাবে জাহেরী ও বাতিনী আহকাম পালন করতঃ নামায আদায় করেছেন এবং সারা জীবন মৌখিকভাবে শিক্ষা দানও করেছেন, তদ্রুপ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর পূর্ণ সুন্নাত অনুযায়ী নামায আদায় করতে হবে। যে ব্যক্তি এমনভাবে নামায আদায় করবে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে অবশ্যই সৎকর্মের তাওফীক প্রাপ্ত হবে এবং যাবতীয় গোনাহর কাজ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক পাবে। যেমনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কে উক্ত আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন যে, যে ব্যক্তিকে তার নামায অশ্লীল ও গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখে না, তার নামায প্রকৃত নামাযই নয়। এখন আমরা নিজেদের নামায হুবহু সুন্নাত অনুযায়ী হয়েছে কি-না এবং খুশু-খুযুর সাথে হয়েছে কি-না, তা যাচাই করে দেখতে পারি। তাহলেই বুঝা যাবে আসল ব্যাপারটা কি? পঙ্গু নামায দ্বারা আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের নামায আমাদেরকে যাবতীয় পাপাচার ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখবে! বর্তমানে মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ) এর প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হকের মাধ্যেমে নামাযের আমলী মশক (ট্রেনিং) দ্বারা নামাযকে সুন্নাত অনুযায়ী আদায় করার প্রচেষ্টা চলছে। আমরা উক্ত মেহনতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নামায, আযান ও ইক্বামত ঠিক করে নিতে পারি। তাহলে আমাদের নামায আমাদেরকে অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখবে বলে আশা করা যায়। [প্রমাণঃ তাফসীরে রুহল মা’আনী ১১:২৪৩# তাফসীরে কাবীর ২৫:৭২# মা’আরিফুল কুরআন ৬:৬৯৫]
বেনামাযীর বাড়ীতে খানা খাওয়া ও হাদীয়া গ্রহণ করা
জিজ্ঞাসাঃ বেনামাযীর বাড়ীতে খানা খাওয়া এবং তার থেকে হাদিয়া টাকা নেয়া ঠিক হবে কি-না?
জবাবঃ নামায না পড়ার দ্বারা তার উপার্জিত সম্পদ হারাম ও নাপাক হয়ে যায় না, নামায না পড়ার কারণে সে গুনাহগার হবে। তাকে হিকমতের মাধ্যমে নামাযের দিকে দাওয়াত দিতে হবে। তার সাথে সম্পর্ক রেখে তাকে যদি দীনের পথে আনা যায়, তাহলে তার বাড়ীতে খেতে বা তার হাদিয়া নিতে কোন অসুবিধা নেই। যদি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে বা তাকে বয়কট করলে অনুতপ্ত হয়ে সহীহ পথে ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তখন সে পথ গ্রহণ করা উত্তম। মোটকথা, যে ভাবেই হোক তাকে নামাযের দিকে আনার চেষ্টা করতে হবে। চাই তার সাথে নম্র ব্যবহার করেই হোক বা কঠোরতা করে হোক। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১:১৪৪]
{পৃষ্ঠা-৪১৩}
নামাযের গুরুত্ব
জিজ্ঞাসাঃ সম্প্রতি আমাদের পারিবারিক পরিবেশে দীনী আলোচনায় নামাযের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ভাইয়া বললেন- কোন অবস্থাতেই নামায মাফ নেই। একমাত্র মহিলাদের মাসিক চলাকালীন নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত কোন অবস্থাতেই নামায মাফ হয় না। এমন কি সন্তান প্রসবকালীন সময় যদি সন্তান অর্ধেক বাহিরে আসে এবং অর্ধেক

ভিতরে থাকে, তবুও নামায মাফ নেই। বিষয়টি আমার কাছে অত্যন্ত জটিল মনে হল। অতএব, হুজুরের সমীপে আবেদন-বিষয়টি বিস্তারিত জানাবেন।

জবাবঃ আপনার ভাইয়া নামাযের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে যে, আলোচনা করেছেন, শরী‘আতের মাসআলাও তাই। তার পরেও আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, কোন মহিলার বাচ্চা প্রসবকালীন সময় বাচ্চা অর্ধেক বের হয়েছে, এমন সময়ও যদি তার জ্ঞান (হুস) থাকে এবং নামাযের সময় এত অল্প থাকে যে, আদায় না করলে কাযা হয়ে যাবে, তাহলে ঐ অবস্থায়ও শুয়ে বা বসে নামায পড়া ফরয, কাযা করা জায়িয নয়।

কিন্তু ঐ সময় নামায পড়ার দরুণ যদি বাচ্চার ক্ষতি হবার প্রবল ধারণা হয় তাহলে নামায ঐ সময় আদায় না করে পরে কাযা পড়ে নিবে। [প্রমাণঃ শামী ২:৯৬-৯৭# বেহেশতী জেওর ২:৬৪]

ঝগড়াবস্থায় স্ত্রী নামায অস্বীকার করলে

জিজ্ঞাসাঃ কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্য হয়। তারা উভয়ে নামাযী এদিকে তখন আসরের নামাযের ওয়াক্তও চলে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে বললো, অনুগ্রহপূর্বক নামায আদায় করে নাও। উত্তরে আফসোসের সূরে স্ত্রী বললো, আমি আর নামায পড়ব না। আমার নামায পড়ে কি লাভ? যেহেতু তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমার নামায পড়ে কি হবে? আমি তো জাহান্নামে যাব। অবশ্য কিছুক্ষণ পরই সে উক্ত নামায আদায় করে নিয়েছে এবং এখনো যথাযথাভাবে নামায আদায় করছে। এক্ষেত্রে শরী‘আতের বিধান কি? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ নামায হচ্ছে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। ঈমানের পরই এর স্থান। কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। সুতরাং কোন পেরেশানীর কারণেও এমন একটি বিধান সম্পর্কে এরুপ উক্তি করা মারাত্মক অপরাধ। সুতরাং উক্ত স্ত্রীর জন্য খালেসভাবে তাওবাহ করা জরুরী।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:১৫৯# বেহেশতী জেওর ১:৪০]

{পৃষ্ঠা–৪১৪}

পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

জিজ্ঞাসাঃ নামায আদায়ের ক্ষেত্রে কোন বিষয় আদায় করার পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে ভিন্নতা দেখা যায়। কেউ কেউ বলে থাকে যে, “পুরুষ ও মহিলাদের নামায আদায়ের পদ্ধতি একই রকম। হাদীসে উভয়ের নামায আদায়ের পদ্ধতির কোন পার্থক্য নেই”।

এখন আমার প্রশ্ন হল, পুরুষ ও মহিলার নামায আদায়ের পদ্ধতিতে কোন পার্থক্য আছে কি-না? যদি থাকে তাহলে হাদীসের আলোকে জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

জবাবঃ শরী‘আতে এমন কিছু হুকুম-আহকাম রয়েছে, যেগুলো পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে সমভাবে আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবয়ান করার নিয়ম-নীতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

কুরআন-হাদীসে মহিলাদের পর্দা করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আর এ পর্দায় প্রতি লক্ষ্য করেই আযান, ইকামাত, ইমামতী ও জুমু’আর ও জামা’আতের নামায ইত্যাদি থেকে মহিলাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

নামায আদায় করার নির্দেশ যদিও পুরুষ ও মহিলা উভয়ের প্রতিই সমভাবে আরোপিত হয়েছে, তথাপি পর্দার প্রতি লক্ষ্য করেই হাদীসে নামাযের কিছু আহকাম বা আরকান আদায় করার পদ্ধতি বা নীতিমালার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে কিছু পার্থক্য করা হয়েছে। সুতরাং নিম্নে উদাহরণ স্বরুপ এমন কয়েকটি রুকন বা

হুকুমের বর্ণনা উপস্থাপনা করা হল, যে সকল রুকন আদায় করার পদ্ধতি বা নীতিমালার হাদীস ও ফিকহের আলোকে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে।

শরয়ী আহকামের উৎস শুধু কুরআন–হাদীস নয়, বরং কুরআন–হাদীস স্বীকৃত আরো দু'টি উৎস রয়েছে। অন্যথায় শুধু কুরআন দ্বারা পুরুষের নামাযও পরিপূর্ণ ভাবে প্রমাণ করা অসম্ভব। সুতরাং পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের পার্থক্য প্রমাণের বিষয়ে একমাত্র কুরআন বা বুখারী শরীফ এর হাদীসের দাবী তুলে এক শ্রেণীর লোক মূলতঃ কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করে। একথাটি মনে রেখেই নিম্নোক্ত জবাব লক্ষ্য করুন।

(১) তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোঃ উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী স্বীয় কর্ণদ্বয় পর্যন্ত উঠাবে। পক্ষান্তরে মহিলাগণ নিজের উভয় হাতের আঙ্গুল উভয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজ্র (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, "হে ইবনে হুজ্র! যখন তুমি নামায

{পৃষ্ঠা–৪১৫}

পড়বে তখন তোমার উভয় হাত স্বীয় কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলাগণ তাদের হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে"। [প্রমাণঃ তাবরানী, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২:১০৩# ই'লাউস সুনাম ২:১৫৬]

এ প্রসঙ্গে মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা নামক কিতাবের ১ম খণ্ড, ২৭০নং পৃষ্ঠার একাধিক তাবেয়ী ফকীহগণ থেকে ফাতাওয়া বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণ থেকেও অনুরুপ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- "যখন কেউ নামাযে প্রবেশ করার ইচ্ছা করবে তখন উভয় হাত স্বীয় কর্ণদ্বয় পর্যন্ত উঠাবে, যেন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় উভয় কানের বরাবর হয়। আর মহিলাগণ তাঁদের উভয় হাত স্বীয় কাঁধদ্বয় পর্যন্ত উঠাবে। তারপর তাকবীর বলে হাত বাঁধবে। এটাই সঠিক পদ্ধতি।"

(২) হাত বাঁধাঃ পুরুষগণ নাভীর নীচে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জা ধরে রাখবে। পক্ষান্তরে মহিলাগণ বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে। সুতরাং গ্রহণযোগ্য হাদীসের মাধ্যেমে জানা গেল যে, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম নামাযে নাভীর নীচে হাত বেঁধেছেন। সুতরাং পুরুষদের জন্য নাভীর নীচে হাত বাঁধাই সুন্নাত। কিন্তু মহিলাদের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের ইজমা হয়ে গেছে যে, তাদের বুকের উপর হাত রাখা সুন্নাত।

[সিআয়াহ ২:১১৫৬]

যেহেতু এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, তাই এর উপর অবশ্যই আমল করতে হবে। কারণ, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইজমার বরখেলাফকারী দোযখী হবে।

[মাজমূ'আয়ে রাসায়িল ১:৩০৭]

(৩) সিজদাঃ সিজদা করার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে অনেকটা পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- সিজদার সময় পুরুষগণ উভয রান ও পেট পৃথক রাখবে এবং খোলামেলাভাবে সিজদা করবে। তেমনিভাবে উভয় কনুই ভূমি হতে উঁচু করে রাখবে এবং এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখবে না ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে মহিলাগণ পুরুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মহিলারা সিজদার সময় উভয় রান পৃথক রাখবে না, বরং পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করবে, যাতে এক অঙ্গ অপর অঙ্গের সাথে মিলে যায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে কয়েকটি হাদীস পেশ করা হল।
হযরত যায়িদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম একবার দু'জন মহিলার নিকট নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে বললেন- "যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন শরীর যমীনের সাথে মিলাবে। কেননা, সিজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মত নয়"।
[মারাসীলে আবী দাউদ ৮# ই'লাউস সুনাম ৩;১৯]
{পৃষ্ঠা–৪১৬}
হযরত আলী (রাযিঃ) বলেন, মহিলাগণ খুব জড়সড় হয়ে সিজদা করবে এবং সিজদার সময় অবশ্যই পেট উভয় রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। [মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইব ১:৩০২]
হযরত লাইছ (রহঃ) প্রসিদ্ধ তাবেয়ী এবং ফকীহ হযরত মুজাহিদ হতে বর্ণনা করে বলেন, তিনি সিজদায় মহিলাদের ন্যায় পুরুষের পেট উভয় রানের উপর রাখাকে মাকরুহ মনে করতেন।
[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১:৩০২]
হযরত ইবরাহীম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, মহিলারা সিজদা করার সময় পেটকে অবশ্যই রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে এবং নিতম্ব উঁচু করবে না এবং পুরুষদের মত খোলামেলাভাবে সিজদা করবে না।
[মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ১:৩০৩]
উপরোল্লেখিত হাদীস ও আ-সা-বে সাহাবা সমূহের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সিজদার ক্ষেত্রে এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলোতে পুরুষ ও মহিলাদের বিধান এক নয়, বরং ভিন্নতর।
(৪) দুই সিজদার মাঝে ও তাশাহহুদের সময় বসার পদ্ধতিঃ এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, পুরুষরা নামাযে বাম পায়ের উপর বসবে এবং ডান পা খাড়া রাখবে। কিন্তু এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ তারা নিতম্বের উপর বসবে এবং উভয় পা ডান দিকে বের করে কিবলামুখী করে রাখবে। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-
হযরত ইবনে উমর (রাযিঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর যুগে মহিলারা কিভাবে নামায পড়তেন? উত্তরে তিনি বললেন, মহিলারা নিতম্বের উপর বসতেন এবং তাদেরকে জড়সড় হয়ে সিজদা করা ও বসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়।
[জামিউল মাসানীদ ১:৪০০# ই'লাউস সুনাম ৩:২০]
হাদীসের আলোকে নামাযের উপরোল্লেখিত কয়েকটি বিষয় আলোচনা করার দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টরুপে জানা গেল যে, নামাযের অনেক বিষয়ই এমন রয়েছে, যেগুলো আদায় করার পদ্ধতিতে পুরুষ ও মহিলাদের মাঝে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং যারা হাদীসের কিতাব অধ্যয়ন না করে বা হাদীস না বুঝে বলে বেড়ায় যে, হাদীসে পুরুষ ও মহিলাদের নামায আদায় করার ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই, আশা করি তারা উপরোল্লিখিত আলোচনা পাঠ করার পর এ ধরনের মনগড়া বাক্য উচ্চারণ করতে আর প্রয়াস পাবে না।
{পৃষ্ঠা–৪১৭}

اذا اراد الدخول في الصلوة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي اذنيه........ والمرأة ترفع حذاء منكبيها هو الصحيح. (الفتاوى الهندية:73/1)

নামায তরককারীর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হলো নামায। মুসলমান নামায পড়ে, কাফেররা নামায পড়ে না। এজন্য আমার বক্তব্য হলো। আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যারা নামায পড়েই না এবং আরো যে কত জঘন্য হারাম কাজের সাথে জড়িত তার কোন ইয়ত্তা নেই। তাহলে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম-এর ভাষ্য অনুযায়ী এরা কি কাফের?
জবাবঃ কোন ব্যক্তি নামাযকে ফরয বিশ্বাস করার পরে যদি নামায তরক করে এবং অন্যান্য হারাম কাজকে হারাম জেনে দুনিয়ার কোন স্বার্থে হারাম কাজে লিপ্ত হয় তাহলে, সে ব্যক্তি কাফের হয় না। তবে এগুলোর জন্য সে মারাত্মক গুনাহগার এবং ফাসিক হবে।

আর উল্লেখিত হাদীসের অর্থ হল যে, কার্যক্ষেত্রে কাফের এবং মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য হল নামায। কারণ, যে মুসলমান নামায পড়ে না বাহ্যিকভাবে তার মাঝে আর কাফেরের মাঝে সাধারণতঃ কোন পার্থক্য রইল না। তা সত্ত্বেও আক্বায়িদ সহীহ থাকলে তাকে কাফের বলা যাবে না। হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি যদি নামাযকে অথবা ইসলামের কোন স্পষ্ট হুকুমকে সরাসরিভাবে অস্বীকার করে বা সন্দেহ করে বা ঠাট্টা করে বা আপত্তি করে তাহলে সে কাফেরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।
[প্রমাণঃ সূরা নিসা ৯৮# মিশকাত ৫৮# আযীযুল ফাতাওয়া ৮৫# ইমদাদুল আহকাম ১:১৩৩]
الصلواة فريضة محكمة لايسع تركها ويكفر جاحدها ولا يقتل تارك الصلوة عامدا غير منكر وجوبها بل يحبس حتى يحدث توبة...الخ (عالمكيرية:50/1)

কাতারে দাগ রাখার উদ্দেশ্য

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের ভিতরের যদি কোন মুসল্লী কাতারে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে থাকে, তবে উক্ত মুসল্লীর সামনের কাতার দিয়ে অতিক্রম করা যাবে কি-না? যদি না যায়, তহলে কাতারে দাগ রাখার অর্থ কি?
জবাবঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর সতর্কবানী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন, এক হাদীসে প্রিয় নবী পাক সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করায় যে কত {পৃষ্ঠা-৪১৮}
মারাত্মক গুনাহ হয়, তা যদি অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানত, তাহলে সে চল্লিশ বৎসর (অপর বর্ণনায় এক শত বৎসর) অপেক্ষা করতে হলেও নিজের স্থানে দাঁড়িয়ে থাকত। তবুও নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করত না।
[প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ১:৭৯]
অতঃএব, নামাযী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা মোটেই সমীচীন নয়। অবশ্য এক্ষেত্রে নামাযী ব্যক্তিকেও সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তিনি এমন স্থানে না দাঁড়ান, যেখানে দাঁড়ালে মানুষের চলা-ফেরার অসুবিধা হয়।
আর যদি জামা'আত দাঁড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কেউ নফল পড়তে থাকে, অথচ কাতারের কোন জায়গা খালি থেকে যায়, যা পূর্ণ করতে হলে আগন্তুককে তার সম্মুখ দিয়ে যেতে হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে সে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যেতে কোন অসুবিধা নেই। তবে কোন মাঠে অথবা বড় মসজিদে নামাযরত ব্যক্তির সামনে ৬/৭ হাত জায়গা (দু'কাতার) ছেড়ে দিয়ে যাতায়াত করায় কোন অসুবিধা নেই। তবে প্রয়োজন ব্যতীত এরুপ না করাটাই উত্তম। কাতারে দাগ টানার অর্থ এই নয় যে, এর দ্বারা কাতারের সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা যাবে। বরং কাতার দাগ রাখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- যেন জামা'আতের সময় কাতার সোজা থাকে। কেননা, কাতার সোজা রাখা নামাযের পরিপূর্ণতার একটি বিশেষ অংশ।

[প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ ১:৯৮# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১০৪# শামী ১:৬৩৬]

لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف اربعين خريفا في ذلك المرور........ مار في الصحراء او في مسجد كبير بموضع سجوده او مروره بين يديه الى حائط القبلة في بيت ومسجد صغير مطلقا...الخ.   (شامي:35,634/1)

নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা

জিজ্ঞাসাঃ নামাযী ব্যাক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া যায় কিনা? যদি যায় তাহলে যাওয়ার সঠিক নিয়ম কি?

জবাবঃ এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিধি জানা প্রয়োজনঃ

(ক) নামাযীর সম্মুখ দিয়ে এক পাশ থেকে আরেকপাশে চলে যাওয়াকে পরিভাষায় অতিক্রম করা বলা হয়-এটা অবশ্যই গুনাহে কবীরা। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইরশাদ করেন- "নামাযীর সম্মুখ দিয়ে যাতায়াত করা যে কত বড় গুনাহ, তা যদি অতিক্রমকারী জানত, তাহলে সে ৪০ বৎসর অপর বর্ণনায় ১০০ বৎসর অপেক্ষা করতে হলেও নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে থাকত; তথাপিও নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করত না। [তিরমিযী পৃঃ ৭৯খণ্ড]১

{পৃষ্ঠা-৪১৯}

(খ) যিনি নামাযীর সম্মুখভাগে পূর্ব থেকেই অবস্থান করছিলেন, অথবা পরবর্তী সময়ে কেউ এসে তার পিছনে নামাযে রত হওয়ার তিনি সম্মুখবর্তী হয়ে পড়েছেন, এমতাবস্থায় তিনি যদি সম্মুখ ভাগ থেকে নামাযীর কোন এক পার্শ্ব দিয়ে চলে যান, তাহলে এটাকে অতিক্রম করা বলা হবে না। এবং তিনি গুনাহগারও হবেন না। অবশ্য বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত এরুপ না করাই সমীচীন, যাতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার না হয়। [প্রমাণঃ আলমগীরী পৃঃ ১০৪ খণ্ড ১]

(গ) রাস্তা-ঘাটে নামাযীকে তার সম্মুখে ন্যূনতম হাতের আঙ্গুল পরিমাণ মোটা ও ১ হাত লম্বা কোন বস্তু দাঁড় করিয়ে রাখা কর্তব্য, যাতে সম্মুখভাগ দিয়ে মানুষ বা কোন প্রাণী চলাচলে অসুবিধা না হয়।

(ঘ) নামাযী ব্যক্তি যদি এ ধরনের কোন ব্যবস্থা না করেন, তাহলে অতিক্রমকারী উপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে কোন বস্তু মুসল্লীর সম্মুখে রেখে যাতায়াত করতে পারেন।

(ঙ) যদি খোলা ময়দানে কিংবা বড় মসজিদে কেউ নামাযরত থাকেন, তাহলে নামাযী তার সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখলে প্রচ্ছন্নভাবে সম্মুখভাগে যতটুকু দৃষ্টিগোচর হয় (অর্থাৎ দুই কাতার বা ৬/৭ হাত) ততটুকু স্থান ছেড়ে মুসল্লীর সমানে দিয়ে যাওয়া বৈধ; তবে বিনা প্রয়োজনে না যাওয়াই উত্তম। [প্রমাণঃ শামী ১:৬৩৬# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৪০# আল বাহরুল রায়িক ২:১৫]

জানাযার নামায

জানাযার নামাযের পর একত্রিত হওয়া, দোয়া করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকার প্রচলিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায আদায় করার পরপরই কবরস্থ করার পূর্বে সবাই সম্মিলিতভাবে দু'আ করে থাকেন। এই দু'আর প্রথা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কিনা? কোন কোন আলেম বলেন- "জানাযার নামায আাদয়ের পরপরই কবরস্থ করার পূর্ব পর্যন্ত দু'আ বৈধ নয়"। আবার কোন কোন আলেম বলেন- "জানাযার নামাযের সালাম ফিরানোর পরপরই কবরস্থ করার পূর্বে কিছু পড়াশুনা এবং কবরস্থান জিয়ারত করে দু'আ করা বৈধ আছে।" সঠিক সমাধান চাই।

জবাবঃ জানাযা পড়াটাই প্রকৃতপক্ষে মাইয়্যিতের জন্য মুসলমানদের তরফ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট উৎকৃষ্ট সম্মিলিত দু'আ। জানাযার দ্বিতীয় তাকবীরের পর দু'আ পড়ে মাইয়্যিতের জন্য সকলে মিলে আল্লাহের কাছে মাগফিরাত কামনা করে থাকে। কাজেই জানাযা পড়ে পুনরায় তার জন্য সম্মিলিত দু'আ করা

{পৃষ্ঠা-৪২০}

নিষ্প্রয়োজন এবং এ ধরনের দু'আ করার কথা কুরআন-হাদীসে সাবিত নেই। বরং জানাযার পরে দু'আ করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কারণ, এতে মাইয়্যিতকে দাফন করতে দেরী হয়ে যায়, যা শরী'আতে নিষেধ। এই একই কারণে জানাযার পর মাইয়্যিতের চেহারা দেখানো নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এতেও দাফনে দেরী হয়।

উল্লেখ্য, জানাযার নামায পড়ে সকলে মিলে লাশ সামনে নিয়ে আবার দু'আ করার অর্থ হবে- আল্লাহ প্রদত্ত নিয়মের দু'আর উপর সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেরা একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নেয়া যা শরী'আতে নিন্দনীয় ও বিদ'আত। তবে সম্মিলিতভাবে না করে প্রত্যেকে মনে মনে দু'আ করতে কোন অসুবিধা নাই। তেমনিভাবে কবর দেয়ার পর যিয়ারত করেও দু'আ করতে পারে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২১২ # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১;২৫৬# আহসানুল ফাতাওয়া ১:৩৩৬]

জানাযার নামাযের পর মৃত ব্যক্তির লাশ দেখানো

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় এক মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাযের পর উক্ত মৃত ব্যক্তির চেহারার কাফনের কাপড়ে খুলে উপস্থিত সকল লোক মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখার সময় এক মসজিদের ইমাম সাহেব বলেলন যে, "এই ভাবে জানাযার নামাযের পর মৃত ব্যক্তির লাশ দেখা জায়িয নাই। কারণ জানাযার পর দাফনের আগে কোন প্রকার দেরী করা যায় না এবং জানাযার নামাযের পর কোন পাপিষ্ঠের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবার আশংকা আছে। যদি এমন হয় তাহলে উক্ত লোক সম্পর্কে মানুষের মাঝে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাই জানাযার নামাযের পর চেহারা খুলে দেখা ঠিক নয়"। উক্ত ইমাম সাহেবের কথা কতটুকু ঠিক?

জবাবঃ জানাযার নামাযের পর মানুষের মৃত ব্যক্তির চেহারা দেখানো মাকরূহ। কারণ এর দ্বারা দাফন করতে দেরী হয়, অথচ মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে।

শরী'আতের নির্দেশ হল, মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন থেকে কয়েকজন জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত মানুষ মিলে গোসল এবং কাফন পরাবে, যাতে মৃত ব্যক্তির চেহারা বিকৃত হলে বা অন্য কোন দোষ ত্রুটি প্রকাশ পেলে তা গোপন থাকে এবং জনসম্মুখে প্রকাশ না পায়। জানাযার নামাযের পর চেহারা দেখানো হলে এ নির্দেশও অমান্য করা হয়। মোটকথা এক্ষেত্রে উক্ত ইমাম সাহেবের কথা সঠিক আছে। সকলেরই তা মেনে নেয়া উচিত। [প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার, ২:২৩২ # খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১;২২৫# ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫:১১০#আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২১৯]

{পৃষ্ঠা-৪২১}

মায়্যিতের চেহারা দেখা ও দেখানো

জানাযার নামাযের পরে মৃত ব্যক্তিকে দেখা জায়িয আছে কি-না? থাকলে, কোন কোন লোক দেখতে পারবে?

জবাবঃ জানাযার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত মাইয়্যিতের চেহারা দেখা ও দেখানো জায়িয। পুরুষদের চেহারা পুরুষগণ এবং তার স্ত্রী ও মাহরাম মহিলা আত্মীয়গণ দেখতে পারবে। মহিলাদের চেহারা মহিলাগণ এবং তার স্বামী ও মাহরাম পুরুষগণ দেখতে পারবে। এর ব্যক্তিক্রম করা জায়িয নয়। জানাযার পরে মুখ দেখার প্রথা নিষ্প্রয়োজন ও মাকরুহ। কারণ, এর দ্বারা দাফন করতে দেরী হয়। অথচ মাইয়্যিতকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে। দাফন করতে দেরী হবে বলে জানাযার পরে দু'আও নিষেধ। তাহলে মুখ দেখা কিভাবে সমীচিন হবে?

[প্রমাণঃ ৫:১১০#ফাতাওয়া শামী ২;২৩২# মারাকিউল ফালাহ ৩৫২# খুলাছাতুল ফাতাওয়া ১:২২৫# সিরাজিয়া ১:২৩# আহকামে মাইয়্যিত ২৩৫]

দ্বিতীয়বার জানাযার নামায

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তির ইন্তিকালের সময় তার দুই ছেলের মাঝে বড় ছেলে বাড়ি ছিল না। এদিকে কাফন-দাফনে বিলম্ব হওয়াতে আগত লোকজন বিরক্ত হয়ে ছোট ছেলেকে তাড়াতাড়ি জানাযার কাজ সমাধা করতে বলায় সে জনৈক আলিম সাহেবের মাধ্যমে তার পিতার জানাযার নামাযের কাজ সম্পন্ন করে। এরপর বড় ছেলে পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে বাড়ি আসে। এখন সে দ্বিতীয়বার তার পিতার জানাযার নামায পড়তে পারবে কি-না?

জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে ছোট ছেলের অন্য আলিম দ্বারা একবার জানাযায় নামায পড়ানোর পর, দ্বিতীয় বার অন্য ছেলে আর তার পিতার জানাযার নামায পড়তে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, কারো ইন্তিকালের পর তার কাফন-দাফন ও জানাযার যাবতীয় কাজ যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করাই শরী'আতের বিধান। কারো জন্য বিলম্ব করা মারাত্মক অন্যায় ও গোনাহের কাজ। হাদীসে শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

[প্রমাণঃ হিদায়াহ ১:১৮০# আল ফাতাওয়াল হিনাদিয়্যাহ ১:১৬৪# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২০৭# ফাতাওয়া শামী ২:২৩২# আল দুররুল মুখতার ২:২২৩]

জানাযার নামায পড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ ও ২য় বার জানাযার নামায

জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামায পড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়িয হবে কি-না? মৃত ব্যক্তির জানাযায় নামায একাধিকবার পড়া বা পড়ানো যায় কি-না?

জবাবঃ জানাযা নামাযের বিনিমিয় বা হাদিয়াম গ্রহণ জায়িয নয়।

{পৃষ্ঠা-৪২২}

কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা যদি তার অভিভাবক ব্যতীত অন্যেরা পড়ে নেয় এবং এ জানাযা পড়া যদি অভিভাবকের বিনা অনুমতিতে হয়, তবে স্বয়ং অভিভাবক ইচ্ছা করলে দ্বিতীয়বার মৃতের জানাযা পড়তে পারেন। কিন্তু প্রথম জানাযায় যারা শরীক হয়েছে, তাদের জন্য দ্বিতীয়বার শরীক হওয়া জায়িয নয়।

তবে দ্বিতীয় বার জানাযা পড়া ওয়াজিব নয়, বরং প্রথম বার জানাযা পড়ার দ্বারা জানাযার ওয়াজিব আদায় হয়ে গিয়েছে।

এখানে জ্ঞাতব্য যে, যদি কোন ব্যক্তির একই শ্রেণীর একাধিক অভিভাবক থাকে, যেমন- মৃত ব্যক্তির কয়েকজন বালেগ ছেলে আছে। এমতাবস্থায় তাদের থেকে যদি কোন একজন একবার নামায পড়ে ফেলে, অথবা অন্যকে পড়ার অনুমতি প্রদান করে, চাই মাসআলা জেনে হোক, বা না জেনে হোক তবে অন্য অভিভাবকরা দ্বিতীয়বার নামাযে জানাযা পড়তে পারে না। কেননা দ্বিতীয় বার পড়ার দ্বারা তা নফলের মধ্যে গন্য হয়। আর জানাযার নামায নফল হিসাবে বৈধ নয়।

[প্রমাণঃ তাহতাবী ৩২৪]

আত্মহত্যাকারীর জানাযার নামায ও তার পরিণাম

জিজ্ঞাসাঃ কোন মুসলমান যদি কীটনাশক ঔষধ পান করে অথবা গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে তার জানাযা পড়া যাবে কি? এবং এর পরিণতিতে তাকে কিরুপ শাস্তি ভোগ করতে হবে?

জবাবঃ আত্মহত্যা মহাপাপ- এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে ইসলামী শরী'আতে সকল মুসলমানের জানাযা পড়ার নির্দেশ রয়েছে। তাই এমন ব্যক্তিরও জানাযা পড়তে হবে। তবে সমাজের বরেণ্য ও অনুসরণীয়

আলিমগণ মানুষকে এ অন্যায়ের জঘন্যতা বুঝানোর জন্য এরুপ ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা থেকে যদি বিরত থাকেন, তাহলে এরও অবকাশ আছে। তবে তার আত্মীয়-স্বজন ও সাধারণ লোকেরা অবশ্যই তার জানাযার নামাযের ব্যবস্থা করবে। জানাযার নামায না পড়ে দাফন করবে না।
আর আত্মহত্যার শাস্তির ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- "যে ব্যক্তি যেভাবে আত্মহত্যা করবে, সে সেভাবেই জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।" উদাহরণ স্বরুপ বলা যায়, যে ব্যক্তি কীটনাশক ঔষধ পান করে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামেও তাই পান করতে থাকবে এবং উক্ত কীটনাশক পান করার দরুন যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকবে। অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে- "আত্মহত্যাকারী চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। অথাৎ তার শাস্তি খুব কঠিন ও দীর্ঘায়িত হবে।
[প্রমাণঃ আদু-দুররুল মুখতার ২:২১১# ফাতাওয়া শামী ২:২১১# মিশকাত শরীফ ৫২-৫৪]
{পৃষ্ঠা–৪২৩}
জানাযার সময় "লোকটি কেমন ছিল" জিজ্ঞেস করা
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের দেশের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, জানাযা শেষে মুর্দাকে সামনে নিয়ে কোন এক লোক জিজ্ঞাসা করতে থাকে- "লোকটা কেমন ছিল?" উপস্থিত লোকেরা বলে– "ভাল ছিল।" এভাবে তিনবার করা হয়ে থাকে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এরুপ জায়িয কি-না?
জবাবঃ যদি তাদের এ বিশ্বাস থাকে যে, সবাই লোকটাকে ভাল বললে, সে ভাল হয়ে জান্নাতী হয়ে যাবে যদিও প্রকৃতপক্ষে সে খারাপ হোক না কেন। তাহলে জানাযা সামনে নিয়ে এরুপ বলা ঠিক হবে না। কারণ, এ ধারণা ভ্রান্ত। বর্তমানে আমাদের দেশে এটা একটা প্রথা হিসাবে চালু হয়ে গেছে এবং তাদের ধারণাও হয়ে গেছে যে, সবাই ভাল বললে, সে লোকটি আল্লাহের দরবারে ভাল হয়ে যাবে এবং জান্নাতী হবে। তাদের এ ধারণার শরী'আতে কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং এরুপ প্রথা বানিয়ে নেয়া বিদ'আত হবে। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ- একেতো এরুপ আমল কোন সাহাবী থেকে ছাবিত নেই। দ্বিতীয়ঃ যদিও সে লোক ভাল না, তবুও মৃত ব্যক্তির খাতিরে তথা লজ্জার খাতিরে তাকে খামাখা উপস্থিতদের ভাল বলতেই হয়। তাই এভাবে জবরদস্তি ভাল হওয়ার সাক্ষ্য আদায়ের মধ্যে কি ফায়দা থাকতে পারে? হাদীসের মধ্যে যে এসেছে, কোন মুর্দার ব্যাপারে চল্লিশজন মু'মিন মুসলমান ভাল হওয়ার সাক্ষ্য দিলে, বা মুর্দার প্রশংসা করলে, তাদের সুধারণা অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা মুর্দাকে মাফ করে দেন' (মিশকাত শরীফ-১৪৫) এর দ্বারা উদ্দেশ্য কোন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তি মারা গেলে সমস্ত নেক লোকেরা তার বিরহের বেদনায় অন্তর থেকে প্রশংসা ও দু'আ করে থাকে এবং তাকে ভাল বলে সাক্ষ্য দেয়। আর নেক লোকদের ভাল বলার ফলে তার যদি দু–চারটা গুনাহ থাকেও আল্লাহ সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন।
জানাযার নামাযে মুক্তাদির জন্য দু'আ-দরুদ পড়া
জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামাযে তাকবীর সহ নির্ধারিত দু'আ–দরুদ পড়া সকলের জন্যই কি জরুরী। না দু'আ–দরুদ ব্যতীত তাকবীর জরুরী? জানাযার নামাযের শেষে প্রথম সালামের সাথে ডান হাত এবং পরে বাম হাত ছাড়তে হয়, না কি সালাম শেষে উভয় হাত ছাড়তে হহয়?
জবাবঃ জানাযার নামাযের মধ্যে তাকবীর সমূহ পড়া সকলের জন্যই ফরজ এবং দু'আ সমূহ পড়া সুন্নাত। জানাযার নামাযের হাত কখন ছাড়তে হবে এ ব্যাপারে ফিকহের কিতাব তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়।
(১) ৪র্থ তাকবীর বলার পরেই উভয় হাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর সালাম ফিরাবে।
(২) উভয় দিকে সালাম ফিরানোর পর উভয় হাত ছাড়বে।

(৩)ডান
{পৃষ্ঠা-৪২৪}
দিকে সালাম ফিরানোর পর ডান হাত আর বাম দিকে সালাম ফিরানোর পর বাম হাত ছাড়বে। অতএব, তিন তরীকাই জায়িয আছে। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতির উপর অধিকাংশ উলামা ও বুজুর্গগণ আমল করে থাকেন। [প্রমাণঃ সিয়ায়া ২:১৫৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৩২৯]
জানাযার নামাযে মাসবুক হলে
জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি নামাযে জানাযার প্রথম তাকবীর অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় তাকবীর না পায়, তাহলে তার করণীয় কি? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।
জবাবঃ যদি কেউ জানাযার নামাযের ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় তাকবীর বলার পর শরীক হয়, তাহলে সে ইমামের সালাম ফেরানোর সময় কেবল বাকী দুই তাকবীর বলবে। অন্য কোন দু'আ পড়বে না। বরং দুই তাকবীর বলেই সালাম ফিরাবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২;২১৭# ফাতাওয়া দারুল উলূম৫:৩১৫]
জানাযার নামাযের জন্য মাইকিং করা
জিজ্ঞাসাঃ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ার জন্য মাইকে গ্রামের চতুর্দিকে ঘোষণা করা জায়িয কি-না?
জবাবঃ মুসলমান মৃত ব্যক্তির জানাযায় নামাযে শরীক হওয়া আত্মীয়-স্বজন ও মহল্লাহবাসীর জন্য জরুরী কাজ। আর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা কেবল অবগত হলেই সম্ভব। তাই সীমার ভিতরে থেকে মাইকে জানাযার নামাযের ঘোষণা করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে নাম-ধামের উদ্দেশ্যে অথবা পাড়ায় পাড়ায় বা অলি-গলিতে ক্যানভাস করে বেড়ানো পছন্দনীয় নয়।
জানাযার নামাযে তাকবীর
জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামাযে ইমাম সাহেব ভুলবশতঃ পাঁচ তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করেন এবং এ অবস্থায়ই মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা হয়। উক্ত জানাযার নামায সহীহ হয়েছে কি? যদি তা সহীহ না হয়ে থাকে, তাহলে এ মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি?
জবাবঃ জানাযার নামাযে যদি ইমাম সাহেব পাঁচ তাকবীর বলে থাকেন, তাহলে এর দ্বারা নামায ফাসিদ হবে না। বরং নামায আদায় হয়ে গেছে। সুতরাং উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে না। [প্রমাণঃ তাহতাবী ৪৮৩# হিদায়া ১:১৮০# ফাতহুল কাদীর ২:৮৭# ফাতাওয়া আলমগীরী ২:৩৬৭]
জানাযার নামাযে বেজোড় কাতার
জিজ্ঞাসাঃ আজ কাল প্রায়ই জানাযার নামাযের কাতার নিয়ে এক প্রকার বিতর্কে লিপ্ত হতে দেখা যায়। কেহ বলে, নামাযের কাতার ইমাম সাহেবকে নিয়ে বেজোড় হবে, আবার কেহ বল ইমাম সাহেব ব্যতীত বেজোড় হবে। তার শরয়ী সমাধান কী?
{পৃষ্ঠা-৪২৫}
জবাবঃ জানাযার নামাযের কাতার ইমাম ব্যতীত বেজোড় হবে। কেননা ইমাম সাহেব কোন কাতারের অন্তর্ভূক্ত নন। সুতরাং যারা বলেছেন ইমাম ব্যতীত বেজোড় হবে তাদের কথাই ঠিক। [প্রমাণঃ মিশকাত ১৪৭ পৃঃ ১:৫৬৮]
মৃত অবস্থায় জন্ম বা জন্মের পর মৃত্যুতে জানাযা ও দাফন-কাফন

জিজ্ঞাসাঃ দু'জন জমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, তন্মধ্যে একজন মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছে, অপরজন ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'ঘন্টা পরে মারা যায়। তাদের উভয়কে জানাযা না পড়িয়ে এক কাপড়ে একত্রে দক্ষিণ দিকে মাথা দিয়ে দাফন করা হয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এতে কোন ক্ষতি আছে কি-না?

জবাবঃ মাতৃগর্ভ হতে মৃত অবস্থায় কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে, তার জানাযার নামায পড়তে হয় না। বরং একটা কাপড়ে পেঁচিয়ে মানুষ হিসেবে তার সম্মান রক্ষা করে তাকে দাফন করে রাখবে। অবশ্য তাকে গোসল দিয়ে নেয়া উত্তম। পক্ষান্তরে কোন নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর নড়াচড়া বা শব্দ করলে, বুঝতে হবে- সে জীবিত। এর পরক্ষণেই যদি সে মারা যায়, তবে তার একটি সুন্দর মুসলমানী নাম রাখতে হবে এবং গোসল দিয়ে পুত্র হলে, একটি চাদর ও একটি ইযার অথবা কমপক্ষে একটি চাদর; আর কন্যা হলে, গোসল দিয়ে কমপক্ষে দু'টি কাপড়ে কাফন দিয়ে জানাযার নামায পড়ে উত্তর দিকে মাথা দিয়ে সম্পূর্ণ ডান কাতে বুক ও মুখ কিবলার দিকে করে দাফন করতে হবে।

উপরোক্ত মাসআলার ভিত্তিতে শরী'আতের ফয়সালা এই যে, প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যা করা হয়েছে, তা শরী'আতের হুকুমের বিপরীত হয়েছ। এটা মূর্খতা বৈ কিছু নয়। আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা না করে যারা এরুপ করেছে, তাদের তাওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:১৮১# ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১:১৫৯# বাদায়িউস সানায়ি ১:৩০৭]

জানাযার উৎপত্তি

জিজ্ঞাসাঃ মূল জানাযার উৎপত্তি কখন থেকে? ইসলামে জানাযার নামায কখন থেকে শুরু হয়?

জবাবঃ জানাযার নামাযের উৎপত্তি আদম (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছে। ইসলামের মধ্যে নবুওতের দশ বছর পর হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযিঃ)–এর ইন্তিকালের পর থেকে শুরু হয়েছে।

[প্রমাণঃ আল-বিদায়া ওয়ান নিহারা ১০:৯১# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:৪৩১]

দাফনের পর লাশ স্থানান্তর

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় কবরস্থানে কোন মুর্দা দাফন করলে ২/১ বৎসর পর কবরস্থানের সব কবর নষ্ট করে সেই স্থানে নতুন মুর্দা দাফন করা হয়।

কবরের চিহ্ন না থাকায় কবরের কাছে দাঁড়িয়ে যিয়ারত করা যায় না। এমতাবস্থায় সেই কবরস্থান থেকে কবর অন্য কোন স্থানে স্থানান্তর করা যায় কি না? যাতে মুর্দার সন্তানরা সব সময় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে জিয়ারত করতে পারে।

{পৃষ্ঠা–৪২৬}

জবাবঃ মৃত ব্যক্তির কোন স্থানে বা গোরস্থানে দাফন করার পর সেই লাশকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নিষেধ। সুতরাং বর্ণিত উযরের কারণে কবর অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যাবে না। তাছাড়া কবর যিয়ারত করার জন্য কবরের চিহ্ন থাকাও কোন জরুরী নয়।

অবশ্য অন্যের জমি জবর দখল করে দাফন করে থাকলে এবং সেই জমির মালিক আপত্তি জানালে লাশ স্থানান্তরিত করা জায়িয আছে। এ ধরণের উযর ছাড়া লাশ স্থানান্তরিত করা নাজায়িয। [আলমগীরী ১;১৬৭]

উল্লেখ্য, দাফনের পর লাশ মাটি দেওয়ার আগে বিনা উযরে এ কবর সমান করে অন্যকে দাফন করার কাজে ব্যবহার না করা চাই।

কাদিয়ানীর জানাযা পড়া

জিজ্ঞাসাঃ কোন কাদিয়ানীর জানাযার নামায পড়া কোন মুসলমানের জন্য জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ সারা পৃথিবীর আলেম, মুফতী, মুসলিম বুদ্ধিজীবি ও অধিকাংশ মুসলিম দেশের ইসলামী আদালতের রায় এই যে, খতমে নবুওয়াত বা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম শেষ নবী একথা অমান্য করার দরুণ কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফির। আর কোন কাফিরের জানাযা পড়া মুসলমানের জন্য জায়িয নয়। সুতরাং কোন মুসলমানের জন্য কাদিয়ানীর জানাযায় নামাযে অংশগ্রহণ করাও জায়িয হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৫:৩০৭]

জানাযার নামাযে রুকু সিজদা না থাকা

জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামাযে রুকু, সিজদা, বৈঠক নেই কেন?

জবাবঃ জানাযা নামায মূলতঃ মৃত ব্যক্তির আত্মার মাগফিরাত কামনার জন্য দু'আ বিশেষ। আর সে দু'আ নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম আমাদের এ পদ্ধতিতেই শিক্ষা দান করেছেন। অর্থাৎ উক্ত দু'আর মধ্যে রুকু-সিজদা থাকবে না। আর একারণেই জানাযার পর মুর্দাকে সামনে রেখে অতিরিক্ত দু'আ বা মুনাজাতের বিধান নেই। সার কথা, নবী সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এ ভাবেই মুর্দার জন্য দু'আ শিখিয়েছেন। এটাই আসল। এর পর আমাদের জন্য কোন কারণ খোঁজার দরকার নেই। [প্রমাণঃ আল-বাহরুর রায়িক ২:১৮৩# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৬৪৩ বাদায়িউস সানায়ি ১:৩১৪]

মুসলমান কাফিরের মধ্যে পার্থক্য না করা গেলে জানাযার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ দু'জন লোক মারা গেলে তম্মধ্যে একজন মুসলমান অপরজন কাফির ছিল। কিন্তু দুর্ঘটনার কারণে এখন পার্থক্য করা যাচ্ছে না কে মুসলমান, কে কাফির? এখন মুসলমান ব্যক্তির জানাযা কিভাবে পড়া হবে?

{পৃষ্ঠা–৪২৭}

জবাবঃ চেহারায় দাড়ী বা খাতনা দ্বারা যদি মুসলমান হওয়া বুঝা না যায় তাহলে এমন পরিস্থিতিতে, উভয় ব্যক্তিকে গোসল দিয়ে এবং কাফন পরিয়ে এক সাথে সামনে রেখে শুধু মুসলমান ব্যক্তির নিয়্যতে জানাযার নামায পড়তে হবে। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৩০৭]

মৃত ব্যক্তির চোখে বা মুখে সুরমা লাগানো

জিজ্ঞাসাঃ অনেক দেখা যায়, মেয়েলোক মারা গেলে, তাদের চোখে বা কপালে সুরমা লাগিয়ে দেয়া হয় এবং সুরমা দিয়ে যোগ চিহ্ন দেয়া হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

জবাবঃ মৃত ব্যক্তির চোখে সুরমা লাগানো বা কপালে সুরমা দিয়ে যোগ চিহ্ন দেয়া কোনাটাই প্রমাণিত নয়। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। তবে মৃত ব্যক্তি চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, উভয়ের চুলে বা দাড়িতে এবং নামাযের মধ্যে যে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়, যেমন- নাক, কপাল, হাটু ইত্যাদিতে কর্পূর লাগানোর হুকুম রয়েছে। সুরমা ইত্যাদি লাগানোর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই সুরমা লাগানো বা যোগ চিহ্ন দেয়া ঠিক হবে না। [প্রমাণঃ হিদায়া ১:১৭৯# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:২৪৮]

ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে জানাযার নামায পড়া

জিজ্ঞাসাঃ ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হওয়ার পর জানাযার নামায ওয়াক্তিয়া নামাযের পূর্বে পড়া ঠিক হবে কি-না? আর জানাযার নামাযের পর সকল মুসল্লীগণকে নিয়ে ইমাম সাহেব দু'আ করতে পারেন কি-না?

জবাবঃ ফরয নামাযের আগেও জানাযার নামায পড়া জায়িয আছে। তাবে উত্তম হল যদি ওয়াক্তিয়া নামাযের সময় হয়ে যায় এবং জানাযাও উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে ওয়াক্তিয়া ফরয-সুন্নাত পড়ার পর জানাযার নামায আদায় করবে। তবে ওয়াক্তিয়া নামাযের খুব বেশী পূর্বে জানাযা আসলে, সেক্ষেত্রে বিলম্ব করা অনুচিত।

[প্রমাণঃ ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৭৩৬]

উল্লেখ থাকে যে, জানাযার নামাযই প্রকৃত দু'আ। সুতরাং, জানাযার নামাযের পর একত্রে হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করার আবশ্যকতা নেই এবং শরী'আতেও এরুপ কোন নিয়ম নেই। তাই এ অবস্থায় হাত তুলে সম্মিলিত দু'আ করা বিদ'আত হবে।

তবে প্রত্যেকে একা হাত উঠানো ব্যতীত দু'আ করতে পারে। বরং তা সাওয়াবের কাজ।

[প্রমাণঃ হাশিয়া মিশকাত ১:১৪৭# খাইরুল ফাতাওয়া ৫৮৮# ইমদাদুল মুফতীন ৪৪৪]

হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর নামাযের ইমামতি কে করেছিলেন?

জবাবঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর জানাযার নামাযের কেউ ইমামতি করেননি। অন্যদের জানাযার ন্যায় নির্ধারিত তরীকা মত জানাযাও

{পৃষ্ঠা–৪২৮}

হয়নি, বরং সাহাবা (রাযিঃ) গণের এক এক দল হযরত আয়িশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) এর ঘরে ঢুকে হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কে সামনে রেখে তাঁর জানাযার নিকটবর্তী হয়ে পৃথক পৃথক ভাবে জানাযার নামায পড়েছিলেন।

[প্রমাণঃ সীরাতে মুস্তফা ৩:১৮৭# আল বিদায়া ওয়ান নিহারা ৫:২৩২]

পিতা-মাতা একজন মুসলমান ও একজন কাফির হলে সন্তানের জানাযা

জিজ্ঞাসাঃ পিতা-মাতার একজন যদি মুসলমান হয় এবং অন্যজন যদি অমুসলিম থেকে যায়, তবে তাদের ঔরশের সন্তান মারা গেলে, তার জানাযা পড়া হবে কি-না?

জবাবঃ পিতা-মাতার কোন একজন মুসলমান হলে, নাবালক সন্তানকে মুসলমান গন্য করে তার জানাযার নামায পড়তে হবে এবং মুসলমানদের গোরস্থানে তাকে দাফন করতে হবে।

[প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার ৩:১৯৬]

জানাযার নামায পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ

জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামায পড়ে অথবা পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা অথবা এর বিনিময় প্রদান করা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ জানাযার নামায পড়ে অথবা পড়িয়ে বিনিময় গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়, বরং এটা হারাম এবং বিনিময় প্রদান করাও জায়িয নয়।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৩৬৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৩৩৪]

কাফন-দাফন

মসজিদের পার্শ্বে দাফন করা

জিজ্ঞাসাঃ মসজিদের পার্শ্বে দাফন করা উত্তম না কবরস্থানে? জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ মুসলিম মাইয়্যিতদের ওয়াকফকৃত গোরস্থানে দাফন করাই উত্তম। কারণ, কবরের কিছু হক এমন আছে, যা গোরস্থানে সহজে আদায় হয়। যদি কেউ ব্যক্তিগতভাবে অন্য কোথাও নিজের বা পরিবারের কবরের জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রেখে থাকে, তাহলে এটাও জায়িয আছে। চাই সে জায়গা মসজিদের পার্শ্বেই হোক বা দূরে হোক। তবে মসজিদের ওয়াকফকৃত স্থানে (চাই মসজিদের পার্শ্বে নিজস্ব জমিনের বা জমি ক্রয় করে অথবা অন্য কারো জমিতে মালিকের অনুমতি সাপেক্ষে কবর দেয়াও উত্তম। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৫# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৪০৭-৪০৭]

{পৃষ্ঠা–৪২৯}

মাইয়্যিতের মুখ দেখা
জিজ্ঞাসাঃ মাইয়্যিতকে কবরে রাখার পর মুখ দেখা জায়িয আছে কি-না?
জবাবঃ জানাযার নামায পড়ার পর থেকে আর মাইয়্যিতের চেহারা দেখানো উচিত নয়। হ্যাঁ, জানাযার নামায পড়ার আগে পর্যন্ত চেহারা দেখাতে পারে। তবে চেহারা দেখানোর জন্য মাইয়্যিতের কাফন-দাফনে দেরী করা জায়িয নয়। গোসল-কাফন ইত্যাদির প্রস্তুতির ফাঁকে চেহারা দেখিয়ে দিতে পারে। এর জন্য আলাদাভাবে সময় দেয়া অনুচিত। আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ, মাইয়্যিতকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় দাফন করা-এ ব্যাপারে অলসতা করা, দেরী করা নিষেধ এবং গুনাহের কাজ। আজকাল চেহারা দেখানোর জন্য কিংবা জুমু'আ বা কোন ফরয নামাযের পর বেশী লোক হবে-এ আশায় জানাযার নামাযে দেরী করা হয়, এটা ঠিক নয়। বরং এর আগে গোসল, কাফন ও কবর খনন হয়ে থাকলে, অল্প লোক হলেও জানাযার নামায পড়ে দাফন সেরে ফেলবে। তেমনিভাবে অনেক মাইয়্যিতকে গ্রামের বাড়ীতে নেয়ার জন্য বা তারা কোন আত্মীয়ের আগমনের জন্য দাফন করতে দেরী করে। এই সবই গুনাহের কাজ। আর খবরদার! দুনিয়াতে যার থেকে যাদের পর্দা করা জরুরী, মৃত্যুর পরেও তাদেরকে তার চেহারা দেখানো যাবে না।
[প্রমাণ শামী ২:২৩১# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ২:৩৯৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:৪০৬ পৃঃ]
মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পদ্ধতি
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সময় তার পা পশ্চিম দিকে করে রাখা হয়। এটা শরী'আত সম্মত কি-না?
জবাবঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি হচ্ছে- মাথা উত্তর দিকে করে শুইয়ে দিতে হবে, যাতে তার চেহারা কিবলামুখী হয়ে থাকে। তবে যদি কোন অসুবিধা থাকে, তাহলে অন্য কোনভাবে মৃত ব্যক্তিকে শুইয়ে দিলেও চলবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ১:১৭৮# ফাতহুল কাদীর ২:৭০]
খাটিয়া নেওয়ার তরীকা
জিজ্ঞাসাঃ জানাযার নামায পড়ার পর লাশের খাটিয়া কবরস্থানে নেয়ার সুন্নাত তরীকা কি?
জবাবঃ জানাযা নেয়ার সুন্নাত তরীকা হলঃ
মাইয়্যিত যদি দুধের বাচ্চা বা তার চেয়ে কিছু বড় হয়, তাহলে তাকে হাতে হাতে অর্থাৎ একজন তাকে নিজের উভয় হাতে উঠাবে। অতঃপর তার থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিবে। তারপরে তৃতীয় ব্যক্তি। এমনিভাবে ধারাবহিকভাবে একের পর এক নিবে।
{পৃষ্ঠা-৪৩০}
আর যদি মাইয়্যিত বয়স্ক হয়, চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তাকে কোন চারপায়ী বিশিষ্ট খাটের উপর করে নিয়ে যাবে। চার বা ততোধিক ব্যক্তি চারপায়া হাত দ্বারা উঠিয়ে কাঁধের উপর করে নিয়ে যাবে, মাইয়্যিতকে খাটে উঠানো ব্যতীত মাল-আসবাবের মতো ঘাড়ের উপর লওয়া বা পিঠের উপর লওয়া মাকরুহ। এমনিভাবে উজর ব্যতীত কোন গাড়ী বা জানোয়ারের উপর করে নেয়াও মাকরুহ। আর যদি উজর হয়, তাহলে মাকরুহ হবে না। যেমনঃ কবরস্থান অনেক দূরে হলে।
জানাযা নেয়ার মুস্তাহাব তরীকা হলঃ প্রথমে মাইয়্যিতের ডান পার্শ্বের সম্মুখের পায়া নিজের ডান কাঁধের উপর রেখে কমপক্ষে দশ কদম হাটবে, তারপরে পিছনের ডান পার্শ্বের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম হাটবে, অতঃপর

মাইয়্যিতের বাম দিকের সম্মুখের পায়া নিজের বাম কাঁধের উপর রেখে দশ কদম চলবে। তারপর মাইয়্যিতের বাম পার্শ্বের পিছনের পায়া নিজের বাম কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। তাহলে চার পায়া কাঁধে নিয়ে মোট ৪০ কদম চলা হবে হাদীস শরীফে জানাযার কমপক্ষে ৪০ কদম কাঁধে করে নিয়ে যাওয়ার অসংখ্য ফযীলতের কথা বলা হয়েছে। খাট বহন করার সময় লোকেরা সাধারণতঃ কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে থাকে। এটা প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা পরিত্যাজ্য।

[প্রমাণঃ রদ্দুর মুহতার ২:২৩১ # হিদায়া ১:১৮২# আহকামে মাইয়্যিত ৬০-৬১]

মহিলাদের কবর থেকে দূরে থাকা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব স্বীয় স্ত্রীদের নিয়ে মসজিদ সংলগ্ন এক কুঠুরীতে বসবাস করেন। উল্লেখ্য যে, উক্ত কুঠুরীর সন্নিকটে একটি কবরস্থান আছে। জনগণ বলে থাকেন যে, মহিলাগণ কবরস্থান থেকে ৪০ গজ দূরে থাকবে। উক্ত সমস্যায় জনগণ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ইসলামের দৃষ্টিতে এর কি হুকুম?

জবাবঃ "মহিলাদের জন্য কবরস্থান থেকে ৪০ গজ দূরে থাকতে হবে"-এমন কোন কথা শরী'আতে নেই। কাজেই কবরস্থানের পার্শ্বেই ইমামের হুজরাহ থাকলে সেখানে তিনি স্ত্রী সহকারে থাকতে পারবেন। কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৮]

হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর দাফনে বিলম্ব

জিজ্ঞাসাঃ হাদীস শরীফে আছে মানুষ ইন্তিকালের পরে বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি দাফন করবে। কিন্তু শুনা যায় হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –কে তিনদিন পর দাফন করা হয়েছে। এর কারণ কি?

জবাবঃ হ্যাঁ, মাসআলা সহীহ। কোন মানুষের ইন্তিকালের পর যত শীঘ্র তার দাফনের ব্যবস্থা করা তার অভিভাবকদের জন্য জরুরী এবং এটাই

{পৃষ্ঠা–৪৩১}

শরী'আতের বিধান। আমাদের দেশে বিভিন্ন কারণে দাফনে বিলম্ব করা হয় যা শরী'আতে মাকরুহে তাহরীমী ও নাজায়িয, যেমন– তার চেহারা দেখানোর জন্য কয়েক ঘন্টা দেরী করা হয়। তার ছেলে বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন দূর-দূরান্ত থেকে পৌঁছার জন্য দেরী করা হয়। কখনও কয়েক ঘন্টা পরে জুমু'আ বা কোন জামা'আতের পর অধিক লোক জানাযার জামা'আতে শরীক হতে পারবে এ আশায় দেরী করা হয়, অথচ ঐ ওয়াক্তের পূর্বেই দাফন কার্য সহজেই শেষ করা সম্ভব ছিল। আবার কখনো মাইয়্যিতের লাশ এক দেশ থেকে বা শহর থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করতে গিয়ে দাফনে বিলম্ব হয় অথচ এসব সুরতে দাফনে বিলম্ব করা শরী'আতে নিষেধ।

হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর দাফনে দেরী হওয়ার কারণঃ

সোমাবার দুপুর বেলা হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইন্তিকাল করেন। অধিকাংশের মতে মঙ্গবার দিবাগত রাত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর দেহ মুবারক সমাহিত করা হয়। কেউ মঙ্গবার আবার কেউ বুধবার এর কথা উল্লেখ করেছে। মূলত এ দেরী ওফাত নিশ্চিত এবং নামাযে জানাযার জন্য হয়েছে, আর এ জরুরতে যতটুকু সময় লাগে তাতো দিতেই হবে। খামাখা দাফনে কোন বিলম্ব হয়নি, যা বিলম্ব হয়েছে দীর্ঘক্ষণ ব্যাপী লোকদের জানাযার নামায পড়ার জন্যই হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম দীর্ঘ ২৩ বৎসর যে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও উত্তম আদর্শের নজীর স্থাপন করে গেছেন, তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য খলীফা নিযুক্ত করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কাজটি সমাধার জন্য হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এর

ন্যায় বড় বড় সাহাবীগণ খলীফা নির্বাচনে ব্যস্ত থাকায় হযরত আলী (রাযিঃ) প্রমুখগণ গোসল, কাফন ইত্যাদি আনজাম দেন তবে দাফনে দেরী হয় এ কারণে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন একথা প্রথমে অনেকেরই বিশ্বাস হয়নি। হুযূরের সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইন্তিকালের ব্যাপারে সকলের বিশ্বাস হতেও অনেক বিলম্ব হয়েছে। এমনকি হযরত উমর (রাযিঃ) একথা ঘোষণাই করেছিলেন, যে ব্যক্তি বলবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন তাকে তলোয়ার দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।। দ্বিতীয় কারণ হলো, হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর জানাযার নামায পড়তে অনেক সময় ব্যয় হয়েছে। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর জানাযায় কেউ ইমাম হয়ে নামায পড়েন নি। বরং দু'চার জন করে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) –এর হুযূরায ঢুকেছেন এবং সকলেই একা একা নামায পড়েছেন। হাজার হাজার সাহাবীর (রাযিঃ) এভাবে অল্প জায়গায় নামায

{পৃষ্ঠা–৪৩২}

পড়তে অনেক সময় লেগেছে। এ সকল কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম –এর দাফন কাজে বিলম্ব হয়েছে। সুতরাং এর উপর অন্য কাউকে তুলনা করা সহীহ হবে না।

বর্তমানে লাশ দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তর করা এবং জানাযা ও দাফনে ২/১ দিন দেরী হওয়া রেওয়াজে পরিণত হয়ে গেছে, এমনকি অনেক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তিদের সাথে তার আত্মীয়–স্বজনগণ এরুপ আচরণ শুরু করেছে। এহেন মুহূর্তে এ বদ রসমকে বন্ধ করার জন্য তৎপর হওয়া এবং ওসীয়তনামা লিখে যাওয়া উচিত। [প্রমাণঃ আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ৫;২৬০# জুরকানী শরহে মুয়াত্তা ২:১৬# আসাহহুল সিয়ার ৫৪৪ # সীরাতে মুস্তফা ৩:১৮৭-১৮৯]

কবরে স্মৃতিফলক স্থাপন

জিজ্ঞাসাঃ কবরের শিয়রে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা জায়িয কিনা? তাতে কুরআনের আয়াত লিখে দিলে, মৃত ব্যক্তির রুহের ফায়দা হবে কিনা?

জবাবঃ কবরের শিয়রে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা কেবল এ উদ্দেশে জায়িয আছে যে, উক্ত কবর যাতে নিঃশ্চিহ্ন হয়ে না যায় এবং পদদলিত না হয়। তাই এ ক্ষেত্রেও শুধু নাম-ঠিকানা লিখার অনুমতি আছে। আর যদি এরুপ আশংকা না থাকে, তাহলে স্মৃতি ফলক স্থাপন করা জায়িয হবে না। কারণ- সেক্ষেত্রে এটা অপচয় বলে গণ্য হবে। স্মৃতি ফলকের উপর কোন আয়াত লিখে দিলে আয়াতের বেহুরমতীর আশংকা প্রবল তাই তা মাকরুহ হবে এবং তা করার দ্বারা মৃত ব্যক্তির কোন ফায়দা হওয়ার কথা কুরআন–হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৩৭# খাইরুল ফাতাওয়া ৬:৫৫০]

পূর্ব-পশ্চিম লম্বিত ভাবে কবর পাকা করা

জিজ্ঞাসাঃ মৌলভী বাজার জেলার, কুলাউড়া থানাধীন ১নং বরমকালি ইউনিয়নের শাহখালা (রহঃ) এর মোকামের খাদেম "রাজাশাহ" স্বপ্নে দেখেছেন, গুজাশাহ নামে জনৈক মৃত ব্যক্তি উনাকে, ঘুমের মাঝে বলছেন যে, "তুমি আমার কবরটি পূর্ব পশ্চিমে লম্বিতভাবে পাকা কর। বর্তমানে ঐ খাদেম কবরের বুকের উপর তিনটি সিঁড়ি দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে একটি পাকা মাজার রচনা করেছেন। বাংলাদেশীদের পক্ষে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে কবর করার বৈধতা আমাদের শরী'আতে আছে কি?

জবাবঃ কিবলার দিকে বুক ও মুখ করে ডান কাতে মৃতকে রাখা মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি, যা শরী'আত কর্তৃক নির্দেশিত। বাংলাদেশে কিবলা যেহেতু পশ্চিম দিকে, তাই মৃতকে কিবলামুখী করতে হলে তার জন্য জরুরী

{পৃষ্ঠা–৪৩৩}

হল– কবর উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বা করা। সুতরাং কেউ যদি পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা করে কবর দেয়, তাহলে তা শরী'আত পরিপন্থি এবং মহানবীর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম এর বিরুদ্ধাচারণ বলে গণ্য হবে। এটা তার গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হওয়ার নিদর্শন। তাছাড়া কবর পাকা করাও শরী'আতে নিষেধ। মুসলিম সমাজে এরূপ নিকৃষ্ট কাজে সাধ্যানুযায়ী বাধা প্রদান ও প্রতিহত করতে হবে। [প্রমাণঃ হিদায়াঃ ১ : ১৭৮ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ৭১২]

দাফন করার সুন্নাত তরীকা

জিজ্ঞাসাঃ মুর্দা ব্যক্তিকে কবরে দাফন করার সুন্নাত তরীকা কি ?

জবাবঃ মাইয়্যিতকে কবরে দাফন করার সুন্নাত তরীকা হল– কিবলার দিক থেকে মাইয়্যিতকে কবরে দাফন করার জন্য নামাবে। অতঃপর সরাসরি ডান কাতে শোয়াবে । যাতে করে সীনা ও চেহারা কিবলার দিকে থাকে। এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। যেমনভাবে জীবিত ব্যক্তি সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী ঘুমায়। এর জন্য (১) কবর পশ্চিম দিকে বেশী ঢালু করে দিবে, (২) অথবা মুর্দারের পিঠের দিকে মাটির আইলের মত করে মাথার নীচেও কিছু মাটি দিবে, (৩) মাইয়্যিতের কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত লম্বালম্বি এক বিঘত গর্ত করে তার মধ্যে ডান কাতে মুর্দাকে শোয়ায়ে দিবে। এ তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতি গ্রহণ করলে, সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী শোয়ানো হবে। উল্লেখ্য আমাদের দেশে মুর্দাকে সাধারণত চিত করে শোয়ায়ে চেহারা ঘুড়িয়ে কিবলামুখী করতে চেষ্টা করা হয় । এটা ভুল তরীকা । এর দ্বারা সুন্নাত আদায় হয় না । কারণ– সীনা কিবলামুখী না করে শুধু মুখ কিবলামুখী করায় কোন ফায়দা নেই । যেমন– কেউ নামাযের মধ্যে সীনা উত্তর বা দক্ষিণমূখী করে মুখ কিবলামূখী করে রাখলে তাতে নামায সহীহ হয় না । অতএব, এ ভুল প্রথার সংশোধন হওয়া দরকার । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ১৬৬ # ফাতাওয়া শামী # ফাতাওয়া রহীমিয়া ১ : ৩৭০ # ইমদাদুল আহকাম ১ : ৭৪৬ # কিফায়াতুল মুফতী ৪ : ৪১]

কবরে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ দেশের বিভিন্ন স্থানে মুর্দাকে দাফন করার পরে কবরের পার্শে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হয় । এটা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে কিনা ?

জবাবঃ মুর্দাকে দাফন করার পরে কবরের উপর আযান দেয়ার শরী'আতে কোন প্রমাণ নেই । সুতরাং কবরের উপর আযান দেয়া নিষেধ । [প্রমাণঃ শামীঃ ১ : ৩৯৩, আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৩৭ # ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১ : ১৯৬ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ৫ : ৩০১]

বরই পাতা দিয়ে লাশ গোসল দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ মৃত্যুর পর লাশকে গোসল দেয়ার জন্য বরই পাতা ব্যবহার করা হয় কেন ?

{পৃষ্ঠা–৪৩৪}

জবাবঃ হযরত উম্মে আতিয়্যা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম–এর কন্যা যয়নব (রাযিঃ)–এর মৃত্যুর পর হুযূর সাল্লাল্লাহু `আলাইহি ওয়া-সাল্লাম কিছু মহিলাকে হুকুম করলেন– তোমরা তাকে গোসল করাও, তিনবার অথবা পাঁচবার অর্থাৎ বেজোড় সংখ্যায় শরীরে পানি ঢালবে এবং তাকে বরই পাতা মিশ্রিত গরম পানি দ্বারা গোসল দিবে ।

বরই পাতার দ্বারা গরমকৃত পানি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো মুস্তাহাব। এর দ্বারা উপকার হচ্ছে- এর দ্বারা ময়লা দূর হয় এবং মৃত ব্যক্তির লাশ দেরীতে নষ্ট হয়।
[প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ ১ : ১৯৩, রদ্দুল মুহতার ২ : ১৯৬, বাদায়িউস সানায়ে ১ : ৩০১]
কবরস্থান স্থানান্তর করা
জিজ্ঞাসাঃ কোন কবর বা কবরস্থান যদি নদী বা খালে ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়, কিংবা কোন ময়লা-আবর্জনার স্তুপে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে ঐ কবর বা কবরস্থান স্থানান্তর করা জায়িয হবে কি ?
জবাবঃ কবরগুলো যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায়ই থাকবে । নদী বা খালে সেগুলো ভেঙ্গে গেলেও স্থানান্তর করা যাবে না। তবে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে । উক্ত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করা বৈধ নয় ।
পুরাতন কবর স্থানান্তরিত করণ
জিজ্ঞাসাঃ কিছুদিন পূর্বে আমি কয়েক কাঠা জমি বিক্রয় করি। সেখানে একটি কবর ছিল। তবে বিক্রির সময় কবরের জায়গাটুকু বাদ রাখা হয়। কিন্তু ক্রেতা সে জমির চতুর্পাশে বাউন্ডারী দেয়াল নির্মাণ করেছে এবং বর্তমানে কবরের উপরেই তার গাড়ী রাখছে কিংবা চলা ফেরা করছে। উক্ত কবরটি আমার পিতার বিধায় ছেলে হিসেবে জমি ক্রেতার এরূপ আচরণে আমি দারুণভাবে মর্মাহত। এ ব্যাপারে তাকে বলার পর সে উত্তর দিয়েছে কবর স্থানান্তর করা যায়। সুতরাং আপনি কবর স্থানান্তর করে নিন। আমি এ জায়গাটুকুর মূল্য পরিশোধ করে দিব।
জবাবঃ ব্যাক্তি মালিকানাধীন কোন কবর যদি এত পুরাতন হয় যে, সেখানে দাফনকৃত লাশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলে প্রবল ধারণা হয়, যা সাধারণত ১০/১২ বছরের মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে এরূপ কবরের উপর মাটি ভরাট করে সমান করে তার উপর দিয়ে চলাফেরা করা কিংবা সেখানে গাড়ী রাখাতে কোন অসুবিধা নেই ।
{পৃষ্ঠা-৪৩৫}
আর যদি কবরে মৃত ব্যক্তির হাড়সমূহ বাকী থাকে, তাহলে এরূপ কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা বা সেখানে গাড়ী রাখা জায়িয হবে না। কেননা এর দ্বারা আশরাফুল মাখলুকাত আদম সন্তানের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পায় ।
উল্লেখিত কবরের জায়গা যদি ওয়াকফকৃত না হয়ে থাকে, তাহলে সেটা বিক্রয় করা জায়িয হবে, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, উক্ত কবর স্থানান্তর করা জায়িয হবে না।
[প্রমাণঃ আলমগীরী ১/১৬৭ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫/৪১১ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৭/২২১]
হিজড়ার কাফন-দাফন
জিজ্ঞাসাঃ এমন কোন লোক যে, পুরুষও নয়, মহিলাও নয় । সে মারা গেলে তার কাফনে কয়টা কাপড় লাগবে এবং কোন নিয়মে তাকে কাফন-দাফন করতে হবে ?
জবাবঃ যে ব্যক্তি পুরুষও নয়, মহিলাও নয় এমন ব্যক্তি মারা গেলে, মহিলাদের কাফনের জন্য যেমন পাঁচটি কাপড় লাগে, তেমনিভাবে তার কাফনের জন্যও পাঁচটি কাপড় লাগবে। এমনিভাবে

মহিলাদের যে তারতীবে কাফন-দাফন করা হয়, তাদেরকেও সেই তারতীবে কাফন-দাফন করতে হবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ২০২]

মসজিদে ওয়াকফকৃত জমিতে কবর দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মাওলানা বলেন যে, মসজিদ কমিটি যাকে মসজিদের মোতাওয়াল্লী ধার্য করেন, তার অনুমতিতে নাকি মসজিদের জায়গায় কবর দেওয়া জায়িয । কথাটা কি ঠিক ?

জবাবঃ মসজিদে ওয়াকফকৃত জায়গায় কোন মুর্দাকে কবর দেয়া জায়িয নয় । কিন্তু ওয়াকফকারী যদি ওয়াকফ করার সময় কিছু অংশে কবর দেয়ার অনুমতি প্রদান করে থাকেন, তাহলে জায়িয হবে, অন্যথায় নয় । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬ : ১৭৫]

কুরআনের আয়াত সম্বলিত গিলাফ দ্বারা মৃতব্যক্তির লাশ আবৃত করা

জিজ্ঞাসাঃ মদীনা শরীফ থেকে আনিত কুরআন শরীফের আয়াত খচিত গিলাফ মৃত ব্যক্তির লাশের উপর দেয়া জায়িয হবে কি-না ? যদি জায়িয হয়, তাহলে দানকারী ব্যক্তি সাওয়াব পাবে কি-না?

জবাবঃ কুরআনের আয়াত সম্বলিত গিলাফ মৃত ব্যক্তির লাশের উপর দেয়া বা তা দিয়ে লাশ আবৃত করা জায়িয হবে না। কেননা, এর দ্বারা পবিত্র কুরআনের অবমাননা প্রকাশ পায়। তাছাড়া সামাজিকভাবেও এটাকে আদবের পরিপন্থী বলে ধারণা করা হয়। অনুরূপভাবে কুরআনের আয়াত সম্বলিত গিলাফ

{পৃষ্ঠা-৪৩৬}

কাউকে দান করা ছাওয়াব তো দূরের কথা, বরং এতে গুণাহের প্রবল আশংকা রয়েছে। কেননা, এর দ্বারা একটি নাজায়িয কাজে সহযোগিতা করা হচ্ছে। আর এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, “তোমরা সৎ কাজে ও আল্লাহ ভীতির কাজে একে অপরের সহযোগিতা কর। আর পাপকার্য ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করো না” । অতএব, এরূপ দানের দ্বারা সাওয়াবের আশা করা বৃথা।

[প্রমাণঃ সূরা হজ্বঃ ৩২ # সূরা মায়িদাহঃ ২ # কানযুল উম্মাল ২ : ৩২৮ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫ : ৩২৩ ইমদাদুল ফাতাওয়া, ৪ : ৬২২ # ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ : ৪০১]

হাড্ডি উঠিয়ে অন্যস্থানে দাফন করা

জিজ্ঞাসাঃ পুরাতন কবরের হাড্ডি উঠিয়ে অন্য স্থানে দাফন করা যাবে কিনা এবং পুরাতন কবরস্থানে ঘর-বাড়ী তৈরি করে বসবাস করা যাবে কিনা?

জবাবঃ শরয়ী উযর ব্যতীত কবরের লাশ বা পুরানো হাড্ডি অন্য কবরস্থানে বা অন্য কোন জায়গায় দাফন করা জায়িয নয়। তবে যদি কারো জমিতে তার অনুমতি ব্যতিরেকে দাফন করা হয়ে থাকে এবং জমির মালিক তার জমি থেকে লাশ উঠিয়ে নিতে বলে, তাহলে সেক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা জায়িয আছে । অনুরূপভাবে কবর অধিক পুরাতন হয়ে যাওয়ার পরে যখন মনে হয় যে, মুর্দার হাড্ডিও মাটি হয়ে গেছে (আনুমানিক ১০/১২ বৎসর পর) তখন তার উপর অন্য কবর খনন করা যেতে পারে এবং ওয়াকফকৃত গোরস্থান না হলে তার উপর ঘর-বাড়ী তোলা, মসজিদ মাদ্রাসা ইত্যাদি বানানোও জায়িয আছে । [প্রমাণঃ ইমদাদুল আহকাম ১ : ৭২৭]

স্বামী স্ত্রীকে ও স্ত্রী স্বামীকে কাফন-দাফন দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর ইন্তিকালের পর স্বামী তাকে গোসল দিতে, কাফন-দাফন দিতে পারবে কিনা? এমনিভাবে স্বামীর ইন্তিকালের পর স্ত্রী স্বামীকে গোসল ও কাফন-দাফন দিতে পারবে কি-না?
জবাবঃ স্ত্রীর ইন্তিকালের পর তার গোসল দেওয়ার জন্য যদি কোন মহিলা না পাওয়া যায়, তাহলে শুধুমাত্র সে ক্ষেত্রে স্বামী স্বীয় স্ত্রীর গোসল করাতে পারে। তাছাড়া স্ত্রীকে কাফন পড়ানোর পর থেকে দাফন পর্যন্ত অন্যান্য সব কাজ স্বামী করতে পারবে। আর স্বামীর ইন্তিকালের পর স্ত্রী সর্বাবস্থায় স্বামীর গোসল সহ অন্যান্য কাজ করতে পারবে। [প্রমাণঃ শামীঃ ২ : ৯৯৯ # আহসানুল ফাতাওয়া ৪ : ২১৫ # ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ : ৭২৪ # দারুল উলূম ২ : ৪৪২]
{পৃষ্ঠা-৪৩৭}
জানাযা ও দাফনে শরী‘আত গর্হিত কাজ
জিজ্ঞাসাঃ জানাযা ও দাফনের সময় শরী‘আত বিরোধী কাজগুলো কি?
জবাবঃ জানাযার মুনকারাত। মৃত্যুর পর দাফনের পূর্বের মুনকারাত বা গর্হিত কাজঃ
(১) মৃত ব্যক্তির জন্য স্বশব্দে কান্নাকাটি করা।
(২) গোসলের পূর্বে মুর্দার পাশে তিলাওয়াত করা।
(৩) দাফনে দেরী করা (আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির আগমনের লক্ষ্যে)।
(৪) কাফনে আহাদনামা, আয়াত, দু‘আ, কালাম ইত্যাদি লিখা।
(৫) জানাযায় লোক বেশীর আশায় জুম‘আ বা জামা‘আতের জন্য বিলম্ব করা।
(৬) মৃত ব্যক্তির লাশ দাফনের উদ্দেশ্যে দূরে নিয়ে যাওয়া।
(৭) কাফন পরানোর পর মুখ দেখানো। তিনি কেমন ছিলেন? জিজ্ঞাসা করে ভাল হবার সাক্ষ্য আদায় করা।
(৮) একাধিকবার নামাযে জানাযা পড়া।
(৯) মৃতের ছবি নেয়া, বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তা প্রকাশ করা।
(১০) গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়া।
দাফন কালের ও পরবর্তীর মুনকারাতঃ
(১১) মৃতকে কবরে বসানো হবে এ বিশ্বাসে অনেক উপরে বাঁশ দিয়ে তারপর মাটি দেয়া ।
(১২) সিনা কিবলামুখী না করে শুধু চেহারা কিবলার দিকে ঘুরিয়ে রাখা।
(১৩) জানাযার পর উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে যিয়াফাত করা।
(১৪) ৩/৫/৭/৪০ ইত্যাদি কোন নির্দিষ্ট দিনকে দান খাইরাতের জন্য ঠিক করা।
(১৫) নাবালেগের অংশ বন্টন না করে, ত্যাযা সম্পত্তি হতে নিজেরা খাওয়া, দাওয়াত খাওয়ানো এবং গরীব-মিসকীন বা মসজিদ-মাদ্রাসায় দান করা।
(১৬) ঈসালে সাওয়াবে যা দান করা হয় তাই পৌঁছে এ জন্য বাচ্চাদের ঈসালে সাওয়াবে দুধ, শুহাদায়ে কারবালার জন্য শরবত ইত্যাদি দান করা।

(১৭) মুর্দার সাওয়াব রেসানীর উদ্দেশ্যে টাকা-পয়সার বিনিময়ে কুরআন শরীফ খতম করানো। শোকসভা ও মৃত্যু বার্ষিকী ইত্যাদি পালন করা। [প্রমাণঃ শামী ২ : ১৯২-২০৮ # আলমগীরী ১ : ১৬৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫ : ২৬৫ # ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫ : ১১০, ১১৩]
{পৃষ্ঠা-৪৩৮}
কবরের উপর রাস্তা করা
জিজ্ঞাসাঃ বিশ বছর আগে আমার দাদা মৃত্যু বরণ করেন, তখন সবার ধারণা ছিল যে, রাস্তার পাশে কবর দিলে ভাল হয়, কারণ রাস্তা দিয়ে অনেক বুযুর্গ লোক যাতায়াত করে, তাই তারা কবর দেখে যদি তার জন্য দু'আ করে যায়, আর সেই দু'আ যদি আল্লাহ কবুল করেন, তাহলে বেহেশতে যেতে পারে। সমাজে এই ধরনের ধারণা তখন ছিল। এখনও আছে। এ কারণেই তখন রোডের পাশেই দাদার কবর দেয়া হয়; কিন্তু এখন জানতে পারলাম এই কবরের উপর দিয়ে বিশ্বরোড হবে, এজন্য আমরা খুবই চিন্তিত এবং ব্যথিত। কি করলে এর সমাধান হবে?
কবর যেহেতু থাকছে না তাই আমার দাদীকে অন্য কোথাও কবর দেয়া যাবে কিনা? কারণ, স্বামী-স্ত্রী তো পাশাপাশিই কবর দেয়া হয়।
জবাবঃ যে কোন স্থান থেকে মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করলে বা সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়তে কুরআন শরীফ পড়লে বা দান করলে মুর্দার নিকট তার সাওয়াব পৌঁছে যায়। এর জন্য কবরের পাশে যাওয়া বা রাস্তার পাশে কবর দেয়া জরুরী নয়। তবে সম্ভব হলে মুর্দাকে কোন নেককার লোকদের কবরের পাশে দাফন করা উত্তম। কোন ব্যক্তি মালিকানা গোরস্থানের কবর যদি এরকম পুরাতন হয় যে, তার মধ্যে লাশ সম্পূর্ণ মাটিতে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে তা আর কবরস্থানের হুকুম থাকে না। বরং সাধারণ জমিতে পরিণত হয়ে যায়। তখন সেখানে অন্যান্য জমির মত চাষাবাদ করা, গাছপালা রোপন করা, বাড়ী-ঘর বা মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করা, রাস্তা-ঘাট তৈরী করা এসব জায়িয আছে। আর কবরস্থানের যে সম্মান করতে হয় তা মূলত মুর্দা ব্যক্তির সম্মানার্থেই। যখন মুর্দা মাটিতে পরিণত হয়ে যায়, তখন আর এমন খালি জমিনের কোন সম্মান করার হুকুম থাকে না। বিজ্ঞ আলেমগণের মতে আমাদের দেশের লাশ সাধারণত ১০/১২ বছরের মধ্যে পঁচে গলে মাটির সাথে মিশে যায়।
আপনার দাদার কবর যেহেতু বিশ বছরের পুরাতন, তাই তার উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করাতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। এতে মৃত ব্যক্তি আপনার দাদারও কোন ক্ষতি হবে না । আর স্বামী-স্ত্রী বা আত্মীয়-স্বজনদের কবর একত্রে থাকা মুস্তাহাব বা ভাল। যা পালন না করতে পারলে কোন গুনাহ নেই। অতএব, আপনার দাদীর কবর দাদার কবর থেকে দূরে অন্যত্র দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। [প্রমাণঃ আবু দাউদ, মিশকাত, ৪ : ৭৮ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ৬৬-৬৭ # ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫ : ৯৫ # ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০ : ৩১৩-৩১৪,৩৯৬]
{পৃষ্ঠা-৪৩৯}
কবরে গাছের ডাল গাড়া
জিজ্ঞাসাঃ আমাদের অঞ্চলে কবরে লাশ দাফনের পর কবরের উপর চার কোনায় ৪ টি গাছের ডাল লাগিয়ে ঐ ডাল ধরে চার কুল (অর্থাত সূরা কাফিরুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও নাস) পড়া হয় । এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটা যুক্তি সঙ্গত?

জবাবঃ কবরের লাশ দাফনের পর কবরের চার কোনায় খেজুর বা অন্য গাছের ডাল গাড়া, এ ডাল ধরে চার কুল পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ‘আত ও বর্জনীয় কাজ । অনেকেই এটাকে জায়িয করার জন্য মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেন যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দু’টি কবরের উপর খেজুরের দু’টুকরা করে গেড়ে বলেছিলেন– যতক্ষণ পর্যন্ত এ ডাল দু’টি তরতাজা থাকবে ততক্ষণ তার আযাব হাল্কা করা হবে । এর জবাব এই যে, এটা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)– এর সাথেই খাস ছিল । হুযূরের সুপারিশের কারণে তাদের আযাব হাল্কা করা হয়েছিল । ডাল দু’টি শুধু আযাব কতক্ষণ বন্ধ থাকবে অর্থাৎ শুকাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)– এর দু’আর বরকতে আযাব বন্ধ থাকবে । যদি এমন করার অনুমতি সবার জন্য হত এবং এটা কোন নেক কাজ হত, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম অবশ্যই এ আমল করতেন । কেননা, তারা নেক কাজের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন । এতদসত্ত্বেও কোন সাহাবী এমন করেননি । তাই এটা বর্জন করা জরুরী ।
তাছাড়া চার কোনায় চার কুল পড়ার প্রমাণও কোন সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না । তবে হাদীসে এতটুকু প্রমাণিত আছে যে, একজন মাথার দিকে সূরা বাকারা এর শুরু থেকে মুফলিহুন পর্যন্ত আর একজন পায়ের দিকে সূরা বাকারার শেষ পৃষ্ঠা আমানার রাসূল থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে, এটাই সুন্নাত । [প্রমাণঃ মুসলিম শরীফ, ১ : ৩১২, ২ : ৪১৭ # ফাতহুল মুলহিম, ৬ : ৫২৫ # ফাতাওয়া শামী, ২ : ২৪৫ # আহসানুল ফাতাওয়া ১ : ৩৭৪]

তাযিয়াত-যিয়ারত

মৃতব্যক্তিকে ছদকাকারীর পরিচয় দান

জিজ্ঞাসাঃ মৃত ব্যক্তির কোন সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন তাঁর জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করলে বা দান সদকা করলে, মৃত ব্যক্তি জানতে পারে কি যে, কে তার জন্য এগুলো করেছে? স্বয়ং দু‘আ কারীর জীবনে এর কোন প্রভাব পড়ে কি না?

{পৃষ্ঠা-৪৪০}

জবাবঃ হ্যাঁ, মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, কে তার জন্য সাওয়াব রেসানী করছে । অর্থাত ফেরেশতা তাকে বলে দেন যে, অমুক ব্যক্তি তোমার জন্য ঈসালে সাওয়াব করছে এবং দু‘আকারীও তার জীবনে এর সুফল পেয়ে থাকে । কেননা, অপরের জন্য দু‘আ করলে আল্লাহ পাক তাকে এর বিনিময় দিয়ে থাকেন । [প্রমাণঃ মিশকাত শরীফ, ২০৬]

শোকার্ত পরিবারবর্গ কে খাবার প্রদান করা

জিজ্ঞাসাঃ প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন বাড়ীতে যদি কেউ মারা যায়, প্রতিবেশী বা নিকট আত্মীয়রা দুই অথবা তিনদিন শোকার্ত পরিবার বর্গকে খাবার পরিবেশন করে থাকে । ইসলামী শয়ীয়ত মুতাবিক তার হুকুম কি ?

জবাবঃ কেউ মারা গেলে তার শোকার্ত পরিবার বর্গের জন্য খানার ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে খাওয়ানো মুস্তাহাব ।এজন্য অনেক সাওয়াবও রয়েছে । রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত জাফর (রাঃ) এর শোকার্ত পরিবারের লোকদের জন্য খানা পাকাতে বলেছিলেন । [প্রমাণঃ তিরমিযী, ১ : ১৯৫ # ফাতাওয়া আলমগীরী, ১ : ১৬৭]

কবর যিয়ারত

জিজ্ঞাসাঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের কবর যিয়ারত জায়িয কিনা? কবর যিয়ারতের সঠিক তরীকা কি? ‘বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সমস্ত মৃত ব্যক্তিদের রূহ সমূহ এ পৃথিবীতে আগমন করে থাকে

এবং জুম‘আর দিনে সমস্ত কবরবাসীদের আযাব মাফ করে দেয়া হয় ।’ ইসলামের দৃষ্টিতে কথাগুলো কি ঠিক ?
জবাবঃ মহিলাদের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে ধৈর্য-সহ্য কম হয়ে থাকে, যার দরুন কবর দেখে বা মুর্দার কথা স্বরণ করে কান্না-কাটি, চিল্লা-চিল্লি করার সম্ভাবনা রয়েছে । সাথে সাথে বিনা জরুরতে মহিলাদের জন্য বাড়ী হতে বের হওয়াটাই অসংখ্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তাই কবর যিয়ারতের জন্য তাদেরকে শরীয়তে অনুমতি দেয়া হয়নি । [প্রমাণঃ মিশকাত ১ : ১৫৪, শামী, ২ : ২৪২ # ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ২ : ৩৬৮ # আহসানুল ফাতাওয়া, ৪ : ১৮৬ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫ : ৪১৮]
আর কবর যিয়ারতের তরীকা হলো, কবরের কাছে গিয়ে সম্ভব হলে, মুর্দার পায়ের দিক দিয়ে যেয়ে চেহারা বরাবর এসে কিবলার দিকে পিঠ করে কবরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে এবং এভাবে সালাম বলবে-
السلام عليكم يا اهل القبور من المسلمين والمؤمنين انتم لنا سلف ونحن لكم تبع وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين اسأل الله لنا ولكم العافية يغفر الله لنا ولكم ويرحمنا الله واياكم.
{পৃষ্ঠা-৪৪১}
অতঃপর কুরআনের আয়াত, সূরা বিশেষভাবে সূরা ইখলাস, সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরছী, আমানার রাসূলু, সূরা ইয়াসীন, সূরা মুলক ইত্যাদি যতটুকু সম্ভব হয় পড়বে । অতঃপর উক্ত দু’আ কালাম এর সাওয়াব কবরবাসীদের নামে বখশে দিবে । আর সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য হাত উঠানোর কোন প্রয়োজন নেই । তবে যদি একান্ত হাত উঠাতে হয়, তাহলে কবরের দিকে পিঠ করে কিবলার দিকে মুখ করে নিবে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী, ২ : ২৪২ # ফাতাওয়া দারুল উলূম, ৫ : ৪৫০ # মালাবুদ্দা মিনহু ৭৫ # ফাতাওয়া রশীদিয়া, ২৩১]
উল্লেখ্য যে কবর যিয়ারতের জন্য উত্তম দিন হলো, জুমু’আর দিন । তবে তার একদিন আগে বা পরে এবং সোমবার দিনকেও কবর যিয়ারতের জন্য বরকতের দিন বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।
আর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে সকল মৃত ব্যক্তিদের রূহ পৃথিবীতে আগমন করে থাকে- এ কথাটি একেবারেই অবাস্তব । কুরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ নেই । মুসলমানদের জন্য এ ধরনের বিশ্বাস রাখা কখনও ঠিক হবে না । জুমু‘আর দিন সমস্ত কবরবাসীদের আযাব মাফ করে দেয়া হয়- এমন কথাও ঠিক নয় । তবে জুমু‘আর দিন কেউ মারা গেলে তার কবরের আযাব মাফ হওয়ার কথা হাদীসে পাওয়া যায় । [প্রমাণঃ তিরমিযী শরীফ # ফাতাওয়া শামী ২ : ২৪৩ # ফাতাওয়া রশীদিয়া ২৩৩- ২৩৪ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫ : ৩৪৯ # আশরাফুল জাওয়াব, ১৫৬]
আপনজনের ইন্তেকালে সমবেদনা
জিজ্ঞাসাঃ আপনজন মারা গেলে অনেকে অধৈর্য হয়ে যায়, পেরেশান হয়ে যায় । তাদেরকে সান্তনা দেয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে কোন বাণী আছে কিনা ? জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো ।
জবাবঃ মৃত ব্যক্তির আপনজনের প্রতি সান্তনা ও সমবেদনা প্রকাশ করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর থেকে হাদীস বর্ণিত আছে । হযরত মু‘আয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার এক পুত্র সন্তান মারা গেলে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এই সমবেদনা পত্র লিখেনঃ
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে মু'আয ইবনে জাবালের নামে । তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক । আমি তোমার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ছাড়া কোন মা'বূদ নাই । তারপর এই কামনা করছি যে, আল্লাহ যেন তোমাকে বিরাট বিনিময় দান করেন এবং ধৈর্য ধারন ও

{পৃষ্ঠা-৪৪২}

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করেন । আমাদের জীবন, আমাদের ধন-সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজনে আল্লাহ সুখ দান করেন এবং জীবন আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষণস্থায়ী আমানত । (তোমার পুত্রও একটি আমানত বিশেষ ছিল) আল্লাহ তোমাকে তার দ্বারা খুশী এবং ঈর্ষণীয় সুখ দান করেছেন এবং এখন বিরাট পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমার নিকট থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন । তুমি যদি পুণ্যের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারন কর, তাহলে বিরাট পুরষ্কার, অশেষ অনুগ্রহ এবং হিদায়াত তোমার জন্য থাকবে । তোমার অস্থিরতা ও হা-হুতাশ যেন তোমার পুরষ্কারকে বিনষ্ট করে না দেয় । এমন করলে তুমি অনুতপ্ত হবে । মনে রাখবে অস্থিরতা কোন মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং কোন শোককে দূর করতে পারে না । যা হবার তা হয়েই গিয়েছে । ওয়াসসালাম ।
اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. لكن يكره الافراط في مجحه لاسيما عند جنازته تعزية اهله وترغيبهم في الصبور. (الدر المختار:239/2)

কববের উপর বাতি জ্বালানো

জিজ্ঞাসাঃ কবরের উপরে বাতি জ্বালানো জায়িয কি ?

জবাবঃ কবরের উপরে বা কবরের পার্শ্বে বাতি দেয়া শরীয়তে কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত হয়েছে । বস্তুতঃ এটা হিন্দুয়ানী প্রথা- যা অগ্নিপূজক পৌত্তলিকদের সাদৃশ্য । এ কারণে হাদীস শরীফে এ ব্যাপরে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, "রাসূলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঐ সমস্ত লোকদেরকে অভিসম্পাত করেছেন, যারা কবর যিয়ারতের জন্য কবরস্থানে উপস্থিত হয় এবং ঐ সমস্ত লোকদের, যারা কবরের উপর সৌধ তৈরী করে ও বাতি প্রজ্জ্বলিত করে ।"[প্রমাণঃ আবূ দাউদ শরীফ, ২ : ৪৬১ # নাসাঈ শরীফ, ১ : ২২২ # মিশকাত শরীফ, ১ : ৭১ # রাহে সুন্নাত, ১৯২]

অন্য এক হাদীসে হযরত আয়িশা (রাঃ)থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, "কেউ যদি ইসলাম ধর্মের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করে, যা ইসলামের মধ্যে নেই, তাহলে তা গর্হিত ।" সুতরাং কবরে বাতি দেয়া জঘন্য অপরাধ ও কুসংস্কার । তাই এ থেকে নিজেও বেঁচে থাকতে হবে এবং মুসলমানদেরও সতর্ক করতে হবে । [ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১০ : ৮৭]
ولا يربع ولايجصص للنهي عنه ولايطين ولايرفع عليه بناء....الخ (الدرالمختار:237/2)

{পৃষ্ঠা-৪৪৩}

দূর থেকে করর যিয়ারত করা

জিজ্ঞাসাঃ লাইলাতুল বরাত আসলে কিছুসংখ্যক লোক হালুয়া-রুটি পাকায় । তারপর বাড়ী বাড়ী মিলাদ পড়ে । আবার কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করে । ফজরের ফরয নামাযের পর কবরস্থানে গিয়ে কবর যিয়ারত করে । এর ফযীলত কতটুকু জানতে চাই । বাসায় থেকে কবর যিয়ারত করা যায় কিনা ?

জবাবঃ যিয়ারত আরবী শব্দ । এর অর্থ– সাক্ষাত বা দর্শন । দূর থেকে কবর যিয়ারত করা যায় না । তবে কবরবাসীর জন্য সাওয়াব রেসানী করা যায় । কবর যিয়ারতের জন্য কবরের পার্শ্বে আসা আবশ্যক । কবর যিয়ারতের অনেক ফযীলত আছে । যেমন মিশকাত শরীফের এক হাদীসে আছে– হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন– "তোমরা কবর যিয়ারত কর । কেননা– এ যিয়ারত মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয় ।" কবর যিয়ারত কোন সময় বা দিনের সাথে খাছ নয়, সব সময়ই করা যায় ।
শবে বরাত উপলক্ষে হালুয়া–রুটি বিলি করা, প্রচলিত গলদ আকীদা সহ কিয়ামওয়ালা মিলাদ ইত্যাদি মনগড়া কাজ, সম্পূর্ণ বিদ'আত । শরীয়তে এসবের কোন স্বীকৃতি নেই । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া, ১ : ১৭৯/১৮৩ # আহসানুল ফাতাওয়া, ১ : ৩৪৭ # কিফায়াতুল মুফতী, ১ : ১৪১]
আত্বহত্যাকারীর ঈসালে সাওয়াব
জিজ্ঞাসাঃ কেউ যদি বিষ খেয়ে বা ফাঁসি দিয়ে অথবা অন্য কোন উপায়ে আত্মহত্যা করে, তাহলে তার জানাযা পড়তে হবে কিনা ? এ জাতীয় লোকদের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ঈসালে সাওয়াব হবে কিনা ?
জবাবঃ কোন মুসলমান যদি ফাঁসি দিয়ে বা বিষ খেয়ে বা অন্য কোনভাবে আত্মহত্যা করে, তাহলে মুসলমান হওয়ার কারণে তার জানাযা পড়তে হবে । তবে আলেম ও সমাজের গন্যমান্য শ্রেণীর লোকদের জন্য তার জানাযায় শরীক না হওয়ার অনুমতি আছে । যাতে করে এ ধরনের অন্যায় কাজে অন্যেরা সাহস করতে না পারে । অনুরূপভাবে মুসলমান হিসাবে তার মাগফিরাত কামনা করা যাবে । এ উদ্দেশ্যে ঈসালে সাওয়াব বা গরীব মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে । তবে মনে রাখতে হবে– তিন দিন, সাত দিন বা চল্লিশা ইত্যাদি নামে যে সমস্ত প্রথা আমাদের দেশে চালু রয়েছে, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং শরীয়তের নিয়ম পরিপন্থী । এ জন্য দিন তারিখ নির্ধারিত করা ব্যতীত যে কোন দিন তার বালেগ ওয়ারিশদের নিজস্ব মাল দ্বারা সামর্থ অনুযায়ী গরীব–মিসকীনকে খাওয়ানো বা কিছু দান করে দেয়া যেতে পারে । [প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২ : ২১০ # ফাতাওয়া আলমগীরী ১ : ১৬৩ # ফাতাওয়া রহিমীয়া ১ : ৩৬৭]
{পৃষ্ঠা–৪৪৪}

রোযা

চাঁদ দেখা

বাংলাদেশ হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে চাঁদ দেখার হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ বাংলাদেশ হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে রামাযান ও দুই ঈদের চাঁদ দেখার যে ঘোষণা বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভশন হতে দেয়া হয়, তা ইসলামে গ্রহণযোগ্য কি-না?
জবাবঃ বাংলাদেশে হেলাল কমিটি তো আছে এবং তার মধ্যে কতক আলেম-উলামাও আছেন। তাদের লিখিত ঘোষণাটি হুবহু রেডিওতে প্রকাশ করা উচিত। তাহলে সে সংবাদ গ্রহণ করে বাংলাদেশের সকল মুসলমানের জন্য রোযা, ঈদ করা জরুরী হবে। কিন্তু দুঃখজনক যে, রেডিওতে সহীহ নিয়ম মত প্রচার করা হয় না। গোজামিল ধরনের খবর প্রচার করা হয় যেমন বলা হয়- বাংলাদেশের আকাশে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেছে। কে দেখলো? চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার খবরটি কাদের সিদ্ধান্ত? এসব বিষয়ের উপর কোন রকম আলোকপাত করা হয় না। হাত পা বিহীণ একটা খবর দায়সারাভাবে শুনিয়ে দেয়া হয় মাত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরুপ গোলমালে ঘোষণা গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে রোযা বা ঈদ করা জরুরী নয়। বরং এরুপ পরিস্থিতিতে প্রত্যেক এলাকার লোক নিজেদের চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ঈদ করতে পারে।

[প্রমাণঃ বুখারী শরীফ ১:২৫৬# ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ৫:১৭৯# জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ২:৩৪# আলমগীরী ১:১৯৯]

সারা বিশ্ব একই দিনে রোযা ও ঈদের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ বদরপুরের পীর সাহেব হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে একথা প্রমাণ করতে চান যে, হানাফী মাযহাবের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সমগ্র বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ হবে এবং এটাই নাকি জাহিরী রিওয়ায়াত। নির্ভরযোগ্য ফিকাহ গ্রন্থসমূহের ইবারতেও নাকি এ মতের অভিব্যক্তি ঘটেছে। এ ব্যাপারে শরয়ী সঠিক ফয়সালা জানতে চাই।

জবাবঃ বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন এলাকার স্বাধীন চিন্তাধারার কিছু লোকদের পক্ষ থেকে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে একই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে এর মধ্যে কি ফায়দা আছে এবং এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল,

{পৃষ্ঠা-৪৪৫}

সে সব বিষয়ে একটু তলিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া একই দিনে রোযা ও ঈদ করার কোন প্রমাণ আছে কিনা, বা থেকে থাকলে তার প্রকৃত অর্থ কি সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(১)

একই দিনে রোযা ও ঈদ করার নির্দেশ সম্বলিত কোন আয়াত বা সহীহ হাদীস কিংবা ফুকাহাগণের ইজমা কেউ পেশ করতে পারবে না। যেমনভাবে জুমু'আ ও ওয়াক্তিয়া নামায সারা বিশ্বে বিভিন্ন সময়ে হচ্ছে, এ ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না বা প্রস্তাব পেশ করে না যে, এগুলো একই সময় কিভাবে করা যায়? কারণ, এগুলো এমন ইবাদত যা ওয়াক্ত মুতাবিক হয়। নামায হোক, রোযা হোক, সারা বিশ্বে এক একই সময় হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা শরীয়তে নেই। আর এটা সম্ভবও নয়।

(২)

সাহাবায়ে কিরাম একই দিনে রোযা বা ঈদ করাকে জরুরী মনে করতেন না, বরং তারা মনে করতেন প্রত্যেক এলাকার লোকেরা তাদের নিজ নিজ দেখা অনুযায়ী রোযা, ঈদ করবে। সকল এলাকায় এক সময় করা জরুরী নয়। যেমন-মুসলিম শরীফের হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হযরত কুরাইব থেকে জানতে পেরেছিলেন যে, শামের লোকেরা মদীনা বাসীদের একদিন পূর্বে রামাযানের চাঁদ দেখেছে। সেই হিসেবে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) শামবাসীদেরকে একদিন পূর্বে রোযা রাখতে বলেছেন। এ তথ্য জানার পরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) শামের ঘটনা তাহকীক করে মদীনাতেও একই দিনে রোযা রাখার কোন ব্যবস্থা করেননি। অথচ তিনি ইচ্ছা করলে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। আসলে একই দিনে রোযা বা ঈদ করাকে তাঁরা জরুরী মনে করতেন না। তাই এ ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেননি।

ইসলামের শুরু লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন সময় রোযা ও ঈদ পালিত হয়ে আসছে। কিন্তু কোন ফকীহ বা ইমাম এক দিনে রোযা ও ঈদ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেননি। জরুরতও মনে করেননি। এখন হঠাৎ করে কিছু লোকের মাথায় এ খেয়াল কিভাবে চাপল যে, এত বৎসর যাবৎ সকল উলামা ও ফুকাহাগন ভুল করে এসেছেন আর তারা সহীহ বুঝতে পেরেছেন? কাজেই এখন থেকে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা ও ঈদ শুরু করা দরকার?

বাস্তবে উলামাগণ ভুল করেননি। বরং এসব আনাড়ীগণ কুরআন হাদীস না বুঝে উল্টা-পাল্টা ব্যাখ্যা দিচ্ছে। এ ব্যাপারে তাদের একমাত্র পুঁজি মুতাকাদ্দিমীন ফুকাহায়ে কিরামের দু' একটা উক্তির অপব্যাখ্যা। উক্তি দু'টি এইঃ

{পৃষ্ঠা-৪৪৬}

(১) উদয়স্থলের বিভিন্নতার কোন ধর্তব্য নেই। [আল বাহরুর রায়িক ২:২৭০]

(২) এক প্রান্তে যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে অপর প্রান্তেও রোযা ও ঈদ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে। [আল বাহরুর রায়িক ২:২৭০]

বস্তুতঃ উক্তি দু'টি না কুরআনের আয়াত, না হাদীস। বরং ফুকাহাগণের বচন (কওল)। সুতরাং উক্ত কওলের এমন ব্যাখ্যা দিতে হবে, যাতে আয়াত, হাদীস, সাহবায়ের আমল ও বাস্তবতার সাথে মিল থাকে এবং এমন কোন ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না, যে ব্যাখ্যা অনুযায়ী উক্তি দু'টি কুরআন ও হাদীসের বাস্তবতার বিরুদ্ধে চলে যায়। এসব দিকে লক্ষ্য রেখে উলামায়ে মুতাআখখিরীন। যেমন- আল্লামা কাসানী (রহঃ) তার বিশ্ববিখ্যাত ফাতাওয়ার কিতাব বাদায়িউস সানায়ি, এ উল্লেখিত উক্তির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, "চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য নিকটবর্তী শহরের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। নিকটবর্তী শহর দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব এলাকা, যেখানে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ১/২ দিনের পার্থক্য হয় না। আর যেসব শহরের মধ্যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ১/২ দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে সে সমস্ত এলাকাকে দূরবর্তী এলাকা বলা হয়। সেসব শহরের মধ্যে চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। সেক্ষেত্রে এক শহরে বা দেশে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে, অন্য এলাকার জন্য প্রযোজ্য হবে না"।[বাদায়িউস সানায়ি ২:৮৩]
তেমনিভাবে আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহঃ) 'মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়িক' গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "পশ্চিম এলাকায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে, পূর্ব অঞ্চলের লোকদের জন্য রোযা ও ঈদ করা জরুরী হবে এর অর্থ সম্পূর্ণ পৃথিবীর পশ্চিম ও পূর্ব এলাকা নয়। বরং একই শহরের পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চল উদ্দেশ্য"। [মিনহাজ ২:২৭০]
এ ধরনের একই কথা হানাফী মাযহাবের প্রচুর কিতাব বিদ্যমান রয়েছে। উদাহরণ স্বরুপঃ (১) তাবয়ীনুল হাকায়িক ১:৩২১ (২) মজমাউল ফাতাওয়া ২৫২ (৩) মারাক্বিল ফালাহ ৫৩৩ (৪) ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২:৩৫৫-৩৫৬ (৫) তাহতাবী ৩৫৫ (৬) ফাতহুল মুলহিম ৩:৩১৩ (৭) মাআরিফুস সুনাম ৬:৩১ (৮) আলউরফুশশুজী ১৪৯ (৯) রুইয়াতে হিলাল ৫৮ (১০) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ২:৪০ প্রভৃতি।
قوله: ويلزم اهل المشرق بروية اهل المغرب اذ ليس المراد باهل الشرق جميعهم بل بلدة واحدة تكفي كما لايخفى . (منحة الخلاق على البحر الرائق:472/2)
{পৃষ্ঠা-৪৪৭}
পক্ষান্তরে কতিপয় স্বাধীন খিয়ালের লোক এ সমস্ত কিতাবাদীকে উপেক্ষা করে নিজের মনগড়া এমন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, যা কুরআন, হাদীস এবং বাস্তবতার বিরুদ্ধে। তা ছাড়া ঐ ব্যাখ্যা হানাফী মাযহাবের কোন কিতাবেও পাওয়া যায় না। আবদুর রব সাহেব (বদরপুরী) যে সমস্ত কিতাবের দলীল দিয়েছেন, ঐ সব কিতাব মুতাকাদ্দিমীনদের উল্লেখিত শুধু দুই কওল বর্ণিত হয়েছে মাত্র। যার সহীহ ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু আবদুর রব সাহেব ঐ উক্তিদ্বয়ের যে ব্যাখ্যা নিজে বুঝেছেন বা করেছেন, তা ঐ সমস্ত কিতাবসমূহের কোনটাতে আদৌ লেখা নেই। বরং ঐ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ তার মনগড়া ব্যাখ্যা, যা শরীয়তের দলীল হতে পারে না। কাজেই ঐ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধারণ লোকদেরকে ধোঁকা দেয়া গেলেও কোন সাধারণ আলেমকে ধোঁকা দেয়া যায় না। মুতাকাদ্দিমীনদের কওলের ব্যাপারে তার উক্ত মনগড়া ব্যাখ্যা যা কুরআন ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। পবিত্র কুরআনে পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে রামাযান মাস পাবে, সে যেন উক্ত মাসে রোযা রাখে"।

বদরপুরী সাহেব বলতে পারেন, হাদীসে আছে- "তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর, এবং ২য় চাঁদ দেখে ঈদ কর"। এ হাদীসে তো সকল এলাকার জন্য ভিন্ন দেখার কথা বলা হয়নি। তার উত্তরে আমরা বলব- উক্ত হাদীসে একসাথে সারা দুয়িার কথা বলা হয়নি। হাদীসের এ অর্থ সাহাবায়ে কিরাম বুঝেছেন। যেমন মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে আমরা শুরুতে উল্লেখ করেছি। অন্য এক হাদীসে এসেছে-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন, "যখন তোমরা পেশাব-পায়খানায় বসবে, তখন পূর্বমুখী বা পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে"। বদরপুরী সাহেব কি বলবেন যে, এটা সারা দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য বলা হয়েছে? নিশ্চয় এ কথা বলবেন না। বরং সকল মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, এটা মদীনাবাসী এবং বাইতুল্লাহ থেকে উত্তর এলাকার লোকদের জন্য। তেমনিভাবে মুতাকাদ্দিমীনদের কাওল পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থিত এলাকার জন্য। অর্থাৎ এ পরিমাণ দূরত্বের জন্য যেখানে উদয়স্থলের ব্যবধানে একদিনের ব্যবধান হয় না।
আসলে বদরপুরী সাহেবের ব্যাখ্যা রীতিমত বাস্তব বিরোধও বটে। কারণ তিনি বলেছেন, সারা পৃথিবীর জন্য চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্কথ্য ধর্তব্য নয়। এটা একটা চরম অবান্তর কথা, যা একজন সাধারণ লোকও স্বীকার করবে। কারণ, শত শত বৎসর ধরে পৃথিবীতে চন্দ্রের উদয়কে কেন্দ্র করে আরবী তারিখের পার্থক্য চলে আসছে। এই পার্থক্য তো চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্যের কারণেই। {পৃষ্ঠা-৪৪৮}
হয়েছে। এই জ্বলন্ত বাস্তবতাকে অস্বীকার করা পাগলামীর চরম বহিঃপ্রকাশ বৈ আর কি? এমন অবান্তর কথা মানতে শরীয়ত কখনও নির্দেশ দেয় না। এটাকে অস্বীকার করা অবান্তর নয় কি?
কেউ কেউ বলে থাকেন, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র পৃথিবীর জন্য একটা সূর্য ও একটা চাঁদ তৈরী করেছেন। প্রত্যেক এলাকার জন্য নতুন নতুন চাঁদ সৃষ্টি করেননি। তাহলে কেন সারা বিশ্বে একই তারিখ হয়ে রোযা ও ঈদ একদিনে হবে না? তার উত্তর এই যে, চাঁদ ও সূর্য একটি –একথা ঠিক, কিন্তু এগুলোর উদয় এবং অস্ত এক সময় হয় না বরং কোথাও পূর্ণিমার চাঁদের আলো ঝলমল করে। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথাও দ্বিপ্রহর বিদ্যমান থাকে। এক্ষেত্রে দূরবর্তী শহরে চাঁদ দেখা দিলে, নিশ্চয় সেখানে মাগরিবের সময় হবে। সুতরাং সেখানকার চাঁদ দেখা যদি গ্রহণ করা হয়, তাহলে মাগরিবের সময়কেও গ্রহণ করে জোহরের সময় মাগরিবের নামায পড়তে হবে।
তেমনিভাবে উপসাগরীয় দেশের চাঁদ দেখা দূরবর্তী দেশে গ্রহণ করলে পূর্ব এলাকার চন্দ্র মাস ২৮ দিনে শেষ হবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী মাসের চাঁদ আকাশে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী মাস গণনা শুরু হয়ে যাবে। অন্যদিকে পশ্চিম এলাকার আকাশে নূতন চাঁদ বিদ্যমান থাকার পরও নতুন মাস শুরুর পরিবর্তে পূর্ববর্তী মাস বহাল থাকবে। অথচ বুখারী শরীফ ১:২৫৫ পৃঃ এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, চন্দ্র মাস ২৯ কিংবা ৩০ দিনেই হয়ে থাকে। সুতরাং সাহাবা (রাযিঃ) গণের সময় থেকে বিগত চৌদ্দশ বৎসর পর্যন্ত সকল মুসলমান যে নিয়মে চলে আসছে, সেটাই শুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।
রোযা ভঙ্গের কারণ ও মাকরূহসমূহ
রোযাদার ব্যক্তি পানিতে বায়ু ত্যাগ করলে তার হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন রোযাদার ব্যক্তি পুকুরে গোসল করতে নেমে পানিতে বায়ু ত্যাগ করে তাহলে তার রোযা ভঙ্গ হবে কি-না?
জবাবঃ পানিতে বায়ু ত্যাগ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু অপারগতা ব্যতীত এরূপ করা মাকরূহ।
রোযা অবস্থায় ইনহিলার ব্যবহার
জিজ্ঞাসাঃ ইনহিলার নামক এক প্রকার ঔষধের শিশিতে চাপ দিলে ধোঁয়ার মত এক প্রকার গ্যাস বের হয়। এজমা বা হাঁপানীর রোগী তার শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য এ গ্যাসের ধোঁয়া মুখ দিয়ে ফুসফুসের ভিতরে টেনে নেয়। যার ফলে এজমা রোগীর শ্বাসকষ্ট কমে যায়। রোযা অবস্থায় এরূপ ইনহিলার গ্রহণ করা যাবে কি-না?
{পৃষ্ঠা-৪৪৯}
জবাবঃ ইনহিলারের গ্যাসের ধোঁয়া এবং আগুন ও বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া যেহেতু একই ধরনের। সুতরাং এগুলোর হুকুমও একই ধরনের। তাই যেমন রোযা অবস্থায় যদি কেউ বিড়ি-সিগারেট পান করে বা রোযার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় ধোঁয়া মুখ দিয়ে পেটের ভিতর টেনে নেয়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তেমনি রোযা রেখে ইনহিলার ব্যবহার করলেও রোযা ভেঙ্গে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি হাঁপানী অথবা এজমার কারণে ইনহিলার গ্রহণে বাধ্য হয়, তাহলে তার জান বাঁচানোর জন্য রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি আছে। তবে উক্ত পরে রোযা

কাযা করতে হবে। আর যদি কোন ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্ট হয় এবং এটা স্থায়ী রোগ হয়ে যায়, কখনো ভাল হওয়ার সম্ভবানা না থাকে এবং পরে রোযা কাযা করাও সম্ভব না হয় তাহলে সে ব্যক্তি প্রতিটি রোযার জন্য একটি করে ফিদিয়া অর্থাৎ, পৌণে দু'সের গম, আটা বা তার মূল্য পরিমাণ টাকা গরীবদেরকে দান করবে অথবা একেক রোযার বদলে প্রত্যেক গরীবকে দু'বেলা খাবার খাওয়াবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৯৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:৩৯৫, দারুল উলূম ৬:৪১৮]
রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করা ও তার কাযা, কাফফারার বিবরণ
জিজ্ঞাসাঃ মাহে রামাযানে সকাল বেলায় স্ত্রী সঙ্গম করলে, কাফফারা ওয়াজিব হবে কি-না? যদি ওয়াজিব হয়, তবে সে কাফফারা শুধু স্বামী আদায় করবে? না স্বামী-স্ত্রী উভয়ের আদায় করতে হবে? আর তা আদায়র নিয়ম কি? কোন অভাবীর দু'বেলা যে পরিমাণ চাউল লাগে, সে পরিমাণ শুধু চাউল দিয়ে দিলে, কাফফারা আদায় হবে কি? আর সেই অভাবীকে উক্ত চাউল একাধারে ষাটদিন দিতে হবে? নাকি মাঝে মধ্যে ফাঁক দেয়া যাবে? অথবা কিছুদিন দেয়ার পর সেই অভাবী লোকটি মারা গেলে তখন কি করতে হবে?
জবাবঃ মাহে রামাযানের সুবেহ সাদেকের পর থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত এ সময়ে রোযা অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে এবং তার স্ত্রীরও রোযার কথা স্মরণ থাকে তাহলে উভয়ের রোযা ভেঙ্গে যাবে এবং উভয়ের উপর কাযা ও কাফফারা আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি স্ত্রীকে বাধ্য করা হয় এবং তার সাথে শক্তি প্রয়োগ করে জবরদস্তি এ কাজ করা হয়, তাহলে স্ত্রীর উপর শুধু রোযা কাযা আদায় করা ওয়াজিব হবে, কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
কাফফারা আদায় করার নিয়ম এই যে, একটি দাস বা গোলাম মুক্ত করতে হবে। তবে বর্তমান এর কোন সুরত নেই। সুতরাং এখন একাধারে দুই মাস রোযা রাখবে, মাঝে একটিও ছাড়তে পারবে না। শারীরিক শক্তি না থাকার কারণে তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে ষাট জন মিসকীনকে দু'বেলা খানা
{পৃষ্ঠা-৪৫০}
খাওয়াতে হবে। অথবা একজনকে ষাট দিন দু'বেলা খানা খাওয়াবে অথবা এ হিসাব মত মিসকীনকে খানা দিবে বা খানার টাকা দিবে। এক মিসকীনের এক দিনের খানার টাকা পৌনে দু'সের গম বা আটার মূল্য পরিমাণ।
[প্রমাণঃ ফতহুল কাদীর ২:২৫৪# দারুল উলূম ৬:৪২৯-৩৯# আলমগীরী ১:২০৩-৫# হিদায়া ১:২১৬-১৯]
যদি চাউল দিতে চান, তাহলে ঐ পরিমাণ চাউল দিতে হবে, যা (নিছফে ছা) অর্থাৎ, পৌণে দু'সের আটার দামের সমান হয়। তাহলে কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একাধারে ষাট দিনও দিতে পারেন এবং মাঝে মধ্যে ফাঁকও দিতে পারেন। তবে ষাটদিন পূর্ণ করতে হবে। আর একজন মিসকীনকে দু'দিনের চাউল একদিন দেয়া যাবে না। যদি দেন, তাহলে একদিনের কাফফারাই আদায় হবে। আর যদি কিছুদিন যাওয়ার পর লোকটি মারা যায়, তাহলে কাফফারার অবশিষ্ট টাকা উপযুক্ত অন্য লোককে দিয়ে দিবেন।
[প্রমাণঃ দারুল উলূম৬:৩০২, ২:৪৫০# মুসলিম শরীফ ১:৩৫৪# আলমগীরী ১:১৯১# হিদায়া ১:২১৯]
রোযা অবস্থায় ভুলে স্ত্রী সহবাস করা
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি রামাযান মাসে দিনের বেলা সহবাসে লিপ্ত হয়ে বীর্যপাত হওয়ার পূর্বেই পৃথক হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তার হুকুম কি?
জবাবঃ যদি কেউ রামাযান মাসে রোযা অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাসে লিপ্ত হয়, তাহলে তার রোয়া ভেঙ্গে যাবে চাই বীর্যপাত (ইনযাল) হোক বা না-ই হোক এবং তার উপর রোযা এবং কাফফারা উভয়টাই ওয়াজিব হবে। কাযা স্বরুপ তো একটি রোযা রাখাতে হবে আর রোযার কাফফারা হল-একাধারে দুই মাস রোযা রাখাতে হবে, মধ্যখানে একটা ভাঙ্গলে আবার শুরু থেকে দুই মাস রাখতে হবে। শারীরিক অক্ষমতার দরুণ একাধারে দুই মাস রোযা রাখা সম্ভব না হলে, ষাটজন মিসকীনকে একদিন দু'বেলা পেট ভরে খানা খাওয়াতে হবে, অথবা একজন মিসকীনকে ষাট দিন দু'বেলা করে খানা খাওয়াবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২১৯# দুররে মুখতার ২:৩৯৪# বাযযাজিয়া ৪:১০৩]

{পৃষ্ঠা-৪৫১}

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ব্যবহারের একটি ভ্রান্ত প্রচারণা

জিজ্ঞাসাঃ গত জানুয়ারী ৯৭ মাসিক রাহমানী পয়গাম এবং ফেব্রুয়ারী ৯৬মাসিক মদীনা উভয় সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পর্বে বলা হয়েছে যে, রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যাবে। অথচ মাসিক আল বায়্যিনাত, ডিসেম্বর ৯৬ সংখ্যায় বলা হয়, রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যাবে না।
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং মাসিক রাহমানী পয়গাম, মাসিক মদীনা সহ অন্যান্য পত্রিকার সমালোচনা করা হয়েছে। আমরা সঠিক মাসআলা জানতে চাই।
জবাবঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে রোযাদারের পেটে অথবা দেমাগের মধ্যে রোযা অবস্থায় স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে যেমন মুখ, নাক ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করলে রোযা ভেঙ্গে যায়ে। এটাই উলামায়ে কিরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ শরীরে বা পেটের মধ্যে পৌছলেও স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে তা পৌছায় না সুতরাং এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেকে মনে করে, অনেক ইনজেশন দ্বারা তো ক্ষুধা দূর হয় এবং তার দ্বারা খানাপিনার কাজ হয়, এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হওয়ার কথা, কিন্তু তাদরে এ ধারণা সহীহ নয়। কেননা, গোসল করলে বা কুলি করলে বা ইয়ারকণ্ডিশন রুমে বসলে অনেকাংশে তৃষ্ঞা নিবারণ হয়, কিন্তু তাতে কি রোযা ভঙ্গ হয়। মোদ্দাকথা, শুধু তৃষ্ণা আর ক্ষুধা নিবারণ হলেই রোযা ভঙ্গ হবে না। বরং পেটে বা দেমাগের মধ্যে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালে তার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যাবে। প্রশ্নে উল্লেখিত প্রত্রিকার ব্যাপারে আমরা এতটুকু বলতে চাই যে, শারীরিক সুষ্ঠ ও সুন্দর চিকিৎসার জন্য বিজ্ঞ পারদর্শী চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতে হয় এবং এ ধরনের ডাক্তার সাধারণতঃ বড় বড় হাসপাতালে ও ক্লিনিকে বসে ফুটপাতে তাদের পাওয়া যায় না। আর ফুটপাতে যাদের পাওয়া যায়, তাদের দ্বারা ভালো চিকিৎসার আশা করা যায় না। এমনিভাবে সহীহ দ্বীন এবং সঠিক মাসআলা পেয়ে রুহের চিকিৎসার জন্য নিঃস্বার্থ হক্কানী উলামায়ে কিরামের স্মরণাপন্ন হওয়া জরুরী। এর কোন বিকল্প নেই। এ ধরনের বিজ্ঞ হক্কানী আলেমদেরকে বড় বড় দ্বীনী মাদরাসা ও দ্বীনী বড় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাওয়া যায়। যেখানে সেখানে তাদেরকে পাওয়া যায় না। শুধু নামধারী আলেম-উলামাদের নিকট সহীহ দ্বীন পাওয়া যায় না। এক শ্রেণীর লোক যারা হক্কানী উলামাদেরকে দেখেননি, তাদের সম্পর্কে ধারণাও রাখেন না। নিজেদের সাথে তুলনা করে হক্কানী হক্কানী উলামাদেরকে সেরুপ মনে করেন এবং দ্বীনে ইসলাম ও উলামাদের সম্পর্কে অযাচিত মন্তব্য করে থাকেন। অথচ এটা তাদেরই দুর্বলতা, এ কথা তাঁরা বুঝেন না।

{পৃষ্ঠা-৪৫২}

সুতরাং আপনাকে বলছি, হাটহাজারী, পটিয়া, নানুপুর, রাহমানিয়া, যাত্রাবাড়ী প্রভৃতি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে যেসব পত্রিকা বের হয়, সেগুলো থেকে সহীহ দ্বীন পেতে চেষ্টা করুন। আর যে সমস্ত পত্রিকা এ ধরনের সর্বজনমান্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া এমন স্থান থেকে প্রকাশিত হয়, যা দেশের দ্বীনদার লোকদের জ্ঞানের বাইরে। যেখানে না আছে কোন হক্কানী বুযুর্গ এবং সেখানে যেসব মুফতগীন ফাতাওয়া লিখেন, তারা কোত্থেকে মুফতী হয়েছেন, কে তাদেরকে ফাতাওয়া দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছেন, এর কোন কিছুর আগামাথা নেই। তারা কাদের পক্ষ হয়ে কাজ করছেন তাও পরিষ্কার নয়। তন্মধ্যে মাসিক আল বায়্যিনাত অন্যতম। এ ধরনের পত্রিকা থেকে দূরে থাকা উচিত।

[বাদায়েউস সানায়ে ২:৯৩]

রোযা অবস্থায় ইনজেশন নিলে রোযা ভঙ্গ না হওয়ার কারণ

জিজ্ঞাসাঃ ইনজেকশনের দ্বারা শরীরে ঔষধ পৌঁছানোর কারণে শরীরের শক্তি বৃদ্ধি পায়, ক্ষুধা নিবারণ হয় তাই রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা ভঙ্গ হবে কি-না জানতে চাই।
জবাবঃ রোযা অবস্থায় পেটে বা মস্তিষ্কে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ, নাক, কান, গলা বা পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে ইচ্ছাপূর্বক কোন কিছু প্রবেশ করলে বা দাখিল হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। এটাই শরীয়তের বিধান। ইনজেকশন দ্বারা যেহেতু স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা দেমাগ কিছু পৌঁছে না। সুতরাং, তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না। আর শুধু শরীরে কোন কিছু প্রবেশ করলে বা করালেই রোযা ভঙ্গ হয় না। যেমন উযু বা গোসল করলে অথবা শরীরে তৈল মালিশ করলে, পানি ও তৈল শরীরে কিছু কিছু প্রবেশ করে। যার ফলে গরমের সময় গোসল করলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। অনেক সময় ক্ষুধাও নিবারণ হয়ে যায়। এমন কি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অধিক গরমের সময় রোযা অবস্থায় শরীর ঠাণ্ডা করার জন্য ভিজা কাপড় মাথায় দিয়ে রেখেছেন। মাথার শিরার সাথে যেহেতু শরীরের সমস্ত শিরার সম্পর্ক রয়েছে, তাই মাথা ঠাণ্ডা হওয়ার কারণে সমস্ত শরীরও ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এগুলো যেহেতু মস্তিষ্কে বা পেটে স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পৌঁছে না, তাই এর দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না।
এমনিভাবে ইনজেকশনের ঔষধ দ্বারা যদিও অনেক সময় ক্ষুধা নিবারণ হয় এবং শরীর ঠাণ্ডা হয়, কিন্তু ইনজেকশনের ঔষধ স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে না। অতএব, ইনজেকশনের দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না এবং রোযার কোন প্রকার ক্ষতিও হবে না।
[প্রমাণঃ বাদায়েউস সানায়ে ২:৯৩# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২]
{পৃষ্ঠা-৪৫৩}
রোযা অবস্থায় সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো
জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা যদি রোযা অবস্থায় তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করায়, তাহলে এতে তার রোযার কোন ক্ষতি হবে কি?
জবাবঃ কোন মহিলা যদি রোযা অবস্থায় সন্তানকে দুগ্ধ পান করায় তাহলে এতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, শরীর থেকে কোন কিছু বের হলে রোযা ভঙ্গ হয় না। কারন, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস বর্জন করার নাম হচ্ছে রোযা। সুতরাং রোযা অবস্থায় স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে কোন কিছু পেটে অথবা মস্তিষ্কে প্রবেশ করলেই কেবল রোযা ভঙ্গ হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৩:৩৭১# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮, ৪১০ও ৪১৩]
সাহরী খেয়ে ঘুমানোর পর স্বপ্নদোষ হওয়া
জিজ্ঞাসাঃ সাহরী খাওয়ার পর ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়েছে। (ক) এখন কি রোযা ভঙ্গ হয়েছে? (খ) এখন পাক হওয়ার নিয়ম কি? (গ) ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নামায ও কুরআন শরীফ পড়তে পারবে কি-না?
জবাবঃ (কা) সাহরী খাওয়ার পর ঘুমে বা রোযা থাকা অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমে স্বপ্নদোষ হলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।
(খ) স্বপ্নদোষ হলে ঘুম থেকে উঠে ফরয গোসলের নিয়ম অনুযায়ী গোসল করলে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে গড়গড়া ছাড়া কুলি করবে এবং সতর্কতার সাথে নাকে পানি পৌঁছাবে। যাতে পেটে পানি না পৌঁছে।
(গ) গোসল করে পবিত্র হওয়ার পর নামায ও কুরআন শরীফ তিলাওয়াত এবং অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৯৬]
রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া বা নিম, পেষ্ট দিয়ে দাঁত মাজা
জিজ্ঞাসাঃ (ক) রোযা অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি-না?
(খ) টুথপেষ্ট বা নিমের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করার হুকুম কি?

জবাবঃ (ক) রোযা অবস্থায় যে কোন ধরনের ইনজেকশন নেয়া জায়িয আছে। তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।
(খ) রোযা অবস্থায় টুথপেষ্ট বা নিমের মাজন দ্বারা মিসওয়াক করা নিষেধ ও মাকরূহ হবে। তবে গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা যায়।
[প্রমাণঃ বাদায়িউস সানায়ি ২:৯৩# ফাতাওয়া শামী ২:১০৬# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪০৮# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২২]
{পৃষ্ঠা-৪৫৪}
সাহরী/ ইফতার ও ইতিকাফ
রামাযান মাসে সাহরীর জন্য মসজিদের মাইক দিয়ে ডাকাডাকি করা
জিজ্ঞাসাঃ রামাযান মাসে সাহরী খাওয়া ও সাহরী রান্না করার জন্য মসজিদের মাইক দিয়ে এলাকার লোকদিগকে ডাকাডাকি করে ঘুম থেকে সজাগ করা ইসলামী শরীয়ত মতে কোন অসুবিধা আছে কি-না? জানতে চাই।
জবাবঃ রামাযান মাসে মসজিদের মাইক দিয়ে এলাকার লোকদিগকে সাহরী খাওয়ার জন্য প্রয়োজন পরিমাণ ডাকাডাকি করা এবং সাহরীর সময় বলে দেওয়া জায়িয আছে। কিন্তু ডাকাডাকিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হামদ, নাত, গজল ও জিকির ইত্যাদি আরম্ভ করে ব্যক্তিগত ইবাদতে মগ্নদের বিঘ্ন সৃষ্টি করা, তেমনিভাবে রুগ্ন ও অসুস্থ ব্যক্তিদের ঘুম ও আরামে বিঘ্ন সৃষ্টি করা মোটেই ঠিক নয়।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ৪:৪৪৫# আহকামুল মসজিদ ৮৫# আল ফিকহুল ইসলামী ৮:১৮৩# খাইরুল ফাতাওয়া ২:৭৭০# কাওয়ায়ীদুল ফিকাহ ১২৫]
ইফতারে বিলম্ব করা
জিজ্ঞাসাঃ (ক) রোযা কখন কার উপর ফরয হয়? (খ) রামাযানের ইফতারের জন্য মাগরিবের আযানের পর দেরী করাতে কোন অুসবিধা আছে কি-না? আযান চলাকালীন অবস্থায় ইফতার করা যাবে কি-না?
জবাবঃ (ক) বালেগ হওয়ার পর থেকেই প্রত্যেক ছেলে ও মেয়ের উপর রোযা ফরয হয়। তবে বাচ্চাদের রোযার ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়ার জন্য শারীরিক ক্ষমতা এসে গেলে, বালেগ হওয়ার পূর্বেই রোযা রাখার হুকুম করা এবং রোযা রাখতে অভ্যস্ত করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব।
(খ) ইফতারের নির্ধারিত সময় নিশ্চিত হওয়ার পরে দেরী করা ঠিক না। উজর ব্যতিরেকে ইফতারের সময় হওয়ার পরে দেরী করা মাকরূহ। ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিবের আযান যখন দেয়া হয়, তখন আযান চলাকালীন সময়েও ইফতার করাতে কোন দোষ নেই।
আবার যদি কোন মসজিদে ওয়াক্ত হওয়ার পরও মাগরিবের আযান দিতে বিলম্ব করতে থাকে, তখন ওয়াক্ত হওয়ার পর আযানের আগে ইফতার করাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু সূর্যোস্তের পূর্বে ইফতার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:১০৭# জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া ১:১১-১২]
ইফতার বাবদ সংগৃহীত টাকা উদ্ধৃত থাকলে তার হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ আমরা বিগত রামাযান মাসে মুসল্লীদের নিকট থেকে রোযাদারদের ইফতারী বাবদ কিছু টাকা সংগ্রহ করি। ইফতারী করানোর পর এই ফাণ্ডের কিছু টাকা বেঁচে গিয়েছে। টাকাগুলো আমরা মসজিদের কোন কাজে ব্যয় করতে পারি কি-না? না পারলে তা কি করলে ভাল হয়?
{পৃষ্ঠা-৪৫৫}
জবাবঃ অবশিষ্ট টাকাগুলোর ব্যাপারে কোন সাধারণ মজলিসে আলোচনা করে মসজিদ ফাণ্ডে নেয়ার জন্য দাতাদের অনুমতি চাইবেন। দাতারা অনুমতি দিলে মসজিদ কমিটি মসজিদের যে কোন কাজে উক্ত টাকা ব্যয়

করতে পারবেন। ভবিষ্যতে খাসাভাবে ইফতারের জন্য পৃথক চাঁদা না তুলে মসজিদ এবং ইফতার উভায়ের জন্য একত্রে টাকা তুলবেন, তাহলে আর অবশিষ্ট টাকা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হবে না।
[প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৫৮৮# আহকামুল মাসজিদ ৮৫]
আযান না দিয়ে ঘোষণা দেয়া
জিজ্ঞাসাঃ (ক) যদি কোথাও রামাযান মাসে ইফতারের সময় হলে আযান না দিয়ে ইফতার করার জন্য এলান দেয়া হয় এবং ১৫/২০ মিনিট পরে আযান দেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা আযান দেয়ার সুন্নাত আদায় হবে কি-না?
জবাবঃ যদি রামাযান মাসে ইফতারের সময় হওয়ার সাথে সাথে আযান না দিয়ে শুধু এলান দেয়া হয়, আর মাগরিবের আযান ১৫/২০ মিনিট পরে দিয়ে আযানের পর পরই জামাআত করা হয়, তাহলে এটাই হবে উত্তম তরীকা। তা না করে যদি ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে আযান দেয়া হয় এবং ১৫/২০ মিনিট পর ইফতার হতে ফারিগ হয়ে জামাআত শুরু হয়, এতেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। রামাযানের কারণে বা অন্য কোন বিশেষ কারণে এতটুকু দেরী করার অনুমতি শরীয়তে আছে।
[প্রমাণঃ আবু দাউদ শরীফ ১:৬০# মিশকাত শরীফ ১:৬১# হাশিয়ায়ে দারুল উলূম ২:৪৫# ফাতাওয়া শামী ১:৩৬৯# হালাবী কাবীর ২৩৪# আহসানুল ফাতাওয়া ২:১৩৮]
রামাযানের ক্যালেণ্ডার
জিজ্ঞাসাঃ (ক) প্রতি বছর জামিআ রাহমানিয়া থেকে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডারে এবং রাহমানী পয়গাম পবিত্র রামাযানুল মুবারক উপলক্ষ্যে সাহরী ও ইফতারের ক্যালেণ্ডার প্রচার হয় এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকেও ক্যালেণ্ডার প্রচার করা হয়, কিন্তু সমস্যা হয় যে, আপনাদের ক্যালেণ্ডারের সাথে অন্যান্য ক্যালেণ্ডারে বেশ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে ইফতারীর সময়ের ব্যাপারে। এই পার্থক্যের কারণ জানতে চাই।
(খ) অনেক বছর থেকে বাংলাদেশে মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী সাহেব (রহঃ) প্রণীত বার মাসের ক্যালেণ্ডার সব মহলে গৃহীত হয়ে আসছে। উক্ত ক্যালেণ্ডার এর ব্যাপারে পরবর্তীতে কোন যাচাই বা তাহকীক হয়েছে কি-না?
জবাবঃ অন্যান্য ক্যালেণ্ডারের সাথে জামিআ রাহমনিয়ার ক্যালেণ্ডারের পার্থক্য হওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে।
{পৃষ্ঠা-৪৫৬}
(ক) মুফতী আমীমুল ইহসান সাহেব এর ক্যালেণ্ডারের উপর পরবর্তীতে অনেক গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়েছে। অনেক স্থানে পরিবর্তন ও সংশোধন করা হয়েছে। সেই সংশোধিত ক্যালেণ্ডার বিগত কয়েক বছর থেকে "ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ" বিতরণ ও প্রচার করে আসছে। জামিআ রাহমানিয়া উক্ত সংশোধিত ক্যালেণ্ডারের ভিত্তিতে সাহরী ও ইফতারীর ক্যালেণ্ডার তৈরী করে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কারণ, প্রত্যেকটির ভিত্তিই আলাদা।
(খ) ইফতারীর ব্যাপারে সংশোধিত ক্যালেণ্ডারে সূর্যাস্তের যে সময় উল্লেখ আছে-আমরা সতর্কতার জন্য তার সাথে তিন মিনিট যোগ করে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করে থাকি। অনেক প্রতিষ্ঠান সাবেক ক্যালেণ্ডারে সূর্যাস্তের সময়ের সতর্কতার জন্য ৫ মিনিট যোগ করে যে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করা আছে এটাকে সূর্যাস্তের সময় মনে করে তার সাথে সতর্কতার জন্য দ্বিতীয়বার ৫ মিনিট যোগ করে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করে। যার কারণে অনেক ক্যালেণ্ডারে দেখা যায় রাহমানিয়ার ক্যালেণ্ডার থেকে ৬/৭ মিনিট পরে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ এতটা বিলম্ব করে ইফতার করা হাদীসের দাবী সম্মত নয়। হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সময় হওয়ার পর যথাসম্ভব শীঘ্র ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন।
(গ) অন্যান্য ক্যালেণ্ডারে রোযার হেফাজতের জন্য সুবহে সাদিকের মূল সময় থেকে ৫ মিনিট পূর্বে সাহরীর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু ফজরের ওয়াক্ত সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এর দ্বারা রোযার হেফাজত যদিও হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফজরের আযান ও নামাযের ব্যাপারে সমস্যা থেকে যাচ্ছে যেমন, অনেক মুআজ্জিন সাহেব আছেন যারা উক্ত ক্যালেণ্ডারে সুবহে সাদিকের অর্থাৎ ফজরের সময় শুরু হওয়ার ৫ মিনিট পূর্বে যে সাহরীর শেষ সময়

নির্ধারণ করা হয়েছে, তারা এটা ফজরের ওয়াক্ত শুরু মনে করে আযান শুরু করে দিচ্ছেন। ফাতাওয়া অনুযায়ী ওয়াক্তের পূর্বে হওয়ার কারণে তাদের এ আযান সহীহ হচ্ছে না। যার ফলে ঐসব মসজিদে ফজরের আযান ছাড়াই ফজরের জামাআত কায়িম হচ্ছে। এতে মসজিদ কর্তৃপক্ষ গুনাহগার হচ্ছেন এবং জামাআতের সাওয়াব কম হয়ে যাচ্ছে। এর চেয়ে মারাত্মক একটা অসুবিধা এই হচ্ছে যে, ঐ ভুল আযান শুনে অনেকে যারা ঘরে ফজরের নামায পড়ে ফেলছেন তাদের অনেকের নামায, ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পূর্বে হওয়ায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এসব সমস্যা সামনে রেখে রাহমানিয়ার ক্যালেণ্ডারে সুবহে সাদিকের মূল

{পৃষ্ঠা-৪৫৭}

সময় থেকে ৫ মিনিট পূর্বে তাহাজ্জুদ নামায এবং সাহরী খাওয়া বন্ধ করতে বলা হয়েছে এবং সুবহে সাদিকের মূল সময় থেকে ৫ মিনিট পরে ফজরের আযান দিতে বলা হয়েছে। সারকথা, অন্যান্য অধিকাংশ ক্যালেণ্ডারে রোযার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং রাহমানিয়ার ক্যালেণ্ডারে রোযা এবং ফজরের আযান ও নামাযের ব্যাপারে সতর্কতা অবম্বন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সুবহে সাদিক এর মূল সময়টি যেহেতু হিসাব করে বের করা হয়েছে, এতে বাস্তবের সাথে ২/১ মিনিট বেশ কম হওয়া অস্বাভাবিক নয়, তাছাড়া ঘড়ির টাইমের মধ্যেও ২/১ মিনিট কমবেশী থাকতে পারে। উভয় সমস্যা এড়ানোর জন্য মূল সময় থেকে পাঁচ মিনিট পরে আযান দিতে বলা হয়েছে। এটা শুধু ফজরের সাথে খাছ নয় বরং সকল ওয়াক্তেই কিছুটা সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করা চাই। ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী সময় হলেই আযান শুরু করে দেয়া উচিত নয়।

(খ) হ্যাঁ, মুফতী আমীমুল ইহসান সাহেব (রহঃ) প্রণীত ক্যালেণ্ডরের উপর আনুমানিক ৭/৮ বছর পূর্বে ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উদ্যোগে বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব হযরত মাওলানা উবাইদুল হক সাহেব এর নেতৃত্বে উলামায়ে কিরাম, আবহাওয়াবিদ ও সৌরবিদদের সমন্বয়ে ব্যাপক গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়। অতঃপর তারা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন এবং তাদের তৈরী নকশা হযরতুল আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান সাহেবসহ দেশের আরো কিছু মুফতী সাহেবদের খিদমতে পেশ করেন। তারপর থেকে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ উক্ত সংশোধিত ক্যালেণ্ডার প্রচার করে আসছে। মুফতী আমীমুল ইহসান সাহেব (রহঃ) প্রণীত ক্যালেণ্ডার এবং পরবর্তী ক্যালেণ্ডারের মধ্যে অনেক স্থানে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান আছে। যার কয়েকটি নিম্নে দেয়া হলোঃ

(ক) ফজর ও মাগরিবের সময়ের মধ্যে উভয় ক্যালেণ্ডারের মধ্যে বহু তারিখে ৪/৫ মিনিটের পার্থক্য আছে, যে কারণে সংশোধিত ক্যালেণ্ডারে কয়েক মাসে সাবেক ক্যালেণ্ডারের তুলনায় ৪/৫ মিনিট পূর্বেই ইফতারীর সময় হয়ে যায়।

(খ) সাবেক ক্যালেণ্ডারে ফজরের সময়ের ব্যাপারে কোন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই, শুধু সতর্কতামূলক সাহরীর শেষ সময় লেখা হয়েছে। আর কোন কোন ক্যালেণ্ডারে মাত্র এক মিনিটের সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে-যা মোটেই যথেষ্ট নয়। আর সংশোধিত ক্যালেণ্ডারে ৩/৫ মিনিট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।

{পৃষ্ঠা-৪৫৮}

(গ) সাবেক ক্যালেণ্ডারে বিভিন্ন জেলা শহরের সময় উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে, ঢাকার সময় থেকে ৫ মিনিট বাড়াতে হবে বা ঢাকার সময় থেকে ৪/৫ মিনিট কমাতে হবে। আর সংশোধিত ক্যালেণ্ডারে প্রত্যেক জিলা শহরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যালেণ্ডার তৈরী কর হয়েছে। কারণ, নির্দিষ্ট কয়েক মিনিট এর পার্থক্যের মাধ্যমে পূর্ণ এক বৎসর এর বাস্তব সময়সূচী রক্ষা কর সম্ভব হয়নি। মুফতী সাহেব (রহঃ) জিলাসমূহের পার্থক্যের ব্যাপারে অক্ষাংশের তারতম্য না করে শুধু দ্রাঘিমার উপর ভিত্তি করেছেন। অথচ বর্তমান সৌরবিদদের তাহকীক অনুযায়ী একই দ্রাঘিমার হয়ে অক্ষাংশের তারতম্যের কারণে বিভিন্ন মৌসুমে নামায ও রোযার সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে। সুতরাং ঢাকা শহরের সময়সূচী থেকে অন্যান্য জেলা শহরের সময়সূচী নির্ণয় করতে হলে দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশ উভয়টি প্রতি দৃষ্টি রাখা জরুরী।

টাকার বিনিময়ে মসজিদে ই'তিকাফে বসানো।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় সকলে মিলে একজন গরীব লোককে টাকার বিনিময়ে মসজিদে ই'তিকাফ করার জন্য বসিয়ে দেয়। এখন প্রশ্ন হলো টাকার বিনিময়ে ই'তিকাফ করানো জায়িয আছে কি-না?
জবাবঃ বিনিময় নিয়ে ই'তিকাফ করা বা করানো জায়িয নেই। কেননা ই'তিকাফ এটা খালেছ ইবাদত আর ইবাদতের বিনিময় দেওয়া এবং নেওয়া উভয় নাজায়িয। তবে যদি কোন এলাকায় ই'তিকাফ বিনিময় দেওয়া-নেওয়ার প্রচলন না থাকে এবং কোন দরিদ্র ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী প্রতিদান ছাড়াই ই'তিকাফ করে। এরপর এলাকার লোকজন তাকে কিছু টাকা-পয়সা দান করে বা হাদিয়া দেয়, তাহলে এই টাকা দেওয়া-নেওয়া উভয়ই জায়িয হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ২:১৯৯# মাসায়িলে ই'তিকাফ ১৫]
ولا يجوز اخذ الاجرة على الطاعة كالمعصية وفيه ان اخذ الاجرة على الطاعة لا يجوز مطلقا عند المتقدمين واجازه المتأخرون على تعليم القرأن والاذان والامامة للضرورة. (الدرالمختار:199/2)

রোযার কাযা/ কাফফারা/ ফিদিয়া

রোযার কাফফারা
জিজ্ঞাসাঃ রোযার যে তিন রকমের কাফফারা অর্থাৎ, গোলাম আযাদ করা, ষাট দিন বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা বা ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়ানোর কথা কিতাবে উল্লেখিত আছে, এ তিনটির মধ্যে হতে কোনটি উত্তম?
জবাবঃ উপরোক্ত তিন রকমের কাফফারা প্রত্যেকটি পর্যায়ক্রমে ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ গোলাম আযাদ করা। এটা যদি সম্ভব না হয়, তাহলে দ্বিতীয়
{পৃষ্ঠা–৪৫৯}
পর্যায়ে ওয়াজিব হচ্ছে-দুই মাস বিরতিহীনভাবে রোযা রাখা। আর যদি তাও সম্ভব না হয়, তাহলে তৃতীয় পর্যায় ষাটজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে আহার করানো।
সুতরাং কেউ যদি গোলাম আযাদ করতে সক্ষম হয়, তাহলে দুই মাস রোযা রাখার দ্বারা তার কাফফারা আদায় হবে না। তেমনিভাবে কেউ যদি দুই মাস রোযা রাখতে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য ষাটজন মিসকীনকে আহার করানোর দ্বারা কাফফারা আদায় হবে না।[প্রমাণঃ সূরা মুজাদালাহ ৩-৪# ফাতাওয়া শামী ২:৩১২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৪৭]
বর্তমানে গোলামের প্রথা চালু না থাকায় গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে কাফফারা আদায় করা সম্ভব নয়।
কাফফারার রোযা রাখা অবস্থায় ঈদ এসে গেলে করণীয়
জিজ্ঞাসাঃ কোন ব্যক্তি রোযার কাফফারা আদায় করতে শুরু করার কিছুদিন পরই ঈদুল আযহার সময় হয়ে যায়। এমতাবস্থঅয় উক্ত ব্যক্তির পূণরায় ষাটটি রোযা রাখতে হবে কি-না?
জবাবঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে রোযার কাফফারার জন্য রামাযান, ঈদ কিংবা আইয়ামে তাশরীক নেই এমন ২মাস ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখা জরুরী। তাই ষাটদিনের ভিতরে ঈদ এসে গেলে ঈদের পর নুতনভাবে ষাট দিন রোযা রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, কাফফারার রোযা রাখা অবস্থায় মাহিলার মাসিকের কারণে বিরতি পালন করতে হলে সেক্ষেত্রে পুনরায় শুরু থেকে নতুনভাবে রোযা রাখতে হয় না। তবে মাসিক বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে অবশিষ্ট রোযাগুলো রাখা আরম্ভ করতে হবে।
[প্রমাণঃ সুরা মুজাদালাহ ৪# ফাতাওয়া শামী ২:৪১২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৫৫ ও ৪৫৮]
নামায না পড়ে রোযা রাখার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের মহল্লার এক ব্যক্তি রোযা রাখে, কিন্তু সে নামায পড়ে না। এমতাবস্থায় তার রোযা হবে কি-না?
জবাবঃ নামায ও রোযা পৃথক দু'টি ফরয ইবাদত। একটি আরকেটির উপর নির্ভরশীল নয়। সুতরাং নামায না পড়লেও তার রোযা হয়ে যাবে। তবে নামায পরিত্যাগ করার কারণে তার কঠিন গুনাহ হবে। যার পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ এবং উক্ত ব্যক্তি চরম পর্যায়ের ফাসিক হিসেবে বিবেচিত হবে।
সুতরাং এমন ব্যক্তির জন্য খালেসভাবে তাওবাহ করে নিয়মিত নামায পড়া শুরু করে দেয়া এবং অতীতের নামাযগুলো কাযা আরম্ভ করা অপরিহার্য কর্তব্য। কেননা, বেনামাযী ব্যক্তির মাঝে ও কাফিরের মাঝে বিশেষ কোন পার্থক্য থাকে না।
[প্রমাণঃ মিশকাত ১:৫৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৯৯]
{পৃষ্ঠা-৪৬০}
মৃত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া নামায রোযার জন্য সন্তানের করণীয়
জিজ্ঞাসাঃ ইন্তিকালের আগে আমার পিতা অসুস্থতার কারণে কিছু দিন নামায-রোযা আদায় করতে পারেনি। এ অনাদায়কৃত নামায-রোযার জন্য সন্তান হিসেবে আমরা কি আমল করতে পারি, যাতে উনার আত্মার উপর শান্তি বর্ষিত হয়।
জবাবঃ আপনার পিতা ইন্তিকালের সময় যদি নামায ও রোযার ফিদিয়া দেওয়ার অসীয়ত করে গিয়ে থাকেন এবং তিনি সম্পদও রেখে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর সে সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হতে ছুটে যাওযা নামায রোযার কাফফারা আদায় করে দেওয়া আপনাদের জন্য জরুরী। আর যদি মাল না রেখে গিয়ে থাকেন, অথবা মাল রেখে গিয়েছেন, কিন্তু ওসীয়্যত করেননি, তাহলে এক্ষেত্রে আপনাদের উপর তার কাফফারা দিয়ে দেওয়া ওয়াজিব নয়। তবে আপনাদের তাওফীক থাকলে মরহুম পিতার নাজাতের জন্য কাফফারা দিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য সন্তানদের মধ্যে কেউ নাবালেগ থাকলে সেক্ষেত্রে তার প্রাপ্য অংশ হতে ফিদিয়া দেওয়া যাবে না। বরং নাবালিগদের অংশ পরিপূর্ণ আদায় করে দেওয়ার পর শুধু বালিগদের অংশ থেকে তাদের সম্মতিক্রমে ফিদিয়া আদায় করতে পারেন।
উল্লেখ্য যে, অসুস্থতার দিনগুলোতে যদি ছয় ওয়াক্ত বা তার অধিক সময় লাগাতার বেহুশ থাকে তাহলে সে সময়ের নামাযের কাফফারা আদায় করতে হবে না। তেমনি যদি জ্ঞান বুদ্ধি ঠিক না থাকে তাহলে তার উপর নামায ফরয হবে না
তেমনিভাবে যদি অসুস্থ অবস্থায় মারা যায় তাহলে ঐ রোযার ফিদিয়া দিতে হবে না। আর সুস্থ হওয়ার পর কাযা করার সুযোগ পাওয়া সত্বেও কাযা না করে মারা গেলে শুধু ঐ দিনগুলোর ফিদিয়া দিতে হবে। রোযা ও নামাযের ফিদিয়ার পরিমাণ হলোঃ প্রতিদিন বিতির সহ ছয় ওয়াক্ত নামায ধরে প্রতি ওয়াক্ত নামায বা প্রতিটি রোযার জন্য পৌনে দুই সের গম/ আটা বা তার সমপরিমাণ মূল্য গরীব মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দিবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪২২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৬২]
স্বপ্নদোষে রোযা ভঙ্গ হয়েছে সন্দেহ করে কিছু খেলে
জিজ্ঞাসাঃ রামাযানে স্বপ্নদোষ হওয়ার পর রোযা ভঙ্গ গেছে এরুপ ধারণায় কোন কিছু খেয়ে ফেললে উক্ত ব্যক্তির উপর কাফফার ওয়াজিব হবে কি-না?
{পৃষ্ঠা-৪৬১}
জবাবঃ রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে তাতে রোযা ভঙ্গ হয় না। তবে কেউ যদি স্বপ্নদোষ হলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায় মনে করে কিছু খেয়ে ফেলে তবে তার উপর কাযা ওয়াজিব হয়, কাফফারা ওয়াজিব হয় না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৫৯৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪২২]
অন্যের পক্ষ থেকে রোযা কাযা করার হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ স্ত্রীর কাযা রোযা স্বামী আদায় করতে পারবে কি-না?
জবাবঃ স্ত্রীর রোযার কাযা স্বয়ং স্ত্রীরই আদায় করতে হবে। স্বামী অথবা অন্য কেউ আদায় করলে তা আদায় হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪০২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪২২]
কাফফারার টাকা দিয়ে ইয়াতীমখানা নির্মাণ
জিজ্ঞাসাঃ কাফফারার টাকা দিয়ে ইয়াতীমখানার জন্য জমি ক্রয় করা জায়িয হবে কি-না?
জবাবঃ কাফফারার টাকাগুলো যাকাত নেয়ার উপযোগী গরীবদেরকে মালিক বানিয়ে দিয়ে দিতে হবে। কাফফারার টাকা দিয়ে ইয়াতীমখানার জন্য জমি ক্রয় করলে যেহেতু গরীব-মিসকীনকে মালিক বানিয়ে দেয়া হয় না, তাই তা জায়িয হবে না এবং এভাবে দিলে কাফফারা আদায় হবে না।
[প্রমাণঃ জাওয়াহিরুল ফিকহ ১:৩৯২# ফাতাওয়া শামী ২:৩৪৪# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৪৭]
অসুস্থ অবস্থায় রোযা
জিজ্ঞাসাঃ আমার স্ত্রীর বয়স ২২ বৎসর। সে বিগত ৫ বৎসর যাবত জটিল গ্যাস্ট্রিক রোগে ভুগছে। যার কারণে আজ চার বৎসর যাবৎ রামাযান মাসে কষ্ট করে ৪/৫ টি রোযা রাখলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, ডাক্তারের পক্ষ থেকে রোযা রাখা সম্পূর্ণ নিষেধ। এখন আমি তার বিগত দিনের রোযা এবং আগামী রামাযানের রোযার ব্যাপারে কি করতে পারি?
জবাবঃ আপনার বর্ণনা অনুযায়ী আপনার স্ত্রীর জন্য সুস্থ হওয়া পর্যন্ত রোযা রাখা জরুরী নয়। যখন সুস্থ হবে, তখন উক্ত রোযাগুলো কাযা করে নিতে হবে। আর যদি ইন্তিকালের পূর্বে সুস্থ না হয়, তাহলে ফিদিয়া দিতে হবে না। অবশ্য যদি দু'একটি করে রামাযানে ও পরবর্তীতে রাখতে সক্ষম হয়, তবে সেভাবে কাযা আদায় করে নিতে হবে।
[প্রমাণঃ সূরা বাকারহ ১৮৪# হিদায়া ১:২২১]
বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অক্ষম হলে করণীয়
জিজ্ঞাসাঃ আমার নানী বার্ধক্যের কারণে রোযা রাখতে অক্ষম এবং **ভবিষ্য**তে যে কাযা করতে পারবেন, এমন কোন আশাও নেই। এমতাবস্থায় তাঁর জন্য করণীয় কি?
{পৃষ্ঠা–৪৬২}
জবাবঃ আপনার নানী যদি প্রকৃতপক্ষেই রোযা রাখতে অক্ষম হন এবং **ভবিষ্য**তে তার দ্বারা রোযা রাখার কোন আশাও না থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান হলো, প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দু'বেলা পেট পুরে আহার করাবেন অথবা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে পৌনে দুই সের গম বা আটা অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য মিসকীনদেরকে দিয়ে দিবেন।
[প্রমাণঃ সূরা বাকারাহ ১৮৪# বুখারী শরীফ ২:৬৪৭# ফাতাওয়া শামী ২:৪২৮# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৪৬১]
সফরের কারণে রামাযান মাসে উনত্রিশটির কম রোযা হলে
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি রামাযানের প্রথম অংশে বাংলাদেশে ছিল। এরপর সে লণ্ডনে চলে যায়। সেখানে বাংলাদেশের চেয়ে একদিন পুর্বে ঈদ অনুষ্ঠিত হয়। আর সেও অন্যান্যদের সাথে ঈদ উদযাপন করে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে রামাযানের রোযা লণ্ডনের চেয়ে একদিন পর শুরু হওয়ার তার রোযার সংখ্যা হয়েছে আটাশটি। সুতরাং এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির জন্য ঊনত্রিশতম রোযা রাখা জরুরী কি-না?
জবাবঃ এরুপ ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের ঈদের দিনে ঈদ উদযাপন করা কর্তব্য এবং পরে তার জন্য অতিরিক্ত একটি রোযা করে ঊনত্রিশতম রোযা কাযা করা জরুরী।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৮৪# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪২৩# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৩৯৯]

শাওয়ালের ছয় রোযার কাযা রোযার বা কাযা রোযার
শাওয়ালের ছয় রোযার নিয়্যত করা
জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলার রামাযানের ৫/৬টি রোযা ছুটে গেছে, এমতাবস্থায় সে যদি শাওয়াল মাসে রোযা আদায় করে, তাহলে একত্রে ফরয রোযার কাযা এবং শাওয়াল এর নফল রোযা আদায় হবে কি-না? অথবা সে শাওয়াল মাসের নফল রোযা রাখা অবস্থায় রামাযানের ছুটে যাওয়া ফরয রোযার কাযার নিয়্যত করল এ অবস্থায় নফল এবং ফরয রোযার কাযা একত্রে আদায় হবে কি-না? প্রমাণসহ জানতে চাই।
জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত উভয় সুরতেই রামাযানের কাযা রোযাই আদায় হবে। শাওয়ালের নফল রোযা আদায় হবে না। হাদীসে শাওয়ালের রোযার যে ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে তাও পাওয়া যাবে না । বরং তার জন্য শাওয়াল মাসের মধ্যে পৃথক আরো ছয়টি রোযা রাখতে হবে।
তবে ইচ্ছা করলে শাওয়াল মাসে শাওয়ালের রোযা আদায় করে, পরবর্তী মাসে বা অন্য সময়ে কাযা রোযাগুলো আদায় করে নিতে হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৯৭# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৪৩০]
{পৃষ্ঠা–৪৬৩}
রোযার নিয়্যতের সময়সীমা
জিজ্ঞাসাঃ মাসিক রাহমানী পয়গাম জানুয়ারী ৯৮ সংখ্যায় "রোযার মাসায়িল" শিরোনামে রামাযানের দিনে ১১টার পূর্বে রোযার নিয়্যত করলেই রোযা হয়ে যাবে। কিন্তু অন্য একটা মাসিক ম্যাগাজিনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীসে শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রাত্র শেষ হওয়ার পূর্বেই রোযার নিয়্যত করল না, তারা রোযা হবে না। সঠিক মাসআলা জানতে চাই।
জবাবঃ রাহমানী পয়গামে যা লেখা হয়েছে, তাই সঠিক। দ্বীপ্রহর এর পূর্বে আনুমানিক বেলা ১১টার পূর্বে নিয়্যত করলেই রামাযানের রোযা হয়ে যাবে। কেননা, বুখারী শরীফে আছে যে, রামাযান শরীফের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে যখন আশুরার রোযা ফরয ছিল, তখন একবার ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় মদীনার লোকেরা মুহাররমের ৯ তারিখে এক ব্যক্তিকে ঘোষণা করতে বললেন যে, যারা খানা খেয়েছে তারা যেন বাকী দিন না খায়। আর যারা খায়নি তারা যেন রোযার নিয়্যত করে নেয়। কেননা আজ আশুরার দিন। উল্লেখ্য, উক্ত মাসিক ম্যাগাজিনে যে হাদীসটি পেশ করা হয়েছে, তা কাযা রোযা বা অনির্দিষ্ট মান্নতের রোযার সাথে সম্পৃক্ত। ফরয, নফল বা নির্দিষ্ট মান্নতের রোযার ব্যাপারে নয়।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৩৭৭# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৩৪৪# বুখারী শরীফ ১:২৬৮# আবূ দাঊদ শরীফ ১:৩৩২]
রোযা ও তারাবীহের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ
জিজ্ঞাসাঃ হাদীসে এসেছে, "অনেক রোযাদারের রোযা রাখার বিনিময় ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া আর কিছুই হাসিল হবে না। তেমনিভাবে অনেকের রাত্র জাগরণ ও তারাবীহর নামায পড়ার বিনিময় জাগ্রত থাকা ছাড়া আর কিছুই হাসিল হবে না"। এ হাদীসের ব্যাখ্যা কি? আমাদের দেশে তারাবীহের নামাযে যেভাবে দ্রুত কুরআন পাঠ করা হয়, যার কারণে আয়াতের শেষ অংশ ছাড়া আর কোন অংশ পরিষ্কার বুঝার কোন উপায় থাকে না, এটা কতটুকু ঠিক?
জবাবঃ উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য ও মর্ম হলো- যারা রোযা রেখে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে গুনাহ থেকে হিফাজত করে না, রামাযানের পূর্বে যেমন গুনাহে লিপ্ত ছিল, রামাযানেও তেমনি গুনাহে লিপ্ত থাকে। হালাল রিযিকের ব্যবস্থা করে না, জিহ্বা ও চক্ষুর হিফাজত করে না (অথচ রোযার মূল উদ্দেশ্য গুনাহ ছেড়ে দিয়ে তাকওয়া অর্জন করা।) এমন ব্যক্তিদের রোযার দ্বারা যদিও কানুন মাফিক তাদের জিম্মাদারী আদায় হয়, কিন্তু রোযার আসল উদ্দেশ্য ও

রুহানিয়্যাত হাসিল না হওয়ায় তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, ক্ষুধার্ত থাকা ছাড়া তাদের রোযার অন্য কোন বিনিময় হাসিল হয় না।
[প্রমাণঃ তাফসীর মাজহারী ৫:৩৬# তিরমিযী শরীফ ১:২৫৫]
{পৃষ্ঠা-৪৬৪}
তেমনিভাবে যারা রামাযানে কষ্ট করে ২০ রাকাত তারাবীহ পড়লো, কিন্তু সে নামাযে মনোনিবেশ করলো না বা নামাযে এমন দ্রুত কুরআন শরীফ পড়লো যে, হরফগুলো সঠিকভাবে মাখরাজ থেকে সিফাতের সাথে উচ্চারিত হতে পারে না, মদ-গুন্নাহ ইত্যাদি সঠিকভাবে আদায় হয় না, ওয়াকফ লাযিমের প্রতি লক্ষ্য করা হয় না, এ সমস্ত লোক হাদীসের দ্বিতীয় অংশের দ্বারা উদ্দেশ্য। এভাবে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয নয়, তেমনিভাবে এরুপ কুরআন তিলাওয়াত শ্রবণ করা এবং এরুপ তিলাওয়াতের সম্মতি দেয়াও জায়িয নয়। কুরআনে কারীমকে তাজবীদের সাথে সহীহভাবে তিলাওয়াত করা জরুরী। আর সহীহভাবে তিলাওয়াতের ভিত্তিতে সাওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। অশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর জন্য কুরআন লানত করতে থাকে। তবে ফরয নামায থেকে তারবাহী নামাযে একটু চালু করে পড়ার নিয়ম রয়েছে। এরুপ পদ্ধতিতে কুরআন তিলাওয়াত করাকে হদর বলা হয়। হদর এর নিয়ম মত সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করায় কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেভাবে তারাবীহ নামায পড়া হয় সেটাকে কোনক্রমেই হদর পড়া বলা চলে না। সুতরাং এ ধরনের তিলাওয়াত দ্বারা সাওয়াবের কোন আশা করা যায় না। আর বর্তমানে যেভাবে দ্রুত পড়া এবং কম সময়ে তারাবীহ খতম করার প্রশংসা করা হয় এটা নিতান্তই অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ যারা সঠিক নিয়মে সহীহভাবে তারাবীহ পড়ে থাকেন তাদের নামায দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত কারীদের থেকে মাত্র ১০/১৫ মিনিট সময় বেশী লাগে। এ ১০/১৫ মিনিটের জন্য তারাবীহ নামাযের সাওয়াব বাতিল করে গুনাহগার হওয়া কত বড় দুর্ভাগ্যের কথা। এজন্য পূর্বেই হাফেয সাহেবদের সাথে এ মর্মে শর্ত করা জরুরী, যাতে করে তারা এভাবে কুরআন কারীমকে বিগড়িয়ে সকলকে গুনাহগার না করেন। বরং সহীহভাবে হদরের নিয়মে কুরআন তিলাওয়াত করেন।
[প্রমাণঃ সূরা মুযযাম্মিল, আয়াতঃ ৪ # মিশকাত ১:১১৪# তিরমিযী শরীফ ২:১১৯-১২১# নাসায়ী শরীফ ১:১১৬]
আরো একটি কারণে তারাবীহ নামাযের সাওয়াব বাতিল হয়ে রাত জাগরণ ছাড়া আর কোন ফায়েদা হয় না। সেটা হল হাফেযদেরকে চুক্তির ভিত্তিতে বা চুক্তি ছাড়া প্রথা অনুযায়ী তারাবীহ নামাযের বিনিময় প্রদান করা। এটা শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষেধ।
তারাবীহ নামায সুন্নাত। তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ খতম করাও সুন্নাত। কিন্তু বিনিময় লেনদেন করা হারাম। আর এটা সহজে অনুমেয় যে, সুন্নাত আদায় করার জন্য হারাম কাজের অনুমতি হতে পারে না। এজন্য
{পৃষ্ঠা-৪৬৫}
ফুকাহায়ে কিরাম লিখেছেন, “কুরআন খতমের বিনিময় গ্রহণ করে না এ ধরনের মুখলিস হাফেয না পাওয়া গেলে নির্ধারিত ইমামের পিছনে বিনিময় ছাড়া সূরা তারাবীহ পড়ে নিবে। এটাই উত্তম। কারণ, এক্ষেত্রে খতমের সাওয়াব না হলেও অন্তত তারাবীহ নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু বিনিময় দিয়ে খতম তারাবীহ পড়লে তো খতম ও তারাবীহ উভয়টির সাওয়াবই বাতিল হয়ে গেল। বিষয়টির প্রতি সকলেরই দৃষ্টি দেয়া উচিত। অনেকে প্রশ্ন করেন যে, হাফেয সাহেবদের সংসার আছে, বিনিময় দেয়া জায়িয না হলে তাঁরা চলবেন কিভাবে? তাদের কাছে জিজ্ঞাসা- তাহলে কি তারা হাফেযদেরকে হারাম খাওয়ায়ে চালাতে চান? অথচ তারা তাদেরকে ইমামতির সর্বোচ্চ পদে বসিয়েছেন। লক্ষ্য করুন! যে রাব্বুল আলামীনের শরীয়তে তারাবীহ নামায বিনিময় নেয়া হারাম ঘোষিত হয়েছে, তিনিই সকলের রিযিকের দায়িত্ব নিজের উপর রেখেছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের মাথা ব্যথার কিছুই নেই। তিনিই হাফেযদেরক কুরআনে পাক হিফয করার তৌফিক দান করেছেন। নতুবা কোন ব্যক্তি এত বড় কিতাব মুখস্থ রাখতে পারতেন না এবং তিনিই বিধান জারী করেছেন যে, হাফেযগণ

আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার বান্দাদেরকে কুরআন শুনাবেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সম্মানজনক রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। কিভাবে কোথেকে করবেন তিনিই ভাল জানেন। বর্তমান যামানায় যে সমস্ত হাফেযগণ হারাম পয়সা তরক করেছেন, আল্লাহ তা'আলার তাদের জন্য ইজ্জতের সাথে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন।

উল্লেখ্য, কোন হাফেজ সাহেব যদি আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে তারাবীহ পড়ান এবং বিনিময় না নেয়ার ঘোষণা করেছেন অপর দিকে মসজিদ কর্তৃপক্ষ ও হাফেয সাহেবকে বিনিময় না দেয়ার ঘোষণা করেছেন। অতঃপর মুসল্লগীণ নিজস্ব উদ্যোগে হাফেয সাহেবের মুহাব্বতে খতমের সময় ব্যতীত অন্য সময় কিছু হাদিয়া প্রদান করে তবে সেটাকে কুরআন খতমের বিনিময় বলা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে মসজিদ হাফেযদের নামে খাতা কলম নিয়ে যেভাবে চাঁদা আদায় করে তাদেরকে দেয়া হয়, তা শরীয়তের বর্ণিত হাদীয়ার আওতায় পড়ে না। তেমনিভাবে মসজিদ ফাণ্ড থেকে হাফেয সাহেবদেরকে যে বিনিময় দেয়া হয় তা-ও উক্ত হাদিয়ার আওতায় পড়ে না। তাছাড়া এভাবে চাঁদা তুললে প্রকারান্তে হাফিযদের ভিক্ষুক বানিয়ে বেইয্যত করা হয়।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারা ৪১# ফাতাওয়া শামী ৬:১৯৩# মুসনাদে আহমদ ৩৫৭# আবূ দাঊদ ১:২২০# ফাতাওয়া শামী ৬:৫৭# ইমদাদুল মুফতীন ৩৬৫# আহসানুল ফাতাওয়া ৩:৫১৪-১৫]

{পৃষ্ঠা-৪৬৬}

স্থানের পার্থক্যে লাইলাতুল কদর হওয়া প্রসঙ্গ

জিজ্ঞাসাঃ রামাযানের ২০ তারিখের পর আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা লাইলাতুল কদর পালন করে থাকি। যেমন প্রতি বেজোড় রাত যথা-২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তারিখ। কিন্তু সৌদী আরবের তারিখ আমাদের তারিখের সাথে মিলে না। আমাদের দেশে যে তারিখে বেজোড় থাকে সে তারিখেই সৌদী আরবে থাকে জোড়। এখন প্রশ্ন হলো আমাদের দেশের তারিখটা ঠিক-না সৌদী আরবের তারিখ ঠিক? এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই।

জবাবঃ রামাযান শুরু ও শেষ হওয়া নির্ভর করে চাঁদ দেখার উপর। সুতরাং যে দেশে যে দিন রামাযানের চাঁদ দেখবে সে দেশে সেদিন থেকে রামাযানের শুরু হবে। আমাদের দেশে সৌদী আরব থেকে সাধারণতঃ একদিন পর রামাযানের চাঁদ দেখা গেলে শবে কদরও একদিন পরে হওয়া স্বাভাবিক। আল্লাহর জন্য এমনটি করতে কোন অসুবিধা নেই। হাদীস শরীফ এসেছে যে, যোহরের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাতের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেওয়া হয়। অথচ যোহরের সময় বিশ্বের সকল জায়গা একই সাথে হয় না। তাহলে বুঝতে হবে, আকাশের দরজা খুলে দেওয়া প্রত্যেক এলাকার নিজ নিজ সময় মোতাবেক হবে। তেমনিভাবে শবে কদরের বিষয়ে যদি এলাকার বিভিন্নতায় স্থানীয় তারিখের হিসাব বিভিন্ন সময় হয় তাহলে তা-ই প্রযোজ্য।

[প্রমাণঃ মিশকাত ১:১৭৪# আবূ দাঊদ শরীফ ১:১৮০]

রামাযান মাসে ঔষধ সেবন করে হায়েজ বন্ধ রাখা

জিজ্ঞাসাঃ মহিলাদের জন্য রামাযান মাসে রোযা পূর্ণ ত্রিশটা রাখার জন্য ঔষধ খেয়ে হায়েজ বন্ধ রাখা জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ প্রতি মাসে মহিলাদের যে ঋতুস্রাব হয়, তা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী ও জরুরী। কখনো কখনো রোগ বা অন্য কোন কারণবশতঃ যে নিয়মিত ঋতুস্রাব হয় না, তাতে দেহের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। তদুপরি যদি কেউ ঔষধ খেয়ে হায়েজ বন্ধ রাখে, তবে তা হবে দেখে বিপদের দিকে পা বাড়ানো। আর এটা নিন্তান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সুতরাং তা অনুচিত। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মহিলা এরুপ ঔষধ খেয়ে হায়েজ বন্ধ রেখে রোযা পূর্ণ করে, তাহলে তার রোযা সহীহ হবে। তবে স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত করার দরুন কাজটি ঠিক হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৬:৪০৪]

{পৃষ্ঠা-৪৬৭}

হজ্জ

হজ্জের শর্তাবলী, ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত

পেনশনের টাকা দ্বারা হজ্জ করা

জিজ্ঞাসাঃ পেনশনের টাকা দ্বারা হজ্জ করা যাবে কি-না?

জবাবঃ পেনশনের টাকা সর্বসম্মতিক্রমে হালাল। এতে কোন খারাবী বা গুনাহ নেই। তাই এটা গ্রহণ করা যাবে এবং এর দ্বারা হজ্জও আদায় করা যাবে। আপনার উপর হজ্জ ফরয হয়ে থাকলে আপনি উক্ত টাকা গ্রহণ করে হজ্জে যাবার নিয়্যত করে ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু করুন।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:২৬০# জাদীদ ফিকহী মাসায়িল ১:২৫০# ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫:১৪৭]

জমি ও ব্যবসা সামগ্রী থাকা অবস্থায় হজ্জের হুকুম

জিজ্ঞাসাঃ কারো নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত নগদ ক্যাশ না থাকলেও কি হজ্জ ফরয হতে পারে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করেবেন।

জবাবঃ হ্যাঁ, প্রয়োজন হতে অতিরিক্ত নগদ ক্যাশ না থাকলেও কোন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির নিকট অতিরিক্ত জমি–জমা, প্লট ও ব্যবসার সামগ্রী ইত্যাদি রয়েছে, তা হতে কিছু বিক্রি করলে হজ্জের খরচ হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট দ্বারা উক্ত ব্যক্তি ফিরে আসা পর্যন্ত নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনীয় হাজত পূর্ণ হয়ে যায়। তাহলে এমন সব ব্যক্তিবর্গের উপর উক্ত সম্পদ বিক্রি করে হজ্জ করা ফরয। সুতরাং নগদ ক্যাশ হাতে না থাকলেও হজ্জ ফরয হতে পারে।

[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২# মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ ৮১]

যে হজ্জে কংকর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডানোর মাঝে ধারাবাহিকতা ওয়াজিব

জিজ্ঞাসাঃ ১০ই যিলহজ্জ বা ১১ই যিলহজ্জ কুরবানী এবং মাথা না মুণ্ডিয়ে শুধু বড় শয়তানকে পাথর মেরে তাওয়াফে যিয়ারত করা জায়িয কি-না?

জবাবঃ হজ্জে তামাত্তু ও হজ্জে কিরানে তিনটি বস্তুর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা ওয়াজিব। অর্থাৎ প্রথম পাথর মারা, এরপর কুরবানী, অতঃপর চুল খাট করা বা মাথা মুণ্ডানো। আর এ কাজগুলোর পরে তাওয়াফে যিয়ারত করা

{পৃষ্ঠা–৪৬৮}

সুন্নাত। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কাজগুলোর পূর্বে তাওয়াফে যিয়ারত করে নেয় তাহলে দম ওয়াজিব হবে না। বরং সুন্নাতের খিলাফ হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২;৫৩৩# মাযাহিরুল উলূম, ১৬৭# রাহীমিয়া ৮:২৮৬]

যে পরিমাণ সম্পদ হলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের উপর হজ্জ ফরজ হয়

জিজ্ঞাসাঃ একজন লোক কি পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে, তারা স্বামী-স্ত্রী উভয় অথবা একজনের উপর হজ্জ ফরয হবে? যদি উভযের উপর হজ্জ ফরয হয়, তবে কি তার নিজের স্ত্রীকে না নিয়ে খুশী মনে নিজের বড় ভাইকে হজ্জে নিতে পারবে, যার আর্থিক অবস্থা খুব ভাল নয়। যদি পারে তবে এটা কি ঐ বড় ভাইয়ের জন্য বদলী হজ্জ হবে, না তার নিজ হজ্জ হবে? দলীল-প্রমাণের সাথে জানালে উপকৃত হব।

জবাবঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মালিকানা ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং স্বামী অধিক সম্পদের মালিক হলে তার স্ত্রীর উপর হজ্জ ফরয হবে না। বরং স্বামী নিজ খুশী মতে যাকে ইচ্ছা তাকেই হজ্জে নিতে পারবে। তবে স্বামীর জন্য যতটুকু সম্ভব স্ত্রীর মন রক্ষা করা উচিৎ। স্ত্রীর হজ্জ পরিমাণ নিজস্ব সম্পদ থাকলে, তা দিয়ে তার উপর হজ্জ করা ফরয হবে। বর্ণিত অবস্থায় স্বামীর বড় ভাই শুধু হজ্জের নিয়্যত করলে তার নিজের হজ্জ বলেই গন্য হবে। একে বদলী হজ্জ বলা হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:২৬২# হিদায়া ১:২৩১]
নফল হজ্ব আদায়ের পর পুনরায় ফরয হজ্ব আদায়
জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তির নিকট হজ্ব ফরয হওয়ার মত মাল না থাকে সে যদি লোন অথবা করজে হাছানা নিয়ে হজ্ব করে। পরবর্তীতে হজ্ব ফরয হওয়ার মাল এসে যায়, তখন কি পুনরায় হজ্ব করতে হবে। না-কি পূর্বেই হজ্ব দ্বারা ফরযের দায়িত্ব হতে রেহাই পাবে, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাই।
জবাবঃ হজ্ব ফরয হওয়ার পূর্বে গরীব থাকা অবস্থায় যদি কেউ শুধু নফলের নিয়্যতে হজ্ব করে থাকে, তাহলে শুধু নফল হজ্বই আদায় হবে। পরবর্তীতে মালদার হওয়ার কারণে হজ্ব ফরয হলে পুনরায় হজ্বে ফরয আদায় করতে হবে। পূর্বের নফল হজ্ব দ্বারা পরের ফরয হজ্বের দায়িত্ব হতে রেহাই পাওয়া যাবে না। আর যদি নফলের নিয়্যত না করে এবং ফরযের নিয়্যতও না করে শুধু হজ্বের নিয়্যত করে অথবা ফরয হজ্বের নিয়্যত হজ্ব করে থাকে তাহলে এই হজ্ব পরবর্তী ফরয হজ্বের জন্য যথেষ্ট হবে। মালদার হওয়ার পর নতুন করে না করলেও চলবে।
[প্রমাণঃ রদ্দুল মুহতরা ২:২৬২# ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:১৫৭# খাইরুল ফাতাওয়া ৪:১৬৪]
{পৃষ্ঠা-৪৬৯}
মহিলার জন্য জমি বিক্রি করে হজ্ব করা
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক মহিলার স্বামী ও উপার্জনশীল পুত্র আছে। উক্ত মহিলার ব্যক্তিগত কিছু জমিও আছে- যা বিক্রি করলে হজ্বের খরচ হবে। উল্লেখ্য, তার অন্য কোন সম্পদ নেই। এমতাবস্থায় তার হজ্ব করার ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কি?
জবাবঃ হ্যাঁ, উক্ত মহিলার ঐ সম্পত্তি বিক্রি করে যদি তার নিজের ও সফরসঙ্গী স্বামী বা কোন মাহরামের হজ্ব সফরের জন্য যথেষ্ট হয়, তাহলে তার উপর হজ্ব করা ফরয হবে। কেননা, এমতাবস্থায় উক্ত জমি তার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভূক্ত নয়।
উল্লেখ্য যে, মহিলার উপর হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য নিজের পাথেয় এবং নিজ খরচে হজ্বযাত্রী মাহরাম না পাওয়া গেলে স্বামী বা মাহরাম সঙ্গীর পাথেয় থাকা জরুরী। তা না হলে তার উপর হজ্ব ফরযই হবে না। যদি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন মাহরাম না পাওয়া যায় তথাপিও গাইরে মাহরাম কোন পুরুষ বা কোন মহিলার সাথে হজ্বে যেতে পারবে না। সেই অবস্থায় বদলী হজ্ব করানোর জন্য ওসীয়্যত করা কর্তব্য।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৬২# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯]
জমি বিক্রি করে হজ্ব করা
জিজ্ঞাসাঃ কারো যদি বিশ বিঘা জমি বা অন্য কোন সম্পদ থাকে, আর দশ বিঘার ফসলে তার বাৎসরিক প্রয়োজনীয় খরচ চলে যায়। আর অবশিষ্ট দশ বিঘার ফসল বা তার মূল্য জরুরী প্রয়োজনের বাইরে খরচ হয়। যেমন, দান-খয়রাত ইত্যাদি, এমতাবস্থায় উক্ত দশ বিঘা জমি বিক্রয় করলে যদি তার হজ্বের খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে কি তার উক্ত উদ্ধৃত জমি বিক্রয় করে হজ্ব করা ফরয?
জবাবঃ যদি কারো নিকট জরুরী খরচ নির্বাহের আবশ্যক পরিমাণ হতে অতিরিক্ত জায়গা-জমি, বাড়ী-ঘর ও আসবাবপত্র থাকে এবং তা বিক্রয় করলে তার হজ্বের যাতায়াত ও আনুসাংগিক খরচ এবং হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের খাওয়া-পরা ও যাবতীয় প্রয়োজনাদির খরচের ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে তার উপর হজ্ব ফরয।
উল্লেখ্যিত মাসআলা অনুযায়ী উক্ত ব্যক্তির অবশিষ্ট দশ বিঘা হতে জমি বিক্রয় করে হজ্ব করা ফরয।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৩২# ফাতাওয়ায়ে খানিযাহ ১:২৮২# ফাতাওয়া শামী ২:৫৬২# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৮]
{পৃষ্ঠা-৪৭০}
বৃদ্ধা মাতাকে রেখে হজ্বে যাওয়া

জিজ্ঞাসাঃ আমার মাতা বর্তমানে তাঁর জীবনের শেষ সময় অতিক্রম করছেন। বর্তমানে তাঁর বয়স একশ বছরের উপরে। তাঁর একাকী চলাফেরার ক্ষমতা নেই। সার্বক্ষণিকভাব তাঁর সাথে কাউকে থাকতে হয়। দীর্ঘদিন থেকেই উনি এই অবস্থায় আছেন এবং বর্তমানে উনি আমার সাথেই আছেন। এই বৎসর আমি, আমার বড় বোন ও বড় ভাইসহ হজ্ব করার নিয়্যত করেছি। আমার মায়ের এই অবস্থায় আমাদের হজ্ব করায় শরীয়তের দিক থেকে কোন বাধা আছে কি-না? তা জানালে বাধিত হব। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা যে তিন ভাই-বোন হজ্বে যেতে চাচ্ছি তারা ছাড়া আম্মার সেবা-যত্নের জন্য আমার অন্যান্য ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন আছেন।
জবাবঃ শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তি, যে নিজ দেশ হতে মক্কা মোকাররমা পর্যন্ত যাতায়াত করতে সক্ষম এবং হজ্ব হতে ফিরে আসা পর্যন্ত নিজের এবং আপন পরিবার বর্গের আবশ্যকীয় ব্যয় বহন করতে সমর্থ, এমন সম্পদশালী ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয। আর মহিলাদের উপর হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য আরো একটি অতিরিক্ত শর্ত হচ্ছে তাদের সাথে স্বামী বা কোন দ্বীনদার মাহরাম আত্মীয় থাকা।
হজ্ব ফরয হয়ে যাওয়ার পর ঐ বৎসর হজ্বে যাওয়া ওয়াজিব। শরয়ী উযর ব্যতিত দেরী করা জায়িয নয়। আর কারো পিতা-মাতা যদি এমন হন যে, খেদমতের মুখাপেক্ষী এবং একমাত্র সে-ই তাদের খাদিম, অন্য কেউ তাদের খেদমত করার মত না থাকে, তাহলে সেই সুরতে পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়া তার জন্য হজ্বে যাওয়া মাকরূহ হবে। আর আপনার মায়ের খিদমত করার জন্য যেহেতু আপনার আরো ভাই-বোন বা আত্মীয় স্বজন বা খাদিম ইত্যাদি আছে। তাই আপনার এই বৎসরেই হজ্ব করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। বরং করে নেয়াই জরুরী।
[প্রমাণঃ (১) আদ্দুররুল মুখতার মা'আশ শামী ২:৪৫৬-৪৬৪# (২) ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৫৩৮]

হজ্বের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব

জিজ্ঞাসাঃ হজ্বের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ও মুস্তাহাব সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চাই।
জবাবঃ হজ্বের ফরয তিনটিঃ
(১) মীক্বাত হতে ইহরাম বাধা।
{পৃষ্ঠা–৪৭১}
(২) ৯ই যিলহজ্ব তারিখ যোহরের পর হতে ১০ই যিলহজ্বের সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত ওকূফে আরাফা তথা আরাফার প্রান্তরে অবস্থান।
(৩) ১০, ১১ বা ১২ যিলহজ্ব তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে কা'বা শরীফের তাওয়াফে যিয়ারত করা।
হজ্বের ওয়াজিব ৫টিঃ
(১) ৯ই যিলহজ্ব তারিখে সূর্যাস্তের পর থেকে পরবর্তী বাদ ফজর সূর্যোদয়ের পূর্বে পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মুযদালিফার প্রান্তরে অবস্থান করা
(২) সাফা-মারওয়া পাহাড় দু'টির মাঝখানে সাঈ করা।
(৩) মিনাতে রমী করা অর্থাৎ শয়তানের উদ্দেশ্য কংকর মারা
(৪) ইহরাম খোলার জন্য মাথা মুণ্ডানো বা ছাটানো।
(৫) বিদায় তওয়াফ করা (মীক্বাতের বাহিরের বাসিন্দাদের জন্য)
হজ্বের সুন্নাত ও মুস্তাহাব দশটিঃ
(১) তওয়াফে কুদূম করা(হজ্বে ইফরাদ বা হজ্বে কিরানের জন্য)।
(২) তওয়াফে কুদূমের প্রথম তিন চক্করে রমল করা। আর তওয়াফে কুদূমে রমল না করে থাকলে তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করা।
(৩) ৮ই যিলহজ্ব মক্কা হতে মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর এ পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া এবং রাতে মিনার অবস্থান করা।

(৪) ৯ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা হতে আরাফার ময়দানের দিকে রওয়ানা হওয়া।
(৫) ওকূফে আরাফার পর তথা হতে সূর্যোস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া।
(৬) ৯ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে মুযদালিফায় থাকা।
(৭) ওকূফে আরাফার জন্যে সেদিন যোহরের পূর্বে গোসল করা।
(৮) ১০, ১১ও ১২ই যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রগুলোতে মিনায় থাকা।
(৯) মিনা হতে বিদায় হয়ে মক্কায় ফিরার পথে মুহাসসাব নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করা।
(১০) ইমামের জন্যে তিন স্থানে খুৎবা দেয়া। ৭ই যিলহজ্জ মক্কা শরীফে, ৯ই যিলহজ্জ আরাফায় ও ১১ই যিলহজ্জ মিনায়।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯, ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৮-৪৬৭]
{পৃষ্ঠা-৪৭২}

হজ্জ আদায়ের পদ্ধতি

তাওয়াফ অবস্থায় দৃষ্টি

জিজ্ঞাসাঃ তাওয়াফ করার সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন?
জবাবঃ তাওয়াফ করার সময় কা'বার দিকে মুখ বা পিঠ করা ঠিক নয়। বরং সিজদার দিকে অর্থাৎ নীচের দিকে চোখের দৃষ্টি রেখে তাওয়াফ করা মুস্তাহাব। তবে হাজরে আসওয়াদ বা সেদিকে হতে কিংবা লাঠি ইত্যাদি উঠিয়ে চুম্বনের সময় কা'বার দিকে নযর করতে পারে।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫৪৭# মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ ১৩০]
وينبغي ان لا يجاوز بصره محل مشيه كالمصلي لايجاوز بصره محل سجوده لانه الادب الذي يحصل به اجتماع القلب.
(غنية الناسك:65)

হায়েয অবস্থায় ইহরাম বাঁধা

জিজ্ঞাসাঃ আমার ফ্লাইট ২০ তারিখে। সে সময় আমি হায়েয় অবস্থায় থাকবো। এমতাবস্থায় ইহরামের নিয়্যত বেধে রওয়ানা দিলে আমি তো উমরা করতে পারবো না। এই অবস্থায় ৬ দিন পর আবার হজ্জের ইহরাম কিভাবে বাঁধবো?
জবাবঃ আপনি যদি আগে মক্কা যেতে চান, তাহলে আপনি শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে যাবেন। সেখানে গিয়ে মক্কা শরীফের বাড়ীতে পাক হওয়া পর্যন্ত যিকির-আযকার করতে থাকবেন। আর যদি আগে মদীনায় যান তাহলে মদীনা থেকে ফেরার পথে ইহরাম বেঁধে আসবেন।
[প্রমাণঃ মা'আরিফুস সুনান ৬:৩৬২]
قال شيخنا رحمه الله تعالى والحائض ان كانت قارنة فترفض للعمرة وتقضي مناسك الحج كلها ثم تقضي العمرة ويكون حجها حج افراد مثل سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها رفضت العمرة. هذا عندنا. (معارف السنن:362/6)

আরাফাতের ময়দানে যোহর ও আসর নামায পড়ার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ আরাফাতের ময়দানে যোহর এবং আসর নামায পড়ার নিয়ম কি?
জবাবঃ আরাফাতের ময়দানে যদি মসজিদে নামিরাতে ইমাম সাহেবের সাথে নামায পড়ার সুযোগ পাওয়া যায় এবং একথাও জানা যায় যে, ইমাম মুসাফির, তাহলে যোহরের ওয়াক্ত যোহর ও আসর একত্র পড়বে। আর যদি
{পৃষ্ঠা-৪৭৩}
ইমাম মুকীম হওয়া সত্ত্বেও কসর করে তাহলে হানাফীগন তার ইক্তেদা করবে না। সেক্ষেত্রে বা অন্য কোন কারণে যদি ইমামের সাথে পড়ার সুযোগ না হয়, তাহলে মুসাফির হাজীগণ নিজ নিজ তাবুতে বা স্থানে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর কছর (দুই রাক'আত করে) পড়ে নিবে। তারপর দাঁড়িয়ে উকূফে আরাফা আদায় করবে, কষ্ট হয়ে গেলে তখন বসে উকূফ করবে। উল্লেখ্য, অনেক খিমায় আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে

আসারের আযান দিয়ে থাকে ঐ আযান শুনে আসর পড়বে না। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পর আযান দিয়ে নামায পড়বে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৫০৫]

في الدر المختار: وشرط لصحة هذا الجمع الامام الاعظم او نائبه والا صلوا وحدانا.

وفي رد المحتار تحت قوله: الامام الاعظم: واطلق الامام فشمل المقيم والمسافر لكن لو كان مقيما كامام مكة صلى بهم صلوة المقيمين ولايجوز له القصر ولا للحجاج الاقتداء به وتحت قوله: والا صلوا وحدانا: فالاصوب قول الزيلعي: صلوا كل واحدة منهما في وقتها. (رد المحتار:504/2)

মেয়েদের মিনা থেকে মক্কা প্রত্যাবর্তন

জিজ্ঞাসাঃ ১২ই যিলহজ্জ তারিখ দিবাগত রাতে মক্কা থেকে যিয়ারত শেষে মেয়েরা কংকর মারতে গেলে কংকর মেরে মক্কায় চলে আসবে, না-কি মিনায় রাত্রি যাপন করবে?

জবাবঃ মিনায় রাত্রি যাপন করে ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে কংকর মেরে মক্কায় ফেরা উত্তম।

[প্রমাণঃ মাআরিফুল কুরআন ১:৪৯১]

কংকর নিক্ষেপ করে ১২ই যিলহজ্জ মক্কা প্রত্যাবর্তন

জিজ্ঞাসাঃ কোন হজ্জ আদায়কারী ১২ই যিলহজ্জ কংকর মেরে মিনা ত্যাগ করে মক্কা আসতে পারবে কি-না?

জবাবঃ প্রকাশ থাকে যে, কোন হাজী যদি ১২ই যিলহজ্জ মিনা থেকে মক্কা আসতে চায়, তাহলে তার জন্য উত্তম হল- সূর্য ডোবার আগেই চলে আসা। কেননা, সূর্যাস্তের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পূর্বে পর্যন্ত মিনা থেকে চলে আসা মাকরূহ। তবে দম দেয়া লাগবে না। কিন্তু ১৩ই যিলহজ্জ সুবেহ সাদিকের পর মিনায় থাকলে কংকর না মেরে আসা জায়িয হবে না। কেউ আসলে দম দেয়া জরুরী।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২৫২# ফাতাওয়া শামী ২:৫২২]

{পৃষ্ঠা-৪৭৪}

মহিলাদের জন্য জামাতাকে নিয়ে হজ্জ করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন মহিলা নিজের মেয়ের স্বামীকে অর্থাৎ জামাতাকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারবে কি-না?

জবাবঃ নারীর হজ্জে যেতে হলে স্বামী বা দ্বীনদার মাহরাম তথা এমন পুরুষলোক, যাদের সাথে বিবাহ বৈধ নয়, তাদেরকে সাথে নিয়ে যেতে হবে। মাহরাম নিজের বংশের কারণে, বিবাহের কারণে, এবং দুধের কারণে হয় এ হিসেবে মেয়ের স্বামীকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারবে। তবে বৈবাহিক এবং দুধপান সূত্রের মাহরামদেরকে নিয়ে বর্তমান ফিতনা ফাসাদের যমানায় হজ্জে যাওয়া হতে পরহেয করা উচিৎ। তাই মেয়ের স্বামীকে নিয়ে হজ্জে না যাওয়াই শ্রেয় হবে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি পিতা, ভাই বা দ্বীনদার স্বামী না পায়, বা পেল কিন্তু তাদের হজ্জের খরচের যোগাড় হলো না, তবে উক্ত মহিলাকে তার পক্ষে হতে বদলী হজ্জের ওসীয়্যত করে যাওয়া জরুরী।

[প্রমাণঃ মু'আল্লিমুল হুজ্জাজঃ ৮৬# শামী ২:৪৬৪]

والمحرم من لايجوز له منكحتها على التابيد بقرابة او رضاع او صهرية.......... لاتسافر باخيها رضاعا في زماننا اي لغلبة الفساد. قلت: ويؤيده كراهة الخلوة بها كالصهرة الشابة فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا ايضا لان السفر كالخلوة. (رد المحتار:464/2)

وجود المحرم للمرأة...... بعضهم جعلوها شرطا للوجوب وبعضهم شرطا للاداء وهو الصحيح. (الفتاوى الهندية:219/1)

গায়রে মাহরামের সাথে হজ্জের সফর করা

জিজ্ঞাসাঃ একজন পুরুষ হজ্জ করবে এবং তার সাথে তার বিবিও হজ্জ করতে যাবে। তাদের দুই জনের সাথে বিবির খালাতো বোন হজ্জ করতে যাবে। বাংলাদেশ হতে সৌদি পর্যন্ত তাদের সাথে যাবে। পরে খালাতো বোন সহোদর ভাইয়ের সাথে হজ্জ করবে, এখন বাংলাদেশ হতে সৌদি পর্যন্ত খালাতো বোন এবং খালাতো বোনের স্বামীর সাথে হজ্জ করার জন্য যেতে পারবে কি-না? ঐ মহিলাটির ভাই সৌদিতে চাকুরি করে।

জবাবঃ বর্ণিত সুরতে উক্ত মহিলার জন্য তার খালাত বোন বা বোনের স্বামীর সাথে হজ্জে যাওয়া জায়িয হবে না। কারণ মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়া এবং তা আদায় করার জন্য শর্তহল- সফরসঙ্গী হিসেবে তার সাথে তার স্বামী বা দ্বীনদার মাহরাম থাকা। মাহরাম বলে ঐ সমস্ত পুরুষকে যাদের সঙ্গে মহিলার

{পৃষ্ঠা-৪৭৫}

স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম। চাই বংশের কারণে হোক, বা বিবাহের কারণে হোক, বা দুধের সম্পর্কের কারণে হোক। যেমন-পিতা, ভাই , দাদা ও আপন শ্বশুর ইত্যাদি। খালাত বোনের স্বামী যেহেতু মাহরামের মধ্যে নয়, তাই তার সঙ্গে উক্ত মহিলার হজ্জে যাওয়া যদিও জিদ্দা পর্যন্ত হোক জায়িয হবে না। আর মহিলার সঙ্গী যতই ঘনিষ্ঠ হোক তা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং উক্ত মহিলার উপর এই মুহূর্তে হজ্জের টাকা থাকা সত্ত্বেও হজ্জে যাওয়া ফরয নয়। যতদিন পর্যন্ত বৈধ সফর সঙ্গী না পাবে, ততদিন তার জন্য হজ্জে যাওয়া ফরয হবে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যদি মাহরাম সফর সঙ্গী না পাওয়া যায় এবং মৃত্যুর সময় তার উপর হজ্ব ফরয থাকে তাহলে বদলী হজ্জের ওসীয়্যত করে যাবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২৩৩# ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২১৯# ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৫-৪৬৪]

হজ্জে কসর নামায

জিজ্ঞাসাঃ পবিত্র হজ্জের সময় মিনা ও আরাফাতের ময়দানে হাজীরা কসর নামায আদায় করেন, যে ভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। অথচ তিনি ছিলেন মুসাফির কিন্তু বর্তমান মুকীম ইমামগণও সেখানে কসর করেন। আমরা যখন প্রশ্নি করি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মুসাফির, তাই কসর করেছেন। আপনারা তো মুকীম। তারা বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফির ছিলেন ঠিক। কিন্তু তখন মক্কার লোকেরা মুকীম ছিলেন। হুযূরের সঙ্গে উনারাও কসর করেছেন। তারা তো পূর্ণ চার রাকা'আত পড়েন নাই। এতে বুঝা গেল এখানে হজ্জের সময় সকলে কসর পড়তে হয়। এর সঠিক সমাধান দলীলসহ জানতে চাই।

জবাবঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জের সময় মুসাফির হিসেবে মিনা ও আরাফা ময়দানে নামায কসর পড়েছেন। তার পরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) প্রত্যেকে নিজের শাসন আমলে উভয় স্থানে কসর পড়েছেন। তার পর হযরত উসমান (রাঃ) ও উভয় স্থানে হজ্জের সময় কসর পড়তে থাকেন। এর পর তিনি যখন মিনা শহরে বিবাহ করেন তার পর থেকে তিনি নিজের মুকীম মনে করে হজ্জের সময় মিনাতে চার রাকা'আত পড়তে শুরু করেন এবং কসর পড়া বাদ দেন। হজ্জের সময় মুকীমদের জন্য কসর পড়ার হুকুম হলে হযরত উসমান (রাঃ) কেন কসর পড়লেন না। শুধু বিবাহ করে সে শহরে স্ত্রীর জন্য আবাস না করে উক্ত শহরে মুকীম হওয়ার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি থাকলেও মুকীমগণ মিনা ও আরাফাতে পূর্ণ নামায পড়বেন। এ সম্পর্কে কোন সাহাবী থেকে মতভেদ শোনা যায় নি। এসব হাদীসের ভিত্তিতে চার

{পৃষ্ঠা-৪৭৬}

ইমামের তিনজনই মিনা ও আরাফাতে শুধুমাত্র মুসাফিরদের জন্য কসর করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুক্বীমদের জন্য পূর্ণ চার রাকা'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং এটাই নির্ভরযোগ্য মত।

অবশ্য এ ব্যাপারে ইমাম মালেক (রাঃ) ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি মুকীম ও মুসাফির সকলের জন্য হজ্জের সময় মিনা, মুযদালিফা ও আরাফাতে কসর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রমাণ হিসেবে বললেন, হারেছা ইবনে ওয়াহহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে আমরা বিদায় হজ্জে মিনায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে দু'রাকা'আত পড়েছি। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের পক্ষ থেকে এর কয়েকটি উত্তর দেয়া হয়েছে।

(১) তিনি মক্কার অধিবাসী কি-না তার উল্লেখ নাই। (২) "আমাদের" শব্দটি দ্বারা উদ্দেশ্য যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর সাথে এসে ছিলেন তারাও হতে পারেন।

[প্রমাণঃ তাহারী শরীফ ১:২৭৯# আবূ দাঊদঃ১:২৭০# আল-ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ১:৪৭৩]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بمنى ركعتين ومع أبى بكر رضي الله عنه ركعتين ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ومع عثمان رضي الله عنه ركعتين شطر امارته ثم أتمها بعد ذلك. (شرح معاني الآثار حـ:2235)

জেনায়াত বা ত্রুটি-বিচ্যুতি

মুহরিম যে সকল প্রাণী মারতে পারবে

জিজ্ঞাসাঃ মুহরিম ব্যক্তি নিম্ম লিখিত প্রাণীসমূহ মারতে পারবে। চাই উক্ত প্রাণী মুহরিম ব্যক্তিকে কষ্ট দেক বা না দেক। সাপ, বিচ্ছু, কাক, চিল, যে কুকুর মানুষ কামড়ায়, ইঁদুর ও গিরগিটি।

[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৪:৩৩১]

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ

জিজ্ঞাসাঃ ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা নিষেধ?

জবাবঃ ইহরাম অবস্থায় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা নিষেধ।

(১) শরীরের গঠনের ভিত্তিতে সেলাই করা কোন কাপড় পরিধান করতে পারবেন। তবে মহিলাদের জন্য এ হুকুম নয়।

{পৃষ্ঠা–৪৭৭}

(২) পুরুষের মাথা ও মুখ ঢাকবে না। মহিলারা মাথা ঢাকবে কিন্তু পর্দা বজায় রেখে মুখ স্পর্শ করে এমন নেকাব লাগাতে পারবে না। তবে মুখ থেকে একটু দূরে এমন নেকাব দ্বারা পর্দা রক্ষা করতে হবে।

(৩) চুল কাটতে, ছিড়তে বা পশম টেনে তুলতে পারবে না।

(৪) চুল-দাড়িতে চিরুনী বা আঙ্গুল চালাবে না, তাতে চুল দাড়ি উঠতে বা ছিড়ে যেতে পারে।

(৫) নখ কাটবে না।

(৬) সুগন্ধী সাবান, তেল, আতর ও স্নো-পাউডার ইত্যাদি প্রসাধণী ব্যবহার করবে ন।

(৭) যৌন আলাপ-আলোচনা বা আচরণ করবে না।

(৮) স্ত্রী সহবাস করবে না।

(৯) কোন প্রাণী শিকার করা নিষেধ। এমন কি মশা, মাছি উকুন ও ছারপোকাও মারা নিষেধ।

(১০) ঝগড়া-বিবাদ করা নিষেধ।

(১১) হেরেম শরীফ এলাকায় কোন প্রকার ঘাস ও লতা-পাতা ছিড়া নিষেধ। এমনকি গাছের ডাল ভাঙ্গা ও নিষেধ।

(১২) পায়ের উপরের পাতা ঢেকে যায় এমন জুতা বা সেণ্ডেল পরা নিষেধ।

(১৩) সমস্ত গুনাহের কাজ করা নিষেধ।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২৩৮-৩৯]

قال : ويتقي ما نهى الله تعالى عنه من الرفث والفسوق والجدال........ ولا يقتل صيدا..... ولا يشير إليه ولا يدل عليه ..... ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين ..... ولا يغطي وجه ولا رأسه ..... ولا يمس طيبا .... وكذا لا يدهن ... ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ..... ولا يقص من لحيته ..... ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر ...الخ (الهداية:238/1)

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধী ফল খাওয়া ও তার ঘ্রাণ লওয়া

জিজ্ঞাসাঃ ইহরাম অবস্থায় কমলা, নাসপতি ও আপেল ইত্যাদি ফলের সুগন্ধি শুকা অথবা ফল খাওয়া কি? কোন্ কোন্ সুগন্ধিযুক্ত ফলের ঘ্রাণ লওয়া মাকরূহ।

{পৃষ্ঠা–৪৭৮}

জবাবঃ ইহরাম অবস্থায় কমলা, নাসপতি ও আপেল ইত্যাদি সুঘ্রাণ সমৃদ্ধ যে কোন ফল খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে স্বেচ্ছায় ফলের সুঘ্রাণ নেয়া মাকরূহ হবে। এক্ষেত্রে কোন দম ইত্যাদি ওয়াজিব হবে না।
[প্রামণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:২৪২]

ولا يلزمه شيئ بشم الريحان والطيب والثمار الطيبة مع كراهة شمه. [الهندية: 242/1]

বিনা উযুতে হজ্জের রুকন সমূহ আদায় করা

জিজ্ঞাসাঃ তামাত্তু হজ্জে বিনা উযুতে উমারার তাওয়াফ ও সাঈ করলে তার মাসআলা কি?
আবার উযু করে শুধু তাওয়াফ করলে দম লাগবে কি-না?
যদি বিনা উযুতে তাওয়াফ করে সাঈ ও হলক করে, তবে তার মাসআলা কি? আবার উযু করে শুধু তাওয়াফ করলে হবে কি-না?

জবাবঃ উমরার তাওয়াফ বিনা উযুতে করলে দম তথা বকরী বা ভেড়া কুরবানী করতে হয়। তবে যদি আবার তাওয়াফ উযু সহকারে করে নেয় তাহলে আর দম দিতে হবে না।
সাঈ যেহেতু তাওয়াফের অধীনে, তাই দ্বিতীয় বার তাওয়াফ করার সময় সাঈ করে নিবে। হলক করতে হবে না।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৫৫১# হাশিয়ায়ে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ ৬১০# আল-হিদায়া ১:২৭৪-৫# আপকে মাসায়িল আওর উনকা হল ৪:১১৪]

ومن طاف لعمرته وسعى على غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شيئ عليه اما السعي فلأنه تبع للطواف وان رجع الى اهله قبل ان يعيد فعليه دم . [الهداية: 274/1]

সাফা-মারওয়া সাঈ না করে হজ্জ পালন করা

জিজ্ঞাসাঃ যদি কোন ব্যক্তি হজ্জ রত অবস্থায় কা'বা ঘর তাওয়াফ না করে এবং সাফা-মারওয়া না দৌড়ায়, তা হলে ঐ ব্যক্তির হজ্জ আদায় হবে কি-না? আমরা জানতে পারলাম, যারা পূর্বে উমরা করেছে তারা তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়া না দৌড়ালেও চলবে এবং হজ্জের বাকী সম্পূর্ণ কাজ আদায় করলে তার হজ্জ আদায় হবে। তা কতটুকু ঠিক?

জাবাবঃ হজ্জ পালনকারীদের জন্য বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করা এবং সাফা-মারওয়া সাঈ করা জরুরী। তাওয়াফ ফরয এবং সাঈ ওয়াজিব। উমরার তাওয়াফ ও সাঈ হজ্জের তাওয়াফ ও সাঈর জন্য যথেষ্ট নয়। হজ্জের জন্য
{পৃষ্ঠা-৪৭৯}
আলাদা ভাবে তাওয়াফ ও সাঈ করতে হবে। এছাড়া হজ্জ সম্পূর্ণ হবে না। সুতরাং আপনারা যা শুনছেন, তা ভিত্তিহীন।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৬৭-৮]

فرضه ثلثة.......الى قوله: طواف الزيارة وواجبه. الى قوله: السعى بين الصفا والمروة . [الدر المختار:8/2, 467]

অন্যকে দিয়ে রমী করানো ও সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সূর্য ডুবার পরে রমী করা

জিজ্ঞাসাঃ ১০ই যিলহজ্জ ভীড়ের কারণে যদি কেউ নিজে রমীয়ে জিমার না করে অন্যের দ্বারা করিয়ে নেয় বা সূর্যোদয়ের পূর্বেই রমীয়ে জিমার করে ফেলে বা কোন পুরুষ ১০ তারিখ সূর্য ডুবার পর রমী অথবা দূরে থেকে করে চলে যায়, তাহলে তার রমী আদায় হবে কি-না? বিশেষ করে মহিলা বা বয়স্কদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন সুযোগ আছে কি?

জবাবঃ দাঁড়িয়ে নামায পড়ার মত শক্তি থাকলে এবং রমীর স্থানে পৌঁছা সম্ভব হলে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে বা বিনিময় ছাড়া রমীর বদলী করানো চলবে না। আর যদি এতটুকু শক্তিও না থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যাকে দিয়ে করালে আদায় হয়ে যাবে। এ বিয়ষ পুরুষ, মহিলা বা বয়স্কদের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই।

১০ই যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সেদিন সূর্যাস্তের পর হতে পরদিন সুবহে সাদিক পর্যন্ত সুস্থ পুরুষদের জন্য রমী করা মাকরূহ। কিন্তু বৃদ্ধা বা অসুস্থ অথবা মেয়েলোকদের জন্য ১০ তারিখ সুবেহ সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে বা সূর্যাস্তের পর সুবহে সাদিক পর্যন্ত রমী করা জায়িয আছে।
তেমনিভাবে প্রচন্ড ভীড়ের কারণে যদি জানের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে সুস্থ পুরুষদের জন্যও সূর্য ডুবার পর রমী করা জায়িয আছে।
সর্বাবস্থায় রমীর স্থলে নির্মিত স্তম্ভের গণ্ডির মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। পাথর যদি স্তম্ভের পার্শ্বের ঘেরাওকৃত দেয়ালের বাইরে পড়ে যায়. তাহলে রমী আদায় হবে না। অতএব, অনেক দূর থেকে কংকর নিক্ষেপ করে চলে গেলে আদায় না হওয়াই স্বাভাবিক।
[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ২:৫১৩-৫১৫# মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ ১৬৮-১৮১]
في الدر المختار ولو وقعت على ظهر رجل او جمل ان وقعت بنفسها بقرب الجمرة جاز والا لا.
وفي رد المحتار او وقعت بنفسها لكن بعيد امن الجمرة . [513/2]
وفي رد المحتار تحت قوله: "ويكره للفجر" اي من الغروب الى الفجر وكذا يكره قبل طلوع الشمس وهذا عند عدم العذر فلا اسائة برمي الضعفة قبل الشمس . [الدر المختار:515/2]

{পৃষ্ঠা-৪৮০}

বদলী হজ্জ ও উমরা

ইফরাদকারীর জন্য উমরা করা
জিজ্ঞাসাঃ হজ্জে ইফরাদকারী হজ্জের পূর্বে উমরা করতে পারবে কি-না?
জবাবঃ হজ্জে ইফরাদকারী হজ্জের পূর্বে উমরা করতে পারবে না। কারণ, ইফরাদকারী ব্যক্তি মীকাত অতিক্রম করার সময় শুধু হজ্জের নিয়্যত করে। তাই ইফরাদকারী ব্যক্তি মক্কায় পৌঁছে যে তাওয়াফ করবে তা উমরার তাওয়াফ হবে না। বরং তাওয়াফে কুদূম হবে। আর হজ্জের পূর্বে উমরা হজ্জ তামাত্তু কারীই করবে। ইফরাদকারীর জন্য ইহার সুযোগ নেই। হ্যাঁ, হজ্জের কাজ শেষ করে ১৩ই যিলহজ্জের পর উমরাহ করতে পারে। তবে তার জন্য উত্তম হল বাইতুল্লাহ শরীফের নফল তাওয়াফ বেশী বেশী করে করা।
[প্রমাণঃ মু'আল্লিমুল হুজ্জাজ ১৯৫# ফাতাওয়া শামী ২:৫০২]
لايجوز ان يفسخ نية الحج بعد ما احرم به ويقطع افعاله ويجعل احرامه وافعاله للعمرة. (رد المحتار:502/2)
উমার আদায়কারীকে হাজী বলে সম্বোধন করা
জিজ্ঞাসাঃ উমরা আদায়কারী ব্যক্তিকে হাজী বলে সম্বোধন করা যাবে কি-না? তেমনিভাবে তার নামের শুরুতে বা শেষে হাজী ব্যবহার করা বৈধ হবে কি-না?
জবাবঃ হজ্জ ও উমরা, এ দু'টি একই পর্যায়ের ইবাদত নয়। বরং দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ইবাদত। আর হাজী কেবল তাকেই বলা যেতে পারে, যিনি নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করেছেন। কারণ, হাজী শব্দের অর্থ হজ্জ আদায়কারী। কাজেই কেউ উমরা করলে তাকে হাজী বলা এবং তার নামের শুরুতে হাজী শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। তবে তাকে মু'তামির (উমরা আদায়কারী) বলা যেতে পারে।
[প্রমাণঃ সূরা বাক্বারাহ ১৯৬# ফাতাওয়া শামী ২:৪৭২]
পিতার ওসীয়্যতের কারণে হজ্জ ফরয না হওয়া সত্ত্বেও বদলী হজ্জ আদায়
জিজ্ঞাসাঃ আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয ছিল। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি হজ্জ করতে পারেননি। এরপর তিনি একসিডেন্ট হয়ে মারা যান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তার পক্ষ থেকে আমাকে বদলী হজ্জ করার জন্য ওসীয়্যত করে গেছেন। এখন কথা হলো, আমার উপর হজ্জ ফরয হয়নি। আমি হজ্জ করলে পিতার হজ্জ আদায় হবে কি-না?
{পৃষ্ঠা-৪৮১}

জবাবঃ আপনার পিতার হজ্ব করার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু হজ্ব করতে না পেরে আপনাকে বদলী হজ্ব করার জন্য ওসীয়্যত করে গেছেন। এখন দেখতে হবে যে, তিনি হজ্বের জন্য টাকা রেখে গেছেন কি-না। যদি টাকাও রেখে যেয়ে থাকেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনার নিজের উপর হজ্ব ফরয হোক বা না হোক, আপনার পিতার ওসীয়্যত পূর্ণ করার জন্য মাসাইল জেনে নিয়ে আপনাকেই বদলী হজ্ব করতে হবে। কারণ, এটা আপনার উপর ওসীয়্যত। তবে যদি আপনার কোন সমস্যা থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে অন্য কারো দ্বারাও বদলী হজ্ব করাতে পারবেন। তাতে আপনার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি আপনার পিতা হজ্বের জন্য মাল না রেখে যান, তাহলে আপনার উপর বদলী হজ্ব করা জরুরী নয়। তবে যদি আপনার তাওফীক থাকে, তাহলে পিতাকে মুক্ত করার জন্য নিজস্ব টাকা দ্বারা বদলী হজ্ব আপনার জন্য উত্তম এবং বিরাট সাওয়াবের কাজ। উল্লেখ্য, আপনার উপর হজ্ব ফরয হলে সেক্ষেত্রে আপনার নিজের হজ্ব আগে করতে হত। তারপরে পিতার বদলী হজ্ব করতে হবে। কিন্তু এখন আপনার উপর যেহেতু হজ্ব ফরয নয়। সুতরাং নিজে হজ্ব না করা সত্ত্বেও পিতার বদলী হজ্ব করতে পারবেন। সুতরাং এখন থেকে হজ্বের মাসআলা শিখেতে শুরু করুন এবং কোন ভাল আলেমের সাথে হজ্বের সফর করুন।

[প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ৩৯৩ # ফাতাওয়া দারুল উলূম ৬:৫৫৯-৭২# আদদুররুল মুখতার ২:৫৯৯]

وبشرط الامر به اي بالحج عنه فلا يجوز حج الغير بغير اذنه الا اذا حج او الحج الوارث عن مورثه. (الدر المختار:599/2)

সৌদি আরবে চাকুরীজীবী ব্যক্তির অন্যের পক্ষ থেকে হজ্ব করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার বাবা আর্থিক ভাবে সক্ষম । কিন্তু শারীরিক ভাবে অক্ষম। উনার ভাগিনা যিনি সৌদি আরবে চাকুরী করেন (রিয়াদে)। এবার উনি আমার আব্বার নামে হজ্ব করেন, আব্বার আদেশ পালনার্থে। এর দ্বারা আব্বার ফরয হজ্ব আদায় হলো কি-না? এবং আমাদের টাকা দিতে হবে কি-না? কারণ, উনার (বাংলাদেশ হতে সৌদি আরব) যাতায়াতের খরচ উনার কোম্পানী বহন করেছেন।

উনার সমুদয় খরচ আমরা দিতে চাই। কিন্তু এখানে আমাদের জানার বিষয় হলো, উনার যাতায়াতের খরচসহ দিতে হবে কি-না?

জবাবঃপ্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী , আপনার আব্বা যদি নিজের ভাগনেকে রিয়াদ থেকে নিজের পক্ষ হতে হজ্ব আদায় করতে বলে দিয়ে থাকেন তাহলে

{পৃষ্ঠা–৪৮২}

আপনার আব্বার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে গেছে। এখন রিয়াদ হতে মক্কার হজ্ব সম্পন্ন করতে যা খরচ হয়েছে, তা আপনাদের বহন করতে হবে।

[প্রমাণঃ (১) আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫১৯# (২) ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৫:২২৯# শামী ২:৬০৪]

وكذا الحكم اذا اوصى ان يحج عنه بمال وسمى مبلغه فانه ان كان يبلغ من بلده فمنها والا فمن حيث يبلغ. (رد المحتار:604/2)

নিজে হজ্ব করে নাই এমন ব্যক্তির জন্য বদলী হজ্ব করা

জিজ্ঞাসাঃ আমার বড় ভাই বিত্তবান হওয়ায় তার উপর হজ্ব ফরয় ছিল। কিন্তু হজ্ব ফরয় হওয়ার বছরই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরে মারা যান। তিনি হজ্ব করতে পারেন নাই। ইন্তিকালের দশ দিন পূর্বে তার পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব সম্পাদনের জন্য আমাকে ৬০,০০০ টাকার একটা চেক প্রদান করেন এবং তার বদলী হজ্ব আদায়ের জন্য আমাকে ওসীয়্যত করে যান । আমি ইতিপূর্বে কোন হজ্ব করি নাই। আমার উপর হজ্ব ফরযও হয়নি। আমার উপর ওসীঁয়্যত কৃত হজ্ব পালনের ব্যাপারে কাকরাঈলের মুরুব্বীদের নিকট পরামর্শ চাইলে তারা জামিয়া রাহমানিয়া থেকে লিখিত ফাতাওয়া গ্রহণের পরামর্শ দেন। সুতরাং এ অবস্থায় আমি আমার ভাইয়ের বদলী হজ্ব আদায় করতে পারবো কি-না? এ ব্যাপারে সঠিক ফয়সালা জানতে চাই?

জবাবঃ আপনার ভাইয়ের উপর হজ্ব ফরয হওয়ার পর তিনি হজ্বের ওসীয়্যত করেন এবং টাকা রেখে গিয়ে নিজের যিম্মাদারী আদায় করেছেন। সুতারং তার পক্ষে থেকে বদলী হজ্ব আদায় করা জরুরী।
জেনে রাখা দরকার যে, যার উপর হজ্ব ফরয় হয়নি, তার জন্য অন্যের পক্ষ থেকে বদলী হজ্ব আদায় করা জায়িয আছে। এক্ষেত্রে যদিও মক্কায় প্রবেশের দ্বারা তার উপর হজ্ব ফরয় হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু সে অন্য ব্যক্তির খরচে সে ব্যক্তির হজ্ব করার জন্য ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করেছে তাই হজ্বটি সে ব্যক্তির পক্ষ থেকেই আদায় হবে। তার উপর পৃথক হজ্ব হবে না। তবে তার জন্য জরুরী হবে হজ্বের মাসায়িল সমূহ ভাল ভাবে শিখে নেয়া এবং হজ্ব করার সময় কোন আলেম ব্যক্তি বা কমপক্ষে আগে যিনি হজ্ব করেছেন, হজ্বের মাসায়েল জানেন, তার সাথে থেকে সঠিকভাবে হজ্বে বদল সম্পন্ন করা। অবশ্য বদলী হজ্ব এমন ব্যক্তি দ্বারা করনো উত্তম, যিনি নিজের ফরয় হজ্ব আদায় করেছেন এবং হজ্বের বিধান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখেন।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৪:৫১২ # ফাতাওয়া শামী ২:৬০৩# আলমগীরী ১:২৫৭# দারুল উলূম৬:৫৭৫]
{পৃষ্ঠা-৪৮৩}

في الدر المختار: فجاز حج الضرورة.
وفي رد المحتار: وقال في الفتح ايضا والافضل ان يكون قد حج عن نفسه حجة الاسلام خروجا عن الخلاف.........والذي يقتضيه النظر ان حج الضرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم. (رد المحتار:603/2)

বদলী হজ্বের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি
জিজ্ঞাসাঃ যদি কেউ দুরারোগ্য ব্যধির কারণে তার ফরয় হজ্ব আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে সে কোন্ ধরনের লোককে দিয়ে তার বদলী হজ্ব করাবে? বিস্তারিত জানাবেন?
জবাবঃফরয় হজ্বের বদলী এমন ব্যক্তির দিয়ে করানো উত্তম, যিনি পূর্বে নিজে ফরয হজ্ব আদায় করে নিয়েছেন। আর যদি এমন ব্যক্তি দিয়ে করানো হয়, যিনি পূর্বে নিজে ফরয হজ্ব করেনি, তবে তার মাসাইল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান আছে, তাহলেও যে পাঠাবে তার বদলী হজ্ব আদায় হবে। তবে যিনি পূর্বে হজ্ব করেছেন তাকে দিয়েই করানোই উত্তম। অবশ্য নফল হজ্বের বদলী যে কোন ব্যক্তিকে দিয়েই করানো যায়। যদি সে সজ্ঞান, সাবালক মুসলমান হয় এবং হজ্বের মাসায়িল সর্ম্পকে ওয়াকিফহাল হয়, তবে এমন ব্যক্তির জন্য বদলী হজ্বে যাওয়া জায়িয নয় যার উপর হজ্ব ফরয এবং সে ব্যক্তি এখনো সেই ফরয হজ্ব আদায় করেননি। কেননা যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে। তবুও সে তা আদায় করলো না। বরং সে তার ফরয হজ্ব আদায়ে অবহেলা করলো। এমন ব্যক্তির দ্বারা অন্যের বদলী হজ্বের হক কতটুকুই বা পালন হতে পারে?
উল্লেখ্য যে, যিনি বদলী ফরয হজ্ব আদায় করবেন, তার হজ্বে ইফরাদের নিয়্যত করা উত্তম। তবে হজ্বে ক্বিরানের অনুমতি পাওয়া গেলে তাও করতে পারেন। তবে কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে করতে হবে। প্রেরণকারীর দেওয়া জরুরী নয়। কিন্তু কোন ক্রমেই হজ্বে 'তামাত্তু'-এর নিয়্যত করবেন না। আর যেহেতু হিসাব রেখে অবশিষ্ট টাকা ফেরত দেয়ার অনেক ঝামেলা হয়, এ জন্য প্রেরণকারীর নিকট থেকে প্রদত্ত টাকা খরচের সাধারণ অনুমতি নেয়া উত্তম।
[প্রমাণঃআলমগীরী ১:২৫৭]

وَالْأَفْضَلُ لِلْإِنْسَانِ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا عَنْ نَفْسِهِ أَنْ يُحِجَّ رَجُلًا قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ، وَمَعَ هَذَا لَوْ أَحَجَّ رَجُلًا لَمْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يَجُوزُ عِنْدَنَا وَسَقَطَ الْحَجُّ عَنْ الْآمِرِ ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَفِي الْكَرْمَانِيِّ الْأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِطَرِيقِ الْحَجِّ وَأَفْعَالِهِ ، وَيَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا. (الفتاوى الهندية:257/1)

{পৃষ্ঠা-৪৮৪}

হজ্বের বিবিধ মাসাইল

জিদ্দা বাসীদের জন্য উত্তম হজ্জ
জিজ্ঞাসাঃ আমরা এখানে জিদ্দায় যারা প্রবাসী অবস্থায় কর্মরত আছি, তাদের জন্য কোন হজ্জ করা উত্তম?
জবাবঃ মীকাতের মধ্যে অবস্থানরত স্থানীয় বা প্রবাসী যারা আছেন, তারা শুধু মাত্র 'হজ্জে ইফরাদ' পালন করবে। তাদের জন্য ক্বিরান বা তামাত্তু করার অনুমতি নেই। তারা সুযোগ মত বছরের মাঝে যার যখন সুযোগ হয়, ইহরাম বেঁধে এসে উমরাহ করে যাবেন। উমরার জন্য কয়েকবার বাইতুল্লাহে আসতে পারেন।
সুদ-ঘুষের টাকা দিয়ে হজ্জ আদায়
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি সুদ-ঘুষের টাকা গ্রহন করে সম্পদশালী হয়েছে। বর্তমানে সে নিয়মিত নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করছে এবং অন্যান্য শরয়ী আহকামও মেনে চলছে। এখন সেই ব্যক্তি ঘুষের টাকা দ্বারা হজ্জ আদায় করতে পারবে কি-না? এবং এ হারাম মাল থেকে তার মুক্ত হওয়ার উপায় কি?
জবাবঃ কারো নিকট যদি শুধু হারাম মাল থাকে, তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হবে না। আর কারো নিকট যদি হারাম-হালাল মিশ্রিত মাল থাকে, তাহলে দেখতে হবে সে সমস্ত মাল হতে হারাম মালের অংশ পৃথক করলে অবশিষ্ট হালাল মাল যদি এ পরিমাণ হয় যে, তাতে হজ্জ ফরয হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হবে। অন্যথায় তার উপর হজ্জ ফরয হবে না। আর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তার হালাল মাল দ্বারাই হজ্জ করা জরুরি। কিন্তু কারও নিকট হজ্জ পরিমান হালাল মাল থাকায় তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জের সময় যদি হালাল মাল হাতে না থাকে, তাহলে এমন ব্যক্তির হজ্জ আদায়ের উত্তম প্রন্থা এই যে, সে প্রথমতঃ কারো নিকট থেকে হজ্জ আদায় করা যায়, এ পরিমান টাকা ঋণ নিয়ে হজ্জ আদায় করবে। এরপর হালাল মাল দ্বারা উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে। আর যদি তা সম্ভব না-ই হয়, তাহলে উক্ত হারাম মাল দ্বারাই ঋণ পরিশোধ করবে এবং এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ইস্তিগফার করতে থাকবে। তা না করে যদি কেউ হারাম মাল দ্বারা হজ্জ আদায় করে ফেলে, তাহলে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে বটে, তবে হজ্জের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু এরুপ হজ্জ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। অর্থাৎ এরুপ হজ্জে কোন সাওয়াব হবে না। হারাম মাল ব্যবহার করা
{পৃষ্ঠা-৪৮৫}
সম্পূর্ণ নাজায়িয। সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব এর থেকে মুক্ত হতে হবে। আর এ থেকে মুক্তি লাভের উপায় হচ্ছে, উক্ত হারাম মালের মালিকের সন্ধান পাওয়া গেলে মালিকের নিকট উক্ত মাল পৌছে দেয়া ওয়াজিব। অন্যথায় সাওয়াবের আশা না করে গরীব মিসকীনদেন মাঝে সদকা করে দেয়া। উল্লেখ্য যে, উক্ত হারাম মালের পরিমাণ পুরোপুরি স্মরণ না থাকলে, নিজের প্রবল ধারণার ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করতে হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ২:৪৫৬# ইমদাদুল ফাতাওয়া ২:১৪ ও ১৬০# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৩:১৯২ # ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া ৩:১১৬]
لايقبل بالنفقة الحرام كما ورد في الحديث مع انه يسقط الفرض عنه معها. (رد المحتار:456/2)
বর্তমান পরিস্হিতিতে হজ্জে মাকবুলের সূরত
জিজ্ঞাসাঃ বর্তমান যামানায় হজ্জে মহিলাদের বেপর্দা অবস্থায় ঘোরা ঘুরী লক্ষ্য করা যায়। এমতাবস্থায় হজ্জে মাকবুলের সুরত কি? সঠিক সমাধান চাই?
জবাবঃ যে হজ্জের মধ্যে কোন রকম গুনাহের কাজ হয় না অথবা যে হজ্জের মধ্যে রিয়া বা বড়াই এর উদ্দেশ্য থাকে না তাকে সম্পূর্ণরুপে হজ্জে মাকবুল বা হজ্জে মাবরুর বলে। ইচ্ছে করে কোন গুনাহের কাজ করলে হজ্জে সম্পূর্ণরুপে কবুল হওয়ার আশা করা যায় না।
অতএব হজ্জে মাকবুল হাসিল করতে হলে নিজ চক্ষু ও অন্তরকে কুদৃষ্টি ও কুমন্ত্রণা থেকে বিরত রাখতে হবে। এর পরেও যদি অনিচ্ছা সত্ত্বে সামনে বেপর্দা মহিলা এসে যায় তাহলে তৎক্ষনাৎ দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিবে। এতে আর গুনাহ হবে না এবং হজ্জে মাকুবলের সাওয়াবও পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

[প্রমাণঃ সূরা বাকারা ১৯৭# বুখারী ১:২০৬, মিশকাত ২৬৯# কাওয়ায়িদুল ফিকহ ২৫৯]
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
(صحيح البخاري حــ:1820)
الحج المبرور: هو الذي لا يخالطه شيئ من الماثم. (قواعد الفقه:259)

তাকবীরে তাশরীক পড়ার নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃ যিলহজ্ঞ মাসের ৯ তারিখ ফজর হতে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর যে তাকবীরে তাশরীক পড়া হয়, তা হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক ফরয নামাযের পর কতবার পড়া উচিত এবং মেয়েলোকদের পড়তে হবে কি-না? মেহেরবানী করে কিতাবের হাওলাসহ জানাবেন?

{পৃষ্ঠা-৪৮৬}

জবাবঃ যিলহজ্ঞ মাসের ৯ তারিখ ফজরের নামাযের পর হতে ১৩ তারিখ আসরের নামায পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর জামা'আত হোক বা একাকী হোক, প্রাপ্ত বয়স্ক প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য হানাফী মাযহাব অনুযায়ী একবার তাকবীরে তাশরীক পড়া ওয়াজীব। অবশ্য পুরুষ লোকদের জন্য উক্ত দু'আ উচ্চঃস্বরে পড়া জরুরী। আর মহিলাদের আস্তে পড়তে হবে।

[প্রমাণঃ (১) হিদায়া প্রথম খণ্ড ১৭৪# ১৭৫ # (৩) ইমদাদুল আহকাম প্রথম খণ্ড ৬৭২# রুদ্দুল মুহতার ২:১৮০]
كل فرض مطلقا ولو منفردا او مسافرا او امرأة لانه تبع للمكتوبة الى عصر اليوم الخامس آخر ايام التشريق وعليه الاعتماد.
(رد المحتار:180/2)

যমযমের পানি পান করা

জিজ্ঞাসাঃ যে কোন খাদ্য-দ্রব্য বা পানীয় বসে খাওয়া আদব। কিন্তু যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করতে হয়? আর এ পানি পান করার সময় কি দু'আ পড়তে হয়?

জবাবঃ সব ধরনের খাদ্য-দ্রব্য ও পানীয় বসে খাওয়া সুন্নাত। আর যমযম কূপের পানি দাঁড়িয়ে পান করলে কোন গুনাহ হবে না। তবে আদবের খেলাফ হবে। কেননা, এটা পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও বরকতময় পানি। এ পানি কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পান করা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা'লীম দিয়ে গেছেন। সুতরাং এট মুস্তাহাব।

মোদ্দাকথা, যে আমল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেভাবে প্রমাণিত আছে, সেটা সেভাবে করাই সুন্নাত। সেখানে আমাদের বিবেক বিবেচনা অর্থহীন।

যমযমের পানি পান করার সময় এ দু'আ পড়া সুন্নাত।

اللهم اني اسئلك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. (مصنف عبد الرزاق حــ:9112, والدار قطني حــ:237)

[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৯:১০৯]

টিভিতে হজ্জ দেখা

জিজ্ঞাসাঃ টিভিতে প্রচারিত হজ্জের কার্যসমূহ দেখার ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন নিষেধ আছে কি-না? যদি নিষেধ থাকে, তাহলে কেন? আর সরাসরি সম্প্রচার করা বা পূর্বে ভিডিও করে সম্প্রচার করার মাঝে কোন পার্থক্য আছি কি-না? বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক।

{পৃষ্ঠা-৪৮৭}

জবাবঃ বর্তমানে প্রচলিত টিভিতে কোন অনুষ্ঠান দেখা বা দেখানোর অনুমতি শরীয়তে নেই। বরং সকল প্রকার অনুষ্ঠান দেখাই কবীরা গুনাহ ও হারাম। যদিও সেটা ইসলামী অনুষ্ঠান হয়। সুতরাং হজ্জের কার্যাবলীও টিভিতে দেখা জায়িয হবে না। সরাসরি সম্প্রচার করা হোক-অথবা পূর্বে উক্ত দৃশ্য যন্ত্রের সাহায্যে ধারণ করে পরে সম্প্রচার করা হোক। এতদুভয়ের মাঝে কোন তফাৎ নেই। কেননা, ফিল্ম কোম্পানী এ কাজ করতে যে সকল যন্ত্র

ব্যবহার করে থাকে, সবই খেল-তামাশার বস্তু। আর এমন বস্তুকে দ্বীনের মৌলিক ইবাদতের মধ্যে প্রবেশ করানো দ্বীনের অবমাননা ও দ্বীনকে তামাশার বস্তুতে পরিণত করার নামান্তর । আর এতদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ভয়াবহ আযাবের কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া হজ্বের অধিকাংশ কার্যক্রমই হল আমলে তা'আব্বুদী তথা শরীয়ত কর্তৃক অবধারিত হুকুম। যার মাঝে যুক্তির বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা যখন এ ধরনের বিষয় টিভিতে দেখবে, তখন তারা অহেতুক যুক্তির পেছনে পড়ে নিজেদের শরীয়ত বিরোধী দাবীসমূহ প্রমাণের অপপ্রয়াস চালাবে। আর দ্বীনের এসব বিষয় নিয়ে উপহাস করতে থাকবে।

শুধু তাই নয়; বরং হজ্বের অনুষ্ঠান দেখার সময় বেগানা মহিলাদের চেহারা থেকে মুক্ত থাকাও সম্ভব নয়। যেমন, অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার ঘোষণা সাধারণতঃ মেয়েরাই দিয়ে থাকে। অতঃপর মাঝেমাঝে বিভিন্ন জিনিসের নাজায়িয বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়ে থাকে। যেগুলো দর্শন করা শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রকাশ থাকে যে, টিভির অনুষ্ঠানমালা যদি পূর্বে ধারণ করে সম্প্রচার করা হয়, তাহলে সেটা ফটো ও ছবি ব্যবহার করার হুকুমে পড়বে-যা সম্পূর্ণ হারাম। পক্ষান্তরে যদি পূর্বে ধারণ না করে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়, তাহলে দ্বীন ও ইবাদতকে তামাশার বস্তুতে রুপান্তরিত করার কারণে তা নাজায়িয হবে।

[প্রমাণঃ সূরা লুকমান, আয়াত ৬# সূরা নূর, আয়াত ৩০-৩১# মিশকাত খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭০# ইমদাদুল মুফতীনঃ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯১# জাওয়াহিরুল ফিকহঃ খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬# ফাতাওয়া মাহমূদিয়াঃ খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪১৮-৪১৯# নিযামুল ফাতাওয়াঃ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১# ফাতাওয়া রহীমিয়াঃ খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৯২-৩০০#]

হজ্ব আদায়কালে মাযহাবের ভিন্নতা

জিজ্ঞাসাঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) সর্বজন স্বীকৃত ইমামে আযম।

আমরা জানি, তাঁর মাযহাব সকল মাযহাবের উর্ধ্বে। প্রশ্ন হলো, ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো হজ্ব। তা কেন হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আদায় করা হয় না? বরং অন্য মাযহাবের ইমাম দ্বারা আদায় করা হয়?

{পৃষ্ঠা-৪৮৮}

জবাবঃ বিশ্বের সকল হানাফী মাযহাবের অনুসারী মুসলমানগণ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী হজ্ব সম্পাদন করে থাকেন। হজ্বের যে সমস্ত ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত আছে, ওগুলো পালন করতে কোন হানাফীকে তার মাযহাব ছাড়তে হয় না। বরং সে তার নিজ মাযহাব অনুযায়ী স্বাধীনভাবে হজ্ব পালন করতে পারে। কাজেই আপনার প্রশ্ন "হজ্ব কেন হানাফী মাযহাব অনুযায়ী আদায় করা হয় না ঠিক নয়। জামা'আতের সাথে নামায আদায় করেত ইমাম লাগে। কিন্তু হজ্ব করতে কোন ইমামের ইকতিদা লাগে না। প্রত্যেকে আলাদাভাবে তার কাজ সম্পাদন করে। তবে নামাযের সময় নামায পড়া এটা ভিন্ন কথা। এট হজ্বের কোন ফরয বা ওয়াজিব নয়। এটা ওখানের মসজিদে পড়তে চাইলে অন্য মাযহাবের ইমামের ইকতিদায় পড়তে হয়। আর এতে কোন দোষ নেই। চার মাযহাবের সকল মাযহাবেই এর স্বীকৃতি আছে যে, এক মাযহাব মান্যকারী সাধারণতঃ অন্য মাযহাবের ইমামের পিছে ইকতিদা করতে পারে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আযীযিয়া ৪৬৩# দারুল উলূম ৩:৩০৬# শামী ১:৫৬৩]

اما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه مايفسد الصلوة على اعتعاد المقتدي عليه الاجماع. (رد المحتار:563/1)

{পৃষ্ঠা-৪৮৯}

কুরবানী ও আকীকাহ

মৃত বাচ্চার আক্বীকা দেয়া

জিজ্ঞাসাঃ একটি মেয়ে নয় মাস বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পিতা নানা কারণে তার আকীকা করতে পারেননি। তার ইচ্ছা ছিল কুরবানীর সঙ্গে মেয়েটির আকীকা করবেন। কোন কোন রেছালায় দেখা যায় যে, যদি

সন্তান পরকালে পিতাকে সুপারিশ করার যোগ্যতা লাভ করে তাহলে পিতা তার আকীকা করে থাকলে নাবালেগ মৃত সন্তান তার জন্য সুপারিশ করবে। আর আকীকা না করে থাকলে তার জন্য সুপারিশ করবে না। এই কথা শুনে মেয়েটির পিতা অস্থির হয়ে পড়েছেন। এখন প্রশ্ন হল এই মৃত মেয়েটির আকীকা করা যায় কিনা?

জবাবঃসন্তান জীবিত থাকা অবস্থায় আকীকা করা মুস্তাহাব। সন্তানের মৃত্যুর পর আকীকা করা মুস্তাহাব হওয়ার কোন প্রমাণ নাই। তবে যদি কেহ মৃত বাচ্চার আকীকা করাকে মুস্তাহাব মনে না করে শুধু পরকালে তার সুপারিশের আশায় এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমার আশায় আকীকা করে তাহলে আকীকা করা জায়িয় আছে। তবে সতর্কতামূলক এ আকীকা কুবরানীর গরুর সঙ্গে না করে পৃথক বকরী ইত্যাদি দ্বারা করা চাই।

[প্রমাণঃ ফাইযুল বারী ৪:৩৩৭# ফাতাওয়া রাহীমিয়া ৬:১৭৩]

وحاصله ان الغلام اذا لم يعق عنه فمات لم يشفع لوالديه ثم ان الترمذي اجاز بها الى يوم احدى وعشرين قلت بل يجوز الى ان يموت لما رأيت في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بنفسه. (فيض الباري:337/4)

আকীকা কত তারিখ করতে হয়

জিজ্ঞাসাঃআমাদের দেশে অনেক ধনী লোকেরা পরে আকীকা করে। আমরা জানি জন্মের সাত দিন পরে আকীকা করতে হয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিদান কি?

জবাবঃআকীকা করা ফরয বা ওয়াজিব নয়, বরং সুন্নাত। জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা ও আকীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে কারো আকীকা না হয়ে থাকলে তার অভিভাবক গণ পরেও যে কোন সময় আকীকা করতে পারবেন। এমন কি সে ব্যক্তি যদি বড় হয়ে নিজে নিজের আকীকা আদায় করেত চায়, তাও করতে পারে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের আকীকা নিজেই করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আকীকার চামড়ার টাকা গরীবদেরকে দান করা জরুরী।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৩২৬]

{পৃষ্ঠা-৪৯০}

কুরবানীর পশুর সাথে কিংবা সতন্ত্রভাবে আকীকা

জিজ্ঞাসাঃ কুবরবানীর গরুর সাথে অথবা পৃথক ভাবে কুরবানীর দিনে ছাগল দিয়ে আকীকা দেওয়া জায়িয আছে কি?

কুরবানীর সাথে আকীকা দিলে ছেলেদের জন্য দুই ভাগ এবং মেয়েদের জন্য এক ভাগ। আর আকীকা ছাগল দিয়ে দিলে ছেলেদের জন্য দুইটি এবং মেয়েদের জন্য একটি ছাগল দিলে আকীকা আদায় হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হল, কিছু দিন আগে এক হুযুর বললেন যে, কুববানীর গরুর সাথে আকীকা দিলে ছেলেদের বেলায়ও এক ভাগেই আকীকা আদায় হয়ে যাবে। আর ছাগল দিয়ে আকীকা দিলে দু'টি ছাগলই লাগবে।

উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সঠিক উত্তর জানতে ইচ্ছুক।

জবাবঃ ছাগল দ্বারা আকীকা করার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে ছেলের জন্য দু'টি আর মেয়ের জন্য একটি যবেহ করা ভাল। আর কুরবানীর গরুর সাথে শরীক হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরী দ্বারা আকীকা করে অথবা কুরবানীর গরুর সাথে এক অংশে ছেলের আকীকার জন্য শরীক হয় তাও জায়িয আছে।

সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের উক্তিটি আংশিক ভাবে সঠিক হলেও পূর্ণভাবে সঠিক বলা যায় না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯৪# বেহেশতী যেওর ৩:৪২-৪৩]

একটি গরুতে সাত শরীক আকীকা করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের গ্রামে একজন ইমাম সাহেব বললেন যে, আকীকার নিয়ম হলো- ছেলের জন্য দুইটি ও মেয়ের জন্য একটি বকরী করা সুন্নাত। অতঃপর তিনি বললেন যে, যদি সাত শরীকে গরু কুরবানী হয়, তাহলে ছেলের জন্য দুই অংশ ও মেয়ের জন্য এক অংশ দ্বারা আকীকা করা সুন্নাত। আর যদি কুরবানী ছাড়া অন্য সময় আকীকা করা হয়, তখন ছেলের জন্য একটি পূর্ণ গরু অথবা দুইটি বকরী দ্বারা আকীকা করতে হবে। এক্ষেত্রে গরুর দুই

অংশ দ্বারা আকীকা হবে না। এ নিয়ে সমাজে দ্বিধাদ্বন্ধ চলছে। অতএব, এর শরয়ী সঠিক বিধান কি এবং কুরবানী ও গায়রে কুরবানীর ক্ষেত্রে আকীকার হুকুম গরুর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন? না কি এক?
জবাবঃ ইমাম সাহেব যে মাসআলা দিয়েছেন, তার এ মাসআলা ঠিক হয়নি। কিতাব অনুযায়ী সঠিক মাসআলা হল এই যে, যেমনভাবে একটি গরুতে
{পৃষ্ঠা-৪৯১}
সাতজন শরীক হয়ে কুরবানীর করতে পারে, ঠিক তেমনিভাবে একটি গরুতে সাতজন শরীক হয়ে আকীকাও করতে পারবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই কুরবানীর সময় ও অন্য সময় এক্ষেত্রে বরাবর। তবে কোন শরীক শুধু গোশতের জন্যে শরীক হতে পারবে না। বরং আকীকা বা ওলীমা বা কুরবানীর কোন একটির নিয়্যাতে শরীক হতে হবে। আর বকরীর ব্যাপারে সঠিক সমাধান এই যে, একজন বালকের জন্য দুইটি বকরী দ্বারা আকীকা করা সুন্নাত। হ্যাঁ, তবে যদি কারো সামর্থ না থাকে, তাহলে একটি বকরী দ্বারা আকীকা করলেও সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে।
[প্রমাণঃ কিফায়াতুল মুফতী ৮:২৬৩]
কুরবানীর গোস্তের বন্টন
জিজ্ঞাসঃ আমরা জানি কুরবানীর গোস্ত তিনটি ভাগে ভাগ করতে হয়, কিন্তু আমাদের গ্রামের একজন বলল, গরীবদের কুরবানীর গোস্ত দিলেও চলে, না দিলেও চলে। এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই?
জবাবঃ কুরবানী দাতার জন্য কুবরানীর গোস্ত বন্টন করার মুস্তাহাব পন্থা হল তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজের জন্য, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য হাদিয়া দিবে এবং আরেকভাগ গরীব মিসকীনদেরকে দান করবে। এটা মুস্তহাব বা উত্তম I সুতরাং কেউ সম্পূর্ণ গোস্ত নিজের জন্য রাখতে পারে। তাতে কুরবানীর কোন ক্ষতি হবে না।
[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ৬:৩২৮]
ويأكل من لحم الاضحية...... وندب ان لاينقص التصديق عن الثلث...الخ (الدر المختار:328/6)
সুদী ব্যাংকে বা ইন্সুরেন্সে চাকুরীরত ব্যক্তির সাথে মিলে অন্যের কুরবানী দেওয়া
জিজ্ঞাসাঃযে ব্যক্তি সুদী ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী করে, এমন ব্যক্তির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কেই কুরবানীর তাদের কুরবানী সহীহ হবে কি-না জানতে ইচ্ছুক।
জবাবঃ সুদী ব্যাংক বা ইন্সুরেন্স কোম্পানীতে চাকুরী করা হারাম। এর বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থও হারাম। এ ধরনের চাকুরী যারা করে তাদের জন্য হালাল ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ এসেছে এবং সে ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ইস্তিগফারের সাথে এ চাকুরীর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যাতে করে তারা মারাত্মক কোন সমস্যায় না পড়ে I সুতরাং উক্ত চাকুরীর অর্থ দ্বারা যারা কুরবানী করেন তাদের সাথে অন্যদের শরীক হওয়ার অনুমতি নেই।
{পৃষ্ঠা-৪৯২}
তবে ব্যাংক বা ইন্সুরেন্সে চাকুরীজীবির যদি উপার্জনের অন্য কোন মাধ্যম থাকে আর হালাল টাকা দিয়ে শরীক হয় তাহলে তার সাথে কুরবানী দেয়া যাবে।
[প্রমানঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩২৬# আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৩]
নিয়্যতকৃত কুরবানীর পশু বিক্রি করা।
জিজ্ঞাসাঃ জনৈক ব্যক্তি তার নিজস্ব একটা গরু কুরবানী করার নিয়্যত করেছিল। কিন্তু কুরবানীর পূর্বেই গরুটি মারাক্তক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে, যার করাণে গরুটি বিক্রি করে ফেলতে হয়েছে। এখন কি উক্ত ব্যক্তির কুরবানী করতে হবে? এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক?
জবাবঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় উক্ত ব্যক্তির কুরবানী করার নিয়্যতের কারণে কুরবানী ওয়াজিব হয়নি। শুধু নিয়্যতের কারণে কোন কিছু ওয়াজিব হয় না।

হ্যাঁ, যদি তার উপর আগে থেকেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে নিয়্যত ব্যতীতই তার যে কোন একটা কুরবানী দিতে হবে। তাই তার উপর যদি পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব হয়ে থাকে, তাহলে কোন জানোয়ার খরিদ করে কুরবানী করে দিতে হবে। উক্ত জানোয়ার দ্বারা কুরবানী দেয়া তার উপর জরুরী নয়। যদি পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব না হয়, তাহলে শুধু এরুপ নিয়্যতের কারণে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হয়নি। তবে যদি তার ইচ্ছা হয়, তাহলে নফল হিসেবে একটা কুরবানী করতে পারে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩২১# ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৮৪]
فلو كانت في ملكه فنوى ان يضحي بها او اشتراها ولم ينو الاضحية وقت الشراء ثم نوى بعد ذلك لايجب لان النية لم تقارن الشراء فلا تعتبر. (رد المحتار:321/6)

মীরাস বন্টন না হওয়া অবস্থায় কুরবানী পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ পিতা মারা যাওয়ার পর সাহেবে নেসাব (অর্থাৎ যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক) কয়েকজন ভাই একত্রে বাস করে। তারা তাদের মীরাস এখনোও বন্টন করেনি।
এখন প্রশ্ন হল- তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলেই চলবে কিনা? জানতে ইচ্ছুক।
জবাবঃ বর্ণনা অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে পৃথক কুরবানী অর্থাৎ একটি করে বকরী বা গরু, উটের সাত ভাগের এক ভাগ কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং একটি বকরী বা সাত ভাগের এক ভাগের মধ্যে সকলে শরীক হয়ে কুরবানী দিলে তাদের জন্য সহীহ হবে না
{পৃষ্ঠা-৪৯৩}
উল্লেখ্য, মীরাস বন্টন দেরী করা অন্যায়। ইন্তিকালের দিনই বা দু'এক দিনের মধ্যেই মীরাস বন্টন করে নেয়া জরুরী। তারপর তারা একত্রেও থাকতে পারে বা পৃথক-পৃথকও থাকতে পারে। তবে পর্দা রক্ষার জন্য পৃথক হয়ে বসবাস করা উত্তম। আমাদের দেশে সকলে মিলে একত্রে থাকাকে ভাল মনে করা হয়, এটা মূলত উত্তম নয়।
[প্রমাণঃ আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৪৮৬# আদ্দুররুল মুখতার ৬:৩১৬]
ولو لاحدهم اقل من سبع لم يجز عن احد. (الدر المختار:315/6)

হাজী ব্যতীত অন্যদের উপর কুরবানী ওয়াজিব কি-না?

জিজ্ঞাসঃআমাদের এলাকায় জনৈক ব্যক্তি বলেন যে, কুরবানী তারাই করবে যারা হজ্বে যাবে। এছাড়া অন্যদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয় এবং আরো বলেন যে, কুরবানীর কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই। যদি কেউ দেখাতে পারে, তাকে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবো। প্রশ্ন হলো-উক্ত লোকের কথাগুলোর বাস্তবতা কতটুকু?
জবাবঃশরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানীর দিন গুলোতে যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় বা থাকে, তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব। ঐ ব্যক্তির কুরবানী না দিলে ওয়াজিব তরকের গুনাহগার হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করবে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটে না আসে"। এর দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, কুরবানী ওয়াজিব। কেউ ওয়াজিবকে অস্বীকার করলে ফাসিক হয়ে যাবে। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেয়া হলঃ
قال تعالى: {فصل لربك وانحر}- استدل به بعضهم على وجوب الاضحية لمكان الامر . (روح المعاني:316/15)
(১) অর্থাৎ "হে রাসূল!) আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায এবং কুরবানী করুন, (সূরা কাউসার) কুরআনের এ আয়াতকে মুফাচ্ছিরীনগণ কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দলীল বলে সাব্যস্ত করেছেন"। অতএব, কুরবানীর আদেশ কুরআনে নেই-এ দাবী অযৌক্তিক।
[প্রমাণঃ তাফসীরে রুহুল মা'আনী ১৫:৩১৬]
{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج : 37]

(২) অর্থাৎ "কুরবানী একটি মহান ইবাদত। আল্লাহর কাছে এর গোশত ও রক্ত পৌঁছে না। কিন্তু পৌঁছে তার কাছে তোমাদের মনের তাক্বওয়া"। [সূরা হজ্জঃ৩৭]

(৩) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১নং এ উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর মদীনায় দশ বৎসরের জীবনে কোন একবারও কুরবানী বাদ দেননি। বলাবাহুল্য, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাদ না দিয়ে প্রতি বৎসর এ আমল করে যাওয়া ওয়াজিব হওয়ার একটি বড় প্রমাণ।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ...الخ (صحيح البخاري حـ:984)

{পৃষ্ঠা-৪৯৪}

(৪) হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে-

من ذبح قبل الصلواة فليعد مكانها اخرى ...الخ [بخاري ومسلم]

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি (কুরবানী ঈদের দিন) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর পশু যবেহ করে ফেলে, সে যেন নামাযের পর তদস্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করে।

কুরবানী যদি ওয়াজিব না হত, তাহলে নামাযের পূর্বে যারা কুরবানী করেছে তাদের পুনরায় কুরবানী করার আদেশ দিতেন না। বলাবাহুল্য, মহানবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতিটি আদেশই উম্মতের জন্য ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয়। যদি তার বিপরীত কোন দলীল না থাকে। তাছাড়া কোন কারণে কোন ইবাদত নষ্ট করা হলে, তা পুনরায় করার আদেশ তখনই করা হয়, যখন তা ওয়াজিব হয়। [বুখারী শরীফ২:৮৩৪ # মুসলিম শরীফ ১:১৫৩]

من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. (ابن ماجة:حـــــــ)

অর্থঃ "যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে"। [ইবনে মাযহা২:২২৬]

উক্ত হাদীস দ্বারা তাওফীক থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করেনি, তাদের ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। যদি কুরবানী ওয়াজিব না হত, তাহলে এমন কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। নিম্নে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ স্বরুপ ফিকাহ শাস্ত্রের কতিপয় নির্ভরযোগ্য কিতাবের ইবারত উদ্ধৃত করা হলোঃ

واما الذي يجب على الغني دون الفقير فما يجت من غير نذر ولاشراء للاضحية...الخ (بدائع الصنائع:62/5)

"ধনীদের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নিয়ামতের শুকরিয়া হিসেবে এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)- এর প্রবর্তিত রীতি পালনার্থে"। [বাদায়িউস সানায়ে ৫:৬২]

يجب على حر مسلم موسر مقيم عن نفسه. (البحر الرائق:153/8)

এমন মুসলমান ব্যক্তি যিনি আযাদ। ধনী এবং মুকীম তার উপর তার পক্ষে থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব। [ফাতাওয়া রহীমিয়া৩:১৭৮# আল বাহরুর রায়িক ৮:১৫৩]

قربانی محض سنت نہیں واجب. (فتاوی رحیمیۃ:178/3)

"কুরবানী শুধু কেবল সুন্নাত নয়, বরং ওয়াজিব"। [ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:১৭৮]

উল্লেখিত আয়াত, হাদীস ও ফুকাহাগনণের ইবারত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কুরবানী ওয়াজিব। কেই যদি অস্বীকার করে, তাহেল সে ফাসিক ও বিদ'আতী বলে গণ্য হবে। উক্ত ব্যক্তি তাওবা না করলে এবং নিজের ভ্রান্ত মতে একগূঁয়ে

{পৃষ্ঠা-৪৯৫}

হয়ে থাকলে, মুসলিম সমাজের জন্য এমন ভণ্ড ব্যক্তির বয়কট করা কর্তব্য। এ ধরনের বদদ্বীন জাহিল ও খণ্ড লোক থেকে দ্বীনের সঠিক ধারণা পাওয়ার কোন আশা করা যায় না। তামাত্তু এবং কিরানকারী হাজী ব্যতীত বাড়ীতে অবস্থানকারী ধনী (সাহেবে নেসাব) ব্যক্তিদের উপর কুরবানী জরুরী নয়-এ কথা ঐ ব্যক্তি কোথায়

পেল? তার যদি কুরআন-হাদীস বুঝার মত জ্ঞান না থাকে, তাহলে উম্মতকে গোমরাহ না করে তার উচিত ছিল কোন বিজ্ঞ আলেমের স্মরণাপন্ন হওয়া।

কোরবানীর গোস্ত জমা করে রাখা

জিজ্ঞাসাঃ আমরা সারা জীবন জেনে আসছি যে, কুরবানীর গোশত সাধারণতঃ তিন ভাগ করা হয়। তার মধ্যে এক ভাগ নিজেদের। এক ভাগ আত্মীয়-স্বজনের, এক ভাগ ফকীর মিসকীনদের দিতে হয়। কিন্তু গত ঈদে আমাদের মসজিদের শ্রদ্ধেয় ইমাম সাহেব ঈদের খুৎবায় বলেছেন যে, কুরবানীর সমস্ত গোশত নিজে খেতে পারবে। তিনি আরও বলেন-এই গোশত ৬ মাস রেখে খাওয়া যাবে। আমাদের প্রশ্ন হলো-পুরা গোশত খাওয়া জায়িয আছে কি-না? ৬ মাস রেখে গোশত খাওয়া যাবে কি-না?

জবাবঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ নিজে, এক ভাগ আত্মীয়-স্বজন ও একভাগ গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়া ওয়াজিব নয়। বরং উত্তম বা মুস্তাহাব। সুতরাং কেউ যদি তিন ভাগ না করে নিজেরাই সব খেয়ে ফেলে, তাতেও কোন গুনাহ নেই।

গোশত কুরবানীর ৬ মাস কেন, তার চেয়ে বেশী সময় রেখে খাওয়া জায়িয আছে। সুতরাং সবটা খাওয়া জায়িয থাকলেও উত্তম নয়।

[প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৫০# ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১৪:৩৩৫# আদ্দুররুল মুখতার ৬:৩২৮]

ويأكل من لحم الاضحية ويطعم الغنياء والفقراء ويدخر. (الهداية:450/4)

ولو حبس الكل لنفسه جاز. (الدر المختار:328/6)

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করা

জিজ্ঞাসাঃ (ক) আমাদের দেশের মানুষ দারিদ্রতার কারণে ৪০ জন মিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে কুরবানী দেয়। এরুপ শতাধিক শরীকও দেয়। তা বৈধ কি-না?

(খ) মৃত পিতার জন্য পৃথক চার ভাই মিলে, একটি ছাগল কুরবানী দেয়া জায়িয কি-না?

জবাবঃ (ক,খ) অন্য ব্যক্তির নামে যদি একাধিক ব্যক্তি মিলে নফল কুবরানী দেয়, যেমনঃ কয়েকজন মিলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামে, অথবা মৃত বা জীবিত পিতা-মাতার নামে নফল কুরবানী দেয়, তাহলে কয়েকজন মিলে একটা বকরী বা গরু, মহিষ বা উটের এক সপ্তাংশে শরীক হয়ে কুরবানী করলে, তা জায়িয আছে। সুতরাং ৪০ বা ততোধিক ব্যক্তির এরুপ কুরবানী করাও জায়িয হবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯০, ফাতাওয়া শামী ৫:২৩৬]

অংশীদারিত্বের কুরবানী

জিজ্ঞাসাঃ আমরা জানি যে, একটি গরুর কুরবানীতে সাত জন অংশীদার হতে পারে। তবে অংশীদারদের সাত অংশের মাঝে ছয় অংশ ছয়জন পূর্ণ অংশের শরীক, আর দু'জন মিলে যদি এক অংশের শরীক হয় তাহলে কুরবানী সহীহ হবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৪৯৬}

জবাবঃ গরু, মহিষ ও উট ইত্যাদির কুরবানীতে যেমন সাত অংশের বেশী জায়িয নয়, তেমনি সাত জনের বেশী অংশীদার হয়েও কুরবানী করা জায়িয হবে না। যদি কেউ এরুপ করে তাহলে কোন অংশীদারের কুরবানীই সহীহ হবে না। সুতরাং দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে কুরবানীর পশুর সাত অংশের মধ্য হতে একটি অংশে শরীক হলেও কুরবানী জায়িয হবে না।

তবে উল্লেখিত মাসআলাটি ওয়াজিব কুরবানী ও নিজের নামে কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু অন্যের নামে নফল হলেও কুরবানীর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি এক অংশে শরীক হতে পারে। যেমন একাধিক ব্যক্তি শরীক হয়ে গরুর সপ্তমাংশ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে কুরবানী করল অথবা চার পাঁচ ভাই

মিলে পিতা-মাতার নামে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে একটি ছাগল বা কুরবানীর গরুর সপ্তমাংশে শরীক হয়ে কুরবানী করল তাহলে এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। বরং এরুপ অবস্থায় কুরবানী সহীহ হবে।
[প্রমাণঃ দুররে মুখতার ৬:৩১৫-৩২৬# খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪:৩১৫# আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৭# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৫৭৩# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২৮৮ ও ৩১৫# ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯০# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৩৩৬]

ولو كان لاخرهم اقل من سبع لم يجز عن احد. (الدر المختار:315/6)

মিনায় কুরবানী না করে তার মূল্য দেশে পাঠিয়ে কুরবানী করা

জিজ্ঞাসাঃ হজ্ব করা অবস্থায় যদি আমরা হজ্বের কুরবানী এখানে না দিয়ে দেশে হজ্বের পূর্বে টাকা পাঠিয়ে আমাদের নামে কুরবানী দিতে বলি, তা হলে আমাদের কুরবানী ও হজ্ব আদায় হবে কি-না?

{পৃষ্ঠা-৪৯৭}

জবাবঃ আপনার মীকাতের মধ্যে অবস্থান করার কারণে আপনাদের ‘হজ্বে ইফরাদ’ করতে হবে। আর হজ্বে ইফরাদ পালনকারীদের উপর কুরবানী করা জরুরী নয়। নফল হিসেবে কুরবানী করতে পারে। তবে আপনার কুরবানী করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে ধনীদের উপর যে কুরবানী ওয়াজিব, তার জন্য মুকীম হওয়া শর্ত। হজ্বের সফরে মুসাফির হলে ঐ কুরবানী ওয়াজিব হবে না। করলে তা নফল হবে। আর মুকীম হয়ে গেলে, ঐ কুরবানী করতে হবে। তখন সেই কুরবানী সেখানেও করতে পারেন বা দেশের বাড়ীতে করার জন্য বলতে পারেন।
[প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার ৬:৩১৫]

فلا تجب على حاج مسافر. (الدر المختار:315/6)

প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ জমি থাকলেও কুরবানী ওয়াজিব হবে

জিজ্ঞাসঃ কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য জমির মূল্যের হিসাব হবে? না উৎপাদিত ফসলের হিসাব হবে?
জবাবঃ জীবিকা নির্বাহের জন্য যতটুকু জমি এবং ফসলের প্রয়োজন তা থেকে অতিরিক্ত জমি এবং ফসলের মূল্য অথবা কোন একটার মূল্য যাকাতের নির্ধারিত নিসাব পরিমাণ হলে তার কুরবানী ওয়াজিব হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া শামী ৬:৩১২# আহসানুল ফাতাওয়া ৭:৫০৬]

আকীকার হুকুম, সময় ও বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার পর আরও করণীয়

জিজ্ঞাসঃ আকীকা করা সুন্নাত না ওয়াজিব? কত দিনের মধ্যে আকীকা করতে হয়। কুরবানীর জানোয়ার – এর সাথে আকীকা বা ওলীমার অংশ একত্র হতে পারে কি? সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর আর কি করণীয় আছ?
জবাবঃ হানাফী মাযহাবে আকীকা করা সুন্নাত। [প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯১]
উত্তম হলো কারো ছেলে বা মেয়ে ভূমিষ্ট হলে, ৭ম দিনে তার নাম রাখা ও আকীকা করা। আকীকা দ্বারা বিভিন্ন বালা-মুসীবত দূর হয়ে যায় এবং বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
আকীকা পদ্ধতি হল-ছেলে হলে দু’টি বকরী বা দু’টি ভেড়া এবং মেয়ে হলে একটি বকরী বা একটি ভেড়া যবেহ করাবে। তাছাড়া বাচ্চার মাথার চুল মুণ্ডাবে এবং সংগতি থাকলে চুলের সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য দান করে দিবে। আর ইচ্ছা করলে বাচ্চার মাথায় জাফরান লাগাবে।

{পৃষ্ঠা-৪৯৮}

কুরবানীর উট, গরু বা মহিষের মধ্যে আকীকার অংশ বা ওলীমার অংশ একত্রে হতে পারে, তাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য কুরবানীর জানোয়ারের মধ্যে কোন অংশ শুধু গোশত খাওয়ার জন্য হতে পারে না।
[প্রমাণঃ তিরমিজী ১:২৭৮# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২৯৬, ৩১৩]

ولو ارادوا القربة الاضحية او غيرها من القرب اجزأهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجب على البعض دون البعض وسواء انفقت جهات القربة. (طحطاوي:266/4)

عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم الغلام مرتهن بعقيقية يذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. (سنن الترمذي حـ:1522)

উট জবাই করার পদ্ধতি

জিজ্ঞাসাঃ উট যবাই করার পদ্ধতি কি? উটকে নাকি যবাই করা যায় না?

জবাবঃ উটকে নহর করা সুন্নাত। নহর করার নিয়ম হল উট দাঁড়ানোবস্থায় প্রথমে তার সামনের বাম পায়ের হাটু ভাজ করে মজবুত করে বেঁধে নিবে। অতঃপর ধারালো ছুরি দিয়ে উটের সীনার নিকটে গলার নীচের অংশে শক্তভাবে একটি আঘাত করে গলার রগগুলি কেটে দিবে। তারপর কিছুক্ষণ ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকবে। অতঃপর উটটি বাম দিকে পড়ে যাবে।

তারপর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পর অন্যান্য যবাইকৃত প্রাণীর মত চমড়া খসিয়ে বাকী কাজ সেরে নিবে।
নহর করতে না জানলে বা অন্য কোন অসুবিধার কারণে নহর করার স্থলে উট যবাই করলেও কোন ক্ষতি নেই। কুরবানী হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, নহর করার পর শব্দ করে চিৎকার করতে ও লাফাতে পারে এতে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নিস্তেজ হয়ে যাবে।

[মিশকাত ১:২৩১, বুখারী ১:২৩১, মিরকাত ৫:৩৫৩, হিদায়াঃ ৪:৪৩৯, আযীযুল ফাতাওয়া ১:৭১৭]

السنة ان ينحرها قائمة معقولة اليد اليسرى وقد فسره ابن عباس رضـ. بقوله قياما على ثلاث قوائم وهو انما يكون يعقل الركبة والاولى كونها اليسرى للاتباع...الخ (مرقات المفاتيح:353/5)

والمستحب في الابل النحر فان ذبحها جاز ويكره...الخ (الهداية:439/4)

গরীবের কেন দু'টি কুরবানী

জিজ্ঞাসাঃ কুরবানীর জন্তু হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে আবার তা পাওয়া গেলে ধনী ব্যক্তির জন্য একটি কুরবানী দিলেই চলে। আর গরীর ব্যক্তির জন্য যদি আবার কুরবানীর জন্তু ক্রয় করে ফেলে তা হলে উভয়টি কুরবানী করতে হবে। এর কারণ কি?

{পৃষ্ঠা-৪৯৯}

জবাবঃ যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে কুরবানীর নেসাবের মালিক তার যিম্মায় যে কোন একটি জানোয়ার কুরবানী করা ওয়াজিব। নির্দিষ্ট কোন গরু-বকরী কুরবানী করা জরুরী নয়। সুতরাং ধনী ব্যক্তির কুরবানীর জন্তু হারিয়ে গেলে বা চুরি হয়ে গেলে অন্য একটি ক্রয় করে দিলেই তার যিম্মা থেকে আদায় হয়ে যাবে। হারানো জন্তু পাওয়ার পর সেটাকেও কুরবানী করতে হবে না।

পক্ষান্তরে গরীব লোকের যিম্মায় কুরবানী করা শরীয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজিব নয়। কিন্তু, সে যদি কুরবানীর নিয়্যতে কোন প্রাণী ক্রয় করে তাহলে সে নির্দিষ্ট প্রাণীটি কুরবানী করা তার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ, গরীব লোকের জন্য কুরবানীর নিয়্যাতে প্রাণী ক্রয় করা এক ধরনের মান্নত যা পূর্ণ করা জরুরী।

আর হারানো পশুটিকে কুরবানী করা যেহেতু পূর্ব থেকেই তার উপর ওয়াজিব ছিল, তাই সেটিকে পাওয়ার পর সেটিকেও কুরবানী করতে হবে। অর্থাৎ উভয়টিকে কুরবানী করতে হবে।

[প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার ৬:৩২৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৫৬৬]

কুরবানীর পশু যবেহ করে টাকা গ্রহণ করা

জিজ্ঞাসাঃকুরবানীর পশু যবেহ করে টাকা গ্রহণ করা জাযিয় আছে কি?

জবাবঃকুরবানীর জানোয়ার স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম। কিন্তু, কেউ যদি জবেহ করতে না পারে, তাহলে অন্যের সাহায্য নিতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির জন্য কুরবানীর পশু যবেহ করে তার বিনিয়ম গ্রহণ করা জায়িয আছে। বরং বিনিময় নেয়াটা যবেহকারীর হক। তবে সেই বিনিময় কুরবানীর গোশত বা চামড়ার দ্বারা লেন-দেন করা নিষেধ। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের জন্তু যবেহ করে দেয়, তাহলে তার জন্য উত্তম। তবে কেই যদি কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের গরীব-মিসকীনদের জন্য প্রতিষ্ঠানের খরচে চামড়া কালেকশনের জন্য প্রেরিত হয়, তাহলে তার জন্য যবেহ করার বিনিময় কেউ দিলে, তা নিজে না নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়া উচিত।
[প্রমাণঃ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৬৬৯# কিফায়াতুল মুফতী ৮:২৪৫]
ঈদের পূর্বে কুরবানী
জিজ্ঞাসাঃ ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর করা জায়িয আছে কি?
জবাবঃযে এলাকায় বা শহরে জুমা'আ ও ঈদের নামায পড়া হয়, সেখানে ঈদের নামাযের পূর্বে অর্থাৎ উক্ত এলাকার কোথাও ঈদের নামায না হয়ে থাকলে, কুরবানী করলে উক্ত কুরবানী জায়িয হবে না। যদি কেউ এরুপ করে ফেলে, তাহলে ঈদের নামাযের পরে তার দ্বিতীয় আরেকটি জানোয়ার কুরবানী করতে হবে। তবে যদি ছোট গ্রাম হয়, যেখানে জুমু'আ বা ঈদের নামায হয় না, সেখানে
{পৃষ্ঠা-৫০০}
১০ তারিখে সুবহে সাদিকের পরে কুরবানী করতে পারে। এমনিভাবে যদি প্রথম দিনে কোন বৃষ্টি-বদলা বা উযরের কারণে ঈদের নামায পড়তে না পারে, তবে ঈদের নামাযের ওয়াক্ত অতিবাহিত হওয়ার পরে কুরবানী দুরস্ত হবে।
[প্রমাণঃ জাওয়াহিরুল ফিকাহ ১:৪৪৯]
কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী ও চামড়ার হুকুম
জিজ্ঞাসাঃকুরবানী কার উপর ওয়াজিব, কতটুকু মাল থাকলে কুরবানী করতে হবে? কুরবানীর চামড়া নিজে ব্যবহার করেত পারবে কি-না?
জবাবঃ কুরবানী স্বাধীন মুকিম মুসলমান যার নিকট কুরবানীর দিনে ৭ ১/২ তোলা স্বর্ণ বা ৫২ ১/২ তোলা রৌপ্য বা এর সমমূল্যের নগদ অর্থ অথবা ব্যবসার মাল কিংবা প্রয়োজন অতিরিক্ত সামানপত্র থাকে, তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। চাই তা পূর্ণ এক বৎসর স্থায়ী থাকুক, বা না থাকুক। এক কথায় যে পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হলে ঈদুল ফিতরের দিনে ফিতরা ওয়াজিব হয়, সেই পরিমাণ সম্পদ কুরবানীর দিনে (অর্থাৎ ১০/১১/১২ ই যিলহজ্জ) কারো নিকটে কিংবা দু'বৎসর বয়সের গরু বা মহিষের সাত ভাগের অন্ততঃ এক ভাগ অংশে শরীক হয়ে কুরবানী করা ওয়াজিব। তবে গরু-মহিষে একাধিক অংশ নিলে বা একাই একটা কুরবানী করলে, কোন ক্ষতি নেই বরং ভাল। আর কুরবানীর চামড়া পাকা করে নিজে ব্যবহার করা যায়, বা অন্যকে হাদিয়া দেয়া যায়। কিন্তু, বিক্রয় করলে তার মূল্য গরীব-মিসকীনদেরকে দান করা ওয়াজিব।
কোন খালিস দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের গরীব তালিবে ইলমকে দান করলে, দানের সাথে সাথে ঈলমে দ্বীনের সহায়তার সাওয়াব পাওয়া যাবে।
[হিদায়াঃ ১:২৩২]
কুরবানীর জন্তু তিন দিনের মধ্যে কুরবানী না করা
জিজ্ঞাসাঃ কারো উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি সে কুরবানী না করে, তাহলে তার হুকুম কি? এমনিভাবে যদি কুরবানীর জন্তু ক্রয় করার পরও তিন দিনের মধ্যে কুরবানী না করে, তবে যে জানোয়ারটি খরিদ করেছিল, সেটি কি করা হবে?
জবাবঃকারো উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল, কিন্তু সে তিনদিনের মধ্যে কুরবানী করেনি, তাহলে তার উপর একটি ছাগল বা ভেড়া অথবা একটি গরু, মহিষ বা উটের সাতভাগের একভাগের মূল্যে সদকা করা ওয়াজিব।

কুরবানীর জন্তু কেনা সত্ত্বেও কুরবানীর সময়ের মধ্যে যদি সে কুরবানী না করে, তাহলে অবিলম্বে সেই জন্তুই সদকা করা ওয়াজিব। উল্লেখিত অবস্থায় সে

{পৃষ্ঠা-৫০১}

ঐ জন্তু নিজে যবেহ করে গরীবদের মধ্যে বন্টন করবে। কিন্তু, সে উক্ত জন্তুর গোশত খেতে পারবে না এবং কোন ধনী লোককেও দিতে পারবে না। এটা শুধু ফকীর-মিসকীনদেরই হক।

রাত্রে কুরবানী করা

জিজ্ঞাসাঃ রাতের বেলায় কুরবানী করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি?

জবাবঃ রাত্রি বেলায় কুরবানী করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, যিলহজ্জ মাসের একাদশ ও দ্বাদশ রাত্রিতে কুরবানী করা মূলত জায়িয। কিন্তু, যেহেতু রাত্রিতে কুরবানী করলে সুন্দরভাবে যবেহের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত ঘটার আশংকা আছে, তাই রাত্রি বেলায় কুরবানী করা মাকরূহে তানযিহী হবে।

উল্লেখ্য, শরীয়তের নিয়ম হিসেবে রাত আগে আসে, দিন পরে আসে। তবে ঈদের পূর্বে রাত্রে এবং ১২ই যিলহজ্জ দিবাগত রাতে কুরবানী করলে তা আদায় হবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে শামী ৫:২০৩# বাদায়িউস সানায়ে, ৭:৫১০# হিদায়া ৪:৪৪৬]

ويجوز الذبح في لياليها الا انه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل. (الهداية:446/4)

কুরবানী জন্তুর মূল্য দান করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন নেসাবের মালিক তার কুরবানীর জন্তু যবেহ না করে তার মূল্য দান করে দিলে কুরবানী আদায় হবে কি–না?

জবাবঃ কোন নেসাবের মালিক যদি কুরবানীর জন্তু যবেহ না করে গরীব মিসকীনদেরকে দান করে দেয়, তাহলে তার কুরবানী আদায় হবেনা। বরং কুরবানী না করলে ওয়াজীব তার যিম্মায় থেকে যাবে। অবশ্য কেউ যদি কোন মারাত্মক উযরের কারনে বা মাস'আলা না জানার কারনে কুরবানীর তিন দিনে কুরবানী না করে থাকে তাহলে তার জন্য কুরবানীর জানোয়ারের টাকা গরীব–মিসকীনদের দান করে দেয়া ওয়াজীব। [প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪৪৭, ফাতাওয়ায়ে শামী ৬:২২৫]

ক্বিরান ও তামাত্তুকারীদের কুরবানী ব্যাংকের মাধ্যমে করা

জিজ্ঞাসাঃহজ্জের সময় ক্বিরান ও তামাত্তুকারীর যে কুরবানী করতে হয়, তা স্বহস্তে করা জরুরী, না ব্যাংকের মাধ্যমে করলেও চলবে?

জবাবঃআহনাফের নিকট ক্বিরান ও তামাত্তুকারীর জন্য ১০ই যিলহজ্জ-এর করণীয় কাজ সমূহের মধ্যে তারতীব ওয়াজিব। কাজেই ১০ তারিখে জামরায়ে আকাবাতে বড় শয়তানকে কংকর মারার পর প্রথম কাজ হল কুরবানী করা। তারপর ইহরাম খুলে হালাল হয়ে তাওয়াফে যিয়ারতের জন্য বাইতুল্লাহ শরীফ যাওয়া।

{পৃষ্ঠা-৫০২}

কাজেই তামাত্তুকারী বা ক্বিরানকারী স্বহস্তে কুরবানী করে হালাল হয়ে যাবে। কিন্তু, যদি ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করতে চায়, তাহলে এতে কুরবানীর সময় অনিশ্চিত হয়ে যাবে এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম খুলতে অসুবিধায় পড়বে। কারণ-কুরবানী না করে মাথা মুণ্ডিয়ে হালাল হলে তারতীব ঠিক না থাকার কারণে দম দিতে হবে। কাজেই হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী করা যাবে না। বরং ওখানের খোলা মার্কেটে গিয়ে নিজ হাতে বা অন্যের হাতে করালে নিজে সামনে থেকে ভেড়া, দুম্বা ও বকরী কুরবানী করা উচিৎ। খোলা মার্কেটে গিয়ে উট কুরবানী করাও ঠিক নয়। কারণ, উট নিজে কুরবানী করা যায় না, অন্যের মাধ্যমে করাতে হয়। তাতেও কুরবানী করতে অনেক বিলম্ব হয়ে যেতে পারে এবং কুরবানীর পর হালাল হয়ে ঐদিন তাওয়াফে যিয়ারত সম্ভব নাও হতে পারে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ১:২৫০]

قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر لماروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان اول نسكنا في يومنا هذا ان نرمي ثم نذبح ثم نحلق ولان الحلق من اسباب التحلل وكذا الذبح حتى يتحلل. (الهداية:250/1)

তাকবীরে তাশরীক তিন বার পড়া জরুরী কি-না?

জিজ্ঞাসাঃতাকবীরে তাশরীক একবার পড়া ওয়াজিব, একবারের বেশী পড়া নিয়ম বহির্ভূত। অথচ আমাদের মসজিদে তিন বার পড়ে এবং বলে-৩ বার পড়া সুন্নাত মুয়াক্কাদাহ। এখন আমরা কোনটা পালন করবো?

জবাবঃ তাকবীরে তাশরীক মূলতঃ একবার পড়া ওয়াজিব। একাধিক বার পড়া ওয়াজিব নয়। তিনবার পড়া ওয়াজিব বা সুন্নাত এটা কোথাও উল্লেখ নেই। বেশী থেকে বেশী কেউ কেউ তিন বার পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন। তবে আল্লামা শামী স্বীয় গ্রন্থ ফাতাওয়া শামীতে বর্ণনা করেন যে, তাকবীরে তাশরীক একবার থেকে বেশী বলা সুন্নাতের পরিপন্থী। হযরত থানবী (রহঃ) তিন বার বলার অভিমতকে দুর্বল বলেছেন এজন্য ফাতাওয়া দারুল উলূমে উল্লেখ করা হয়েছে-

"তাকবীরে তাশরীক একবার পাঠ করাই উত্তম"। সুতরাং এ সমস্ত স্পষ্ট দলীল প্রমাণাদি থাকার পরও কেউ যদি বলে-৩ বার পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ তাহলে সেটা দ্বীন শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতা বৈ আর কি হতে পারে?

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ১:১৫২# ফাতাওয়া দারুল উলূম ৫:২০৩# হিদায়া ১:১৭৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ১:৭১১# আহসানুল ফাতাওয়া ৪:১৪২]

واما عدده وما هيئته فهو ان يقول مرة واحدة الله اكبر- الله اكبر- لااله الاالله والله اكبر- الله اكبر ولله الحمد. (الفتاوى الهندية:152/1)

{পৃষ্ঠা-৫০৩}

লিল্লাহ বোর্ডিং-এর জন্য সদকা, ফিতরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা তুলে শিক্ষকদের বেতন দেয়া

জিজ্ঞাসাঃলিল্লাহ বোর্ডিং-এর জন্য সদকায়ে ফিতর এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা তুলে উক্ত টাকা বোর্ডিং-এ খরচ না করে হিলার মাধ্যেমে মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন জায়িয কি-না? যদি জায়িয থাকে, তাহলে তার পদ্ধতি কি?

জবাবঃ যাকাত, সদকায়ে ফিতরা ও কুরবানীর চমড়ার মূল্য ইত্যাদি কেবলমাত্র গরীব-মিসকিনের হক। গরীব-মিসকীন ব্যতীত কোন ধনী বা নেসাব পরিমাণ মালের মালিককে দান করলে বা তার জন্য খরচ করলে, তা আদায় হবে না। অনুরুপভাবে এ টাকার দ্বারা মসজিদ, মাদরাসা বা যে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন দেওয়াও জায়িয হবে না। উক্ত টাকা ইলমে দ্বীন শিক্ষার্থী গরীব অসহায় ছাত্রদের খাবার-দাবার, কাপড়-চোপড় এবং শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদির জন্য মালিক বানানোর ভিত্তিতে প্রদান করা জরুরী। তবে মাদরাসার সাধারণ ফাণ্ডে যদি কোন টাকা পয়সা না থাকে এবং শিক্ষকদের বেতন না দেয়ার দরুন মাদরাসা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়, যদিও এরুপ হওয়ার কথা নয়। কারণ, কোন দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে সহীহভাবে ত'লীম-তরবিয়্যত হলে ও মুদাররিসগণ আল্লাহর উপর ভরসা রাখলে এবং জনসাধারণের মধ্যে ফরযে আইন পরিমাণ তা'লীমের যিম্মাদারী আদায় করলে সে প্রতিষ্ঠানে আল্লাহর মদদ অব্যাহত থাকবেই। সাধারণতঃ সহীহভাবে পরিচালনার ত্রুটির কারণেই বরকত খতম হয়ে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায় না বললেই চলে।

যাই হোক এরুপ অপারগতার সময় প্রয়োজনের তাগিদে সাময়িকভাবে শরয়ী তামলীকের মাধ্যমে উক্ত টাকার দ্বারা বেতন দেওয়ার অবকাশ আছে। তবে শরয়ী তামলীক সহজ ব্যাপার নয়। এটা কোন বিজ্ঞ মুফতী থেকে সরাসির বুঝে নেয়া উচিত। যাতে করে মানুষের যাকাত ও কুরবানী বরবাদ না হয়ে যায়।

এ বৎসরের কুরবানী আগামী বৎসরে করা

জিজ্ঞাসাঃ একজন লোকের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব এবং সেও নিয়্যত করেছে কুরবানী করবে। কিন্তু গিয়ে দেখল পশুর খুব দাম I তাই সে এবার কুরবানী করল না। এখন সে যদি আগামী বৎসর কুরবানী করে, তাহলে কি তার একটা করলেই চলবে, না দুইটি করতে হবে?

{পৃষ্ঠা-৫০৪}

জবাবঃ কুরবানীর কাযা নেই তাই দাম বেশী হলেও সামর্থ অনুপাতে জানোয়ার ক্রয় করে কুরবানী করে নিবে। কুরবানীর দিনসমূহে কুরবানী না করতে পারলে তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। পরবর্তী বছর দুইটি কুরবানী করলে বিগত বছরের দায় এড়ানো যাবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:১৮০# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১২:৩৩৫]

হাজীদের জন্য কুরবানী করারু নিয়ম

জিজ্ঞাসাঃহজ্ব পালনরত অবস্থায় হাজীদের কুরবানীর বিধান কি?

জবাবঃহজ্বে তামাত্তু ও হজ্বে কিরান আদায়কারীদের জন্য (অর্থাৎ যারা পৃথক পৃথক ইহরামে বা একই সফরে একই ইহরামে হজ্ব ও উমরাহ উভয়টি পালন করবেন) ১০ই যিলহজ্ব সূর্যোদয়ের পর শুধুমাত্র জামরায়ে ‘আকাবহ’ তথা বড় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের পর তাদের মাথা মুণ্ডানোর পূর্বেই কুরবানী করা ওয়াজিব I আর হজ্বে ইফরাদকারীর জন্য (অর্থাৎ যিনি হজ্বের সফরে উমরাহ ছাড়া শুধু হজ্ব করবেন তার) ১০ তারিখ রমীর পর কুরবানী করা মুস্তাহাব। মাথা মুণ্ডানোর পূর্বে হোক বা পরে।

[প্রমাণঃ শামী ২:৫৫৫]

ويجب في يوم النحر اربعة اشياء الرمي- ثم الذبح لغير المفرد- ثم الحلق- ثم الطواف.   (الدر المختار:555/2)

চাকর-চাকরানীকে কোরবানীর গোস্ত খাওয়ানো

জিজ্ঞাসাঃআমরা বাসা-বাড়ীতে যে চাকর-চাকরানী রেখে থাকি। তাদেরকে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো যাবে কি-না?

জবাবঃ কুরবানীর গোশত বাসা-বাড়ীর চাকর-চাকরানীকে বেতন হিসেবে খাওয়ানো জায়িয হবে না। বেতন হিসেবে না খাওয়ায়ে যদি এমনিতেই খাওয়ায়, তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। দারুল উলূম দেওবন্দের মুফতী মাহদী হাসান সাহেব (রহঃ) বলেছেন, কুরবানী বা আকীকার গোশত বেতনের মধ্যে শামিল হবে না। কারণ, মালিক যখন ঐ গোশত স্বীয় ঘরে এনে পাকায়, তখন কুবরানীর গোশতরে হুকুম খতম হয়ে সাধারণ খানার ন্যায় হয়ে যায়ে। কাজেই চাকরকে খাওয়াত কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমানঃ ইমদাদুল মুফতীন ৯৬৬]

قال وياكل من لحم الأضحية ويطعم الاغنياء والفقراء.   (الهداية:450/4)

{পৃষ্ঠা-৫০৫}

কুরবানী ও আকীকার বিভিন্ন মাসায়িল

জিজ্ঞাসাঃ(১) আকীকার গোশত আকীকাকারী খেতে পারবে কি-না?

(২) কুরবানীকৃত জানোয়ার থেকে যবেহকারীকে গোশত দেয়া জায়িয হবে কি?

(৩) একই জানোয়ার দ্বারা ফরয ও নফল কুবরানী করা যাবে কি-না? এমনিভাবে নফল কুরবানীতে একই জানোয়ারে সাতজনের অধিক শরীক হতে পারবে কি-না?

(৫) যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, সে যদি নিজের মৃত পিতার নামে কুরবানী করে, তাহলে তার দ্বারা তার কুবরানী আদায় হবে কি-না?

(৬) কুবরানীর নিয়্যতকৃত জানোয়ারের দুধ এবং বাচ্চা কি করতে হবে?

(৭) কুরবানীর চামড়ার টাকা মাদ্রাসার জেনারেল ফাণ্ডে খরচ করা জায়িয আছে কি-না?

জবাবঃ(১) কুবরানীর ন্যায় আকীকার গোশত আকীকাকারী খেতে পারবে। আত্মীয়-স্বজনদের হাদিয়া দিতে পারবে এবং গরীবদেরকেও দান করতে পারবে। আকীকার জানোয়ারের চামড়া বিক্রয়ের টাকা গরীবদের দান করা জরুরী।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২৯৬]

(২) কুরবানীর গোশত বা চামড়ার মূল্য দ্বারা কসাই, যবেহকারী বা অন্য কাউকে পারিশ্রমিক হিসাবে দেয়া দুরস্ত নয়। তাদের মজুরী পৃথকভাবে দিতে হবে। পৃথকভাবে মজুরী দেয়ার পর কসাই বা যবেহকারীকে অন্যান্য লোকদের মত কিছু গোশত দেয়া জায়িয আছে।

[প্রামণঃ আদ্দুররুল মূখতার ৬:৩২৮]

(৩) হ্যাঁ, একই জানোয়ার দ্বারা ওয়াজিব এবং নফল কুরবানী জায়িয আছে। যেমন কোন কোন শরীক ওয়াজিব কুরবানী অংশ নিল, আর কোন কোন শরীক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তার পিতা-মাতার নামে নফল কুরবানীতে অংশ নিল।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০৪]

এমনিভাবে নফল কুরবানীর ক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তি একটি জানোয়ারের মধ্যে শরীক হতে পারবে। যেমন চার পাঁচ ভাই মিলে পিতা-মাতার ঈদের সাওয়াবের জন্য একটি বকরী কুরবানী দিল বা কুরবানীর গরুর সাত ভাগের শরীক হল।

[পমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯০# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৪:২৮৮# ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪:৩৩৭]

{পৃষ্ঠা–৫০৬}

(৪) কুরবানীর তিন দিনের মধ্যে যদি কোন মুসলমান আকেল, বালেগ ও মুকীম ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ঘর-বাড়িও আসবাব-পত্রের অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা কিংবা সমমূল্যের টাকা (যা বর্তমান হিসেবে আনুমনিক দশ হাজার টাকা) বা সমপরিমাণ অন্য কোন সম্পদ থাকে, তবে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে।

[প্রমাণঃ আদদুররুল মুখতার ৬:৩১২]

(৫) যার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি নিজের পক্ষ থেকে কুরবানী না করে, অন্যের ওয়াজিব কুরবানী করে তাহলে ঐ কুরবানীর দ্বারা তার নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না। কারণ, একটি কুরবানী দুইজনের পক্ষ থেকে যথেষ্ট নয়। আর যদি কুরবানী নিজের পক্ষ থেকে করে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য শুধু ঈসালে সাওয়াব উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উক্ত কুরবানীর দ্বারাই তার ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

[প্রামণঃ ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৮:২১৮# ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৪২০]

(৬) এ সম্পর্কে শরীয়তের মাসআলা হল-কুরবানীর জানোয়ার দ্বারা নিজে উপকৃত হওয়া মাকরূহ। চাই সে ধনী হোক বা গরীব হোক। সুতরাং কুরবানীর জন্য জানোয়ার ক্রয় করার পর যদি বাচ্চা হয়, অথবা যাবেহ করার পর যদি পেটে জীবিত বাচ্চা পাওয়া যায়, তবে ঐ বাচ্চাটি কুরবানী করে দিতে হবে। ঐ বাচ্চার গোশত নিজে খাবে না, দান করে দিবে। তবে বাচ্চা কুরবানী না করে জীবিত দান করে দেয়াও জায়িয আছে। এমনিভাবে কুরবানীর নিয়তে খরিদকৃত জানোয়ারের দুধও নিজে পান করবে না বরং গরীবদের মধ্যে দান করে দিবে।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৩:৩৫৪# ফাতাওয়া শামী ৬:৩২২]

(৭) না। কুরবানীর চামড়ার টাকা সহীহ তামলীক ছাড়া সরাসরি মাদ্রাসার জেনারেল ফাণ্ডে খরচ করা যাবে না।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ৮:২২৯# আযীযুল ফাতাওয়া ৭১৩পৃঃ]

ولا يعطي اجر الجزار منها لانه كبيع. (الدر المختار:328/6)

ولو ارادوا القربة الأضحية اوغيرها من القرب اجزاهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجب على البعض دون البعض. (عالمغيرية:304/5)

وشرائطهما الاسلام والاقامة واليسار الذي يتعلق به....... بان ملك مائتي درهم او عرضا يساويها غير مسكنة وثياب اللباس او متاع يحتاجه الى ان يذبح الأضحية ولو له عقار يشتغله فقيل تلزم لو قيمته نصابا. (الدر المختار:312/6)

{পৃষ্ঠা-৫০৭}

কুরবানীর গোশত বিক্রি করণ

জিজ্ঞাসাঃকুরবানীর গোশত বিক্রি করা জায়িয আছে কি?

জবাবঃকুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর গোশত বিক্রি করা হারাম। এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বিক্রি করে দেয়, তাহলে সেই মূল্য গরীব-মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। ঐ মালিক কোনো মতেই সেই মূল্য ভক্ষণ করতে পারবে না । তবে অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত কুরবানীর গোশতের মালিক হওয়ার পর সে যদি তা বিক্রি করে দেয়, তাহলে তা নাজায়িয হবে না এবং ক্রয়কারীর জন্যও তা কিনতে অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৩]

কুরবানীর দিন হাঁস-মুরগী যবেহ করা

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় অনেক মহিলারা বলে যে, কুরবানীর দিন কুরবানীর পশু ব্যতীত হাঁস, মুরগী ও কবতুর যবেহ করা জায়িয নেই। একথা কি ঠিক?

জবাবঃ যে সকল জীব-জানোয়ার দ্বারা কুরবানী জায়েজ নয়, কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানীর নিয়্যতে ঐ গুলো যবেহ করা মাকরূহ। কুরবানীর নিয়্যত ব্যতীত গোশত খাওয়ার নিয়্যত করাতে কোন অসুবিধা নেই।

[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০০# দুররে মুখতার ৬;৩১৩]

فيكره ذبح دجاجة وديك لانه يتشبه بالمجوس. (الدر المختار:313/6)

কুরবানীর চামড়া ঈদগাহ মাঠের জন্য দান

জিজ্ঞাসাঃআমাদের এখানে একজন আলেম বলেছেন যে, কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি না করে ঈদগাহ মাঠ প্রশস্ত করার জন্য দান করলে তা জায়িয হবে। এ মর্মে ৬৪ টি চামড়া আদায় করে প্রায় ৪২ হাজার টাকা বিক্রয় করা হয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো এটা মাসআলা অনুযায়ী জায়িয হবে কি-না?

জবাবঃ কুরবানীর চামড়া বিক্রী না করে মালিক নিজের ব্যবহার উপযোগী কোন জিনিষ বানিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পারেন। যেমন- জায়নামায, দস্তরখান, পানি রাখার পাত্র ইত্যাদি। অথবা কোন গরীব-মিসকীনকে দান করে দিতে পারেন যাতে সে উক্ত চামড়ার মালিক হয়ে যায়। কিন্তু কুরবানীর চামড়া বিক্রি করে দিলে, তার মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। উল্লেখ্য যে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে দানের দ্বারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে মালিক বানানো হয় না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে কুরবানীর চামড়া বা তার মূল্য দান করা জায়িয নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে ঈদগাহে দান করাতে যেহেতু কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মালিকানা পাওয়া যায় না,

{পৃষ্ঠা-৫০৮}

সেহেতু কুরবানীর চামড়া বা তার মূল্য ঈদগাহে দান করা জায়িয নয়। এখন ঈদগাহের জন্য চাঁদা কালেকশন করে তার সম্প্রসারণ করতে হবে এবং ফাণ্ড থেকে কুরবানীর চামড়ার সমুদয় টাকা গরীব-মিসকীনদের বন্টন করে দিতে হবে।

[প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪৫০]

قال ويتصدق جلدها لانه جزء منها او يعمل منه الة تستعمل في البيت . (الهداية:450/4)

অন্যের পক্ষে থেকে কুরবানী

জিজ্ঞাসাঃ অন্যের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া কুরবানী করলে কিংবা কুরবানীর পর তার অনুমতি নিলে কুরবানী সহীহ হবে কিনা, জানিয়ে বাধিত করবেন।

জবাবঃ অন্যের পক্ষ হতে ওয়াজিব কুরবানীর ক্ষেত্রে কুরবানীর পূর্বেই তার অনুমতি নেওয়া চাই। তবে কোন ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে প্রতি বছর কুরবানী করা অব্যাহত থাকলে, তখন তার অনুমতি ছাড়া

কুরবানী করলেও কুরবানী সহীহ হবে। আর যদি এ ধরণের নিয়ম স্থায়ী না থাকে তাহলে অন্যের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে কুরবানী করলে তার ওয়াজিব আদায় হবে না। আর অন্যের জন্য কুরবানী না হওয়ার ক্ষেত্রে কুরবানী দাতার পক্ষ থেকে সে কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে নফল কুরবানী হলে অন্যের অনুমতি নেওয়া জরুরী নয়। অনুমতি ছাড়া নিজের টাকায় অন্যের জন্য নফল কুরবানী করলে নফল কুরবানী সহীহ হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:৩০২# ফাতাওয়া শামী ৬:৩১৫, ৩৩৫# বাদায়িউস সানায়ে ৫:৬৫# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩;৬১০]

ولو ضحى عن اولاده الكبار وزوجته لا يجوز الا باذنهم وعن الثاني انه يجوز استحسانا بلا اذنهم .   (بزازية)
قال في الذخيرة ولعله ذهب الى ان العادة اذا جرت من الاب في كل سنة صار كالاذن منهم فان كان على هذا الوجه فما استحسنه ابو يوسف مستحسن.   (رد المحتار:315/6)
وان تبرع بها عنه له الاكل كانه يقع على ملك الذابح والثواب للميت..... اقول صرح في فتح القدير في الحج عن الغير بلا امر انه يقع عن الفاعل فيسقط به الفرض عنه وللاخر الثواب.   (رد المحتار:335/6)

{পৃষ্ঠা-৫০৯}

শিকার ও যবেহ সংক্রান্ত মাসায়িল

ইচ্ছাকৃত কোন প্রাণীকে হত্যা করা

জিজ্ঞাসাঃ কোন লোক যদি অহেতুক কোন প্রাণী হত্যা করে, তাহলে তার ইবাদত বাতিল হবে কি- না?
জবাবঃইচ্ছাকৃতভাবে কোন প্রাণীকে অনর্থক মেরে ফেলা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ। কেননা, এর দ্বারা প্রথমতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুকুম অমান্য করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মাল নষ্ট করা হয়, যা অপচয়। তৃতীয়তঃ আল্লাহর নেয়ামতের নাশুকরী করা হয়। এমনিভাবে প্রাণীকে কষ্ট দেয়া হয়। অথচ শরীয়তে যবেহের সময় প্রাণীকে বেশী কষ্ট না দেয়ার জন্য ভাল করে ছুরি ধারালো করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যদি কেউ অহেতুক কোন প্রাণীকে হত্যা করে থাকে তবে তার খাঁটি অন্তরে আল্লাহর নিকট তাওবা করা উচিত এবং এর দ্বারা আমল বাতিল হবে না।
[প্রমাণঃ সূরা আন'আম ১৪১# সূরা ইবরাহীম ৬# মুসলিম শরীফ ২:১৫২# আবূ দাউদ শরীফ ২:৩৬২]

মহিলাদের দ্বারা যবেহকৃত জন্তুর হুকুম

জিজ্ঞাসাঃমহিলাদের দ্বারা যবেহকৃত জন্তু খাওয়া জায়িয আছে কি-না?
জবাবঃ মেয়ে লোকের দ্বারা যবেহকৃত জন্তু খাওয়া জায়িয আছে। যবেহের ক্ষেত্রে পুরুষ হওয়া জরুরী নয়। কোন সাহায্যকারী না থাকলে পায়ের নীচে দাবিয়েও যবেহ করা যেতে পারে।
[প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪৫০# ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:২৮৬]

والافضل ان يذبح اضحيته بيده ان كان يحسن الذبح .   (الهداية:450/4)
المرأة المسلمة والكتابية في الذبح كالرجل.   (الفتاوى الهندية:286/5)

বন্দুক দিয়ে শিকার করা

জিজ্ঞাসাঃইয়ারগান অথবা বন্দুক দিয়ে যদি বিসমিল্লাহ বলে পাখি শিকার করা হয়, তাহলে জীবিত অবস্থায় পাওয়ার পর যবেহ করা ছাড়া ঐ পাখি খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল কি-না?
জবাবঃইয়ারগান বা বন্দুকের গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত পাখি মারা গেলে খাওয়া জায়িয নেই। আর জান থাকা অবস্থায় যবেহ করা ব্যতীত খাওয়াও হালাল হবে না। সুতরাং ঐ সব পাখী ধরার পর জীবিত অবস্থায় যবেহ করা জরুরী। জীবিত বুঝা না গেলে যবেহ করে দেখবে, যদি রক্ত বের হয় বা সামান্য নড়াচড়া করে তাহলে বুঝতে হবে জীবিত আছে।
[প্রমাণঃ শামী ৬:৪৭১, হেদায়া ৪:৪৮৬# আযীযুল ফাতাওয়া ৭০২]

{পৃষ্ঠা-৫১০}
في الدر المختار: او بندقة ثقيلة ذات حدة.
وفي رد المحتار: والاصل ان الموت اذا حصل بالجرح بيقين حل وان بالثقل او شك فيه فلا يحل حتما او احتياطا. (رد المحتار:471/6)
বড়শী বা কোঁচ দিয়ে মাছ শিকার
জিজ্ঞাসাঃবড়শী ব কোঁচ দিয়ে মাছ ধরা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয আছে কি-না?
জবাবঃ বড়শী বা কোঁচ দিয়ে মাছ ধরা জায়িয আছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা, এক হাদীসে আছে, যে মাছ তোমরা (জীবিত) শিকার কর, তা খাও। এ হাদীসে সব রকমের শিকারকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তা যে ভাবে যে পন্থাই হোক না কেন। কেননা, এ হাদীসে শিকারের বিশেষ কোন পদ্ধতির উল্লেখ নেই।
{واذا حللتم فاصطادوا}. (سورة المائدة:2)
পশুর কোন অংশ হালাল কোন অংশ হারাম
জিজ্ঞাসাঃযবেহকৃত গরুর কোন কোন অংশ খাওয়া জায়িয এবং কোন কোন অংশ খাওয়া জায়িয নয়?
জবাবঃ প্রাণীর আটটি অংশ খাওয়া নিষেধ। যথা-১.পুরুষ লিঙ্গ, ২.স্ত্রীলিঙ্গ, ৩. মুত্র থলি, ৪.পিঠের হাড়ের ভিতরের মগয বা সাদা রগ, ৫. চামড়ার নীচের টিউমারের মত উঁচু গোশত, ৬. অণ্ডকোষ, ৭. পিত্ত ও ৮.প্রবাহিত রক্ত।
উল্লেখিত অংশগুলো ব্যতীত বাকি সব অংশ খাওয়া জায়িয আছে।
[প্রমাণঃ তহতভী ৪:৩৬০# ইমদাদুল মুফতীন ২:৯৭০# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪:১১৮]
اما بيان مايحرم اكله من اجزاء الحيوان سبعة. الدم المسفوح والذكر والانثيان والقبل والغدة والمثانة والمرارة. بدائع. (الفتاوى الهندية:29/5)
যবেহ করার সময় যদি দেহ থেকে মাথা পৃথক হয়ে যায়
জিজ্ঞাসাঃ কোন পশু-পাখি যবেহ করার সময় যদি ছুরী বেশী ধারালো হওয়ার কারণে দেহ হতে মাথা পৃথক হয়ে যায়, তাহরে ঐ প্রাণী খাওয়া জায়িয আছে কি-না?
জবাবঃ কোন পশু-পাখি যবেহ করতে গিয়ে যদি ধারালো ছুরীর কারণে মাথা শরীর থেকে পৃথক হয়ে যায়, তাহলে তা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা বেপরোয়া ভাবে এমনটি করা মাকরূহ। কেননা, এতে প্রয়োজনের বাইরে জানোয়ারটিকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে। আর হাদীসে এমন নিষেধ করা হয়েছে।
[প্রমাণঃ হিদায়া ৪:৪৩৪# ফাতাওয়া আলমগীরী ৫:২৮৬# ফাতাওয়া খানিয়া ৩:৩৬৮# ইমদাদুল ফাতাওয়া ৩:৫৪৮]
{পৃষ্ঠা-৫১১}
পশু পাখির কোন দিকে মাথা রেখে যবেহ করতে হয়
জিজ্ঞাসাঃ আমরা পশুপাখি দক্ষিণ দিকে মাথা রেখে যবেহ করি কেন? অন্যদিকে মাথা রেখে যবেহ করলে কি হালাল হবে না?
জবাবঃ পশু-পাখি যবেহ করার বেলায় আমাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা আল্লাহ তা'আলার নামে যবেহ করা হচ্ছে কি-না? বিসমিল্লাহ বলে যবেহ করলে পশু হালাল হয়ে যায়। তবে যবেহকারী ও পশু উভয়ই যাতে কিবলামুখী থাকে, সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এটা সুন্নাত। এ সুন্নাত আদায়ের লক্ষ্যে পশু-পাখির মাথা দক্ষিণ দিকে করে মুখকে কিবলামুখী করে যবেহ করা হয়।
একথা সত্য যে, যদি কিবলামুখী না করেও যবেহ করা হয়, তাতেও পশু হালাল হবে, গোশত খাওয়া জায়িয হবে। তবে সুন্নাতের প্রতি গুরুত্ব দেয়া এবং সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। কেননা, সাহাবীগণ (রাঃ) যবেহকালে পশুকে কিবলামুখী করে যবেহ করতেন।

[প্রমাণঃ বাদায়ীয়ুস সানায়ে ৫:৬০]
তাছাড়া মুশরেকরা যেহেতু পশু ইত্যাদি যবেহকালে প্রেমিকের দিকে মুখ করে নিতো, তার বিপরীতে মুসলমানদেরকে তাদের পশু কিবলামুখী হয়ে যবেহ করতে বলা হয়েছে। সুতরাং আমরা নিজেদের পশু ইত্যাদিকে সুন্নাত পালনার্থে যবেহের জন্য কিবলামুখী করে নেবো।
[প্রমাণঃ বাদায়ীয়ুস সানায়ে ৬:৬০# ফাতাওয়া রহীমিয়া ২:৯৫]
منها ان يكون الذابح مستقبل القبلة والذبيحة موجهة الى القبلة. (بدائع الصنائع:60/5)
রোগাক্রান্ত গরু-ছাগলের হুকুম
জিজ্ঞাসাঃ কোন হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগল রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর নিকটবর্তী হলে মৃত্যুর পূর্বে ঐ হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগল যবেহ করে খাওয়া যাবে কি-না?
জবাবঃগরু-ছাগল বা হাঁস-মুরগী বা যে কোন হালাল প্রাণী রোগের কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হলে, মৃত্যুর পূর্বে তা শরীয়ত মুতাবেক যবেহ করে খাওয়া হালাল। যদি রোগের তীব্রতা সত্ত্বেও প্রাণীর অবস্থা এমন থাকে যে সাধারণতঃ কোন সুস্থ প্রাণী যবেহ করে ছেড়ে দিলে তার মধ্যে যে পরিমাণ হায়াত বাকী থাকে, ততটুকু জীবন এখনও তার মধ্যে আছে, সে ক্ষেত্রে সেটা যবেহ করে খাওয়া হালাল। মোটকথা, রোগের কারণে যদি নির্জীব হয়ে পড়ে থাকে, এবং যবেহ করার পরে নড়াচড়া বা প্রবহমান রক্ত পাওয়া গেলে,
{পৃষ্ঠা–৫১২}
হালাল হবে। যবেহ করার পরে নড়াচড়া বা প্রবাহমান রক্ত না পাওয়া গেলে এমন প্রাণী মৃত বলে গণ্য হওয়ার কারণে হারাম হবে।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে বাযযাযিয়া ৬:৩০৫# তাবয়ীনুল হাকায়িক ৫:২৯৭]
وفي النوازل ام تحرك بعد الذبح وخرج دم مسفوح يحل وان تحرك ولم يخرج او بعكسه يحل ايضا وان عدمتا لايحل هذا اذا لم يعلم حياتها وقت الذبح فان علم يحل تحرك اولا خرج الدم او لا. (البزازية:305/6)
বিষ জাতীয় দ্রব্যের দ্বারা প্রাণী শিকার
জিজ্ঞাসাঃ বিষের টোপ মাছের ভিতরে দিয়ে সেই মাছ দ্বারা বক বা অন্য কোন প্রাণী শিকার করা যাবে কি-না? এবং যদি শিকারকৃত পাখি বিষাক্রান্ত হয়ে বেঁচে থাকাকালীন যবেহ করা হয়, তবে তা শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ হবে কি-না?
জবাবঃ যদি বিষাক্রান্ত প্রাণীর গোশত খেলে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে শারীরিক ক্ষতির আশংকা না থাকে, তাহলে বিষাক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পূর্বেই যবেহ করে নিতে পারলে উক্ত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা হালাল হবে। তবে বাহ্যিকভাবে এতটুকু বুঝা যায় যে, বিষাক্রান্ত পাখি বা অন্য কোন প্রাণীর গোশত শরীরের জন্য ক্ষতিকর হবে। সুতরাং এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ বস্তু খাওয়া এবং সেভাবে শিকার করা উচিত নয়।
[প্রমাণঃ ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া ৫:৩৪১]

****
###################################
****